GIFT

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা

গবেষক
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466816

DIGITIZED

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুন, ২০১৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
466816

466816

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান পেশকৃত ''বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসির ভূমিকা'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে আমার নিবিড় তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানামতে এটি একটি একক ও মৌলিক গবেষণা। এ অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর কোন অংশ ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করার জন্য অনুমতি দেয়া হ'ল।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

ঢাকা, জুন, ২০১৩

466818

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ''বিশ্বে শান্তি প্রাতষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা'' আমার একক ও মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য পেশকৃত এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

৩০/৬/১৩

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৫৩ সেশন ২০০৪/০৫
পুন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৫/ ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

জুন, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য ২০০৫ সালে আমি ''বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসির ভূমিকা'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করি। দীর্ঘ সময়ে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ-এর তত্ত্বাবধানে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। আমি তাঁর কাছে চিরঋণী এবং তাঁকে বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রীর বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ শেষ করা পর্যন্ত তাঁর যাবতীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আমার অনেক শিক্ষক এবং বন্ধু শিক্ষক বৃন্দ, আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন স্নাতকোত্তর পর্যায় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার এক সময়ের সহকর্মী, অগ্রজ কবি ও গবেষক আবদুল মুকীত চৌধুরীর সার্বক্ষণিক পরামর্শ এবং গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহ করে আমাকে যে সহযোগিতা প্রদান করেছেন সেজন্য আমি তাঁর নিকট ঋণী এবং তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মরত আমার অনেক সহকর্মী গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করতে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করেছেন, আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে আমাকে বাংলাদেশের অনেক গ্রন্থাগার থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। ভারত, মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরব সফর করে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত করেছি। বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস, বাংলাদেশে ওআইসি পরিচালিত Islamic University of Technology (IUT) গাজীপুর, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাভার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম ও ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী লাইব্রেরী, আগারগাঁও, ঢাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

আমার মা, বাবা, ভাই-বোন, ভগ্নিপতি, ভাগ্নি, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এবং আমার শুভানুধ্যায়ীগণ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী হাফিজা জামানের প্রতি আমি একান্ত ঋণী, কারণ সে আমাকে নৈতিক সমর্থন প্রদান করেছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা যার অপরিসীম দয়া, মেহেরবানী ও কুদরতের ফলে আমি গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসংক্ষেপ নির্দেশনা

(ABBREVIATIONS)

আইনী	:	বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমুদ ইবন আহমাদ ইবন মূসা ইবন আহমদ আইনী (র.)
আত্ তামাদ্দুন	:	তারীখুত্ তামাদ্দুনিল ইসলামী
আন্ নুজূমুয যাহিরাহ	:	আন নুজূমুয যাহিরাহ ফী মুলকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ
আবূ হাতিম	:	মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম
আবু জা'ফর আত্ তাহাভী	:	আবু জা'ফর আত্ তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল-হাদীস
আল মুখ্তাসার	:	আল মুখ্তাসার ফী আখবারিল বাশার
আল বিদায়াহ্	:	আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ
আমানী	:	আমানিল আহবার ফী শারহি মা'আনিল আসার
আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ	:	আল জাওহিরুল মুযিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ
আস সুবকী	:	তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহাব আস্ সুবকী
ওয়াফায়াত	:	ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আমবাহু আবানাইয যামান
ইবন খাল্লিকান	:	কাযী আহমদ উরফে ইবন খাল্লিকান
ইবনুস আসাকির	:	আবুল কাসিম ইবন হাসান উরফে ইবনুল আসাকির
ইবনুল সালাহ	:	ইমাম হাফিয আবু আমর উসমান ইবন আবদির রহমান ইবন উসমান ইবন মুসা আশ-শাফিঈ উরফে ইবনুস সালাহ
ইবন হাজার আল আসকালানী	:	আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন শাফিঈ উরফে হাফিয ইবন হাজার আল আসকালানী
কাশফুয যুনূন	:	কাশফুয যুনূন আন আসমাইল কুতুবি ওয়াল ফুনুন
কাশ্ফ	:	কাশফুল আসতার আন রিজালি মা'আনিল আসার
আল-ইবার	:	কিতাবুল ইবার
খাতীব	:	হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইবন আলী উরফে আল খাতীব আল বাগদাদী
খঃ	:	খন্ড
খ্রী	:	খ্রীস্টাব্দ
খুলাসাহ	:	খুলাসাতু তাহ্যীব ও তাহ্যীবিল কামাল

Dhaka University Institutional Repository

জঃ	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তারাজমুল আহবার	:	তারাজিমুল আহবার মিন রিজালি মা'আনিল আসার
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
দ্রঃ	:	দ্রষ্টব্য
পৃঃ	:	পৃষ্ঠা
মাঃ	:	মাসিক
মুকাদ্দিমাতু আমানী	:	মুকাদ্দিমাতু আমানিল আহবার
মুকাদ্দিমাতু ইবনিস্ সালাহ	:	কিতাবু উলূমিল হাদীস উরফে মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ
মৃ.	:	মৃত্যু
ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ	:	ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ
মাকরীযী	:	আহমাদ ইবন আলী আল মাকরীযী
মুহাযারাত	:	মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ
যাহাবী	:	আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন উরফে ইমাম যাহাবী (র.)
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু
র.	:	রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
রাফ'উল ইসর	:	রাফ'উল ইসর আন কুযাতি মিস্র
সং	:	সংস্করণ
সুয়ূতী	:	হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
সাম'আনী	:	আবদুল করীম ইবন মুহাম্মদ আস সাম'আনী
হামাভী	:	আবূ আবদিল্লাহ ইয়াকূত আল-হামাভী
হাফিয ইবন কাসীর	:	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল শায়খ আবু হাফস শিহাবুদ্দীন উরফে হাফিয ইবন কাসীর (র.)
হিঃ	:	হিজরী সাল

ASEAN	:	**Association of South East Asian Nations**
ECO	:	**Economic Cooperation Organisation**
EEC	:	**European Economic Community**
FAO	:	**Food and Agricultural Organisation**

Dhaka University Institutional Repository

GCC	:	Gulf Cooperation Council
GIGO	:	General International Governmental Organisation
ICAO	:	International Civil Aviation Organisation
ICCICE	:	Islamic Chamber of Commerce, Industry and Commodity Exchange
ID	:	Islamic Dinar
IDB	:	Islamic Development Bank
IFSTAD	:	Islamic Foundation for Science, Technology and Development
IGO	:	International Governmnetal Organisation
IINA	:	International Islamic News Agency
ILO	:	International Labour Organisation
IMF	:	International Monetary Fund
INGO	:	International Non-Governmental Organisation
ISBO	:	Islamic States Broadcasting Organisation
ISESCO	:	Islamic Educational Scientific and Cultural Organisation
ISF	:	Islamic Solidarity Fund
MNLF	:	Moro National Liberation Front
MWL	:	Muslim World League
NAM	:	Non-Aligned Movement
QAU	:	Organisation of African Unity
OIC	:	Organisation of Islamic Conference
OPEC	:	Organisation of Petroleum Exporting Countries
PDPA	:	Pepple's Democratic Party of Afghanistan
PLO	:	Palestine Liberation Organisation
SEATO	:	South East Asian Treaty Organisation
UAE	:	United Arab Emirates
UAR	:	United Arab Republic
UNCTAD	:	United Nations Conference on Trade and Development
UNESCO	:	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNIDO	:	United Nations Industrial Development Organisation
UNO	:	United Nations Organisation
WHO	:	World Health Organisation

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালার বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ব্যাপারে এ গবেষণায় অনুসৃত নিয়ম

ব্যঞ্জনবর্ণ		ব্যঞ্জনবর্ণ		স্বরবর্ণ	
ء = ا	উর্ধ্ব কমা '	ط	ত	ـَ	অ, আ
ب	ব	ظ	য	ـِ	ই=ি
ت	ত	ع	উল্টো কমা '	ـُ	উ=ু
ث	স	غ	ঘ	ـَا = ا	আ=া
ج	জ	ف	ফ	ـِي	ঈ=ী
ح	হ	ق	ক	ـُو	উ=ূ
خ	খ	ك	ক	ـَوْ	ও
د	দ	ل	ল	ـً	অন্
ذ	য	م	ম	ـٍ	ইন্
ر	র	ن	ন	ـٌ	উন্
ز	য	و	ভ, ও	ـْ	=হস্ চিহ্ন
س	স	ة = ه	হ, ঃ	ـّ	বর্ণদ্বিত চিহ্ন
ش	শ	ى	য়		অথবা
ص	স, স্ব				J
ض	দ, দ্ব				

দ্রষ্টব্য ঃ (১) শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণে হস্ চিহ্ন না থাকলে তার উচ্চারণ 'অ' কারান্ত হবে।

(২) যেসব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১.	প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ, স্থান ও দেশের নাম	৭২
০২.	ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের তারিখ, সাল, স্থান ও দেশের নাম	৭৫
০৩.	বর্তমান পর্যন্ত ওআইসির মহাসচিববৃন্দের নাম	৭৯
০৪.	ওআইসির সদস্যরাষ্ট্র ও সদস্যপদ লাভের সন	৮৭-৮৮
০৫.	পর্যবেক্ষক সদস্যসমূহের নাম ও সদস্যপদ লাভের বছরওয়ারী তালিকা	২২৯
০৬.	পর্যবেক্ষক সদস্যদেশ সমূহের নাম ও সদস্যপদ লাভের বছরওয়ারী তালিকা	২৩০
০৭.	যে সকল দেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং পর্যবেক্ষক প্রেরিত হয়েছে তার নাম	৩০৬
০৮.	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধে কয়েকটি মুসলিম দেশের পাকিস্তানকে প্রদত্ত অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য	৩২৩
০৯.	বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নাম	৩৩২
১০.	বাংলাদেশে প্রেরিত বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের নাম	৩৩৩
১১.	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী মুসলিম দেশ ১৯৭১-১৯৭৫	৩৩৭-৩৩৮
১২.	২০১০ সালে আইডিবি অনুমোদিত বাংলাদেশে প্রকল্প ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তা	৩৪১
১৩.	অঞ্চল ভিত্তিক তেলের রিজার্ভ	৩৪৮
১৪.	ইসরাইল ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে ১৯৪৭-২০০৮ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী	৩৪৮-৩৪৯
১৫.	এক নজরে আফগান রাজনীতি	৩৬৮
১৬.	বিশ্বে তেলের মওজুদ	৩৭৫
১৭.	ইরান-ইরাক যুদ্ধের ঘটনাবলী যেগুলো যুদ্ধের জন্য দায়ী	৩৭৭-৩৭৮
১৮.	দক্ষিণ এশিয়ার পরমানু শক্তি সম্পন্ন দুই দেশ	৩৮৫
১৯.	অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে অংশ নেয়া বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী	৩৮৮
২০.	জাতিসংঘের সাথে শান্তি কার্যক্রম বিষয়ক তারিখওয়ারী রেজুলেশন	৩৯৩
২১.	বিশ্বে গ্যাস রিজার্ভে পরিমান	৪১০
২২.	এপেকভুক্ত দেশগুলোর সামাজিক তথ্য চিত্র	৪১০-৪১১

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	III
ঘোষণাপত্র	IV
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	V
শব্দসংক্ষেপ নির্দেশনা	VI-VIII
প্রতিবর্ণায়ন	IX
সারণি	X
সূচিপত্র	XI-XIII
ভূমিকা	১৩-১৮
প্রথম অধ্যায় : ইসলামে বিশ্বশান্তির ধারণা	১৯-৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : সমকালীন অবস্থা ও ওআইসি প্রতিষ্ঠা	৪৬-৬৪
২.১. ওআইসি গঠন	
২.২. আর্ন্তজাতিক সংগঠন	
২.৩. শান্তি ও সংঘর্ষ সম্পর্কে ধারণা	
তৃতীয় অধ্যায় : ওআইসি পরিচিতি ও এর সংস্থাসমূহের কার্যক্রম	৬৫-৮৪
৩.১ ওআইসি	
৩.২. ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
৩.৩. সাংগঠনিক কাঠামো	
৩.৪. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন	
৩.৫. পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন	
৩.৬. স্থায়ী কমিটি	
৩.৭. ওআইসি'র সচিবালয়	
৩.৮. আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত	
৩.৯. স্বাধীন স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন	
৩.১০. সহযোগী সংস্থাসমূহ	
৩.১১. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ	
৩.১২. অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ	
চতুর্থ অধ্যায় : ওআইসি-র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৮৫-২২৮
৪.১. ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র	
৪.১.১. আইভরিকোস্ট	
৪.১.২. আজারবাইজান	
৪.১.৩. আফগানিস্তান	
৪.১.৪. আলজিরিয়া	
৪.১.৫. আলবেনিয়া	
৪.১.৬. ইন্দোনেশিয়া	
৪.১.৭. ইয়েমেন	
৪.১.৮. ইরাক	
৪.১.৯. ইরান	
৪.১.১০. উগান্ডা	
৪.১.১১. উজবেকিস্তান	

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১২.ওমান
৪.১.১৩. কমোরু দ্বীপপুঞ্জ
৪.১.১৪. কাজাখস্তান
৪.১.১৫. কাতার
৪.১.১৬. ক্যামেরুন
৪.১.১৭. কিরঘিজিস্তান
৪.১.১৮. কুয়েত
৪.১.১৯. গ্যাবন
৪.১.২০. গাম্বিয়া
৪.১.২১. গায়ানা
৪.১.২২. গিনি
৪.১.২৩. গিনিবিসাও
৪.১.২৪. জর্দান
৪.১.২৫. জিবুতি
৪.১.২৬. টোগো
৪.১.২৭. তাজিকিস্তান
৪.১.২৮. তিউনিসিয়া
৪.১.২৯. তুরস্ক
৪.১.৩০. তুর্কমেনিস্তান
৪.১.৩১. নাইজার
৪.১.৩২. নাইজেরিয়া
৪.১.৩৩. পাকিস্তান
৪.১.৩৪. ফিলিস্তিন
৪.১.৩৫. বাংলাদেশ
৪.১.৩৬. বারকিনা ফাসো
৪.১.৩৭ .বাহরাইন
৪.১.৩৮. বেনিন
৪.১.৩৯. ব্রুনেই
৪.১.৪০. মরক্কো
৪.১.৪১. মৌরিতানিয়া
৪.১.৪২. মালদ্বীপ
৪.১.৪৩. মালয়েশিয়া
৪.১.৪৪. মালি
৪.১.৪৫. মোজাম্বিক
৪.১.৪৬. মিশর
৪.১.৪৭. লিবিয়া
৪.১.৪৮. লেবানন
৪.১.৪৯. সংযুক্ত আরব আমিরাত
৪.১.৫০. সৌদি আরব
৪.১.৫১. সিয়েরা লিওন
৪.১.৫২. সিরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫৩. সুদান
৪.১.৫৪. সুরিনাম
৪.১.৫৫. সেনেগাল
৪.১.৫৬. সোমালিয়া
৪.১.৫৭. শাদ
৪.২. ওআইসি-র পর্যবেক্ষক সদস্যসমূহের পরিচিতি ২২৯-২৪৪
৪.২.১. ওআইসি'র পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্র
৪.২.২. তুর্কী সাইপ্রাস
৪.২.৩. বসনিয়া-হার্জিগোভিনা
৪.২.৪. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
৪.২.৫. থাইল্যান্ড
৪.২.৬. রাশিয়া
পঞ্চম অধ্যায়: ওআইসি'র সম্মেলনসমূহ ও কার্যক্রম ২৪৫-৩১৬
৫.১. ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা
৫.২. ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা
৫.৩. ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্য পর্যালোচনা
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে ওআইসি'র কার্যক্রম ৩১৭-৩৮৯
৬.১. বাংলাদেশ
৬.২. ফিলিস্তিন
৬.৩. আফগানিস্তান
৬.৪. ইন্দোনেশিয়া
৬.৫. ইরাক
৬.৬. ইরান-ইরাক যুদ্ধ
৬.৭. কাশ্মীর
৬.৮. কুয়েত
সপ্তম অধ্যায়: ওআইসি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন ঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ৩৯০-৩৯৬
৭.১. ওআইসির সমালোচনা
৭.২. ওআইসির সফলতা
৭.২.১. জাতিসংঘের সাথে শান্তি কার্যক্রম
৭.২.২. রাজনৈতিক
৭.২.৩. অর্থনৈতিক
৭.২.৪. শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক
৭.২.৫. মানবিক
অষ্টম অধ্যায়: ইসলামের আলোকে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি ৩৯৭-৪১১
নবম অধ্যায়: সুপারিশমালা ৪১২-৪১৪
উপসংহার ৪১৫-৪১৮
গ্রন্থপঞ্জি ৪১৯-৪৩৫
পরিশিষ্ট-১. ওআইসি সনদের বাংলা অনুবাদ ৪৩৬-৪৪৮
পরিশিষ্ট-২. জাতিসংঘ সনদের নিরাপত্তা বিষয়ক ধারাসমূহের বাংলা অনুবাদ ৪৪৯-৪৫৫
পরিশিষ্ট-৩.ওআইসি'র ইংরেজি গঠনতন্ত্র ৪৫৬-৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু তা'লার। অগণিত দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়া-সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের উপর।

বিশ্ব মুসলিম এবং গোটা মানব জাতির কল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিত করার মহতী উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানব সংহতির বৃহত্তর পটভূমিতে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে এবং অমুসলিম শাসনাধীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বকীয় ইতিহাস ঐতিহ্য, ধর্ম, জীবন-দর্শন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন বিকাশ এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় ওআইসি'র প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যয়। ইসলামী মানব সংহতির সার্বজনীন দৃষ্টিকোণের উদারতা যেনো আগ্রাসন ও মুসলিম উৎপীড়ন নির্যাতনের অবকাশ সৃষ্টিতে প্রকারান্তড়রে সহায়ক ও আত্মঘাতী না হয়, ওআইসি- কর্মপরিধিতে এটিও মূল্যায়নযোগ্য অনুসরণীয় সীমারেখা। অর্থাৎ সামগ্রিক মানব-কল্যাণে এই সংস্থার কার্যক্রম সুবিস্তৃত, এটি যেমন সত্য; তিমনি অবৈধ আগ্রাসন, নির্যাতনের বিপরীতে এর মানবিক (এবং সর্বমানবিক) অবস্থান আপোষহীন, এটিও তেমনি বাস্তবসম্মত। মুসলিম জাতির সুরক্ষায় ওআইসি'র কর্মকান্ড প্রতিরক্ষামূলক। এ সংস্থাটি পরঘাতী হবে না, আত্মঘাতও মেনে নেবে না।

বিশ্ব মানবিক প্রেক্ষাপটে ওআইসি-র কর্ম- উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে ইতিবাচক বিবেচনা ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ জন্য যে, এ বিশ্বসংগঠনের কর্মপন্থা গঠনমূলক। মুসলিম বিশ্ব এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও শান্তিনিশ্চিত করতে এর ভূমিকা নিয়মতান্ত্রিক। আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুশীল নীতিমালার ভিত্তিতেই এ সংস্থা পরিচালিত। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নীতি ও দৃষ্টিকোণের সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। ওআইসি মুসলিম বিশ্বে কল্যাণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক মানব সংহতির দৃষ্টিকোণ সমৃদ্ধ; মানবগোষ্ঠীর সার্বজনীনতার চেতনা সমুন্নত রেখে এর ঘোষণা ও কর্মকান্ড পরিচালিত এবং সম্প্রদায়গত ভেদ-নীতির যূপকাষ্ঠে এ সংস্থা কখনো আত্মবিসর্জন দেয়নি বলে এ সম্পর্কে বিভ্রান্তিবা অবমূল্যায়নের অবকাশ নেই। ব্যর্থতা মূল্যায়নের যদিও বা প্রয়োজন থাকে, তা নিছক মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রশ্নে; অন্য কোন জনগোষ্ঠীর ক্ষতি বা অকল্যাণের ব্যাপারে নয়। তারপরও ওআইসি সম্পর্কে অবমূল্যায়ন রয়েছে, উদ্দেশ্যমূলক অপচিত্রায়ন সংস্থাটির মর্যাদা খাটো করতে পারে, এ জন্য এর সম্ভাব্য সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সময়োপযোগী হবে। এর কর্মকান্ড যথাযথ বিশ্লেষণ একান্তই কাম্য। এতে এ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে কোন উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের জবাব যেমন স্পষ্ট হতে পারে, তেমনি ওআইসি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার বিকাশে এ গবেষণাকর্ম সহায়ক হতে পারে। মূলতঃ এ উদ্দেশ্যই আমাকে 'বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি-র ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অভিসন্দর্ভ রচনায় স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন, (ও আই সি) মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও শান্তির লক্ষ্যে নিবেদিত সর্ববৃহৎ বিশ্বসংগঠন বিধায় এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মকান্ড ও সাফল্য সম্পর্কে গবেষণার বিশেষ অবকাশ রয়েছে। সমকালীন ইতিহাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলের প্রেক্ষিতে গবেষণা কর্মের স্বল্পতা রয়েছে। তবে মুখ্য (Primary) উপাদান ও গৌণ (Secndory) উপাদান ব্যবহার করে এস্বল্পতা অনেকটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসি-র প্রকাশনা এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এ সংস্থা বহির্ভূত দেশ-বিদেশের প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাবিদদের এ বিষয়ক রচনাও গবেষণার অবলম্বন হয়েছে। ওআইসি-র শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের ভাষণ-বিবৃতি এতে সংযোজিত হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের গবেষণায় বাংলাদেশের প্রধান গ্রন্থাগারসমূহ যথাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গণ-গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ , বিটিভি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ বেতার গ্রন্থাগার, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। দেশে-বিদেশে প্রকাশিত এবিষয়ক গ্রন্থাবলী, সাময়িকী, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা থেকে গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সৌদি আরবের জেদ্দাস্থ সংস্থাটির সচিবালয় এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশসহ বিশ্বের অপরাপর দেশ ভ্রমণ করে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ওআইসি-র তথ্য উপাত্ত অভিসন্দর্ভের জন্য সংগ্রহ করা হয়। ওআইসি সংশ্লিষ্ট বা ওআইসি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব বৃন্দের সাক্ষাতকার ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

উল্লেখ্য সমকালীন ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত ৫টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে ঃ (১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (২) আইনগত পদ্ধতি (৩) বর্ণনামূলক পদ্ধতি (৪) আদর্শভিত্তিক পদ্ধতি (৫) সমন্বিত পদ্ধতি।[১] ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কলা, সমাজ বিজ্ঞান , আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ইতিহাস নির্ভর একটি সমন্বিত বিষয় হওয়ায় উপরে উল্লেখিত ৫টি পদ্ধতি প্রযোজ্য হিসেবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এসবের ব্যবহার করা হয়েছে।

বিগত চার দশক (১৯৬৯-২০১০) ধরে এ সংস্থা মুসলিম বিশ্বের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সক্রিয়। এর যাত্রাপথ কখনো উজ্জ্বল, কখনো খানিকটা নিষ্প্রভ হলেও এ জাতীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। যথাযথ গতিশীল নেতৃত্বের সাথে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতার সমন্বয় ঘটলে এ সংস্থা লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরো গতিশীল ভূমিকা রাখতে এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কল্যাণ ও শান্তিনিশ্চিত করতে আরো সফল হতে পারবে। প্রয়োজন সংহত চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।

উল্লেখ্য, এ সংস্থার আন্তর্জাতিক পরিসর ও ইমেজের তুলনায় এ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে অভিসন্দর্ভ পর্যায়ে এ বিষয়ে গবেষণা-মূল্যায়ন সমৃদ্ধ গ্রন্থ নেই এবং সাধারণ ভাবে এ বিষয়ে বইপত্রের অভাবও প্রকট। ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি।

---

(১) আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক*-১৯৭১-১৯৮১, অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশ, সার্ক, জাতিসংঘ-এপেক, ওপেক, ন্যাম সম্মেলন সংস্থাসমূহ নিয়ে বাংলাদেশে অনেক কাজ বাংলা ভাষায় ও ইংরেজি ভাষায় হলেও ওআইসি এবং ওআইসির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে এ দেশে কোন ভাষায়ই তেমন কাজ হয়নি। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ঐ সময় পর্যন্তবাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কিছু লেখা-লেখি হয়েছে। তবে গবেষণা পর্যায়ে কোন কাজ তখনও হয়নি। উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো- Global-Geo. Strategy of Bangladesh, OIC and Islamic Ummah[২] বইটিতে OIC মুখ্য শিরোনাম থাকলেও এখানে সার্ক, ন্যাম এবং UN বিষয়ে প্রায় সম-আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ OIC তে যোগদানের প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে দুটি প্রবন্ধে। Organisation of Islamic Conference Theory and Practice of Pan-Islamic Coopration[৩] বইটি একমাত্র OIC এর উপর ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম নিয়ে রচিত একটি গবেষণা কর্ম। এতে ১ম থেকে ১০ তম শীর্ষ সম্মেলন এবং শুরু থেকে ২১ তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন পর্যন্তআলোচনা হয়েছে। OIC এর বিভিন্ন এজেন্সি এবং ওআইসির অভ্যুদয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সামান্য। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি[৪] নামে একটি প্রবন্ধ এবং মক্কা ঘোষণা [৫] অনুবাদ নামে অপর একটি প্রবন্ধ অর্থাৎ মোট ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার উপকরণ হিসেবে প্রবন্ধ ২টি যথেষ্ট নয়। একই পত্রিকার একই বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা রাবাত ঘোষণা [৬] লাহোর ঘোষণা [৭] ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন [৮] সহ ঢাকা ঘোষণা [৯] বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা কর্মের উপকরণ হিসেবে এসব প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ হলেও চূড়ান্ত বিচারে এটিও পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা কর্ম নয়।

---

(২) Syed Tayyeb-ur-Rahman, *Globalgeo-Strategy of Bangladesh*, OIC and Islamic Ummah, Islamic Foundation, Dhaka,1985, P.59

(৩) Noor Ahmad Baba, Organisation of Islamic Conference Theory and practice of pan Islamic Cooperation, Dhaka-1994, p-63-67, XIV-XVI.

(৪) সাহাবউদ্দিন খান, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি), *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ.১২৪-১৩০।

(৫) মোহাম্মদ জহুরুল আশরাফ, *মক্কা ঘোষণা*, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩১-১৩৯

(৬) সাজ্জাদ হোসাইন খান, *রাবাত ঘোষণা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪,পৃ-৫৩৯-৫৪০

(৭) লাহোর ঘোষণা, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৪১-৫৪৩

(৮) পূর্বোক্ত, পৃ-৫৪৪-৫৫০

(৯) পূর্বোক্ত, ঢাকা ঘোষণা, পৃ-৫৫০-৫৫২

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh and Muslim Countries: A Political Study (1972-1990)[১০] গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইংরেজি ভাষায় রচিত, বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের ১৯৭২-১৯৯০ সাল পর্যন্তরাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত একটি গবেষণা কর্ম। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অব্যবহিত পরে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন আচরণ এবং স্বাধীনতার স্বীকৃতির বিষয়টি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভাবে আলোচিত হয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে OIC প্রসঙ্গ এতে আলোচিত হলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কখনো OIC থাকে নি। এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় বাংলা ভাষায় বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ওআইসির ভূমিকা অভিসন্দর্ভ পর্যায়ে একটি গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতা রয়েছে। সুতরাং যথাযথ তথ্য-উপাত্ত, উপকরণভিত্তিক বিস্তৃত আলোচনা-পর্যালোচনা, ইতিবাচক মূল্যায়ন সমৃদ্ধ এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থার নির্দেশনামূলক তথ্যবহুল বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রণয়ন এই অভিসন্দর্ভের পরিধিভুক্ত।

অভিসন্দর্ভে অধ্যায়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাঝানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ''বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা'' বিষয়ক অভিসন্দর্ভে সর্বমোট নয়টি অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। তম্মধ্যে প্রথম থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত মূল অভিসন্দর্ভ রচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভূমিকা মূলত অভিসন্দর্ভের ভূমিকা গবেষণা পদ্ধতি, প্রকাশনা পর্যালোচনা ও অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'ইসলামে বিশ্বশান্তির ধারণায়' বিশ্ব শন্তি প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ধর্ম ইসলামের শিক্ষাগুলো কি কি, কিভাবে বিশ্ব শান্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় সমকালীন অবস্থা ও ওআইসি প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়-এ অধ্যায়ে ওআইসির গঠন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে, যেমন ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ অধ্যায় শান্তি ও সংঘর্ষ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ওআইসি বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করে এবং বর্তমান অভিসন্দর্ভের শিরোনামে ওআইসির বিশ্বশান্তি কার্যক্রম গ্রহণ করে বিধায় শান্তি ও সংঘর্ষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। তৃতীয় অধ্যায়ে ওআইসির পরিচিতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সাংগাঠনিক কাঠামো, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন তথা ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন, মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সম্মেলন, স্থায়ী কমিটি, ওআইসির সচিবালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত, স্বাধীন স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন, ওআইসির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত সহযোগি সংস্থাসমূহ, বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠাসমুহ এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, এই অধ্যায়ে ওআইসি সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে কি কি কার্যক্রম রয়েছে এবং সদস্য কারা ও তাদের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। ওআইসির পর্যবেক্ষক সদস্যদের বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি কার্যকরী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হলে এটি যে বিশ্ব সংস্থার আকৃতি ও প্রকৃতি ধারণ করেছে মুলত তা বুঝানোর জন্যই এ অধ্যায়ের অবতারণা।

---

(১০) Abdullah-AL-Mamun, *Bangladesh and Muslim countries: A Political study, 1972-1990*, Departant of Political Science, University of Dhaka, Dhaka 1996, p.2.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ে ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত, ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনামে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে অবস্থান করে নেয়ার পর কিভাবে ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে, সদস্যপদ লাভের পর থেকে ওআইসিতে এবং এ দেশে ওআইসি কি কি কাজ করে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ওআইসি গঠনে ফিলিস্তিন সমস্যা অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই অধ্যায়ে ফিলিস্তিন সমস্যার পটভূমি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ, প্যালেষ্টাইনের মুক্তি বা অধিকার আদায়ের জন্য যে সকল দল বা গোষ্ঠির জন্ম হয়, যেমন PLO এবং হামাস-এদের সম্পর্কে আলোচনা করে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

''সমস্যা গ্রস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম'' খুবই সময়োপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় বিধায় বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশে এবং অমুসলিম দেশে, অন্যভাবে বললে ওআইসিভুক্ত দেশে বা ওআইসি সদস্য নয় এরূপ সমস্যা গ্রস্থ দেশের সমস্যার কারনে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, মানবতা হোচট খাচ্ছে-আলোচ্য অধ্যায় এ সকল দেশের সমস্যা সমূহের তথ্যকথা, সমস্যার বিষয়ে আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ওআইসি কি কি কাজ করছে, তার উল্লেখের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ অনুযায়ী আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, কাশ্মীর, কুয়েত ইত্যাদি সমস্যাগ্রস্থ দেশ এবং এলাকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম ওআইসির কার্যক্রম মূল্যায়ণ: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি। এ অধ্যায়ের একটি বিশেষ দিক হলো ওআইসি যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ণ। এ অধ্যায়ে সংস্থাটির কর্মকান্ডের পর্যালোচনা তথা সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা। অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম ইসলামের আলোকে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি। ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং এর মূল আদর্শ ইসলাম, ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য প্রকাশের এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামের নীতির অন্যতম ভিত্তি হলো 'মুসলিম ঐক্য'। ফলে আলোচ্য অধ্যয়টিও প্রাসঙ্গিক এবং এর বিষয়বস্তু অত্যান্ত গুরুত্ব পুর্ণ। নবম অধ্যায়ে সুপারিশমালা ও উপসংহার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রন্থপঞ্জি এবং পরিশিষ্টতে ওআইসির ইংরেজি গঠনতন্ত্রের বাংলা অনুবাদ পরিশিষ্ট ১ এ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো পরিশিষ্ট ২ এবং ওআইসি'র ইংরেজি গঠনতন্ত্র পরিশিষ্ট-৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

''বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ এ বিষয়ে মূল্যায়ণ প্রচেষ্টায় অন্যতম সংযোজন এবং সন্ধানী জ্ঞানপিপাসুদের জন্য বাস্তবতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক এবং মুসলিম বিশ্ব সংস্থা। মানব জাতির কল্যানের ও শান্তির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য যে কয়টি বিশ্ব সংস্থা কাজ করে ওআইসি তার অন্যতম একটি। এটি যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও শান্তির জন্য কাজ করবে তেমনি অপরাপর সম্প্রদায় ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। এরূপ একটি কর্মকান্ড, সংস্থা এবং জ্ঞানের বিষয় এতদিন মানব জাতির তথা বাংলা ভাষাভাষিদের নিকট অনেকটা অনুদার ছিল। এ বিষয় পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণার ফলে মানব জাতির তথা বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট জ্ঞানের একটি আঁকর উম্মোচিত হলো। বাংলা ভাষায় এ অভিসর্ন্দভটি লিখিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষি মানুষ জ্ঞানের এই নতুন দিকটিকে অতি সহজে কাছাকাছি পাবে, লাভ করতে পারবে এতদবিষয়ক তথ্য উপাত্ত। অন্যান্য ভাষাভাষি মানুষের নিকটও এটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রার যোগ করবে। এ অভিসন্দর্ভ পাঠান্তে পাঠক ওআইসি'র পরিচিতি এবং বিশ্বের সমস্যাগ্রস্থ দেশে ওআইসির শান্তি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে জানতে পারবে বলে আমি মনে করি।পরিশেষে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ''বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন এবং এটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়: ইসলামে বিশ্বশান্তির ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়: ইসলামে বিশ্বশান্তির ধারণা

বিশ্ব শান্তির ধারণা ইসলামে অত্যন্ত মৌলিক ইতিবাচক এবং সর্বাত্মক। ইসলামের প্রকৃতির সাথে এ ধারণা গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। জীবন, জগত এবং মানুষ সম্পর্কে মানুষের সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এর সম্পর্ক সুগভীর। ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থা, তার আইন-বিধান, বিধি-ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান সবই এর ধারণার সাথে যুক্ত। এ ধারণা গোটা ইসলামের সাথে এমন ভাবে মিশে আছে যে, এর অধ্যয়নকারীকে এর গভীর এবং সুদূরপ্রসারী শেকড়ের সন্ধান করতে হবে। সে পর্যন্ত পৌছার জন্যে প্রয়োজন গভীর দূরদৃষ্টি, ধৈর্য-স্থৈর্য এবং বিচক্ষণতা। ইসলামের সর্বাত্মক দর্শনের সকল দিক ও বিভাগ একে অপরের সাথে যুক্ত। এ সর্বাত্মক দর্শন, তার সকল খন্ডিত অংশের ধারণা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত সুদৃঢ় সম্পর্ক । গভীর ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে জানা যায় যে, ইসলাম মানব জীবনের সমস্যাবলীর বিচ্ছিন্ন সমাধান পেশ করে না। তার কোন খন্ডিত অংশকে এমন ভাবে স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর স্থাপন করে না, যাতে অন্যান্য ভিত্তির সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকে। পক্ষান্তরে ইসলাম সে সবকেই এক কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপন করে এবং ব্যাপক খুঁটির চারপাশে আবর্তিত করায়। কিছু দৃশ্য অদৃশ্য বিষয় তার এসব জীবন সমস্যাকে একই খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। এ সম্পর্ক সর্বাবস্থায় অটুট থাকে। ইসলামের সকল বিষয় এবং আদেশ নিষেধ মিলে সৃষ্টি হয় এক সর্বত্মাক ঐক্য। জগত জীবন এবং মানুষের কল্যাণ ও শান্তির লক্ষ্যে ইসলামের সর্বত্মাক দর্শন হচ্ছে এ ঐক্যের উৎস।[১]

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকেও ভালবাসতে উদ্ধুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা যোগায়। তাতেই বিশ্ববাসীর জীবনধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হয় অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা কালো সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভুক্ত। রাসুল্লাল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের ন্যায়।[২]

বস্তুত মানব জাতি একটি দেহের মত। কেননা আমরা সকলেই আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ[৩]

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم- ان الله عليم خبير.

১। সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম*, (অনুবাদ, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী) *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ,২৪

২। আল খালকু ই'য়ালুল্লাহ

৩। আল কুরআন, ৪৯:১৩ (হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন)

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম শুধু মানুষের প্রতিই সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়নি, উপরন্তু প্রাণীর পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ও সুষম ব্যবহার সম্পর্কেও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যারা দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর তা হলে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। মোটকথা, সমস্ত সৃষ্টি জড় অজড় প্রাণী ও প্রকৃতি সকলেই ইসলামের উদারতায় উদ্ভাসিত। ইসলাম শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম নয়। বরং তা বিশ্বাস ও কর্মের এক সুষম সমন্বয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি।[৪]

আবদুল মুকীত চৌধুরী উল্লেখ করেন- Peace is the root of Islam. Peace in the family, in the neighbourhood and society, peace at the national and international levels is the goal of Islam. The Holy Quran, as revealed from Allah Rabbul Aalameen and the Sunnah, as manifested in the life of Sayyidul Mursaleen Rahmatullil Aalameen Hazrat Muhammad (SM) has defined and described the principles and way of realising peace in all these spheres.

According to the Holy Quran, human beings owe their inheritance from Hazrat Adam (AS) and Hazrat Hawa (AS), the father and the mother. Thus mankind is a great family in Islamic perspective. The whole of human race is a society of brethren. In spite of various castes, creeds, colours and nations, there should be the tie of onehood. Those who believe in Islam, must believe in the brotherhood of mankind, whatever difference of varities there be. The concept lays the foundation structure of world peace. Besides, Islamic belief in Tawhid or the Oneness of the Creator is also very important and significant in this regard.[৫]

এ বিশ্ব জগতে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এর সুদৃঢ় গঠন এবং প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলা, লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, তা জীবনের বিকাশ ঘটাবে, তার প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সরবরাহ করবে এবং জীবজগতের প্রয়োজন পূরণ করবে। অতঃপর জীবনকে ধ্বংস ও বিনাশ থেকে রক্ষা করবে। যমীন সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা যাক। আল্লাহ বলেন [৬]

وجعل فيها رواسى من فوقها وبرك فيها وقدر فيها اقواتها فى اربعة ايام.

৪। সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ,৩৭-৩৮

৫। Abdul Muqit Chowdhury, *Islamic occasions*: Rituals, spirit and message, Islamic Foundation, Dhaka, 2010, p,60

৬। আল কুরআন, ৪১:১০ ('তিনি যমীনের বুকে স্থাপন করেছেন বিশাল পর্বতমালা, তাতে নিহিত রেখেছেন বরকত এবং জীবন জীবিকার রকমারি উপকরণ')

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'লা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুযী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ভূ-খন্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারী করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূ-খন্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন ভূ-খন্ডে তার অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার খনিজদ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু জানোয়ার ও পোষাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন রূপ হয়েছে। কোন ভূ-খন্ডে গম, কোন ভূ-খন্ডে চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তূলা, কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। এতে এ উপকার আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোন ভূ-খন্ডই অন্য ভূ-খন্ডের উপর অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে।[৭]

আসমান যমীনের মাঝখানে যে হাওয়া জীবন এবং প্রাণীকূলের সেবায় নিয়োজিত তাও তো সৃজন ও স্থাপন করেছেন তিনিই ঃ আল্লাহ বলেন,[৮]

الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلله- فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون.

আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবনের সাধারণ প্রকৃতিতে সহযোগিতা সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করেন, বিদূরিত করেন সংঘাত আর সংঘর্ষের ধারণা, যেমনভাবে বিশ্ব সৃষ্টির গঠন প্রণালীতে লক্ষ্যে পৌছার পথের সূচনা করেন এবং নিয়ম শৃংখলাবিহীন দৈবাৎ ঘটনাচক্রের কথা অস্বীকার করেন।

বিশ্বের বুকে বিচরণশীল প্রানীকুল একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত আর তার সকল আকার আকৃতিও একই ধাতুমূলের সমন্বয়ে গঠিত। সে মূল ধাতু হচ্ছে পানি যা সকল প্রাণীর উৎস ঃ 'আল্লাহ বলেন,[৯]

وجعلنا من الماء كل شيئ حي افلا يؤمنون.

আর প্রাণীকূলের মধ্যেও উন্নত শ্রেণী একটি বৈশিষ্ট্যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টিতে সম অংশীদার। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-[১০]

سبحن الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون.

৭। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ), *তাফসীরে মাআ'রেফুল কোরআন*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী, পৃ, ১২০১

৮। আল কুরআন, ৩০:৪৮ ('তিনিই তো আল্লাহ যিনি হাওয়া প্রবাহিত করেন, অতঃপর তা মেঘমালা ছড়িয়ে দেয়, আর তিনিই আসমানের বুকে তা বিস্তৃত করেন যেমন খুশি যেভাবে খুশি। আর তাকে করেন টুকরো টুকরো, অতঃপর আপনি (হে নবী!) দেখতে পান, সে মেঘমালার ফাঁক দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশি যখন তা পৌঁছে দেন, তখন তাঁরা কতই না উৎফুল্ল হয়')

৯। আল কুরআন, ২১:৩০,(এবং আমরা পানি থেকে সকল জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি)

১০। আল কুরআন, ৩৬:৩৬. (তিনিই তো পবিত্র মহান সত্তা, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু মাটিতে জন্মায়, আর তাদের নিজেদের মধ্য থেকেও আর তারা যা কিছু মোটেই জানে না এমন সব জিনিসের মধ্য থেকেও)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ বলেন, [১১]

فاطر السموت والارض وجعل لكم من انفسهم ازواجا ومن الانعام ازواجا.

এসব প্রাণীকূল একই ধরনের সামাজিক সংগঠনে অংশীদার। আল্লাহ বলেন, [১২]

وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم.

এমনিভাবে স্থাপিত হয় পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল সকল প্রাণীর মধ্যে উৎসমূল ভিত্তিক। এরা সবাই মিলে পরিণত হয় একই পরিবারে। এ পরিবারের উদ্ভব একই মূল থেকে। যেন উন্নত স্তরের প্রাণীদের মধ্যে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। তাদের মধ্যে স্থাপিত হয় একাত্মতা ঐক্য, নৈকট্য, আত্মীয়তা। মানুষ হচ্ছে প্রাণিকূলের মধ্যে সর্বোচ্চ আদর্শ-বিশ্ব জাহানের আদি উপাদান থেকে তার সৃষ্টি। এ উপাদানের সাথে তার সম্পর্ক অতিশয় গভীর। আল্লাহ বলেন, [১৩]

ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين.

অতঃপর মানবগোষ্ঠির সদস্যবর্গ তাদের মৌলিক ঐক্যের কারণে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত মূলের সাথে সকলের সম্পর্ক সমান। মানবগোষ্ঠির সকল সদস্য একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি। এ প্রাণ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে তার জোড়া। আর এতদুভয় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অন্য সকল মানুষ। আল্লাহ বলেন, [১৪]

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

পারস্পরিক পরিচিতি আর প্রীতি-ভালবাসার জন্যই এ সবের সৃষ্টি; অনৈক্য এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে নয়। আল্লাহ বলেন, [১৫] يا ايها الناس ان خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.

এমনিভাবে ভিত্তি, প্রকৃতি, এবং বিকাশে মানবীয় ঐক্য সপ্রমাণ করে পৃথক পৃথক দল গোত্রের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বংশ গোত্রের বিরোধের সকল কার্যকারণ অপসারণ করা হয়েছে। স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে বংশ গোত্রের বিভক্তি পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্প্রীতির জন্যে; অনৈক্য ও বিভেদের জন্যে নয়।

১১। আল কুরআন, ৪২:১১.(তিনি আসমান যমীনের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর জন্তু জানোয়ারের মধ্যে থেকেও জোড়া পয়দা করেছেন)

১২। আল কুরআন, ৬:৩৮. (পৃথিবীতে বিচরণশীল যত জন্তু জানোয়ার আছে, আর পাখা দ্বারা উড়ে এমন যত পাখি রয়েছে, এরা সবই তোমাদের অনরূপ দল ছাড়া কিছুই নয়)

১৩। আল কুরআন, ২৩:১২. (সন্দেহ নেই, আমরা মানুষকে কাদা মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি)

১৪। আল কুরআন, ৪:১. (হে মানবমন্ডলী! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া আর এ উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী পুরুষ)

১৫। আল কুরআন, ৪৯:১৩. (হে মানবমন্ডলী! আমরা তোমারদেরকে এক নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন দল গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারে')

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ধর্মের অন্যতম অপরিহার্য শিক্ষা হিসেবে বলবৎ করেছিলেন 'নারীর প্রতি সম্মান'। তিনি জীবন ব্যবস্থায় নারীদের এমন সব অধিকার প্রদান করেছেন যা তারা এর পূর্বে কোন দিন পায়নি। তিনি তাদেরকে এমন সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন যা কালের অগ্রগতির সঙ্গে অধিকতর পরিপূর্ণতার সঙ্গে মূল্যায়িত হবে। সমুদয় আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও ভূমিকা পালনে তিনি নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে নিখুতভাবে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন বিনষ্ট করার অধিকার কোন অমিতব্যয়ী স্বামীর নেই। আইনের অধিকার বলে নারী তার স্বামী বা পিতার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে তার ব্যক্তিগত অধিকারের সীমানায় তার নিজের ও সম্পত্তির যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা করে। কোন বন্ধুর সাহায্য ব্যতিরেকে, স্বামীর নামের ছত্রছায়া ছাড়া সে তার অধমর্ণের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারে। পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে গমনের পরও সে আইন মোতাবিক তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। একজন মহিলা ও স্ত্রী হিসেবে সে সুযোগ সুবিধা লাভ করে তা ''পরিবর্তনশীল'' স্বেচ্ছজন্যের বলে নয়, আইন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আইনের বলে নিশ্চিত ধারায়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মুসলিম মহিলার মর্যাদা অনেক ইউরোপীয় মহিলার মর্যাদার তুলনায় অধিকতর প্রতিকূল নয় বরং অনেক দিক দিয়ে সে নিশ্চিত উত্তম মর্যাদার অধিকারিণী।[১৬] নারীদের মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে কিংবা মেয়ে হিসেবে ইসলাম সম্মান প্রদান করে মূলত: পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য স্থাপন করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে শান্তিময় সমাজব্যবস্থা। আর এ নারী ও পুরুষমিলেই একটি জাতি। আল্লাহ মানব জাতির কাছে একই পয়গাম প্রেরণ করেছেন। এ পয়গামে ঈমান আনয়নকারী সকলে একই উম্মত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, [১৭]

شرع لكم من الذين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسي ان
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.

আলোচ্য আয়াতে ধর্ম বলতে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্মকে বুঝানো হয়েছে যা সমস্ত নবীগণের অভিন্ন ও সর্ব সম্মত ধর্ম। একই সাথে বিবেদ সৃষ্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। নবীদের কথা উল্লেখ করে আরো অনেক আয়াত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন[১৮], قلولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسبا وما اوتى موسي وعيسي وما اوتى النبيون من ربهم ولا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون.

১৬। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩২৩, ৩৫৫

১৭। আল কুরআন, ৪২:১৩ (আল্লাহ তোমাদের জন্যে দীন নির্ধারণ করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন নূহ (আ)-কে আর (হে নবী!) তাই আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, আর তারই হুকুম দিয়েছি ইবরাহীম (আ)-কে মূসা (আ)-কে। (নির্দেশটি এই) যে, তোমরা সকলে দীন কায়েম কর, তাতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করো না)

১৮। আল কুরআন, ২:১৩৬ (তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রতি যে শিক্ষা অবতীর্ন হয়েছে, আমরা তা মেনে নিয়েছি। ইবরাহীম, ইসমাইল ইসহাক, ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম) এবং তাদের বংশধারায় যে দীন নাযিল করা হয়েছে, আমরা তা মেনে নিয়েছি। মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীর প্রতি তাঁদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যে বিধান প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা তাঁদের কারুর মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি অনুগত)

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, [১৯]

يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون.

এমনিভাবে ইসলাম সকল ধর্মীয় বিরোধের কার্যকারণ দূরীভূত করেছে এ বক্তব্য দিয়ে যে, সব দীনই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর তা হচ্ছে এক দীন। ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে এই যে, কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক না করে কেবল তাঁর সামনেই মাথা নত করতে হবে। এক আল্লাহর ইবাদত হচ্ছে নিঃশর্ত। কোন প্রকার পার্থক্য ছাড়াই সকল ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত। এ মহা ঐক্যের ধারণা বদ্ধমূল করার জন্যে ইসলাম আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলাম এ ঐক্যকে অন্তরের গভীরে, দেহ-প্রাণের এবং আত্মার আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রবেশ করায়। মানব জীবনের সকল প্রান্তে এবং সকল দিকে ইসলাম তাকে নিয়ে যায়।[২০]

বিশ্বশান্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো মানব জাতির মাঝে বিভাজন। বিশ্ব মানবতাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে খন্ডিত আকারে দেখা হয়েছে। স্বয়ং স্রষ্টাকে পর্যন্ত কেবল একটি বিশেষ জাতির সাথে সম্পৃক্ত করে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেমন ইহুদি ধর্মে যিহোভাকে ইহুদিদের ঈশ্বর এবং ইহুদি জাতিকে তার বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত জাতি বলে অন্যদের থেকে বিশেষ মর্যাদা ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ধর্ম ও দর্শনে মানুষের মাঝে বিশেষ শ্রেণীকে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের মুখ থেকে এবং শূদ্ররা তাঁর পা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে ভাবা হয়েছে। কেউ কেউ ঈশ্বরকে কালোরূপে কেবল কালোদের জন্য আবার কেউ পরম সত্তাকে নারীরূপে কল্পনা করেছে এবং সেভাবে তার সাথে সাজুয্য অনুযায়ী নৈকট্যের দাবি করেছে।

বিশ্বনবী (সা) এ ধরনের চিন্তাধারাকে বিশ্ব মানবিক ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ঘোষণা দেন স্রষ্টা কোন বিশেষ মানব গোষ্ঠির নন। তিনি নর বা নারী নন, এ জাতীয় বিশেষণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান সত্তার প্রতি প্রযোজ্য নয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি বা তিনি কারো জাতও নন। তাঁর কাছে নৈকট্যের মানদন্ড সৎ, বিশ্বাস ও শুভ কর্ম। যে কেউ তাঁর প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখবে ও সৎকাজ করবে, সে যে জাতিরই হোক যে ভাষাতেই কথা বলুক, তার গাত্রবর্ণ যেরূপই হোক, সে নারী বা পুরুষযাই হোক-এতে করে তাঁর কর্মের সুফল লাভে বা সে অনুযায়ী মর্যাদা পেতে কোন অসুবিধা হবে না।[২১]

১৯। আল কুরআন,২৩:৫১-৫২ (রাসূলগণ! তোমরা পাক পবিত্র বস্তু খাবে এবং সৎকর্ম করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমল সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত রয়েছি। সন্দেহ নেই, তোমাদের এই দল একই দল আর আমি তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করবে)

২০। সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পূর্বোক্ত, পৃ,৩২-৩৩

২১। ড. আনিসুজ্জামান, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা) এর অবদান, *ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ২০১০, পৃ,৪৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে যেসব কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, ইসলাম সেসব কার্যকারণ রহিত করেছে। যুদ্ধের বহুবিধ ধরন, কার্যকরণ এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রত্যাখ্যান করে যথাযথ বাস্তবায়নযোগ্য নীতিমালা দিয়ে ইসলাম তাকে প্রায় অসম্ভব করে দিয়েছে।

ব্যক্তিস্বার্থে গোষ্ঠিগত এবং জাতিগত আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করা এবং বস্তুগত স্বার্থে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হয়ে থাকে, ইসলাম তারও বিরোধী। উপনিবেশ সৃষ্টি, শোষণ, বাণিজ্যিক বাজার সৃষ্টি এবং কাঁচামাল লাভ করার জন্যে যুদ্ধকেও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। অপরের শ্রম, জীবন জীবিকার উপকরণ এবং মানবতা হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা ভিত্তি। সুতরাং সেখানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন অবকাশ নেই। ইসলাম বিশ্ব জাহানের সকল জীবনধারীকে মনে করে নিকটতম পরিবারের সদস্য। চায় গোটা দুনিয়ায় একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য কার্যকর করতে। ইসলাম নেক এবং তাকওয়ার কাজে একে অপরের সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয় এবং পাপ ও জুলুমের কাজে সহযোগিতা করতে বারণ করে। লুটতরাজ ছিনতাই রাহাজানি হত্যাকে হারাম করে। ইসলাম গোটা মানব জাতির সাথে ওয়াদা করে সার্বিক সুবিচারের। ইসলামের মতে বংশ-ধর্ম-গোত্রের পৃথকত্ব এবং ধর্মের ভিন্নতা আল্লাহর সুবিচার থেকে উপকৃত হওয়ার পথে আদৌ প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

রাজা বাদশাহ এবং জাতীয় বিরোধের মিথ্যা অহমিকায় বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং রাজা-বাদশাহদের অধিকারের মোহে যেসব যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা হয়, ইসলাম তাকেও প্রত্যাখ্যান করে।[২২] আল্লাহ বলেন, [২৩]

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

'কল্যাণ এবং আল্লাহ ভীতির কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো গুনাহ আর সীমালংঘনের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না'।

মানবতার মুক্তির জন্যে ইসলামের আবির্ভাব। তাই আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে ইসলামের আনীত মহাকল্যাণ সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা এবং সে মহাকল্যাণের পথে কারো কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করা। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষের কাছে এ বার্তা পৌঁছানোর কাজে প্রতিবন্ধক হবে, ক্ষমতার জোরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, বস্তুত সে বা তারা আল্লাহর বাণীর প্রতি অবিচারী বলে প্রতিপন্ন হবে।

২২। পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৫
২৩। আল কুরআন, ৫:২ (কল্যাণ এবং আল্লাহ ভীতির কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো গুনাহ আর সীমালংঘনের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না)

Dhaka University Institutional Repository

কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর বাণীকে জোর করে মানুষের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে তারা যাতে জ্ঞানের স্বাধীনতা এবং হিদায়াতের ইখতিয়ার লাভ করতে পারে সে ধারায় অগ্রসর হতে হবে। ইসলাম কবুল করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না, কিন্তু যারা তার পথে অন্তরায় হয়, মানুষকে সে দিকে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়, ইসলাম তাকে অত্যন্ত না পছন্দ করে। মহান আল্লাহ বলেন, [২৪]

وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

গোটা বিশ্বে সুবিচার আর ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম চায় মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সুবিচার প্রতিষ্ঠা। সকল প্রকার ইনসাফ কায়েম তার অভীষ্ট লক্ষের অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে বিশ্বশান্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহানবী (সা) বিশ্বশান্তির স্বরূপ। মহান আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেন, [২৬]وما ارسلنك الا رحمة للعالمين

মহানবী (সা.) হলেন বিশ্বজগতের শান্তিদূত। রাহমাতুল্লিল আলামীন শুধু আক্ষরিক অর্থে নয় বরং প্রয়োগের দিক থেকে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাস্তবিক অর্থেই ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। এমন এক সাম্যবাদী সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা)-কে জবাবদিহী করতে হয় যুবকের কাছে। তিনি বায়তুল মাল থেকে কি দু'টুকরো কাপড় নিয়ে জামা তৈরী করেছেন, যেখানে অন্যরা মাত্র এক টুকরো করে কাপড় পেয়েছে। খলিফা-পুত্র পিতার হয়ে জবাব দিয়েছেন যে, ''আমার টুকরোটি আমি বাবাকে দান করেছি বলেই বাবা জামা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন''। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও এক টুকরো বেশী কাপড় নেয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। মহানবী (সা) এর সাম্যবাদী সমাজে রাতের আঁধারে পিঠে বয়ে আটার বস্তা গরীবের ঘরে পৌঁছে দিতে হয় খলিফাকে, যেখানে নবীতনয়া হয়েও সংসারের সমস্ত কাজ করতে হয় বিবি ফাতিমা (রা)-কে।[২৭] সাম্য ও সমতার বাণী শুধু প্রচারে নয়। কার্যক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে।

২৪। আল কুরআন, ৮:৩৯ (আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না বিপর্যয় দূর হয়ে আল্লাহর পূর্ণ দীন কায়েম হয়ে যায়)

২৫। সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পূর্বোক্ত, পৃ,৩৭

২৬। আল কুরআন, ২১:১০৭ (আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি)

২৭। অধ্যাপক হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক, মহানবী (সা)-র অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব, (মহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত), *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)*, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ, ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ব সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়িক সমাজ বির্নিমাণে রাসূল (সা) এবং অনুসারীদের ভূমিকা এ মহত্তম আদর্শ বাস্তবয়ানমূলক ইতিহাসের অবমূল্যায়ন সম্পর্কে আবদুল মুকীত চৌধুরী উল্লেখ করেন

These sublime ideals and injunctions of the Holy Quran were realised by Rasulullah (SM) and his faithful companious conveyed his message of fraternity, justice and peace to all regions of the world, thereby making this world an unique abode of human civilisation attaining zenith. The followers of the Best Ideal, Muhammadur Rasulullah (SM) till today stick to the principles of religious tolerance and peaceful co-existence with other communities. Irony of fate is that, all their noble vision and mission have been thrown to unbelievable disaster colouring them commnual, narrow and preachers of hatred among nations!

The history bears testimony to the universal humanitarian basis of Muslim nation in theory and practies; but biased, narrow, vested quarters are shameless in colouring the Muslims as communal and their scriptural philosophy and the greatest Prophet's mission as conflicting with other religious communities, thus creating a situation of conflict among civilisations. This is gross misinterpretation and attempt to vilify the brightest face in the world. We feel pity to such narrow outlook and condemn this heinous propaganda unequivocally.

The famous historian and orientalist W.W Montgomery Watt remarked, ``Of all the world's great men none has been so maligned as Muhammad (Muhammad as Medina)

This is not the complete picture. There are many tributes to and positive evaluation of Rasulullah (SM).

We present here a quotation from the Encylopaedia Britannica (11 th Edition):

``Of all the great religious personalities of the world Muhammad was the most successful.

It is transparent that Hazrat Muhammad (SM) is the greatest ideal, best character for mânkind to follow. The Holy Quran and the Sunnah of Hazrat Muhammadur Rasulullah (SM) can ensure human integrity and solidarity, if followed and practised in all spheres of life. [২৮]

সৈয়দ আমীর আলী উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রপ্রধান ও জনগনের জীবন ও সম্পদের অভিভাবক হিসেবে মুহাম্মদ (সা) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অপরাধীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কিন্ত রাসূল মুহাম্মদ (সা), ধর্ম প্রচারক মুহাম্মদ (সা) ছিলেন তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুর প্রতিও কোমল হৃদয় ও দয়ালু। তাঁর চরিত্রে মানুষের চিন্তায় অধিগত শ্রেষ্ঠ গুণ ন্যায়বিচার ও করুণার সম্মিলন ঘটেছিল। [২৯]

২৮। Abdul Muqit Chowdhury, Ibid, p-50.

২৯। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, (অনুবাদ, ড. রশীদুল আলম), কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ, ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে - Edward A. Farmer তার A History of the Conquests of the Saracnes.'' গ্রন্থে মন্তব্য করেন Muhammad had wrong to avenge, but they are satisfied by a handful exception to a general amnesty and the majority even of these are ultimately forgiveness. It is the temple of God desecrated by idols, which he had come to ransom. With the sublime Words; ''Truth is come, let falsehood disapper'' he shattered in succession the three hundred and sixty abominiations which were standing in the Holy place; as Hezekieth broke into pieces the brazen servants of Moses, so Muhammad destroyed the forms of the patriarach of his race where Abraham and Ismael are represented in the act of superstitious devotions. And his work, once accomplished, he did not, like his victorious namesake in later times, fix his throne in the city he had won. He reared no palace for own honour by the side of the temple, which he recovered to the honour of God.' [৩০]

পাদরী রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ উল্লেখ করেন, মুহাম্মদ (সাঃ) একসঙ্গে ত্রিগুণ প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার দাবী করতে পারেন। তিনি একটা জাতি, একটা সাম্রাজ্য ও একটা ধর্মকে গড়ে তুলেছিলেন। ইতিহাসে এত বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষের পরিচয় খুব কমই মিলে। সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়েও তিনি এমন মহান গ্রন্থের প্রচার করে গিয়েছেন, যা একাধারে মহাকাব্য, আইনগ্রন্থ ও উপাসনার কিতাব। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ লোক এখনও ভক্তি সহকারে এই মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করে থাকে। এই মহাগ্রন্থের লিখনভঙ্গি অতুলনীয়, ইহা সত্য ও জ্ঞানের বিরাট ভান্ডার। মুহাম্মদ (সাঃ) এই একটি অলৌকিক কার্যের দাবী করে থাকেন। ইহা যে অলৌকিক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই মোটেই। ইসলামের নবজাগরণের সাথে গণতান্ত্রিক মূলনীতির বাস্তবায়ন লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন- যে সব ঘৃণ্য প্রথা আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল যা এখনও আফ্রিকার কোন কোন অংশে দেখা যায়; যথা নরভোজী মানুষ। নরবলি দান ও শিশুকে জীবন্ত সমাহিত করা। এ সকল ঘৃণ্য মানব সম্প্রদায় ও তাদের গর্হিত আচরণ ইসলামের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে মুসলমান অধুষিত অঞ্চল থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। যে সকল পার্বত্য জাতি উলঙ্গ থাকত তারা এখন পরিচ্ছন্ন রুচিসম্পন্ন হয়ে কাপড় পরতে শিখেছে। যে সব উপজাতি কখনো গোসল করতো না বা ধৌত প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিতি ছিল না, তারা কুরআনের আদেশ অনুযায়ী নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে অজু করে-হাত মুখ প্রক্ষালন করে।

৩০। Edward A Farmer, *A History of Conquests of the Saracens*, PP,37-45

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতিগণ ক্রমে একতা বলে জাতিতে পরিণত হয় এবং জ্ঞান বিজ্ঞান পরিচর্যা ও স্বীয় শক্তির প্রভাবে সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়। মুসলমানের ইতিহাস থেকে এর নজীর পাওয়া যায় এবং সন্নিহিত দেশসমূহের শত বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্যটুকু প্রকটিত হয়ে উঠবে। এখন আর বিনা কারণে ঝগড়া বিবাদ সেখানে সংঘটিত হয় না। এখন সেখানে দৈনিক পাঁচবার নামাজের জন্য মোয়াজ্জিনের আজান বা আহবান শ্রুত হয়। ঈমামের পিছনে মক্কা শরীফকে সামনে রেখে সমবেত মুসলিমগণ সেখানে নামাজ আদায় করে।[৩১]

বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ, ঐতিহাসিক Stanley L. Poole. উল্লেখ করেন Muhammad has shown what he was. The nobility of his character, his strong friendship, his endurance and courage, above all his earnestness and the enthusiasm for the truth he came to preach these things had revealed the hero, the master whom it was alike impossible to disobey and impossible not to love. Hence forward, it is only a question of they too will devote themselves to him body and soul; and the enthusiasm will catch fire and will spread among the tribes till all Arabia is at the feet of the prophet of the one God. No emperor with his tiaras was obeyed as this man, with a clock of his own counting. He had the gift of influencing men and he had nobility only to influence them for good.[৩২]

শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে শুধু পরবর্তী কিংবা বর্তমান সময়ে নয়; বরং তাঁর শৈশবেও তৎকালীন সমাজে তিনি 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী উপধি লাভ করেন। রাহমাতুললিল আলামীন তখন কেবল কৈশোর। তদানীন্তন আরবের নৈরাজ্য ভরা পরিবেশ তখনই তাঁকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অধীর করে তুলল। শান্তিকামী মহানবী (সা) বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে সমমনাদের নিয়ে তখনই গঠন করেন 'হলফুল ফুজুল'। প্রতিজ্ঞা নেন : আমরা দুর্বলের প্রতি সবলের জুলুম প্রতিরোধ করব, দেশের অশান্তি দুর করার নিমিত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব, দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্য করতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হব না।

তখন থেকেই শুরু হল সুন্দরের চেতনায় উজ্জীবিত মহানবী (সা)-র শান্তি প্রতিষ্ঠার গৌরবদীপ্ত প্রয়াস প্রচেষ্টা। এরপর কাল পেরিয়ে সামনে যেতে থাকেন তিনি। যতই সামনে অগ্রসর হন ততই বেড়ে যেতে থাকে তার সচেতন দায়িত্ববোধ। সময়ের ব্যবধানে তাঁর ওপর অর্পিত হল নবুওয়াতের মহান যিম্মাদারী। এবার ইলাহী প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে শুরু হল নতুন দাওয়াত, নতুন বিপ্লব, সামগ্রিক মুক্তির মহা পয়গাম নিয়ে নতুনভাবে মানব জাতিকে আহবান জানাতে লাগলেন অনাবিল শান্তির চিরস্নিগ্ধ ছায়ার দিকে।

৩১। ডাঃ মোঃ আফাজ উল্লাহ, *বিশ্বনবী (সা) সমন্ধে অমুসলিম মনিষীদের বাণী*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৭-২৮

৩২। Nur Ahmed, *Islam and its Holy Prophet as Judged by the Non Muslim World*, Chittagong, dateless, p.24.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি জানতেন শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে, শান্তিময় সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে আগে মানুষের ব্যক্তি জীবনে ঘটাতে হবে ইনসানিয়্যাতের চূড়ান্ত ইনকিলাব, আর মূলত ব্যক্তি জীবনের শান্তিই তো পর্যায়ক্রমে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তির ভিত রচনা করে থাকে। প্রিয় নবী (সা) তাই সে পথেই এগোলেন, মানুষকে এক আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবান জানালেন; মিথ্যা, অনাচার, অন্যায়, ব্যভিচার, হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি ইত্যাদি সকল বীভৎস কর্মের ইতি টেনে মানুষকে পরিশোধিত, শুচিতায় ভরা এক পরিচ্ছন্ন শুভ্র জীবনের দিকে আহবান জানালেন। কিন্ত সামাজিক শান্তি ও মুক্তির এই মহা পয়গ্রাম মেনে নিতে পারল না মক্কার বন্য স্বভাবের মানুষগুলো, প্রবল বাধার সম্মুখীন হল মক্কার জীবনে রাহমাতুললিল আলামীনের মুক্তি-বিপ্লব।

এরপর সর্বাত্মক শান্তির বৃহত্তর কর্মসুচিসহ মহানবী (সা) তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাথীদের নিয়ে হিজরত করেন মদীনায়। কেননা ইসলাম তো এসেছে মানবতার সামাগ্রিক জীবনে শান্তি নিশ্চিত করে তাদেরকে এক আল্লাহর খাঁটি অনুগত বান্দা বানিয়ে দিতে। অশান্ত পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দাগণ কি করে তাঁর দাসত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাবে তাদের জীবনে? তাই সত্য প্রতিষ্ঠার পথে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি ব্যাপক কমুসচী নিয়ে মদীনায় গড়ে তুললেন মানবেতিহাসের সর্বোত্তম কল্যাণরাষ্ট্র, আর এখান থেকেই মহানবী (সা) এর শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিমন্ডল বিস্তৃত হল। ব্যাপক ও বিপুল গতিশীলতায় এগিয়ে যায় সত্য ও সুন্দরের বিপ্লব।

এ সময় মহানবী (সা) ভাবলেন, ইসলামী মতাদর্শের ক্রমবিস্তার ও আন্তর্জাতিক ভাবে ইসলামের কল্যাণময়তা ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে মদীনার সার্বিক পরিস্থিতির শান্ত হওয়া প্রয়োজন। ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ইসলাম কখনই অনর্থক সংঘাতকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই শান্তির মহান দিশারী মহানবী (সা) মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মুসলমান, ইয়াহুদী ও অন্যদের নিয়ে সর্বজাতীয় ঐক্যের আহবান করে তাদের নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মানবিক ও ধর্মীয় অধিকারকে নিশ্চিত করে সকলের শান্তি ও নিরাপত্তাকে শংকামুক্ত করে সম্প্রদায়গুলোর মাঝে সংঘটিত হয় একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা আমাদের নিকট ঐতিহাসিক মদিনা সনদ হিসেবে পরিচিত। [৩৩]

৩৩। খন্দকার মনসুর আহমেদ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহান দিশারী মহানবী (সা), (মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা, সম্পাদিত) *বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৪.

Dhaka University Institutional Repository

এর পূর্বে মহানবী (সা) আকাবার প্রথম শপথ[৩৪] ও দ্বিতীয় শপথ[৩৫] পরিচালনার মাধ্যমে শপথকারীদের থেকে মহানবী (সা) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁকে অনুসরণের অঙ্গিকার করার পাশাপাশি তাঁর জন্য লড়াই করতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁকে রক্ষারও অঙ্গীকার করেন। এটি ছিল 'বায়াতুল হারব' বা যুদ্ধের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার সাথে সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ চুক্তিই ছিল মূল ভিত্তি যার উপর হিজরত পরবর্তীকালে নয়া উম্মাহর কাঠামো নির্মিত হয়।[৩৬] হিজরতের পর মহানবী (সা) মদিনার আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক (মুআখাত) [৩৭] প্রতিষ্ঠা করেন। ৬২৩ খ্রস্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই মুআখাত মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কার্যকর হয়। মহানবী (সা) মদিনায় হিজরতের [৩৮] অব্যবহিত পরই কিতাব[৩৯] অথবা মদিনার সনদ জারী করা হয়।

৩৪। আকবার প্রথম শপথে ১২ জন মদিনাবাসী ছিলেন, তাদের ৯ জন ছিলো খাযরাজ এবং ৩ জন ছিলো আওস গোত্রের। খাযরাজ ও আওস ছিল মদিনার দুটি গোত্র।

৩৫। আকাবার দ্বিতীয় শপথে ৭৫ জন মদিনাবাসী মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন। এটি ছিল আকাবার শেষ বৈঠক।

৩৬। ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ.২

৩৭। মুআখাত বা ভ্রাতৃসম্পর্ক ছিল একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে ইসলামী সংগঠনের প্রথম সুস্পষ্ট বহি:প্রকাশ। তখনও পর্যন্ত আরবরা রক্তকেই একমাত্র বন্ধন হিসাবে স্বীকার করত এবং এটাই তাদের সমাজ ও সম্প্রদায়গত সম্পর্ক নির্ধারণ করত। সমাজতত্বগত ভাবে একটি উপজাতীয় ব্যবস্থায় কোন গোষ্ঠীর জন্ম হলে ও বেড়ে উঠলে তারা ভিন্ন আচরণ করতে পারে না। কিন্তু মহানবী (সা) আরবদের সুপ্রাচীন কালের এ দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন এক প্রচন্ড পরিবর্তন আনলেন যে ঈমান রক্তে অন্যান্য সকল সম্পর্ক যথা হিলফ, জিওয়ার ও বিলা প্রভৃতির স্থলাভিষিক্ত হল। অথচ এগুলোর মূল নিহিত ছিল আরবদের গোত্রীয় ঐতিহ্যের গন্ডীতে। রক্ত সম্পর্কের সকল বিবেচনা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী উম্মা গঠিত হল (ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো)

৩৮। হিজরত : মক্কা আল মোকাররমা হতে আল্লাহর নির্দেশে ২৭০ মাইল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে হযরত আবু বকর (রা) কে সাথে নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ৮ রবিউল আউয়াল ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রী ইয়াসরিব নতুন নাম মদিনার ''কুবা'' নামক স্থানে পৌঁছেন। এখানে ১৪ দিন অবস্থান করেন। অত:পর এখান থেকে হযরত আইয়ুব আনসারীর ঘরে আশ্রয় নিলেন। শুরু হল মদিনার জীবন (ড ওসমান গণী, হযরত আবু বকর (রা), কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ.৩৪-৩৫)

৩৯। কিতাব বলতে চুক্তির কথা বুঝানো হয়েছে। একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে, মদিনার ইহুদীদের সাথে স্বতন্ত্র একটি চুক্তি হয়। তবে ঐতিহাসিকদের অনেকেই কিতাব বলতে মদিনার সনদকেই বুঝিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মদিনার সনদ[৪০]

*ইহা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা।

*কুরাইশ ও ইয়াসরেব এর মু'মিন মুসলিমগণ ও যারা তাদের অনুগামী হয়ে তাদের সাথে যুক্ত হবে এবং তাদের সাথে মিলে জিহাদ করবে তাদের মধ্যে (এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত)।

*তারা অন্যদের থেকে ভিন্ন একটি জাতি।

*কুরাইশদের মধ্য থেকে যারা মুহাজির তারা তাদের পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে ঃ তাদের পূর্বেকার রক্তপণ লেনদেন করবে এবং স্বেচ্ছামূলক দানে তাদের বন্দী-মুক্তিপণ পরিশোধ করবে। তারা মু'মিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং বনূ'আওফ তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে এবং সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মুমিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং বনূ হারেস (ইবনুল খাযরাজ) তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে ও সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মু'মিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*বনূ সায়েদাহ তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে এবং সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মু'মিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং বনূ জুশান তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে এবং সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মু'মিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং বনূ নাজ্জার তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে এবং সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মু'মিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং বনূ আমর ইবন আওফ তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে এবং সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মু'মিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং বনু নাবীত তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে এবং সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মুমিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং বনূ 'আওস তাদের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ব রক্তপণ আদায় করবে এবং সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করবে এবং মু'মিনদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

*এবং মু'মিনগণ তাদের কাউকে দায়গ্রস্ত ফেলে রাখবে না বরং তাদের মুক্তিপণ বা রক্তপণ স্বেচ্ছাদানে আদায় করে দেবে।

৪০। সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত ইবনে হিশাম*, ২য় খন্ড, দারুল ফিকর, কায়রো, অনুবাদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫০১-৫০৪

Dhaka University Institutional Repository

*এবং কোন মু'মিন অন্য মু'মিনের অনুমতি ছাড়া তার বন্ধুর সাথে মিত্রতা করবে না।

*মু'মিন মুত্তাকীদের কারও ওপর কোন সন্ত্রাসী হামলা হলে অথবা জুলুমের থাবা বিস্তার করতে চাইলে অথবা কোন অন্যায় বা সীমা লংঘন করতে চাইলে অথবা মু'মিনদের মধ্যে বিপর্যয় বিশৃঙখলা সৃষ্টি করতে চাইলে সকলের সম্মিলিত হাত ওই অপরাধীর ওপর নিপতিত হবে, চাই সে কারও সন্তানই হোক।

*কোন মু'মিন কোন কাফিরের পক্ষ নিয়ে অন্য মু'মিনকে হত্যা করবে না এবং কোন মু'মিনদের বিপক্ষে কোন কাফেরকে সাহায্য করবে না।

*নিশ্চয়ই আল্লাহর জিম্মাদারী সকলের জন্য একই, তাদের পক্ষে একজন সাধারণ লোকও আশ্রয় দিতে পারবে।

*নিশ্চয়ই মুমিনগণ স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের মিত্র।

*এবং ইহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের অনুগামী হবে তাদের জন্য সাহায্য ও মর্যাদার অধিকার থাকবে। তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হবে না।

*মু'মিনগণ প্রদত্ত শান্তি-নিরাপত্তা হবে অভিন্ন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সময় এক মু'মিনকে ছেড়ে অন্য মু'মিন নিরাপত্তা চুক্তি করতে পারবে না বরং পারস্পরিক সমতা ও ন্যায় ভিত্তিক চুক্তিই গৃহীত হবে।

*এবং যে সকল সম্প্রদায় আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে তারা একের পর আরেক দল এসে দায়িত্ব পালন করবে।

*এবং আল্লাহর রাস্তায় রক্তপাতের আশঙ্কা দেখা দিলে মু'মিনগণ একে অন্যের পক্ষে তা প্রতিহত করবে।

*এবং নিশ্চয়ই ধর্মনিষ্ঠ মু'মিনগণ উত্তম ও সুষ্ঠুতম হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

*কোন অংশীবাদী (মুশরেক) কুরাইশ এর কোন সম্পদ ও জীবনের পক্ষে সাহায্য করতে পারবে না এবং কোন মু'মিনের বিপক্ষে তার অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে না।

*যদি কেউ গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া কোন মু'মিনকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। তবে যদি নিহতের অভিভাবক রক্তপণের বিনিময় গ্রহণের সম্মত হয় তাহলে সে তা পারবে। সকল মু'মিনকে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং ইহা কার্যকর করা ছাড়া তাদের জন্য অন্য কিছু বৈধ হবে না।

*এবং কোন মু'মিন যে এই চুক্তিপত্রে বিদ্যমান বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছে, তার জন্য কোন চুক্তিভঙ্গকারীকে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেওয়া বৈধ নয়। যে এমন কাউকে সাহায্য করবে অথবা আশ্রয় দেবে তার ওপর রোজ কেয়ামতে আল্লাহর লানত ও ক্রোধ নিপতিত হবে। সেদিন তার কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা (প্রতিদান) গ্রহণ করা হবে না।

*কোন বিষয়ে তোমরা যখনই কোন মতানৈক্যে উপনীত হবে তখন তা আল্লাহ ও মুহাম্মদ (সা) এর সমীপে সপোর্দ করতে হবে।

*যুদ্ধ অবস্থায় ইহুদীরাও মু'মিনদের সাথে ব্যয়ভার বহন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

*বনূ 'আওফ এর ইহুদীগণ মু'মিনদের সাথে একই জাতি হিসেবে গণ্য হবে : ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম। তারা এবং তাদের মিত্রগণ অভিন্ন অবস্থানে থাকবে। তবে যে জুলুম করবে এবং অপরাধে লিপ্ত হবে সে কেবল তাকে ও তার পরিজনদেরই ধ্বংস করবে।

*এবং বনি নাজ্জার এর ইহুদীগণ বনি 'আওফের অনুরূপ অধিকার পাবে।

*এবং বনি হারেস এর ইহুদীগণ বনি 'আওফ এর ইহুদীদের অনুরূপ অধিকার পাবে।

*এবং বনি সা'য়েদাহ এর ইহুদীগণ বনি 'আওফ এর অনুরূপ অধিকার পাবে।

*এবং বনি জুশাম এর ইহুদীগণ বনি 'আওফ এর অনুরূপ অধিকার পাবে।

*বনি আওসের ইহুদীগণ, বনি 'আওফ এর অনুরূপ অধিকার পাবে।

*বনি ছালাবাহ এর ইহুদীগণ বনি 'আওফ এর ইহুদীদের অনুরূপ অধিকার পাবে। তবে যে ব্যক্তি কোন জুলুম ও অপরাধ করবে, সে বস্তুত নিজের ও নিজ পরিজনকেই ধ্বংস করবে।

*এবং ছালাবাহ গোত্রের উপগোত্র জুফনা ছালাবাহ এর মতই গণ্য হবে।

*বনি শুতাইবাহ এর জন্য 'আওফ এর অনুরূপ অধিকার থাকবে। অবশ্যই অঙ্গিকার পূর্ন করতে হবে, তা ভঙ্গ করা যাবে না।

*এবং ছা'লাবাহ গোত্রের মিত্ররা তাদেরই মত।

*নিশ্চয়ই ইহুদীদের অন্তরঙ্গ মিত্ররা তাদেরই মত গণ্য হবে।

*এই চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর কেউ মুহাম্মদ (সা) এর অনুমোদন ব্যতিরেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতে পারবে না।

*আহত ব্যক্তিকে প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দেওয়া যাবে না।

*এবং যে ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটন করবে সে তার জন্য দায়ী হবে এবং তার পরিজনও দায়ভার নেবে। তবে যদি সে মজলুম হয় তা হলে সে নিজের প্রতিরক্ষা করতে পারবে। যে ব্যক্তি এই চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে আল্লাহ তার সাহায্য করবেন।

*ইহুদীদের ব্যয়ভার তারা বহন করবে এবং মুসলিমগণ তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

*এই চুক্তিপত্রের পক্ষগুলোর বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করলে পক্ষগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে।

*এবং পক্ষগুলো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও কল্যাণ-কামিতা বজায় রাখবে। প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, তা ভঙ্গ করবে না।

*এবং অবশ্যই কোন ব্যক্তি তার মিত্রের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না এবং মজলুমকে সবাই সাহায্য করবে।

*যুদ্ধ অবস্থায় ইহুদীরাও মুমিনদের সাথে ব্যয়ভার বহন করবে।

*এই চুক্তির পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরেব একটি সংরক্ষিত ও পবিত্র নগরী হিসেবে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

*প্রতিবেশীকে নিজের মতই গণ্য করতে হবে। তার কোন ক্ষতি বা তার প্রতি কোন অপরাধ সংঘটন করা যাবে না।

*কোন নারীকে তার পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

*এই চুক্তিপত্রের পক্ষগুলোর মধ্যে যদি এমন কোন পরিস্থিতি বা মতানৈক্যের উদ্ভব হয় যাতে এই চুক্তি নস্যাৎ হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে রুজু করতে হবে। এই চুক্তিপত্রের উত্তম হেফাজতকারী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর ওপর আল্লাহ (সাক্ষী) আছেন।

*এবং কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদের কোন আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

*ইয়াসরেবকে কেউ আক্রমণ করলে চুক্তির সকল পক্ষ পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে।

*যখন তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) কোন সন্ধি করতে এবং সংশ্লিষ্ট হতে আহবান করা হবে তারা সেই সন্ধি করবে এবং দায়ভার গ্রহণ করবে। যদি তারা কোন অনুরূপ সন্ধির পক্ষে যায় তখন মু'মিনদের ওপরও তাদের দাবী আছে। তবে যদি ইহুরীরা ধর্মকে আঘাতকারী কারও সাথে সন্ধি করতে চায় তা মু'মিনগণ মেনে নেবে না।

*প্রত্যেকের ওপর (প্রতিরক্ষার) সে অংশ বর্তাবে যা তার সম্মুখ দিকে থেকে আসবে।

*'আওস গোত্রীর ইয়াহুদী-তাদের মিত্রগণ এবং তাদের নিজেদেরকে এই চুক্তিপত্রে পক্ষগুলোর অনুরূপ গণ্য করা হবে। এই চুক্তিপত্রের পক্ষগুলো থেকে তারা বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী আচরণ পাবে।

ইবনে ইসহাক থেকে ইবন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী এখানেই মদীনা সনদ সমাপ্ত হয়েছে। তবে তিনি ইবন ইসহাকের আরেকটি বর্ণনা যুক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ :

*নিশ্চয়ই অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে, ভঙ্গ করা যাবে না। কেউ কোন বিরূপ কর্মতৎপরতায় জড়িত হলে তার ওপরই বর্তাবে।

*এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ এই চুক্তিপত্রের বিষয়াদির সত্যনিষ্ঠ বাস্তবায়ন ও প্রতিশ্রুতির প্রতিপালনকারীদের সাথে আছেন।

*এবং এই লিখিত সনদ কোন জালেম বা অপরাধীকে রক্ষা করবে না।

*এবং মদীনা থেকে যে বাইরে যাবে সে নিরাপদ এবং এর অভ্যন্তরে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ। তবে যে জুলুম করবে এবং অপরাধ করবে, সে নয়।

*নিশ্চয়ই আল্লাহ ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) সে ব্যক্তির সাহায্যকারী,যে সত্যনিষ্ঠ ও সংযত।

অনুচ্ছেদ ১-এ পুনরায় এর সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২ থেকে ১১তে রক্তপাত ও মুক্তিপণের বিষয়ে বলা হয়েছে যা আরবের গোত্রীয় কাঠামোতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে ছিল একটি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যবস্থা। মুহাজির কুরাশগণ, যাদেরকে বাস্তব কারণেই একটি গোত্র বা দলের বেশি কিছু বলে গণ্য করা হত না, তারা সহ শহরের প্রতিটি গোত্র দলই একটি ইউনিট হিসাবে রক্তপণ পরিশোধ করতে বাধ্য ছিল। অনুচ্ছেদ ১২ থেকে ১৯ পর্যন্ত মদীনার সকল অধিবাসীকে সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তবে ১৪, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদেরকে অধিকতর সুবিধাভোগীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের প্রাধান্য মদীনার অমুসলিমগণ মেনে নিয়েছিল। মুসলমান, পৌত্তলিক ও ইহুদীরা সহ মদীনার সকল অধিবাসীই অনুচ্ছেদ ১৬, ১৭, ২১, ২২, ৪০ ও ৪৭ এ সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আরোপিত শর্তসমূহ মেনে চলতে বাধ্য ছিল। এ হিসাবে সকল ব্যক্তি ও গোত্র বা দল তাদের নিজেদের কাজের জন্য দায়ী ছিল এবং কেউই কোন অন্যায়কারীকে আশ্রয় দিতে পারত না তা সে যেই হোক না কেন। অনুচ্ছেদ ২৪ থেকে ৩৫ পর্যন্ত মদীনার ইহুদীদেরকে বিভিন্ন গোত্র বা দল এবং তাদের সামাজিক প্রথা ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ৩৬, ৩৭, ৩৮, ও ৪৬ এ ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সকল অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা অথবা যুদ্ধে তাদের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্য অনুচ্ছেদ সমূহ যেমন ১৮, ৩৮ ও ৪৫ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী ও মুসলমানগণ যুদ্ধের সময় পরস্পরকে সাহায্য এবং যৌথভাবে যুদ্ধের খরচ বহন করবে। অনুচ্ছেদ ৩৯, ৪৫, ও ৫৫ এ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নগররাষ্ট্রকে রক্ষার দায়িত্ব মদীনার জনগোষ্ঠির সকল অংশের উপরই সমভাবে অর্পিত হয়েছে। যেহেতু মদীনার জন্যে সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ ছিল মক্কার কুরায়শরা, সে কারণে অনুচ্ছেদ ২০ ও ৪৩ এ বিশেষ করে মক্কার অধিবাসীদের এবং সাধারণভাবে অন্য শত্রুদের কোন সাহায্য বা নিরাপত্তা প্রদান না করার কথা বলা হয়েছে। এরপর অন্য ৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যাতে ইসলামী উম্মাহ এ রাসূল (সা) এর অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সকল বিরোধ বা বিবাদে মহানবী (সা) ছিলেন একমাত্র এবং চূড়ান্ত বিচারক (অনুচ্ছেদ ২৩)। মুসলমান বা অমুসলমান কেউই তাঁর বিনা অনুমতিতে যুদ্ধে যেতে পারবে না (অনুচ্ছেদ ৩৬)। উপরন্তু অনুচ্ছেদ ৪২ এ সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে যখন লোকদের মধ্যে কোন গোলযোগ বা ঝগড়া লাগে যা থেকে বিপর্যকর কিছু ঘটার আশংকা থাকে, সে সব বিষয় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সা) এর কাছে পেশ করতে হবে। এভাবে ধর্মীয় বিষয় ব্যতীত বেসামরিক রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়সহ সকল বিষয়েই মহানবী (সা) এর সর্বোচ্চ ও দ্ব্যর্থহীন কর্তৃত্ব মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের প্রথম পর্যায়েই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেহেতু নবুয়ত প্রাপ্তিই ছিল তাঁর কতৃর্ত্বের উৎস সে কারণে ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর সরাসরি নিদের্শনায় পরিচালিত ও শাসিত হত। সুতরাং মুআখাতের পর মদীনার সংবিধানই ছিল ইসলামী উম্মাহর গঠন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রম উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[৪১]

৪১। ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা) যুদ্ধ চাননি, তিনি চেয়েছেন শান্তি, আর এজন্য বদরের যুদ্ধে[৪২] কুরাইশদের যারা বন্দি হয় তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিলেন তাদের জন্য মুক্তিপণ নির্ধারণ করলেন, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি মুসলমানদের ১০ জনকে লেখাপড়া শিখাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে আজও এরূপ মুক্তিপণ বিরল।[৪৩]

হযরত মুহাম্মদ (সা) কত অধিক মাত্রায় সুহৃদ ও মানব প্রেমিক ছিলেন তার কিঞ্চিৎ পরিচিতি এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন মক্কা আল মুকাররমাতে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তিনি মক্কায় দরিদ্রজনদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ৫০০ (পাঁচশত) স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন। তৎকালে মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলার গমনাগমন পথ রুদ্ধ হওয়ায় আবু সুফিয়ানের নিকট বিপুল সংখ্যক পশুচর্ম বিনষ্ট হচ্ছিল। হযরত (সা) তাকে মদিনা হতে প্রচুর পরিমাণে খেজুরের উপঢৌকন প্রেরণ করে ঐ পশুচর্ম খরিদ করার সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন।[৪৪] আসলে মহানবী (সা) মক্কাবাসীকে ভালবাসতেন, তিনি তাদের সাথে সন্ধি করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি তার প্রমাণ।

হুদায়রিয়ার সন্ধি[৪৫]

ইমাম ইবন হিশাম (র) তাঁর গ্রন্থ আসসীরাহ আন নাবাবিয়্যাহ তে সীরাতের আদি ও মৌলিক প্রণেতা ইমাম ইবন ইসহাক (র) এর নিম্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মক্কার কুরাইশগণ তাদের প্রতিনিধি হিসাবে সুহাইল ইবন আমরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট প্রেরণ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত রূপে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি লিখিত হয় ঃ

রাসুলুল্লাহ (সা) হযরত আলী ইবন আবু তালেব (রা)-কে ডেকে এনে বললেন, লিখ-বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ তে সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললেন, এই বাক্য তো আমার পরিচিতি নয়। বরং লিখুন, বিসমিকা আল্লাহুম্মা (তোমার নামে হে আল্লাহ)। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, লিখ-বিসমিকা আল্লাহুমা। তখন তিনি তাই লিখলেন। এরপর বললেন, লিখ এটি হচ্ছে যা মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সন্ধি করেছেন সুহাইল ইবন আমর এর সাথে। তখন সুহাইল আপত্তি জানালেন, যদি আমি এ সাক্ষ্যই দিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসুল, তা হলে তো আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না। বরং আপনার নাম ও আপনার পিতার নাম লিখুন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন তাহলে লিখ যা মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ সন্ধি করেছেন সুহাইল ইবন আমর এর সাথে।

৪২। দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রামাদান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে ৩১৩ জন মুসলমান এবং ৯৫০ জন কুরাইশ ছিল, কুরাইশরা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০ তম খন্ড, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ২০১৩,পৃ. ৫৯০)

৪৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০ তম খন্ড, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৯০

৪৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১

৪৫। সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত ইবনে হিশাম*, ৩য় খন্ড, দারুল ফিকর কায়রো, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১৪২-১১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

(মুল শর্তাদি) উভয়ে এ বিষয়ে সন্ধি করলেন যে,

১. দশ বছরের জন্য লোকেরা যুদ্ধ ত্যাগ করবে। এ সময় জনগণ নিরাপত্তায় থাকবে এবং একে অপরকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে।

২. কুরাইশদের যারা তাদের অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের নিকট আসবে তাদের তাদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে।

৩. তবে যারা এখন মুহাম্মদের সাথে আছে, তাদের কেউ কুরাইশদের নিকট ফিরে আসলে তাকে তাঁর কাছে ফেরত দেওয়া হবে না।

৪. আমরা কেউ কারও বিষয়ে নাক গলাবো না।

৫. কেউ গোপনে কোন চৌর্যবৃত্তি করবে না এবং খেয়ানত করবে না।

৬. যে বা যারা মুহাম্মদের চুক্তি ও অঙ্গিকারে প্রবেশ করতে চায় সে বা তারা প্রবেশ করতে পারবে।

৭. আর যে বা যারা কুরাইশের চুক্তি ও অঙ্গিকারে অন্তর্ভুক্ত হতে চায় সে তা পারবে।

বনু খুজাআহ পতাকা উচিঁয়ে বললো, আমরা মুহাম্মদের চুক্তি ও অঙ্গিকারে দাখিল হলাম। এ দিকে বনু বাকর উঠে বললো, আমরা কুরাইশ এর চুক্তি ও অঙ্গিকারে অন্তর্ভুক্ত হলাম।

৮. আপনি এ বছর আমাদের এখান থেকে ফিরে যাবেন, কাজেই আপনারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

৯. আগামী বছর আমরা আপনার জন্য এলাকা ছেড়ে দিয়ে যাব। তখন আপনি আপনার সৈন্যদের নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন এবং তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন। তখন আপনার সাথে থাকবে সফরকারী যাত্রীর অস্ত্র এবং তলোয়ার থাকবে খাপের ভেতর। এ অবস্থা ব্যতিত মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, বিশেষত চতুর্থ শর্ত মুসলমানদের পক্ষে বড়ই পরিতাপ ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং হযরত উমর (রা)-র ন্যায় সমুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারীও এই সন্ধির সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী পরিণতি প্রসঙ্গে তৎক্ষণাৎ কিছুই অনুধাবন করতে পারেন নি। ফলে তাঁরা প্রকাশ্যে রাসুল আকরাম (সা) এর সম্মুখেই তাদের বিরূপ মনোভাবের কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। রাসুল আকরাম (সা) এর সন্তুষ্টিপূর্ণ সম্মতি লক্ষ্য করেন প্রত্যেকেই শান্ত হালনা।

আল কুরআনে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট অর্থাৎ যথার্থ বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে আল্লাহ পাকের এই মহাবাণী যর্থাথই সত্যে পরিণত হয়েছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তি মুতাবিক এক বছর পরেই হযরত মুহাম্মদ (সা) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে আগমন করলেন। কিন্তু কুরায়শগণকে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ দিলেন না, বরং সর্বতোভাবে তাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই বছরেই তিনি মক্কায় হযরত মায়মুনা (রা)-কে বিবাহ করলেন। এই সময়ে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) ও হযরত আমর ইবন আল আস (রা)- এর ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিদ্বয় ইসলাম কবুল করেন। আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা যিনি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলেন-

Dhaka University Institutional Repository

হাবশা অবস্থান কালে বিধবা হওয়ার পরে হুযূর আকরাম (সা) তাকে তাঁর নিজের সাথে বিবাহ বন্ধনের সুযোগ প্রাপ্তির মর্যাদা দান করলেন। (উম্মে হাবীবার স্বামী ধর্মত্যাগী হয়ে তাকে খৃষ্টান হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্ত তিনি দীন ইসলামেরই একজন দৃঢ়পদ অনুসারী ছিলেন। তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন) এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আবু সুফিয়ানকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই কালে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমান এবং কতিপয় নব বায়আত প্রাপ্ত হাবশী মুসলমানও আরব দেশে আগমন করেন। খায়বারে অবস্থান কালে রাসুল আকরাম (সা)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। এর ফলে মক্কা বিজয় সহজ হয়।

মক্কা বিজয় ৮ম হিজরীর শাবান মাসে বানু খুযাআঃ ও বানু বাকর এর মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কিঞ্চিৎ রক্তপাত ঘটে। কতক মক্কাবাসী ছদ্মবেশে বানু বাকর এর সৈন্যদলে যোগদান করে। অধিকন্ত তাদেরকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে। এই আচরণ হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলীর প্রত্যক্ষ লংঘনের শামিল। মুসলমানদের হালীফ বানু খুযাআঃ হযরত (সা)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করল তিনি সাহায্য প্রেরণের ওয়াদা করলেন। অতঃপর তিনি দূত মারফত মক্কার কুরায়শদের নিকট তিনটি শর্ত পেশ করলেন (১) নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হোক। (২) বানু বাকরদের সহিত কুরায়শদের চুক্তিপত্র রহিত করা হোক (৩) হুদায়বিয়ার সন্ধিকে চূড়ান্ত ভাবে সমাপ্ত অর্থাৎ বাতিল ঘোষণা করা হোক। কুরত ইবন উমার কুরায়শদের পক্ষ হতে পত্রোত্তরে জ্ঞাত করাল, ''আমরা তৃতীয় শর্তই কবুল করলাম''।[৪৬]

মহানবী (সা) মদীনার মুসলমানদেরকে একটি অভিযানে অংশগ্রহণ মানসে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দান করলেন। কিন্ত ঐ অভিযান সম্পর্কে বিশেষ কোন ব্যাখ্যা প্রদান করলেন না। রাসুল আকরাম (সা) একদিকে এই ব্যবস্থা কায়েম করলেন যে, মদীনা মুনাওওয়ারা হতে কেউ বাইরে গমন করতে পারবে না। হাতিব ইবন আবী বালতা'আ (রা) মক্কার কুরায়শগণকে সংবাদ পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। কিন্ত তার প্রেরিত পত্র উদ্ধার করা হয়। হযরত (সা) বদর যুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাকে ক্ষমা করে দেন। অপরপক্ষে দেশের সকল হালীফ গোত্র গোষ্ঠিকে সঙ্গোপনে এমত আদেশ দান করলেন, সকলেই এক বৃহৎ অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। কিন্ত কেউ মদীনা মুনাওওয়ারায় আসবে না। তাদের এলাকার উপর দিয়ে যাত্রাকালে তাদেরকে নেয়া হবে।

৪৬। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯২.

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল আকরাম (সা) তাদের এলাকার উপর দিয়ে গমন কালে সকলকেই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। সকল প্রকার প্রস্তুতি সমাপনান্তে তিনি আকা বাঁকা অচেনা অনভ্যস্ত ও দুর্গম পথে রওয়ানা হলেন। মক্কা হতে মাত্র এক মনযিল দূরে অবস্থিত, 'মাররুজ জাহরান' পৌঁছবার পূর্ব পর্যন্ত শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ তাঁদের গন্তব্য স্থান সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন নি। অবশেষে বিভিন্ন হালীফ গোত্রসমূহসহ মোট দশ হাজার সৈন্যের এক মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ সরঞ্জামসহ ৮ম হিজরীর রামাদানুল মুবারক মাসে মক্কা নগরীর চর্তুদিকে অবস্থিত পাহাড়ের পাদদেশে পৌছে অবরোধ কায়েম করলেন। সন্ধ্যার পর আদেশ জারি হল প্রত্যেক মুজাহিদকেই পৃথক পৃথকভাবে অগ্নি প্রজ্জলিত করতে হবে। মক্কার কোন সুউচ্চ স্থান হতে সেই বিশাল বাহিনীর অতি ব্যাপক অগ্নি প্রজ্জলনের দৃশ্য অবলোকন করেঃ আবু সুফিয়ান অনুমান করল যে, অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র মুসলিম সৈন্য মক্কা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

হতাশার শিকার ও ঘর্মাক্ত কলেবর আবু সুফিয়ান প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অগ্রসর হলে টহলরত মুসলিম বাহিনীর এক ক্ষুদ্র দল তাকে বন্দী করে রাসুল আকরাম (সা) এর সমীপে হাযির করল। দয়ালু নবী (সা) আদেশ দান করলেন, সযত্নে আবদ্ধ রাখবে, মুক্তি দেবে না। প্রভাতকালে আদেশ দিলেন সমগ্র সেনাবাহিনী মক্কার চতুর্দিকে হতে একযোগে শহরে প্রবেশ করবে। কিন্তু সম্মুখ প্রতিরোধ ব্যতীত রক্তপাত ও লুটপাট কিছুই করতে পারবে না। বন্দী আবু সুফিয়ানের সম্মুখবর্তী রাস্তার উপর দিয়ে সমগ্র সৈন্যবাহিনীর পথ পরিক্রমার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সকল সৈন্যের গমনান্তর আবু সুফিয়ানকে মুক্তি প্রদান করা হয়। ইসলামী সৈন্যবাহিনীর শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ আরম্ভের অব্যবহিত পরেই তিনি শহরে পৌঁছলেন। এই সময়ে সৈন্যবাহিনীর নাকীব (ঘোষক) উচ্চ স্বরে মুর্হুমুহু এই ঘোষণায় সোচ্চার ছিলেন ''যে কেউ অস্ত্র ত্যাগ করবে সেই নিরাপদ''। ''যে ব্যক্তি স্বগৃহে স্বেচ্ছায় অন্তরীন থাকবে, সে ব্যক্তিও নিরাপদ''। ''যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে''। রাসুল আকরাম (সা) স্বয়ং রাজপথ দিয়ে মক্কা শহরে প্রবেশ করলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এই নগর প্রবেশ ছিল বিজয়ীর বেশে, কিন্তু আল্লাহ পাকের শেষ বাণীবাহক ও রাহমাতু ল্লিল আলামীন এর যথার্থ পরিচয়বহ এবং অনন্য। শান্তিপূর্ণ বিজয় শেষে হযরত (সা) ঘোষণা করলেন মুসলমানদের পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ফেরৎ দেয়া হবে না ; বরং অমুসলিম দখরদারদের দখলেই থাকবে। এমনকি তিনি স্বীয় বাসগৃহটিও পুনঃগ্রহণ করেন নি।[৪৭]

৪৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৩.

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কাবাগৃহে জামাআ'তে সালাত আদায়ের পরেই রাসুল আকরাম (সা) অমুসলিম মক্কাবাসিগণকে লক্ষ্য করে তাদের বিগত বিশ বর্ষব্যাপী ইসলামের সাথে চরম শত্রুতামূলক দুর্ব্যবহার প্রচেষ্টার পরিচয় প্রদান করে জানতে চান, এখন তোমরা আমার নিকট কি রকম ব্যবহার আশা কর? তারা লজ্জায় মরিয়া হয়ে শুধু এতটুকু বলতে পারল, ''আপনি তো আমাদের অতি সজ্জন শরীফ ভাই''। কেই বা উচ্চারণ করল ''বড়ই শরীফ ভাতিজা''। অতঃপর হযরত (সা) হযরত য়ুসুফ (আ) এর ভ্রাতাদের প্রতি তাঁর সেই ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন, যার কোন তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই, ''আজ তোমাদের উপর কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না। যাও তোমরা সকলেই মুক্ত, স্বাধীন''।[৪৮]

এভাবে পবিত্র মক্কা বিজয়ের পর দশম হিজরীতে নবী করীম (সা) হজ্জ পালনে মক্কায় শুভাগমন করলেন। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার হজ্জযাত্রীর বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। মহানবী (সা) সমবেত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে রিসালতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গ করে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করলেন, ইতিহাসে একেই বিদায় হজ্জের ভাষণ বলে। এখানেও ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান।

বিদায় হজ্জের ভাষণ।[৪৯]

মহানবী (সা) তাঁর ভাষণের প্রারম্ভে মহান আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করার পর বলেন ঃ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা আমরা কথা শোন। জানি না, হয় তো আমি এ বছরের পর এখানে আর কখনো তোমাদের সাথে মিলিত হবো না। হে মানবমন্ডলী! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এই দিন ও এই মাসের মতো তোমাদের ওপর নিষিদ্ধ ও পবিত্র তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। অচিরেই তোমরা তোমাদের মহান প্রভুর সাক্ষাতে উপনীত হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আমি তো তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের কারো কাছে যদি কোন আমানত গচ্ছিত থাকে, তা তার প্রাপকের নিকট অবশ্যই পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই সকল প্রকার সুদ রহিত করা হলো। তবে তোমাদের মূলধন বহাল থাকবে। তোমরা কোন জুলুম করবে না, বরং তোমাদের প্রতিও কোন জুলুম করা হবে না। মহান আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন যে, আর কোন সুদ নয়। আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সকল সুদ রহিত করা হলো। জাহিলী যুগের যত রক্তের দাবি তা সব রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি রবী'আ ইবন হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিবের শিশুপুত্রের রক্তের দাবি রহিত করলাম। এই শিশুটি দুগ্ধপানের জন্য লাইছ গোত্রে প্রতিপালিত হচ্ছিল। তখন হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। কাজেই সেই প্রথম, যাকে দিয়ে তিনি জাহিলী যুগের সব রক্তের দাবি রহিতকরণের সূচনা করলেন।

৪৮। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৪.
৪৯। ইবনে হিশাম, পুর্বোক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৪৮-২৫৩.

Dhaka University Institutional Repository

হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের এই ভূখন্ডে উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে চিরদিনের জন্যে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা যা তুচ্ছ মনে করে থাক এমন বহু কাজ রয়েছে, যাতে তার আনুগত্য করলে সে খুশি হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার থেকে সাবধান থেকো।

হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই মাসসমূহকে আগ পিছ করা বস্তুত কুফরীকেই বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফিরগণ বিভ্রান্ত হয়। তারা কোন বছর নিষিদ্ধ মাসকে বৈধ করে এবং কোন বছর হালাল মাসকে হারাম করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসের সংখ্যা যেন ঠিক থাকে অথচ আল্লাহর হারাম মাসকে তারা হালাল ঘোষণা দেয় এবং হালাল মাসকে হারাম ঘোষণা দিয়ে থাকে। অথচ কাল তার নিজস্ব নিয়ম প্রকৃতিতে আবর্তিত হয় যেদিন থেকে আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারো। এর মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ ও পবিত্র, যার তিনটি ধারাবাহিক এবং একটি হলো মুদার গোত্রের রজব, যা জুমাদাছ-সানিয়া ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস।

হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীগণের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার আছে। তাদের ওপর তোমদের অধিকার হলো, তারা তোমাদের বিছানায় কাউকে স্থান দিবে না, যা তোমরা অপছন্দ করে থাক এবং তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা প্রকাশ্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে না। যদি তারা তা করে, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে এই অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের শয্যা বর্জন করবে এবং প্রয়োজনে এমন হালকা প্রহার করবে, যা কঠোর হবে না। তবে যদি তারা এহেন কাজ থেকে বিরত থাকে, তা হলে তারা ন্যায়সঙ্গত ভরণ পোষণ প্রাপ্য হবে। তোমরা নারীদের প্রতি কল্যাণকামী হও। কারণ, তারা তোমাদের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তারা তো নিজেদের জন্য কিছু করতে সমর্থ হয় না। তোমরা তো তাদেরকে আল্লাহ্র আমানতস্বরূপ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের সতীত্বের ওপর অধিকার লাভ করেছ।

অতএব হে মানবমন্ডলী! তোমরা আমার কথা অনুধাবন কর। আমি তো পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে এমন সুস্পষ্ট বিধান রেখে গেলাম, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না : আল্লাহ্র কিতাব এবং তার রসূলের সুন্নাহ।

হে মানবমন্ডলী! তোমরা আমার কথা শোন ও অনুধাবন কর। তোমরা অবশ্যই জেনে রেখো, প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই এবং মুসলিমগণ ভ্রাতৃপ্রতীম। সুতরাং কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের কোন কিছু বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্টচিত্তে তাকে তা প্রদান করে। অতএব, তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? বর্ণিত আছে, তখন সকল মানুষ সমস্বরে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ! হ্যা! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দিশারী হযরত মহানবী (সা) প্রথম আরব ভূখন্ডে মানুষের সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সামনে একটা শান্তিময় মডেল পেশ করেন। মূলত এ ছিল গোটা বিশ্বের প্রতি সত্যের কার্যকর আহবান, ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে সত্য ও শান্তির সে প্রদীপ্ত পয়গাম ছড়িয়ে দিতে তিনি তদানীন্তন বিশ্বের শক্তিশালী শাসকদেরকেও সত্যের আহবান জানিয়ে দুত মারফত তাঁদের নিকট পত্র পাঠান। চীন, আবিসিনিয়া, রোম, পারস্য, মিশর ইত্যাদি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি তিনি পত্র দেন। তাঁদের অধিকাংশই ধীরে ধীরে সত্যের আহবানে সাড়া দিলেন। এভাবে এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার দিকে দিকে শান্তির পয়গাম ছড়িয়ে দিলেন মানবতার মুক্তির নবী। বিশ্বনবী (সা)-র সে আহবানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হল। পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট ও বীরগণ রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে যা করতে সক্ষম হননি, আরবের উম্মী নবী (সা) শুধু তাঁর বাণী দ্বারাই তা সম্পন্ন করলেন। আর এখানেই মহানবী (সা)-র বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য।[৫০]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মহানবী (সা) বিশ্বশান্তির পথে যে সব বড় বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল একে একে সবের মূলোৎপাটন করেছিলেন এবং সেগুলোর স্থলে মানবতার উদ্বোধক ও বিশ্বশান্তির সহায়ক বিকল্প নীতি, কর্মকৌশল ও আদর্শ প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশিত এবং বাস্তবে প্রয়োগকৃত এসব শিক্ষা ও নির্দেশাবলী পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সংরক্ষিত আছে। এসব নির্দেশনা মান্য করে তাঁর প্রকৃত অনুসারীরা জগতে এক বিস্ময়কর সভ্যতা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বলিত সমাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে যে, জাহেলী আরবের সেই সমাজে যেখানে মানুষের জানমাল ও সম্মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না, চুরি ডাকাতি হত্যা নারী নির্যাতন, উলঙ্গতাসম পাপাচার ছিল নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, সেখানে ইসলামী সমাজ নির্মাণের পর এমন নিরাপত্তা এসেছিল যে, সুদূর ইয়েমেন থেকে একজন সুন্দরী যুবতী অলংকার পরিহিতা অবস্থায় হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে, কিন্তু তার দিকে কামনার চোখ তুলে তাকানোর মতো সামান্য নির্লজ্জতা পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। পারস্য বিজয়ের পর সে দেশের রাজার রাজমুকুট সাধারণ একজন মুসলিম সৈনিক বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন। তিনি লোক দেখানো বা মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্খা হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এ অবস্থায় কোন পুরস্কার গ্রহণ করতে সম্মত হননি।

৫০। খন্দকার মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৯.

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত মহানবীর শিক্ষা ও আদর্শে গঠিত সেই সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা, পারস্পরিক কল্যাণকামিতা, আইনের প্রতি আনুগত্য, মানুষের উপকার সাধন, জ্ঞান চর্চা প্রভৃতি মৌলিক মানবীয় গুণাবলী পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং কিছুদিন পূর্বের সেই মরুচারী নিষ্ঠুর পশুর চেয়েও নিকটের মানুষগুলো বিবেক ও ন্যায়ের এক একজন অতন্ত্র প্রহরীতে পরিণত হয়েছিল।[৫১] এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামের মহানত্ব, আর এ ধারায় আজও ইসলামের সুমহান শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৫১। ড. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৭,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমকালীন অবস্থা ও ওআইসি প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমকালীন অবস্থা ও ওআইসি প্রতিষ্ঠা

ওআইসি গঠনের পটভূমি

ও আই সি[১] (Organization of Islamic Cooperation) বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংগঠন। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও শান্তির লক্ষ্যে এর কর্মকান্ড নিবেদিত। বিশ্বে প্রায় এক শত সত্তর কোটি মুসলমানের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক ওআইসি। এ সংস্থার আদর্শ ইসলাম। ইসলাম মানব কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম। শুধু মুসলিম নয়, বিশ্বের সকল সম্প্রদায় ও জাতির কল্যাণ ও শান্তির লক্ষ্যে এর অনুসারীরা জীবন পরিচালনা করবে, এটাই এ ধর্মের শাশ্বত বিধান। মুসলিম বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ওআইসি ইসলামের এ বিশ্বজনীন ধারণার সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, কল্যাণ ও শান্তি এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলেও চূড়ান্ত বিযেশ্লণে বিশ্বমানবের কল্যাণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা এর আওতাভুক্ত।

দু' দুটি বিশ্বযুদ্ধে মানব জাতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পটভূমিতে এবং পূর্বতন বিশ্বসংগঠন লীগ অব নেশন্স (Legaue of Nations)- এর আকাঙ্খিত দায়িত্ব পালন ও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের (United Nations) প্রতিষ্ঠা। জাতিসংঘের কর্মপরিধিতে পৃথিবীর সকল দেশই সদস্য হওয়ার সাপেক্ষে এর সদস্য অথবা কমপক্ষে এর কার্যপরিধিভূক্ত। এ হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও জনগোষ্ঠী এর কর্মপরিধিভুক্ত। সুতরাং জাতিসংঘের ভূমিকা মুসলিম দেশ ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণ এবং শান্তিড়তে বৃহত্তর উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘের ভূমিকায় পরাশক্তির প্রভাব থাকায় বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে এর প্রশ্নসাপেক্ষ অবস্থান এবং মুসলিম বিশ্বের শান্তিনিশ্চিত করতে অসাফল্যের দিকটি বিশ্বমুসলিমের ক্ষোভ ও অসন্তেড়াষের কারণও বটে। তবে, এ বিশ্বসংস্থার নীতিমালার সার্বজনীনতা রয়েছে এবং প্রভাবমুক্ত অবস্থায় এর কর্মকান্ড পরিচালিত হলে এর ভূমিকা অত্যন্তগঠনমূলক হতে পারতো; এটিও সত্য। এজন্য বিশ্বসংগঠন রূপে ও আই সি-র ভূমিকা জাতিসংঘের ভূমিকার আলোকে বিবেচনাযোগ্য। জাতিসংঘের ভূমিকা মুসলিম বিশ্বের জন্য নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকলেও ও আই সি-র ভূমিকা অধিক ফলপ্রসূ হতো। ওআইসি-র ভূমিকা তাই জাতিসংঘের সম্ভাব্য সার্বজনীন ভূমিকার সদৃশ ও ক্ষেত্রবিশেষের ইতিবাচক রূপ-এ দৃষ্টিকোণে ও আই সি-র স্বকীয় পরিমন্ডলের সাথে জাতিসংঘের ভূমিকার দিকটিও বিবেচ্য। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকাও বিবেচনায় আসবে। মুসলিম বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তির জন্য এ আন্তর্জাতিক মুসলিম সংস্থার সংহত প্রয়াসে কল্যাণ ও শান্তিনিশ্চিত হতে পারে মুসলিম বিশ্বে এবং এর পাশাপাশি গোটা বিশ্ব-পরিবারে।

---

(১) ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর সময়কালকে ওআইসির প্রতিষ্ঠাকাল ধরা হয় (বিস্তারিত দেখুন, রাবাত ঘোষণা এবং ওআইসি গঠন) প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল (Organigation of Islamic Conference) পরবর্তীতে ২০০৮ সালে পরিবর্তিত হয়ে (Organigation of Islamic Countries), এবং সর্বশেষ ২৮ জুন ২০১১ তারিখে নাম পরিবর্তন করে (Organigation of Islamic Cooperation) বা ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা রাখা হয় (বিস্তারিত WWW. OIC-OCI.Org. Com)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত জেদ্দায় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিশটি দেশের অংশগ্রহণে এ সম্মেলনে 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স, এর খসড়া চার্টার অনুমোদিত হয়। ওআইসি-র বিধিবদ্ধ যাত্রা সূচিত হয় তখন থেকেই। তবে ওআইসির সূচনাকাল ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সময়কাল। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে এ চাটারের সংশোধন একে অর্থবহ বিশ্বসংস্থার পর্যায়ে উন্নতি করে।

গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে , অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে কোন আগ্রাসী নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়নি; বিশ্ব মানবিক সংহতি ও ঐক্য পরিপন্থী কোন সংকীর্ণ চিন্তার প্রতিফলনও ঘটেনি। যুগ যুগ ধরে হামলা, ধ্বংস, বিপর্যয় ও পরাধীনতার শিকার হলেও এবং আল-কুদসে অগ্নিসংযোগের সর্বশেষ বৈরী ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে ও আই সি আত্মপ্রকাশ করলেও মুসলিম বিশ্বের আত্মরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি'র পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুবিচার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান'ই এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষিত হয়। ওআইসি-র চার্টারে মুসলমানদের নিজস্ব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও উন্নয়নমূলক এবং বিশ্বমানবের প্রতি সার্বজনীন সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিমূলক চেতনাই বিধৃত হয়েছে।

এই সংস্থাটি মুসলিম বিশ্বের সুরক্ষা, উন্নতি, অগ্রগতি এবং বিশ্বের অপরাপর জনগোষ্ঠী বা অমুসলিম দেশসমূহের সাথে স্নৌহাদ্যমূলক সম্পর্ক এবং কল্যাণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠায় যে চার্টার বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়েছিল, গত চার দশকের ওআইসি-র কর্মকান্ড বিশে-ষণ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ সু-সম্পর্ক দৃশ্যমান হলেও মুসলিম বিশ্বের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় এ সংস্থা আকাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়নি। ও আই সি-র আওতায় মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। কিন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হওয়ায় কোন কোন মুসলিম দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ সংস্থাটির ভূমিকা অনুজ্জ্বল। ও আই সি-র ঘোষিত ও উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ পর্যন্তকিছু ব্যর্থতা প্রকট হয়েছে এবং এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মতই ও আই সি সম্পর্কেও কিছু জিজ্ঞাসা এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশে-ষণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উচ্চারিত হচ্ছে। এটা এক মূল্যায়ন সাপেক্ষে বাস্তবতা।

একটি বিশ্ব-সংগঠন হিসেবে মানব জাতির জন্য জাতিসংঘের যেমন প্রয়োজন, তেমনি মুসলিম বিশ্বের এবং গোটা বিশ্বমানব পরিবারের জন্যও প্রয়োজন ও আই সি-র মত আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার। এর দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা, এ প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্ম-উদ্যোগে বলিষ্ঠ ও কর্মচঞ্চল করা এ মুহূর্তে প্রয়োজন। যোগ্য নেতৃত্বের সাথে মুসলিম দেশসমূহের সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিত করেই লক্ষ্যে পৌছাতে হবে। চার্টার

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী কল্যাণ ও শান্তিবাস্তবায়নে ঘরে-বাইরে ব্যাপক ও সমন্বিত প্রচেষ্টার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। ও আই সি-র বর্তমান দুর্বল অবস্থান থেকে সংস্থাটির দ্রুত উত্তরণ অপরিহার্য।

ওআইসি-র জন্ম, ঘোষণা, সামগ্রিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ, আভ্যন্তড়ীণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, মুসলিম বিশ্ব তথা গোটা বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠায় এ সংস্থার ভূমিকা, সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ এবং এর ইতিবাচক মূল্যায়নের দৃষ্টিকোণে বাংলায় একটি অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী। এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি এবং এর গঠনমূলক পর্যালোচনা-মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করতে এ ধরনের অভিসন্দর্ভ সহায়ক হতে পারে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ও আই সি সৃষ্টির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি বিশ্লেষণ করে বিশ্ব মূসলিমের জন্য একটি দিক নির্দেশনামূলক অভিসন্দর্ভ রচনা করা অতীব প্রয়োজন।

মুসলমানগণ বিশ্বে অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হলেও তাদের একক কোন সংগঠন ছিল না যেখান থেকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। কোন কোন সময় দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে গ্রুপ গঠিত হলেও সবগুলো মুসলিম দেশের এক সাথে বসে সম্মিলিত ভাবে কিছু করার কল্পনাও করা যায়নি। বিষয়টির বাস্তবতা অনেক পূর্বেই চিন্তা করা হয়েছে, কোন কোন সময় এর উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়, কিংবা বাস্তবে বৃহদাকার এরূপ সংস্থার বাস্তবায়ন ঘটেনি। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ তথা 'মুসলিম বিশ্ব' প্রতিষ্ঠার ধারণা থেকে ওআইসি'র জন্ম হয়। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এরূপ সংস্থা গঠন এক অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গোড়ার কথা

তুরস্কের উসমানীয় খিলাফতের বিলোপের সংগে সংগে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের শিথিল বন্ধনটিও ছিন্ন হয়ে যায়। একদিকে পুর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে নতুন ভাবে জাতীয়তাবাদের জাগরণের সাথে সাথে বিত্তবান ও অগ্রসর ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে জায়নবাদের চেতনা আর অন্যদিকে গোত্রীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাঝে পারস্পরিক সংঘাত মুসলিমঐক্যের জন্য এক হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান অসন্তোষ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতীয় আকাংখা বা প্রাদেশিক গভর্নরদের উচ্চাভিলাষ এসব অঞ্চলে বহি:শক্তির ষড়যন্ত্র বিস্তারের বিরাট সুযোগ করে দেয়। তুরস্ক ছিল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরাজিত শক্তি জার্মানীর অন্যতম দোসর। তাই যুদ্ধের শুরুতেই মিত্রশক্তি, বিশেষ করে বৃটেন আর ফ্রান্স তুরস্কের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষমতালিপ্সু গভর্নরদের সংগে গোপন চুক্তি স্থাপন শুরু করে। তুরস্কের সরকারী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মিত্র শক্তিকে যুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রতিদান স্বরূপ যুদ্ধের শেষে এসব অঞ্চলকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করে চুক্তিবদ্ধ গভর্নরদের সুলতান রূপে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ সকল চুক্তির প্রধান শর্তাবলী। এ ধরনের এক গোপন চুক্তির অংশীদার ছিলেন হেজায বা মক্কার গভর্নর শেরীফ হোসেন।

এ দিকে জায়নবাদকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদানের মাধ্যমে রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদীরা প্যালেস্টাইন অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী রথশীল্ড

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারসহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু বিত্তশালী ইহুদী নাগরিক ও জায়নবাদী সংগঠন প্যালেস্টাইনে উদ্বাস্তু ইহুদিদের পুর্ণবাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। আমারিয়া, জুডা, গেলিলীসহ প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদিনের নতুন নতুন কলোনী গড়ে উঠতে থাকে। জায়নবাদী আন্দোলন এক পর্যায়ে এসে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৯১৭ সালে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ব্যালফোর ঘোষণার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাবকে সমর্থন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ফরাসী ও ইটালী সরকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন এ প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। স্বাভাবিক ভাবেই এ ঘটনা একদিকে ইহুদিদের যেমন অনুপ্রাণিত করে, ঠিক তেমনি ভাবে আরবদের, বিশেষ করে প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী মুসলমানদের নিরাশ করে। ১৯৪২ সালে মে মাসে নিউইয়র্কে অবস্থিত শক্তিশালী জায়নবাদী সংগঠন American Zionist Organisation (AZO) প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত একটি নতুন কর্মসুচী গ্রহণ করে। এ কর্মসুচীর আওতায় ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করা, একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা, ১৯৩৯ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত শ্বেতপত্রকে অগ্রাহ্য করা। পরবর্তীতে এ কর্মসুচীই প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য প্রধান রাজনৈতিক কর্মসুচী হিসেবে পরিণত হয়।[২]

১৯৪৭ সালের মে মাসে জাতিসংঘে মোট ১১টি দেশের সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিকল্পনায় প্যালেস্টাইনকে একটি আরব রাষ্ট্র, একটি ইহুদী রাষ্ট্র এবং জেরুজালেমকে আন্তঃরাষ্ট্রীয়করণের সুপারিশ করা হয় এবং একই পরিকল্পনায় প্যালেস্টাইনে দেড় লক্ষ নতুন ইহুদী পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। উপরোক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যখন জাতিসংঘ সাধারণ সভার একটি বিশেষ এডহক কমিটিতে নানারকম বিতর্ক শুরু হয়, ঠিক তখনই জায়নবাদীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ ভোটাভোটির মাধ্যমে প্যালেস্টাইনকে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীহ হয় এবং ১৯৪৮ সালের ১৪ মে তারিখে ইহুদিদের প্রতিনিধিগণ স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করে।[৩]

---

২. সাহাবুদ্দিন খান, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি), *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, তেইশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ.১২৫.

৩. তোফাজ্জল হোসেন, *জাতিসংঘ*, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

নতুন ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে গোটা আরব বিশ্বে যুদ্ধের দামামা বেড়ে উঠে। জর্দান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও লেবাননের বিশাল সম্মিলিত বাহিনী প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রসর হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন ইসরাইলী বাহিনী পরাস্ত হতে শুরু করে, ঠিক তখনই জাতিসংঘের আহবানে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হয়। এ সুযোগে রাশিয়াসহ অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলো ইসরাইলকে প্রচুর সামরিক সাহায্য দিতে শুরু করে এবং ইহুদীরা বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে নিজেদের শক্তিশালী করে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করে। এবার আরবরা আর ইসরাইলী বাহিনীর সাথে পেরে উঠেনি এবং প্যালেস্টাইনের ইতিহাসে এ যুদ্ধ তাদের পক্ষে পরিস্থিতিকে সম্পূনণ পাল্টে দেয়।

১৯৬৭ সালে আরব বিশ্ব পুনরায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এবরাও যুদ্ধে বিজয়ী হয় ইসরাইল। যুদ্ধের শুরু তেই ইসরাইলী বিমান বাহিনীর অতর্কিত হামলার মিসরের বিমানবহর প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিজয়ী ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২ আগষ্ট তারিখে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সারা বিশ্বের মুসলমান এ ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। The burning of the Al-Aqsa Mosque in Israeli-occupied Jerusalem (the third most Sacred Shrine for the Muslims) on 21 August 1969 created profound feeling of anguish and frustration throughout the Muslim world. And out of this incident came the momentuos move to organise a meeting of the leaders of the Muslim countries at the highest level. [8]

২.১. ওআইসি গঠন

ওআইসি (Organization of Islamic Cooperation) বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্রের সংগঠন। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও জনগোষ্ঠির কল্যাই ও শান্তিড়্র লক্ষে এর কর্মকান্ড নিবেদিত। বিশ্বে প্রায় এক শত সত্তর কোটি মুসলমানের ঐক্য ও সংস্কৃতির প্রতীক ওআইসি। এ সংস্থার আদর্শ (Ideology) ইসলাম। ইসলাম মানব কল্যাণ ও শান্তিড়্র ধর্ম। An introduction to peace and conflict studies এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, Islam professes peace and in a verse in the Holy Quran it proclaims "Be not weary and Faint-hearted. Crying for peace, when you should be upper most "[৫]

৪. সাহাবুদ্দিন খান, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬

৫. Harun un Rashid, Ibid, p-118, *আল কুরআন, ৪৭ঃ ৩৫*

Dhaka University Institutional Repository

শুধু মুসলিম নয় বিশ্বের সকল সম্প্রদায় ও জাতির কল্যাণ এবং শান্তিড়র লক্ষ্যে এর অনুসারীরা জীবন পরিচালনা করবে, এটাই এ ধর্মের শাশ্বত বিধান। মুসলিম বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তিড়র জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ওআইসি ইসলামের এ বিশ্বজণিন চেতনা সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলত বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা কল্যাণ ও শান্তিএ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলেও চূড়ান্তবিশে-ষণে বিশ্বমানবের কল্যাণ ও শান্তিএর আওতাভুক্ত।

মুসলমানগণ বিশ্বে অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হলেও তাদের একক কোন সংগঠন ছিল না, যেখান থেকে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। আরবদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আরব জাতীয়তাবাদের ঐক্য সুসংহত করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন The Slogan of Arab Socialism was naugurated in order to Unity the Arabs.[৬] কোন কোন সময় দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে গ্রউপ গঠিত হলেও সবগুলো মুসলিম দেশের এক সাথে বসে সম্মিলিত ভাবে কিছু করার কল্পনা করা হয় নি।

এ ক্ষেত্রে মুসলিম নেতাগণ মুসলিম উম্মাহই সম্পর্কিত সংহতি ও ঐক্যের আদর্শের বাস্তবায়নে স্বাভাবিকতা ভিত্তির ব্যবহার করতে পারেননি। 'উম্মাহ' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে তাদের মতভেদ ছিল। Noor Ahmed Baba উল্লেখ করেন The OIC- operating within the state-centric framework-accepts or is rather based on the principle of state sovereignty of various Islamic countries that compose it and their mutual co-existence. Historically also, Ummah has not always meant a politically unified Muslim community and, therefore, cannot be equated with the word nation with its contemporary connotations.

The Arabic word the Qur'an uses Umma is often treated today as synonymous with nation. Yet if there is one thing the Islamic Umma is not it is a nation, in either Roman or the modern sense. What was significant about the Umma of Muslims in history was that it transcended national and tribal loyalties rooted in the accident of birth, and was a community of believers, bound together in a brotherhood more vital than that of blood. In Arabic, Umma is used for people, community.

6. Mohammad Ruhul Amin and ATM Fakhruddin, *Arab Nationalism and Arab Unity, Poblems and prospects*,The Dhaka University Studies, Vol-53, NO-1, June-1996, P. 53

Dhaka University Institutional Repository

In Qur'an this word is used in many senses but the chief reference is to racial or religious bodies of people with whom God is concerned. After Mohammad, the spread of Islam across much of the ancient world led to Ummah being enlarged from Arabic people to all Muslims and this has created a strong sense of community which has characterised Islam. [৭] এ মতভেদ অতিক্রম করে-মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা জোরদার করণ তথা "মুসলিম বিশ্ব" প্রতিষ্ঠার ধারণা এবং বায়তুল মোকাদ্দসের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ওআইসির প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্বের ইতিহাসে এরূপ সংস্থা গঠন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন- This is true of all international organisations, including the OIC. Therefore, the inclusion of the word ``conference'' in the nomemnclature of the OIC only refers to this aspect of an organisation of its kind and not to any distinctive feature which is specific to the OIC alone. A conference is a meeting of individuals called together to engage in discussion with the aim of accepting a limited task within a realisitic period of time. In the case of international governmental organisations like the UNO, OAU, or OIC, It is representatives of member-states who assemble to deliberate on issues or problems of common concern and try to arrive at a common stand or strategy to deal with them. A conference, especially in the technical sense of conference diplomacy, is associated with elaborate procedurul details. It is formal in certain well defined respects. A conference must have a scheduled begining and end, identifiable sessions, and a distinguished membership. Its subject matter is specified. The conference plan must include, as a final step, a projected outcome, whether this takes the form of a report, a set of recommendations of resolutions, a prononucement about some program, or the formulation of new insights. The working of the OIC and its conference sessions, either at Foreign Minsters' level or at the summit level, stands testimony to this style of functioning. Its sessions are identifiable, they deal with identifiable issues and at the end of each session a set resolutions are passed and a communique is issued.[৮]

---

৭. *Noor Ahmad Baba*, পূর্বোক্ত, p.3.
৮. পূর্বোক্ত, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন সংস্থা বা সংগঠন গঠিত হয় একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এমনই একটি ঘটনা রয়েছে। নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন- In the changed situation it was not only the economic might of Saudi Arabia but also its political clout that consolidated its position in the Arab World. As Egypt increasingly adopted a conciliatory approach toward Saudi Arabia the main hurdles in the path of Faisal's pan-Islamic initiative were overcome.

The 1967 war not only helped Faisal in his initiative by shifting the balanec of power in the area but it also created a new set of issues to exploit. The most important development in this regard was the military occupation of East Jerusalem the third holiest city for Muslims by Israel. This fact had greatly shocked Faisal and he committed himself to the liberation of the city and the Al-Aqsa mosque located there. It is widely known that Faisal had wished to offer prayers in the liberated al-Aqsa mosque before his death. So he called upon all the Islamic states to support the Arabs for securing the liberation of Jerusalem. In such a conductive politico-diplomatic environment arson in the al-Aqsa mosque in Jerusalem on August 21,1969 provided an opportunity to Faisal to call for an Islamic Summit Conference. The incident sent shock waves througout the Muslim world and deeply infuriated Muslim sentiments. It was widly believed that the fire was an intentional and planned one so that al-Aqsa mosque could be destroyed and the Temple of soloman resurrected in its place.[৯]

এ ঘটনাটি বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের নিকট কাম্য ছিল না, ছিল না সুখকর। ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের পর ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইহুদীরা অধিকৃত জেরুজালেম[১০] নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কেবলা[১১]

৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩-৫৪

১০. জেরুজালেম, মুসলমান, খৃস্ট্রান ইহুদীদের পবিত্র স্থান, ১৯৬৭ সালে আবর-ইসরাইল সংঘর্ষের পর এ শহরের শাসন ক্ষমতা ইসরাইলের হস্তগত হয়।

১১. প্রথম কেবলা. হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকারামরয় যখন সালাত ফরয হয়, তখন কাবা গৃহ সালাতের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল মোকাদ্দাস ছিল- এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা;) বলেন ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল মোকাদ্দস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর মহানবী (সা.) এর আন্তরিক বাসনার কারণে কাবাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় অবস্থান কালে হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে- ইয়ামনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যাতে কাবা ও বায়তুল মোকাদ্দস উভয়টিই সামনে থাকে। মদিনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মহানবী (সা.) এর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। (মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী; তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন; অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, পৃ.৭৫,৭৬, ঢাকা)

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র মসজিদুল আকসায় [১২] অগ্নি সংযোগ ও অশোভন আচরণ করে, যা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। ফলে মুসলিম জাহান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

২৫ আগস্ট মিশরের রাজধানী কায়রোতে ১৪টি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে সৌদি আরব প্রস্তাব দেয় যে, বিষয়টি শুধু আরব নয় গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্যই অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বিষয়টি আলোচনার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের একটা শীর্ষ সম্মেলন অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সে মতে মরক্কো, সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মালয়েশিয়া ও নাইজিরিয়াকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। পরের মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ৮ ও ৯ তারিখে প্রস্তুতি কমিটি মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মিলিত হয়ে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চূড়ান্তকরে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেপ্টেম্বর মাসের ২২ থেকে ২৫ তারিখ তিনদিন ব্যাপী এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। ইতিহাসের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধাদের এ ঐতিহাসিক সম্মলিত অনুষ্ঠানে ২৫টি [১৩] মুসলিম দেশ যোগদান করে। পিএলও পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগ দেয়। বেশ কিছু মুসলিম দেশ এ সম্মেলন থেকে দূরে থাকে, এদের মধ্যে সিরিয়া ও ইরাক উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে সিয়েরালিওন, ক্যামেরুন, আইভরিকোষ্ট, ঘানা, আপারভোল্ট, নাইজেরিয়া ও মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র। সিরিয়া যোগ না দেয়ার কারণ ছিল মরক্কোর সাথে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা। আর ইরাক সম্মেনের ক্ষেত্রে কয়েকটা শর্ত আরোপ করেছিল যেগুলো পূরণ হয়নি। রাবাত Summit এর মাধ্যমেই OIC গঠিত হয়।

নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন- The Rabat Summit Conference, convened in 1969 in the wake of arson in al-Aqsa had proved to be of historic significance as it was here that the foundation of the Organisation of Islamic Conference (OIC) was laid.[১৪] সম্মেলন শেষে এক ঘোষণায় বলা হয় ইসরাইলকে অবিলম্বে ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমানায় ফিরে যেতে হবে। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন [১৫], যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেনকে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধান ও সৈন্য প্রত্যাহারে ইসরাইলকে বাধ্য করার জন্য আহবান জানানো হয়। [১৬] শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তেড়র প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে ২৫-২৭ মার্চ জেদ্দায় মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

---

১২. মসজিদুল আকসা ঃ মসজিদুল আকসা জেরুজালেমে অবস্থিত, মুসলমানদের দ্বিতীয় পবিত্রতম মসজিদ, আব্দুল লতিফ খান, পৃ.৪০৯

১৩. ২৫টি মুসলিম দেশ হল- আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, শাদ, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, মরক্কো, সৌদি আরব, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, নাইজার, পাকিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মিশর, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, সেনেগাল

১৪. *Noor Ahmad Baba*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫

১৫. সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ

১৬. আব্দুল মোতালেব সরকার, *আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা-২০০২, পৃ.৬৯

Dhaka University Institutional Repository

এতে ২২টি [১৭] মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে জেরুজালেম মুক্ত না হওয়া পর্যন্তওআইসির সেক্রেটারিয়েট জেদ্দায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্তগৃহীত হয় এবং মালেশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমানকে[১৮] প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ১৯৭০ এর ২৫-২৯ ডিসেম্বর পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ১৯৭১ এর ২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ পর্যন্তস্ৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয়। ৩০টি মুসলিম দেশ এতে যোগদান করে। এই সম্মেলনেই ওআইসির খসড়া চার্টার অনুমোদিত হয় এবং ওআইসির বিধিবদ্ধ যাত্রা শুরু হয়।

চার্টারের ভূমিকায় বলা হয়, মুসলিম জনতার সাধারণ বিশ্বাসকেই মুসলিম দেশগুলোর সংহতি ও পুনর্মিলনের ভিত্তি হিসেবে উদ্বুদ্ধ করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সযত্নে ওআইসিভুক্ত দেশগুলো সংরক্ষণ করার চেষ্টা চালাবে। এ চার্টারে ১৪টি অধ্যায় বা আর্টিকেল, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ৫টি আচরণ বিধি ও সংগঠনের ৭টি লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়।[১৯] পরবর্তীতে সংশোষিত সনদে ১৮টি অধ্যায়-৩৯টি ধারা অনুমোদিত হয়।[২০] সর্বশেষ সংশোধিত ও অনুমোদিত চার্টারের উপক্রমণিকাতে বলা হয়।

> ইসলামের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে ঐক্য ও সংহতিকে সমুন্নত ও সুসংহত রাখার অপরিহার্যতার প্রতি অঙ্গীকার জ্ঞাপন জাতিসংঘ সনদ, বর্তমান সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার জ্ঞাপন,
>
> মানবিক মর্যাদা, শান্তি, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সাম্য, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান মূল্যবোধ লালন এবং সমুন্নত রাখা
>
> সদস্য রাষ্ট্রসমূহের টেকসই উন্নয়ন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ইসলামের অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা ;
>
> মুসলিম জাতিসমূহ এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতি সমুন্নত ও জোরদার করা ;

---

১৭. ২১টি দেশ হল ঃ আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, শাদ, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, মরক্কো, সৌদি আরব, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, নাইজার, পাকিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মিশর, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, সেনেগাল

১৮. *টংকু আব্দুর রহমান*- জন্ম ৮ ফেব্রুয়ারী- ১৯০৩, মৃত্যু ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০। তিনি মালেশিয়ার রাজকীয় উপাধি (Tunku) টংকু লাভ করেন। তিনি মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক। মালয়েশিয়ার জনক। স্বাধীন মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী (বিস্তারিত The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition. Columbia University Press-2000)

১৯. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সনদ, উপক্রমণিকা।

২০. Charter of the Organisagation of the Islamic Conference, সংশোধিত ১৪ মার্চ ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

সকল সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক অখন্ডতাকে সংরক্ষণ ও সম্মান জানানো ;

বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা এবং সংলাপ এবং আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমর্থন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান ;

সদস্য রাষ্ট্রসমুহের সাংবিধানিক ও আইন ব্যবস্থা অনুযায়ী মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, সুশাসন, আইনের শাসন, গণতন্ত্র এবং জবাবদিহিতার লালন ও উন্নয়ন ;

সদস্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আস্থা, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা শাসন ;

ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পর্কে ইসলামের সুউচ্চ মূল্যবোধ লালন এবং ইসলামের প্রতীক ও সাধারণ উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীনতাকে সমর্থন ;

বুদ্ধিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের সুউচ্চ আদর্শ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও জনপ্রিয়করণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো ;

অংশীদারিত্ব ও সমতার ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর অংশগ্রহণের নিমিত্ত টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণ ;

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা ;

ফিলিস্তিনী জনগণের যাঁরা বর্তমানে বিদেশী দখলদারদের অধীনে আছেন, সংগ্রামকে সমর্থন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং আলকুদস আশ শরীফে রাজধানীসহ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং একই সাথে এর ঐতিহাসিক ইসলামী পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণের অধিকার অর্জনে তাদের ক্ষমতা প্রদান।

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আইন ও বিধান অনুযায়ী জীবনের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখা ;

মুসলিম শিশু ও যুবকদের যথাযথ ভাবে প্রতিপালনের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা এবং তাদের সাংস্কৃতিক সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের উন্মোষ ঘটানো ;

সদস্য রাষ্ট্রের বাইরে অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মর্যাদা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণের জন্য তাদের সহায়তা প্রদান ;

এই সনদ জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য এবং নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং একই সাথে কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকা ;

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুশাসন কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে ক্ষমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক এবং কোন দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ;

অত:পর এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহযোগিতার সিদ্ধান্তগৃহীত হয় এবং সংশোধিত সনদের প্রতি ঐক্যমত্য পোষণ করা হয় ;

উপক্রমণিকাতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং ঐতিহাসিক ইসলামী পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণের এবং ইসলামের সুমহান মূল্যবোধ লালনের বিষয়ে যেমন অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে, তেমনি আর্ন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য এবং নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা , বিশ্বের অপরাপর জনগণ ও বিভিন্ন রাষ্টের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার তাগিদ প্রদান এবং আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থায় ইসলামী বিশ্বের প্রাণের চাওয়া একটি আন্তর্জাতিক ইসলামীক সংগঠন হিসেবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা যা বর্তমানে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ও.আই.সি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২.২. আর্ন্তজাতিক সংগঠন

আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা বিধান করতে পারলে মানবসমাজ উন্নয়ন অধিকারের সুফল ভোগ করতে পারবে। "উন্নয়নের জন্য বেশি প্রয়োজন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন, যাতে করে সংশ্লিষ্ট দেশ মুক্ত ভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশে এগিয়ে যেতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব থাকতে হবে। উন্নয়নের ফলকে বাধাগ্রস্থ করে এমন সব অবস্থার নিরসনে সচেষ্টা হওয়া দরকার। এসব বাধাগুলো হল- উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, আদিবাসি নির্যাতন, বিদেশি আগ্রাসন ও দমন, দখলদারিত্ব,সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, যুদ্ধ প্রভৃতি।[২১] এ বাধাগুলো বিদূরিত করে জাতীয় অঞ্চল কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় রাজনীতি, আঞ্চলিক সংগঠন কিংবা আন্তর্জাতিক সংগঠন কাজ করে। বিশ্বের কোন একটা অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, প্রতিরক্ষামূলক বা সার্বিক সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সহযোগিতা হল আঞ্চলিক সহযোগিতা। এরূপ সহযোগিতা কোন না কোন সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমেই রূপ লাভ করে। ইইসি বা ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অধুনালুপ্ত ওয়ারশ জোট, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'আসিয়ান', দক্ষিণ এশিয়ার 'সার্ক' ইত্যাদি আঞ্চলিক সহযোগিতার উদাহরণ।[২২]

২১. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০৯, পৃ.১৪০

২২. হারুনুর রশিদ, *রাজনীতি কোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০১২, পৃ.৫৬

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিকতার গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শৃংখলার নির্ধারিত নিয়মাবলীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগঠনই হল আন্তর্জাতিক সংগঠন, যেমন ওআইসি এবং জাতিসংঘ।[২৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ হিসেবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব ইতিহাসের এক দুর্যোগময় অধ্যায়ে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "স্থায়ী শক্তির লীগ (The League of enforce peace) গঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারী লীগ অব নেশন্স (League of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] তবে বিশ্বের তাবত পন্ডিতগণের অনেকে মনে করেন বিশ্বের বিবদমান সংঘাত প্রশমিত করার জন্য বিশেষ করে সংঘাত নিরসনের সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা হল আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপন।[২৫] অনেক ঘটনার পর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগের বেশি মানুষের প্রতিনিধি ৫০টি রাষ্ট্রের এক মহাসম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৬] ১১১টি ধারা সম্বলিত জাতিসংঘের সনদের উপক্রমণিকার শুরু তেই ঘোষিত হয়েছে 'আমরা জাতিসংঘের জনগণ'। এই ঘোষণার মাধ্যমে সনদ প্রণেতাদের এবং জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের গণতান্ত্রিক মনোভাব এবং সমগ্র বিশ্বের জনগণকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একই সূত্রে সম্পৃক্ত করার মানসিকতা পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।[২৭]

২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্তজেদ্দায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত চার্টারে ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্তরাবাতে অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে 'রাবাত ঘোষণার' মাধ্যমে গঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার[২৮] চূড়ান্তঅনুমোদন দেয়া হয়।[২৯] পরবর্তীতে ১৪ মার্চ ২০০৮ [৩০] তারিখে ১৮টি অধ্যায় ও ৩৯টি ধারার মাধ্যমে গৃহীত চার্টারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সদস্যপদ ধারা (৩) এর মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে OIC আত্মপ্রকাশ করে।

---

২৩. নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ-২০০৪, পৃ.১৭-১৮

২৪.ফিরোজা বেগম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা-২০১১, পৃ-৪৪৪-৪৪৫

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৩

২৬.পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬১

২৭.তোফাজ্জল হোসেন, *জাতিসংঘ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৭, পৃ.৪১

২৮.Noor Ahmad Baba, *Organisation of Islamic Conference theory and practice of pan Islamic Cooperation*, Dhaka-1994, pp.63-67. XIV-XVI

২৯. ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (প্রথম অধ্যায়ের ১নং টিকা দ্রঃ)

৩০. ১৪ মার্চ-২০০৮ সালে ওআইসি'র সংশোধিত চার্টার অনুমোদিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা (৩) এ বলা হয়েছেঃ

1. The Organisagtion is made up of 57 States member of the Organisation of the Islamic Conference and other States which may accede to this Charter in accordance with Article 3 paragraph 2.
2. Any State, member of the United Nations, having Muslim majority and abiding by the Charter, which submits an application for membership may join the Organisation if appoved by consensus only by the Council of Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the Council of Foreign Ministers.
3. Nothing in the present Charter shall undermine the present Member States' rights or privileges relating to membership or any other issues.

ধারা (৪) এ বলা হয়েছেঃ

1. Decision on granting Observer status to a State, member of the United Nations, will be taken by the Council ot Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.
2. Decision on granting Observer status to an international organisation will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.

উল্লেখিত ধারা ৪ এর (২) এ International Organisation বা আন্তর্জাতিক সংগঠন শব্দের উল্লেখ এবং ধারা ৩ এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, OIC একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। অন্যাভাবে বললে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক সংগঠনের পরিধি এবং ওআইসির পরিধি সমার্থক।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩. শান্তি ও সংঘর্ষ সম্পর্কে ধারণা

শান্তিসম্পর্কে ধারণা

Peace বা শান্তিএকটি ইতিবাচক শব্দ। Peace এর অভিধানিক অর্থ situation or a period of time in which there is no war or violence in a country or an area এটি Negotiation অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন, The Negotiators are trying to make peace between the warring factions যে রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শান্তিভূপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে এমন অবস্থা বুঝানোর জন্য Peace শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[৩১] কোন কোন তাত্ত্বিকের মতে Peace শব্দটি positive এবং Nagative উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। Positive অর্থে A state of harmony এবং Negative অর্থে A state existing during the absence of war ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধ বিদ্যমান নয় এরূপ শান্তিভূপূর্ণ অবস্থানকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিবেচনা করে থাকেন।[৩২] ব্যাপক অর্থে Peace হল Peace is the least application of violence and coercion to the individual human being and to the freedom of access of the individual to cherished values. Peace has also been defined in terms that do not limit its domin to the adsence of war, but extend it to mean universial harmony and liberty as well.[৩৩]

কেউ কেউ মনে করেন শান্তি এবং যুদ্ধ একটি শক্তিশালী আদর্শিক বিষয়। এ বিষয়ে মার্কসবাদীদের বিশ্লেষণ অন্য রকম। তাদের কেউ কেউ মনে করেন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন থেকে শান্তিবিনষ্ট হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়। কমিউনিষ্টদের অনেকে মনে করেন ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব ছিল শান্তির পক্ষে উত্থান।

---

৩১. A S Hornby, *Ox ford Advanced Learners Dictionary of current English*, Oxford University Press, Seventh edition, p-1114.
৩২. Harun Ur Rashid, *An Introduction to peace and conflict studies*, The Universtiy Press Limited, Dhaka-2005, P-01.
৩৩. Mohammed Rabie, *Conflict Resolution and Ethnicity*, Westport, connecticut London-1994, p-13.

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এবং জর্জ ডবি-উ বুশের[৩৪] বক্তব্য পাওয়া যায়। জন এফ কেনেডি Peace concept কে বিভিন্ন দিক থেকে বিশে-ষণ করে বলেছেন: I am not referring to the absolute, infinite concept of universial peace and good will. Let us focus instead on a more practical, more alleinable peace, based on not an a sudden revolution in human nature but an a gradual evolution in human institution. Peace is a process, a way of solving problems.[৩৫]

সংঘর্ষ সম্পর্কে ধারণা

সংঘর্ষ বা Conflict একটি নেতিবাচক শব্দ। Conflict এর শাব্দিক অর্থ দ্বন্দ্ব, সংঘাত, যুদ্ধ, বিরোধী হওয়া, সংন্ত্রাস করা ইত্যাদি।[৩৬] কোন কোন তাত্ত্বিকের মতে Conflict এর সঙ্গে Competition ও Coopreration এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। থমাস শেলিং মনে করেন Conflict, Competition and Cooperation are inherently interdependent, confict occurs when competing groups goals, objective, need or values clash and aggression, although not necessarily violence, is a result. কারো কারো মতে Conflict ও Competition এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। Conflict এমন এক আচরণ যার affect an opponent অন্যদিকে Competition এর উদ্দেশ্য হলো achieving particular goals. কিছু তাত্বিক দেখিয়েছেন Competition রাজনীতিতে ইতিবাচক ফল বয়ে আনে।[৩৭] সংঘর্ষ সম্পর্কে বলা হয় মোহাম্মদ রাবাই উল্লেখ করেন ঃ Conflict is neither good nor bad and does not always lead to unquestionable consequences, conflict that conrtibutes to dishonorable competition to accentuating differences between social and political groups, or to widespread violence that Inflicts pain of thers is bad and always leads to undesirable consequenes.[৩৮] রসস্ট্যোগনার মনে করেন conflict এমন এক অবস্থা যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কাঙ্খিত লক্ষ্য কেবল তাদের যে কোন একজন অর্জন করতে পারেন; উভয়ে পারেন না।

---

৩৪. James veitch, *President Geoge W Beosh and Beginnings of the War on Terror*, Peace and Security Review, Volume-2, Number-2, Second Quarterly 2009, pp-87-111, 2009

৩৫. Harun ur Reshid, Ibid, p-2

৩৬. *English-Bengali Dictionary*, বাংলা একাডেমী, ২২ তম সংস্করণ, ঢাকা-২০০৩, পৃ-১০৬

৩৭. জালাল ফিরোজ, *সংঘর্ষ, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং বাংলাদেশ একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, সমাজ নিরীক্ষণ, নং-১২১ এপ্রিল-জুন ২০১২, P-1-2

৩৮. Mohammed Rabie, Ibid, p-5

Dhaka University Institutional Repository

এমন পরিস্থিতি যেখানে কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে, প্রতিটি পক্ষ তাদের একটি লক্ষ্য অর্জন, কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা অবস্থার প্রাপ্তি বা নির্মাণে নিজেদের সকল শক্তি নিয়োগ করে এবং প্রতিটি পক্ষ অন্য পক্ষকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে একটি বাধা বা হুমকি বলে গণ্য করে[৩৯] তবে ঃ কোন কোন তাত্ত্বিক উল্লেখ করেন Conflicts are usually divided into two major catagories, Interest-related and value-related, conflict over trade issue, state sceuity considertions, regional influence, and even over territory and natural resources are generally considered to be interest related, conflicts caused by conpetition between similar economic and professional groups and disputes between labar and management, are also catagoriyed as interest related, Other conflicts within and between state caused by matters related to political Ideologies, religious beliefs, cultural rights, national sovereignty, and the socio- political status of minorities are considened value-related, None the less, most international and all ethnic conflicts are both interest-related and value-related at the same time.[৪০]

Peace এবং conflict সম্পর্কযুক্ত peace এবং conflict এর উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিএবং সংঘর্ষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তবে উভয়ের সুব্যবস্থাপনাই গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এ জন্য The old Roman doctrine of all (qui desiderat pacem, praeparet bellum who desires peace prepare For war) Implies that peace and conflict are interwined or are two sides of the same coin. Many writers on the subject hold the same view that peace and conflict are inseparble, Quincy Wright made this point when he wrote:` the absence of conditions of peace is the cause of war' Mohan Rabie argues that peace without conflict is stagnation and conflict without peace is chaos, making peace and conflict two preconditions for continued human progress and organisational rejuvenation.[৪১]

---

৩৯. জালাল ফিরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ.২
৪০. Mohammed Rab*ie*, Ibid, p-8
৪১. Harun un Reshid, Ibid, p-3

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে মনে করেন শান্তি ও সংঘর্ষের সাথে সন্ত্রাস (বর্তমান বিশ্বের) আলোচনা হতে পারে। বস্তুত সন্ত্রাস[৪২] একটি ভিন্ন বিষয় যদিও সন্ত্রাসের কারণে সংঘর্ষ বাধতে পারে এবং সন্ত্রাসহীন সমাজে শান্তি বজায় থাকে। অন্যদিকে মুসলমানদের জীবনধারার সাথে শান্তি কথাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পবিত্র কুরআনে ৫৩টি আয়াতে এই শান্তির কথা বলা হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা তাদের জীবনের সব কার্য প্রক্রিয়ায় শান্তি কথাটা উচ্চারণ করে, কারণ এ কথাটা তাদের সাদর সম্ভাষণের একটা মাধ্যম। অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে তাই মুসলমানদের জীবন ধারায় শান্তির প্রসার ঘটানো বাধ্যতামূলক। নিজেদের মধ্যে বা অন্যের সাথে যুদ্ধ করার কারণ অনুসন্ধান তাই ইসলাম সম্মত নয়।[৪৩]

---

৪২. সন্ত্রাস হলো- According to the Anti Terrotism Act 2009 of Bangladesh ``Acts or omissions constituting threats to unity, integrity, security of sovereignty of Bangladesh, creating panic among the people, or obstructing official activities and possessing explosive substance, chemical or fire arms for that purpose would be regarded as `terrotism' (See-Counter Terrorrism Training Handbook. Bangladesh Institute of peace and Seceutity studies, Dhaka-2011-p-13

৪৩. মহাথির মোহাম্মদ, *ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ (অনুবাদ, আবু জাফর)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা-২০০৯, পৃ.১৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ওআইসি পরিচিতি ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: ওআইসি পরিচিতি ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম

ওআইসি

ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২ আগষ্ট তারিখে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সারা বিশ্বের মুসলমান এ ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

১৪টি আরব রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ২৫ আগষ্ট, ১৯৬৯ তারিখে কায়রোতে এক জরুরী বৈঠকে বসেন। মসজিদুল আকসায় ইসরাইল কর্তৃক আগুন দেয়ার ঘটনাকে সামনে রেখে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সৌদি আরব প্রস্তাব দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের। এ বছরই সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধানদের তিনদিন ব্যাপী প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনই মুসলমানদের ইতিহাসে রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রথম বৈঠক। এ সম্মেলনে মোট ২৫টি মুসলিম রাষ্ট্র যোগ দেয়। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (পি. এল. ও) সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেয়। মুসলিম জনসংখ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জোর বিরোধিতার জন্য অবশেষে ভারত যোগ দেয়নি। কিছু সংখ্যক মুসলমান রাষ্ট্রও এ সম্মেলন থেকে দূরে ছিল। এদের মধ্যে সিরিয়া ও ইরাকের নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলন শেষে, জেরুজালেম ইস্যুর ব্যাপারে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করানো। এ ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হওয়া আবশ্যক। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের ২২ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী জেদ্দায় মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মুসলমি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলনে একটি স্থায়ী ইসলামী সেক্রেটারীয়েট ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সেক্রেটারীয়েটের অধীনে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ও.আই.সি) অর্থাৎ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা গঠিত হয়, যা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস ধারায় একটি কার্যকরী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে মোড় নেয়ার প্রতিশ্রুতি বহন করে। ইসলামী সেক্রেটারীয়েট প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল লক্ষ্য হল, পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা। জেরুজালেম সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ সেক্রেটারীয়েট জেদ্দায় প্রতিষ্ঠা করা হল। এর প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টংকু আবদুর রহমানকে দু'বছরের জন্য মনোনীত করা হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে পি.এল.ও-কে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সাহায্য-সমর্থন দান এবং মুসলিম রাজধানীগুলোতে পি.এল.ও-র অফিস চালু করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত ইসলামী দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের করাচীতে। এ সম্মেলনে গৃহীত গুরুত্ব্ পূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ইসলামী সেক্রেটারীয়েটের জন্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারের ফান্ড প্রতিষ্ঠা, ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী নিউজ এজেন্সী প্রতিষ্ঠা এবং সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে টংকু আবদুর রহমানের মনোনয়নকে অনুমোদন দান উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, যা বর্তমানে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ও.আই.সি) আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ওআইসি 'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রচলিত রীতি মেনে পৃথিবীর প্রায় সবকয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধাণনেই একটি উপক্রমণিকা (Preamble) সংযোজিত হয়েছে। উপক্রমণিকা হন সংবিধান তথা রাষ্ট্র এবং জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং আদর্শের একটি স্বচহ দর্পন। ওআইসি হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক সংস্থা। ওআইসির সংবিধান হল তার সনদ। এ সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল জাতির শান্তিড়, সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভের ঐকান্তিড়ক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৭১ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ পর্যন্তজেদ্দায় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিশটি দেশের অংশগ্রহণে এ সম্মেলনে 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স এর খসড়া চার্টার অনুমোদিত হয়। ও আই সি-র বিধিবদ্ধ যাত্রা সূচিত হয় তখন থেকেই। ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত চার্টারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে এ সংস্থার সাতটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ [১]

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতি বৃদ্ধি করা।
২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সদস্য রষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা সংহত করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা।
৩. সকল প্রকার বর্ণবৈষম্যের মূলোচ্ছেদ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান।
৪. পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত ও সংহত করা এবং ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং তাদের অধিকার আদায় ও মাতৃভূমি মুক্ত করার সংগ্রামে সহায়তা দান করা।
৫. মুসলমানদের মানমর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো।

---

১. তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১

Dhaka University Institutional Repository

৬. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৭. সুবিচার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান।

পরবর্তীতে ১৪ মার্চ ২০০৮ তারিখে[২] সংশোধিত চার্টার অনুমোদিত হয়। সংস্থাটির কার্যক্রম মূল্যায়ণ ও চূড়ান্ত বিচার বিশ্লেষণের জন্য এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা-পর্যালোচনা প্রয়োজন। এখানে সর্বশেষ সংশোধিত ও অনুমোদিত চার্টারের উপক্রমণিকা এবং লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সম্বলিত প্রথম অধ্যায়ের ধারা (১) এর ২০টি উপধারা এবং ধারা (২) এর ৮টি উপধারা[৩] উল্লেখ করা হ'ল।

১। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির বন্ধন দৃঢ় করা।

২। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা এবং সংরক্ষণ এবং মুসলিম বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষ ভাবে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য সাধারণভাবে সদস্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা সমন্বয় এবং একীভুত করা।

৩। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অন্য রাষ্ট্রের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ;

৪। আগ্রাসনের শিকার দখলাধীন কোন সদস্য রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে সমর্থন ;

৫। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের নিম্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;

৬। বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও সৌহার্দ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুবিচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের ভিত্তিতে আরও রাষ্টীয় সম্পর্ক উন্নয়ন।

৭। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আইনে বিধৃত জাতি সমূহের অধিকারের প্রতি সমর্থন পূর্ণব্যক্ত করা।

৮। ফিলিস্তিনী জনগণের আল কুদস আল শরীফে রাজধানী সহ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদানের এবং ইহার ঐতিহাসিক ও ইসলামী বৈশিষ্ট এখানে অবস্থিত পবিত্র স্থান সমূহের বৈশিষ্ট সংরক্ষন করা।

৯। ইসলামিক কমনমার্কেট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সংহতি অর্জনের নিমিত্ত আন্ত:ইসলামী অর্থনীতি ও বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করা।

---

২. ১৯৭১ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ পর্যন্তজেদ্দায়, সৌদি আরব, অনুষ্ঠিত তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে অনুমোদিত চার্টার অনুযায়ী।

৩. পূর্বোক্ত, চার্টার ধারা-২।

Dhaka University Institutional Repository

১০। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের টেকসই এবং ব্যাপক ভিত্তিক মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়াস চালানো।

১১। সংযম ও সহনশীলতার ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ, ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানো।

১২। ইসলামের সার্বিক ভাবমর্যাদা রক্ষা ও সংরক্ষণ, ইসলামের অবমাননা প্রতিরোধ করা এবং সভ্যতা ও ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ উৎসাহিত করা।

১৩। বিজ্ঞাপন ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার এ সকল ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গবেষণা ও সহযোগিতা উৎসাহিত করা।

১৪। মানবাধিকার এবং নারী শিশু যুব ও প্রবীণ বিশেব যত্নের প্রয়োজন এরূপ ব্যক্তিদের অধিকার সহ মৌলিক অধিকারের লালন ও সংরক্ষণ এবং ইসলপামী পারিবারিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ।

১৫। সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক হিসেবে পরিবারের ভূমিকার সম্প্রসারণ সংরক্ষণ এবং গুরুত্ব প্রদান।

১৬। সদস্য বহির্ভূত দেশসমূহে মুসলিম সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার মর্যাদা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সুরক্ষা।

১৭। আন্তর্জাতিক দেশসমূহে অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সমন্বিত অবস্থানের প্রসার এবং সমর্থন।

১৮। সকল রূপে ও আকারে সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতায় সংঘটিত অপরাধ, মাদক পাচার, দুর্নীতি মুদ্রাপাচার/কালো টাকা সাদাকরণ এবং মানব পাচার।

১৯। প্রাকৃতিক দূর্যোগের মত জরুরী আস্থায় সহযোগিতা সমন্বয় করা।

২০। সদস্যাদেশ সমূহের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং তথ্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারন।

ধারা (২) এর ৮টি উপধারা[৪] হ'ল

সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকার করিতেছে যে, ধারা ১ এ বিবৃতি উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে তাহারা ইসলামের মহান শিক্ষা ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া এবং নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করিবেন।

১। সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন।

২। অধিকার ও দায়িত্বে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সার্বভৌম, স্বাধীন ও সমান।

৩। সকল সদস্য রাষ্ট্র তাহাদের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিমাংসা করিবেন এবং পারস্পরিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকী থেকে বিরত থাকবেন।

---

৪. পূর্বোক্ত, চার্টার ধারা-২।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সকল সদস্য রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিতেছে যে, তাহারা অপরের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখন্ডতার সম্মান প্রদর্শন করবেন। অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে।

৫। সকল সদস্য রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিতেছে যে, তাহারা আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং বর্তমান সনদ, জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান অনুযায়ী একে অন্যের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকবে।

৬। এই সনদে যাছাই থাকুক না কেন, তদ্বারা যেইরূপে বিধৃত আছে এটি কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমোদন দেবে না।

৭। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুশাসন গণতন্ত্র, মানবাধিকার মৌলিক অধিকার এবং আইনের শাসনের সম্প্রসারণ ঘটবে।

৮। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ পরিবেশ সুরক্ষা এবং সংরক্ষণে প্রচেষ্টা চালানো হবে।

গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে কোন আগ্রাসী নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়নি; বিশ্ব মানবিক সংহতি ও ঐক্য পরিপন্থী কোন সংকীর্ণ চিন্তার প্রতিফলনও ঘটেনি। যুগ যুগ ধরে হামলা, ধ্বংস, বিপর্যয় ও পরাধীনতার শিকার হলেও এবং আল-কুদসে অগ্নিসংযোগের সর্বশেষ বৈরী ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে ও আই সি আত্মপ্রকাশ করলেও মুসলিম বিশ্বের আত্মরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি'র পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুবিচার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান'ই এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষিত হয়। ও আই সি-র চার্টারে মুসলমানদের নিজস্ব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও উন্নয়নমূলক এবং বিশ্বমানবের প্রতি সার্বজনীন সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিমূলক চেতনাই বিধৃত হয়েছে।

২.৫.ওআইসি'র সাংগঠনিক কাঠামো

অনুমোদিত চার্টারের তৃতীয় অধ্যায়ে ওআইসি'র গঠন পরিচয় লিপিবব্ধ হয়েছে। বলা হয়েছে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অংগসমূহ[৫] নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

১। ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন।

২। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ।

৩। স্থায়ী কমিটি।

৪। নির্বাহী কমিটি।

৫। আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত।

৫. পূর্বোক্ত, তৃতীয় অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৬। স্বাধীন স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন।

৭। স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটি।

৮। সাধারণ সচিবালয়।

৯। সহযোগী সংস্থাসমূহ।

১০। বিশেসায়িত প্রতিষ্ঠান সমূহ।

১১। অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ।

চার্টারের তৃতীয় অধ্যায় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় ধারা ৫ থেকে ধারা ২০ পর্যন্ত ওআইসি'র সাংগঠনিক কাঠামোর উল্লেখ রয়েছে। এ অধ্যায় ও ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে ওআইসি'র বিভিন্ন অংগ, স্থায়ী কমিটিসমূহ, সহযোগী সংস্থাসমূহ ,বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সমূহ, অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ ইত্যাদির গঠন, গঠন প্রক্রিয়া, কার্যাবলী ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে ওআইসি'র বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

২.৬. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন

রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনই ওআইসি'র সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল সংস্থা। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে যখনই প্রয়োজন তখনই এ সংস্থা বৈঠকে মিলিত হতে পারবে। মুসলিম বিশ্বের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা এবং ওআইসি'র নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করাই এর প্রধান কাজ।

চার্টারের চতুর্থ অধ্যায়ে ধারা ৬, ৭, ৮ ও ৯ এ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের কনফারেন্স বা ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।[৬]

ধারা ৬ এ বলা হয়েছে"সদস্য রাষ্ট্র সমূহের বাদশাহ এবং রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সমন্বয়ে ইসলামী শীর্ষক সম্মেলন গঠিত। সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।"ধারা -৭'ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন আলোচনা ও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে এবং সনদে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে সকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এ ছাড়া সদস্য রাষ্ট্র ও উম্মাহর জন্য গুরুত্ববহ অন্যান্য ইস্যু ও বিবেচনা করবে। 'ধারা ৮এ ১' সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কোন একটিতে প্রতি তিন বছরে একবার ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।' ধারা ৮এর ২ 'সাধারণ সচিবালয়ের সহায়তা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আলোচনা সূচি প্রণয়ন এবং সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

---

৬. পূর্বোক্ত, ধারা-৬,৭,৮,৯।

Dhaka University Institutional Repository

'ধারা -৯ 'উম্মাহর স্বার্থে প্রয়োজন হইলে উম্মাহর জন্য গুরুত্ববহ বিষয়ে বিবেচনার জন্য অসাধারণ অধিবেশন ডাকা হইবে এবং সংস্থার নীতি সমন্বয় করা হবে। অসাধারণ অধিবেশন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সুপারিশ ক্রমে অথবা কোন সদস্য রাষ্ট্রের বা মহাসচিবের উদ্যোগে অনুষ্ঠান হতে পারে যদি এইরূপ উদ্যোগ সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাভ করে। নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন- Under Article IV of the Charter the Summit Conference of Islamic States is the supreme authotity of the organisation. The Charter had originally stipulated that it would hold its meeting wherever the interests of Muslim nations warranted it to consider issues of vital concern to them and to coordinate the policy of the organisation accordingly.[৭]

বাস্তবে প্রতি বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় না। বিগত ৪২ বছরে মাত্র ১১ টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে বছরওয়ারী সম্মেলনের তথ্য উল্লেখ করা হল–

সারণি ঃ ০১

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্তযতগুলো শীর্ষসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, নিচে সেগুলোর তারিখ, স্থান, দেশসহ উল্লেখ করা হল।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন	তারিখ	সাল	স্থান	দেশ
প্রথম	২২-২৫ সেপ্টেম্বর	১৯৬৯	রাবাত	মরক্কো
দ্বিতীয়	২২-২৪ ফেব্রুয়ারী	১৯৭৪	লাহোর	পাকিস্তান
তৃতীয়	২৫-২৮ জানুয়ারি	১৯৮১	তায়েফ	স্ৌদি আরব
চতুর্থ	১৬-১৯ জানুয়ারি	১৯৮৪	ক্যাসাব্লাংকা	মরক্কো
পঞ্চম	২৬-২৯ জানুয়ারি	১৯৮৭	কুয়েত সিটি	কুয়েত
খষ্ঠ	৯-১২ ডিসেম্বর	১৯৯১	ডাকার	সেনেগাল
গপ্তম	১৩-১৫ ডিসেম্বর	১৯৯৪	ক্যাসাব্লাংকা	মরক্কো
অষ্টম	৯-১১ ডিসেম্বর	১৯৯৭	তেহরান	ইরান
নবম	১২-১৩ নভেম্বর	২০০০	দোহা	কাতার
দশম	১৬-১৭ অক্টোবর	২০০৩	পুত্রজায়া	মালয়েশিয়া
একাদশ	১৩-১৪ মার্চ	২০০৮	ডাকার	সেনেগাল
দ্বাদশ		২০১২	কায়রো	মিশর

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক বিভিন্ন সূত্রে থেকে তৈরীকৃত

৭. Noor Ahmed baba, পূর্বোক্ত, পৃ.২১০

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়াও বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২২-২৩ মার্চ ১৯৯৭, ইসলামাবাদ,পাকিস্তানে প্রথম, ৪-৫মার্চ ২০০৩, দোহা,কাতারে দ্বিতীয় এবং ৭-৮ ডিসেম্বর ২০০৫ মক্কা,সৌদি আরবে তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন এবং ১৪-১৫ আগস্ট ২০১২ মক্কা, সৌদি আরবে ৪র্থ বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২.৭. ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও সংগঠনের সাধারণ কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্যে প্রতি বছর ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন হয়ে থাকে। ওআইসি সচিবালয় একজন মহাসচিব ও চারজন সহকারী সচিবের সমন্বয়ে গঠিত। এরা পরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংগঠনের সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রতিষ্ঠান ওআইসি সচিবালয় শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সার্বিক কর্ম সম্পাদন করে থাকে।[৮]

চার্টারের পঞ্চম অধ্যায়ে ধারা ১০-এ পরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১০ এর ১-এ বলা হয়েছে[৯] ঃ ''পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন প্রতি বছরে একবার কোন সদস্য রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে।' ধারা ১০ এর ২ এ কোন সদস্য রাষ্ট্র বা মহাসচিবের উদ্যোগে বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে যদি তাহা রাষ্ট্রবর্গের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাভ করে। 'ধারা ১০ এর ৩-এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আলোচনার জন্য কোন বিশেষ মন্ত্রীপরিষদ সভা ডাকার জন্য সুপারিশ করতে পারে। এরূপ সভার প্রতিবেদন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে দাখিল করতে হবে। 'ধারা ১০ এর ৪-এ'সংস্থার সাধারণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন উপায় বিবেচনার্থে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

(ক) সংস্থার সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্তও প্রস্তাবনা গ্রহণ ;

(খ) পূর্ববর্তী শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তও প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ;

(গ) সাধারণ সচিবালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মসূচী বাজেট ও অন্যান্য সার্বিক ও প্রশাসনিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন ;

(ঘ) এক বা একাধিক সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যদি সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক এ মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে কোন অনুরোধ করা হয়।

(ঙ) নতুন কোন সংস্থা বা কমিটি গঠনের সুপারিশ করা ;

---

৮. আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সিড়ি বই বিতান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ ২০০৯, পৃ.১০৫

৯. ওআইসি চার্টার, ধারা.১০

Dhaka University Institutional Repository

(চ) সনদের ১৬ ও ১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাক্রমে মহাসচিব নির্বাচন ও সহকারী মহাসচিববৃন্দের নিয়োগ ;

(ছ) উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে অন্য যে কোন বিষয় বিবেচনা করা ;

পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের সিদ্বান্ত গ্রহণের বিষয়ে নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন Two-third of the total membership of the organisation forms the quorum of the Foreign Ministers' Conference and its resolutions and recommendations have to be adopted by a two-third majority. The conferenec of the Foreign Ministers also decides about the procedure that it itself and the Conference of Kings and Heads of States and Governments are to follow. These procedures also proviede for the working of various subsidiary organs that have come up under the Organisation of Islamic Conference.[১০]

ও আই সি ভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে প্রতি বছর যে কোন দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন হয়ে থাকে। প্রয়োজনে বিশেষ সম্মেলনও হতে পারে । এ পর্যন্ত ৩৮টি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন এবং ৪টি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিন্মে সরণি-০২ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠানের তথ্য উপস্থাপন করা হল।

---

১০. Noor Ahmed Baba, পূর্বোক্ত, পৃ.২১১

Dhaka University Institutional Repository

সরণি-০২

ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের তারিখ, সাল, স্থান ও দেশ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন	তারিখ	সাল	স্থান	দেশ
১ম	২২-২৬ মার্চ	১৯৭০	জেদ্দা	সৌদি আরব
২য়	২৬-২৯ ডিসেম্বর	১৯৭০	করাচী	পাকিস্তান
৩য়	২৯ ফেব্রুয়ারী-৪মার্চ	১৯৭২	জেদ্দা	সৌদি আরব
৪র্থ	২৪-২৭ মার্চ	১৯৭৩	বেনগাজী	লিবিয়া
৫ম	২১-২৫ জুন	১৯৭৪	কুয়ালালামপুর	মালয়েশিয়া
৬ষ্ঠ	১২-১৬ জুলাই	১৯৭৫	জেদ্দা	সৌদি আরব
৭ম	১২-১৫ মে	১৯৭৬	ইস্তাম্বুল	তুরস্ক
৮ম	১৬-২২মে	১৯৭৭	ত্রিপোলী	লিবিয়া
৯ম	২৪-২৮ এপ্রিল	১৯৭৮	ডাকার	সেনেগাল
১০ম	৮-১২ মে	১৯৭৯	ফেজ	মরক্কো
১১ তম	১৭-২০ মে	১৯৮০	ইসলামাবাদ	পাকিস্তান
১২ তম	১-৫ জুন	১৯৮১	বাগদাদ	ইরাক
১৩ তম	২২-২৬ আগস্ট	১৯৮২	নাইজার	নাইজার
১৪ তম	৬-১০ ডিসেম্বর	১৯৮৩	ঢাকা	বাংলাদেশ
১৫ তম	১৮-২২ ডিসেম্বর	১৯৮৪	ঘানা	ইয়ামেন
১৬ তম	৬-১০ জানুয়ারী	১৯৮৬	ফেজ	মরক্কো
১৭ তম	২১-২৫ মার্চ	১৯৮৮	আম্মান	জর্ডান
১৮ তম	১৩-১৬ মার্চ	১৯৮৯	রিয়াদ	সৌদি আরব
১৯ তম	৪-৮ আগস্ট	১৯৯১	ইস্তাম্বুল	তুরস্ক
২০ তম	৪-৮ আগস্ট	১৯৯১	ইস্তাম্বুল	তুরস্ক
২১ তম	২৫-২৯ এপ্রিল	১৯৯৩	করাচী	পাকিস্তান
২২ তম	১০-১২ ডিসেম্বর	১৯৯৪	ক্যাসাব্লাংকা	মরক্কো
২৩ তম	৯-১২ ডিসেম্বর	১৯৯৫	কোনাক্রি	গায়ানা
২৪ তম	৯-১৩ ডিসেম্বর	১৯৯৬	জাকার্তা	ইন্দোনেশিয়া
২৫ তম	১৫-১৭ মার্চ	১৯৯৮	দোহা	কাতার
২৬ তম	২৮জুন-১ জুলাই	১৯৯৯	ওগাদোগো	বার্কিনা ফাসো
২৭ তম	২৭-৩০ জুন	২০০০	কুয়ালালামপুর	মালয়েশিয়া
২৮ তম	২৫-২৭জুন	২০০১	বাসাকো	মালি
২৯ তম	২৫-২৭ জুন	২০০২	খার্তুম	সুদান
৩০ তম	২৮-৩০ মে	২০০৩	তেহরান	ইরান
৩১ তম	১৪-১৬ জুন	২০০৪	ইস্তাম্বুল	তুরস্ক
৩২ তম	২৮-৩০ জুন	২০০৫	ঘানা	ইয়ামেন
৩৩ তম	১৯-২১ জুন	২০০৬	বাকু	আজারবাইজান
৩৪ তম	১৫-১৭ মে	২০০৭	ইসলামাবাদ	পাকিস্তান
৩৫ তম	১৮-২০ জুন	২০০৮	কামপালা	উগান্ডা
৩৬ তম	২৩-২৫ মে	২০০৯	দামেস্ক	সিরিয়া
৩৭ তম	১৮-২০ মে	২০১০	দোশানবে	তাজাকিস্তান
৩৮ তম	২৮-৩০ জুন	২০১১	আস্তানা	কাজাকিস্তান

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক বিভিন্ন সূত্র হতে তৈরীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আরো চারটি বিশেষ বৈঠক বসেছিল।

প্রথম বৈঠক ঃ ২৭-২৮ জানুয়ারী, ১৯৮০, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

দ্বিতীয় বৈঠক ঃ ১১-১২ জুলাই, ১৯৮০, আম্মান, জর্দান।

তৃতীয় বৈঠক ঃ ১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ফেজ, তুরস্ক

চতুর্থ বৈঠক ঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

২.৮. স্থায়ী কমিটি

চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধারা ১১ তে স্থায়ী কমিটির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১১এর ১-এ বলা হয়েছে[১১] ''সংস্থা এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় বিবেচনার্থে এই সংস্থা নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করেছে ;

এক ঃ আল কুদস কমিটি

দুই ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ; (COMIAC)

তিন ঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা সংক্রান্তস্থায়ী কমিটি : (COMEC)

চার ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সংক্রান্তস্থায়ী কমিটি ; (COMSTECH)'

ধারা ১১এর ২-এ বলা হয়েছে 'শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদে রূপ বা এরূপ কমিটির সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি সমূহের প্রধান হিসাবে আছেন বাদশাহ, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ।'

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,বিভিন্ন সময়ে স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে,নিম্নে এসবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল।''[১২]

১. আল কুদস কমিটি ঃ ১৯৭৫ সালে ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে জেরুজালেমে অবস্থিত পবিত্র মসজিদ আল কুদ্স-এর হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এ কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১৪টি দেশ এ কমিটির সদস্য।

২. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ঃ

১৯৮১ সালে এ কমিটি গঠিত হয়।

৩. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ঃ

১৯৮১ সালে এ কমিটি গঠিত হয়।

৪. . বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ঃ

১৯৮১ সালে এ কমিটি গঠিত হয়।

---

১১. ওআইসি চার্টার, ধারা-১৬

১২. WWW. OIC-OCI.Org. Com.

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ ওআইসি'র সচিবালয়

চার বছরের জন্য নির্বাচিত মহাসচিব ও ৪ (চার) জন নির্বাচিত সহকারী সচিবের সমন্বয়ে ওআইসি সচিবালয় গঠিত। ওআইসি সচিবালয়ই সংগঠনের সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রতিষ্ঠান, যা শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠান ও এতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সাচিবিক কর্ম সম্পাদনের জন্য করে থাকে। এ সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওআইসি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থার মর্যাদা লাভ করে । নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন-The OIC, in spite of these difficulties, has survived, and diplomatically gained due recognition as an international organisation. For all ptactical purposes it operates like an international organisation in line with the state-centric framework. It has been granted observer status by internatinal organisations like, the UNO, OAU, Non-Alignment Movement, League of Arab States, UNESCO and a number of other small and big organisations on a reciprocal basis. These organisations have commited themselves to reciprocal cooperation with the OIC in social, economic, political and cultural fields.[১৩]

চার্টারের একাদশ অধ্যায়ে ধারা ১৬,১৭,১৮,১৯,২০ এ ওআইসি'র সাধারণ সচিবালয় বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১৬-এ বলা হয়েছে 'একজন মহাসচিব যিনি এই সংস্থার মুখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবেন এবং এই সংস্থার জন্য প্রয়োজন এইরূপ কর্মীবাহিনী নিয়ে সচিবালয় গঠিত হবে। মহাসচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদে নির্ধারিত হবেন যা একবার নবায়নযোগ্য হবে। সদস্যরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্য হতে সমতাভিত্তিক ভৌগোলিক বন্টন, আবর্তন ও সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতি সমান সুযোগের ভিত্তিতে এবং দক্ষতা সততা ও অভিজ্ঞতার বিবেচনা করে মহাসচিব নির্ধারিত হবে।'

ধারা ১৭ এ বলা হয়েছে 'মহাসচিব নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন ;

(ক) যে সব বিষয় সংস্থার উদ্দেশ্য পূরন বা ব্যাহত করতে পারে বলে মনে করেন তাহা সংস্থার উপর্যুক্ত শাখাসমূহের গোচরীভূত করবেন।

(খ) ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সমূহে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন এবং অন্যান্য মন্ত্রীপর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তড়, সুপারিশ ও প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন তদারকী করা ;

(গ) ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তড়, সুপারিশ ও প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কর্মপত্র এবং স্মারক প্রদান।

---

১৩. Noor Ahmed Baba, পূর্বোক্ত, পৃ.২১৪

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) এই সংস্থার সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

(ঙ) সাধারণ সচিবালয়ের কর্মসূচী ও বাজেট প্রণয়ন করা ।

ধারা ১৮ এর (১) এ বলা হয়েছে মহাসচিব ভৌগোলিক বন্টনের নীতি অনুযায়ী এবং সনদের উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও সততার প্রতি লক্ষ্য রেখে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে নিয়োগের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের নিকট সহকারী মহাসচিব পদসমূহের জন্য মনোয়ন দাখিল করবেন। সহকারী মহাসচিবের একটি পদ আল কুদ্‌স এবং প্যালেস্টাইনের জন্য নির্বাচিত থাকবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র তার প্রার্থী মনোনয়ন দেবে।'

ধারা ১৮ এর (২) এ বলা হয়েছে মহাসচিব ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তএবং সুপারিশমালা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিশেষ প্রতিনিধিগণকে নিয়োগ করতে পারেন। এরূপ নিয়োগ তাঁর ম্যান্ডেটসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অনুমোদিত হতে হবে।'

ধারা ১৮ এর (৩) এ বলা হয়েছে মহাসচিব সুষম ভৌগোলিক বন্টন নীতি অনুযায়ী যোগ্যতা, উপযুক্ত, সততা এবং লিঙ্গের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের মধ্য থেকে সাধারণ সচিবালয়ের কর্মী নিয়োগ করবেন। মহাসচিব অস্থায়ীভাবে বিশেষ এবং পরামর্শক নিয়োগ দিতে পারেন।

ধারা ১৯-এ বলা হয়েছে দায়িত্ব পালনকালে মহাসচিব, সহকারী মহাসচিবগণ এবং সাধারণ সচিবালয়ের কর্মীগণ এই সংস্থা ব্যতীত কোন সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নির্দেশ প্রার্থনা বা গ্রহণ করবেন না। এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন যা তাঁদের সংস্থার নিকট দায়বদ্ধ আন্তর্জাতিক কার্যক্রম হিসাবে তাঁদের মর্যাদা করে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহে এই একান্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করবেন এবং তাঁদের দায়িত্ব পালনের কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবেন না।'

ধারা ২০ এ বলা হয়েছে সাধারণ সচিবলায় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সভা প্রস্তুত করবেন এবং প্রশাসনিক ও সাংগঠিক বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশের সাথে কমিটি সহযোগিতার কাজ করবেন।[১৪]

---

১৪. ওআইসি চার্টার, ধারা-১৬,১৭,১৮,১৯,২০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ধারা ও উপধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সকল গুণাবলী ওআইসি সচিবালয়ে রয়েছে। অন্যদিকে সংস্থার মহাসচিব, সহকারী মহাসচিব পদসমূহের মনোনয়ন আর্ন্তজাতিক মানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ওআইসির সচিবালয় প্রসংগে নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন- The General Secretariat is the Executive/Administrative organ of the organisation. The decision to establish it was taken by the First Islamic Foreign Ministers Conference held at Jeddah. The headquarters of the General Secretatiat is located in Jeddah, Saudi Arabia, pending the liberation of Jeruslem. It undertakes all functions entrusted to it by the Conference in accordance with the rules and regulations of the Charter and within the framework of the plan of work as adopted by the Conference and the Secretary General. It assists the subsidiary organs and specialised agencies to perform their task and ccordinates their programmes. It also works for follow-up of the resolutions and recommendations of the Summit and Foreign Ministers Conference.[১৫]

সারণি ঃ ০৩
বর্তমান পর্যন্ত ও.আই.সি নির্বাচিত মহাসচিববৃন্দ

ক্রমিক	নাম	সন	দেশ
১।	টেংকু আবদুর রহমান	১৯৭০-১৯৭৩	মালয়েশিয়া
২।	শরীফ আল তোহানী	১৯৭৪-১৯৭৫	মিশর
৩।	ড. সাঃ করিম গায়ে	১৯৭৫-১৯৭৯	সিনেগাল
৪।	হাবিব শাত্তিড়	১৯৭৯-১৯৮৪	তিউনিবিয়া
৫।	সৈয়দ শরীফউদ্দিন পীরজাদা	১৯৮৫-১৯৮৮	পাকিস্তান
৬।	ড. হামিদ আল গাবিদ	১৯৮৮-১৯৯৫	নাইজার
৭।	ড. ইজ্জাদ্দিন লারাকী	১৯৯৭-২০০০	মরক্কো
৮।	ড. আবদুল ওয়াদি বেলকজিজ	২০০১-২০০৪	মরক্কো
৯	ড. একমেলেদ্দীন এহসানোগলু	২০০৫- বর্তমান	তুরস্ক

উৎস: আব্দুল লতিফ খান; আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী।

১৫. Noor Ahmed Baba, পূর্বোক্ত, পৃ.২১১-২১২

Dhaka University Institutional Repository

২.১০. আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত।

চার্টারের চতুর্দশ অধ্যায়ে ধারা ১৪-এ ওআইসি'র আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১৬-এ বলা হয়েছে ১৯৮৭ সালে কুয়েতে আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। যা এ সংক্রান্তআইন কার্যকরের পর হতে এই সংস্থার মুখ্য বিচারিক শাখা হইবে। The jurisdiction of the court is to

1) deal with all cases whose referral to it is agreed to by its member-states;

2) look into disputes that may arise among member-states;

3) arbitrate in cases of difference that may arise in the inerpretation of the Charter of the Organisation;

4) to give Fatwas-consulatative opininis-on the legal issues at the request of the Summit Conference, the Foreign Mimisters' Conference or by any organ of the organisation provided such reqests are approved by the Foreign Ministers Conference.

The court is to consist of a panel of eleven members elected by the Conference of Foreign Ministers after nomination by the member-states.

The member-states shall bear the expenses of the court which shall have an independent budget.

The official lanuages of the court are to be Arabic, English and French.[১৬]

২.১১. স্বাধীন স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন।

চার্টারের দশম অধ্যাপয় ধারা ১৫-এ ওআইসি'র স্থায়ী স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১৬-এ বলা হয়েছে স্থায়ী স্বাধীন মানধিকার কমিশন ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাযুয্যপূর্ণ সংস্থার চুক্তি ও ঘোষণাবলীতে এবং সর্বজনীন ভাবে গৃহীত বিধৃত নাগরিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ মানবাধিকার দলীল সমূহের লালন করিবে।'

---

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ-২১৪-২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২.১২. সহযোগী সংস্থাসমূহ।

চার্টারের দ্বাদশ অধ্যায়ে ধারা ২২ ও ২৩ এ ওআইসি'র সহযোগী সংস্থার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ২২-এ বলা হয়েছে, সনদের ধারা অনুযায়ী সংস্থা অধীনস্থ সংগঠন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে অধিভুক্ত মর্যাদা প্রদান করতে পারবে। নুর আহমেদ বাবা উল্লে করেন- In providing an institutional framework for coordinating the activities of Muslim countries in social, economic and other areas for the promotion of mutually beneficial cooperation among them, the OIC has created a host of subsidiary organs, agencies and institutions. They are supposed to play a vital role in achieving the objectives that had set for itself in the Charter and in the declarations it had passed from item to time. There are several areas and ways in which these institutions are required to play a useful role to promote the social, cultural, educational and economic welfare of the Muslim World, and strive to achieve other socio-political objectives set by the organisation.

One of the primary objectives of the Organisation of Islamic Conference has been to consolidate cooperation among the member-states in economic, social, cultural and other fields. To provide a mechanism for such cooperation, it has created a number of subsidiary organs and institutions. These institutions aim at helping the muslim states by providing them financial assistance, and technical know how to raise their mutural trade and helping them in improving their infrastructural capicities. There are a number of organs and institutions that are required to play the vital functions of strengthening cooperation in economic and developmetal areas.

Organisations and Institutions Operating in the Economic and Developmental Areas

1. Islamic Development Bank;
2. Islamic Chamber of Commerec, Industry and Commodity Exchange;
3. Islamic Foundation for Science, Technology and Development;
4. Statistcal, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries;
5. Islamic Centre for Vocational and Technical Training and Research;
6. Islamic Centre for the Development of Trade;
7. Islamic Civil Aviation Council;

Dhaka University Institutional Repository

8. Islamic Ship Owners Association;[১৭]

ধারা ২৩-এ বলা হয়েছে অধীনস্থ সংগঠন শীর্ষ সম্মেলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার কার্যালয়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্তবাজেট পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হবে।'

৯. সহযোগী সংস্থা সমূহ নিম্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:[১৮]

১. ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক ঃ সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৭৫ সালে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ও আই সি, সদস্য দেশসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী ঋণদান ও প্রযুক্তিগত অনুদান প্রদান করে থাকে।

২. ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স, ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমোডিটি এক্সচেঞ্জ।

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স, টেকনোলোজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আই এফ এস টি এন্ড ডি) ঃ ইসলামীক দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার ফর দি ইসলামিক কান্ট্রিজ ঃ তুরস্কের আংকারায় ১৯৮৭ সালে এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. ইসলামিক সেন্টার ফর টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ (আইসিটি ভিটি আর)ঃ ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং ক্যামিক্যাল প্রকৌশলের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি এবং প্রশিক্ষক গড়ার লক্ষ্যে তথা এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে এটি গড়ে উঠে।

৬. ইসলামিক সেন্টার ফর দি ডিভালপমেন্ট অব ট্রেড ঃ ১৯৮৩ সালে মরক্কোর রাজধানী কাসাব্লাংকায় এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এর কাজ ।

৭ ইসলামিক শীপ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন।

---

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.২১৭
১৮. www.oic-oci.org.com.

Dhaka University Institutional Repository

২.১৩. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সমূহ।

চার্টারের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধারা ২৪-এ ওআইসি'র বিশেষায়িত সংস্থার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ২৪-এ বলা হয়েছে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার কাঠামোর আওতায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্যভুক্ত স্বেচ্ছামূলক এবং সংস্থার সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। এদের বাজেট স্বাধীন এবং তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী আইন সভায় অনুমোদিত হয়। নুর আহমেদ বাবা উল্লেখ করেন- In addition to the four main bodies of the OIC the organisation of Islamic Conference has from time to time set up specialised committees to follow up policies, decisions and actions of the OIC in their respective fields of specialisation. The Committees;

1. Al-Quds Committee;
2. Permanent Finance Committee;
3. Islamic Commission for Economic, Cultural and Social Affairs;
4. Standing Committees for Scientific and Technical Cooperation;
5. Standing Committees for Economic and Trade Cooperation;
6. Standing Committees for Information and Cultural Affairs; [১৯]

৭. নুর আহমেদ বাবা তাঁর গবেষণায় উল্লেখিত কমিটিসমূহকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে চার্টারের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধারা ১১-তে স্থায়ী কমিটির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ১১ এর ১-এ বলা হয়েছে সংস্থা এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় বিবেচনার্থে এই সংস্থা স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করিয়াছে; অর্থাৎ উপরোক্ত কমিটিসমূহ ধারা ১১এর অর্ন্তভূক্ত স্থায়ী কমিটি ধারা ২৪-এ বর্ণিত ওআইসি'র বিশেষায়িত সংস্থা নয়। বরং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: [২০]

৯. ১. আন্তর্জাতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ইসলামিক কমিশন ১৯৭৬ সালে এ কমিটি গঠিত হয়।

১০. ২. স্থায়ী অর্থনৈতিক কমিটি ঃ ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর জেদ্দায় মিলিত হয়।

১১. ৩. ফিলিস্তিন বিষয়ক বিশেষ কমিটি ।

১৯. Noor Ahmed Baba, পূর্বোক্ত, পৃ.২১৫
২০. www.oic-ocl.org.com.

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪ অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ

চার্টারের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধারা ২৫-এ [২১] ওআইসি'র অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ধারা ২৫-এ বলা হয়েছে 'অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো সেই সত্তা বা সংস্থা যা উদ্দেশ্য এই সনদের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যভুক্তি ঐচ্ছিক এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠান ও শাখা সমূহের জন্য উন্মুক্ত। এদের বাজেট সাধারণ সচিবালয়ের অধীনস্থ শাখা এবং বিশেষায়িত সংগঠনের বাজেটের থেকে স্বাধীন। অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তবলেও পর্যবেক্ষক মর্যাদা প্রদান করা যেতে পারে। তারা অধীনস্থ শাখাসমূহ এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট থেকে স্বেচ্ছামুলক সহায়তা গ্রহন করতে পারেন।' ওআইসি'র অধীনে কিছু অঙ্গ সংগঠনও রয়েছে। যেগুলো ও আই সি এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়নের মূলভূমিকা পালন করে থাকে। অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো-[২২]

১. ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর দি প্রিজারভেশন অব ইসলামিক কালচারাল হেরিটেজ ঃ ১৯৮২ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স একাডেমী ঃ সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮১ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড ঃ সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে সাহায্য প্রদানসহ মসজিদ, হাসপাতাল, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইসলামিক কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এ এটি কাজ করে থাকে।
৪. রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক হিস্ট্রি, আর্ট এন্ড কালচার ঃ ১৯৭৯ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫. আন্তর্জাতিক ইসলামীক সংবাদ সংস্থা (আই. আই. এর. এ) ঃ ১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬. ইসলামিক এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশন ঃ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ১৯৮২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
৭. ইসলামিক এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ঃ সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ও আই সি ভুক্ত দেশসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক ব্যাংকিং এবং ফাইনেনশিয়াল কার্যক্রম এবং ইসলামী আইন কানুনের ক্ষেত্রে গবেষণা-কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যায়।
৮. ইসলামিক ট্রেড ব্রডকাষ্টিং অর্গানাইজেশন ঃ সৌদি আরবের জেদ্দায় প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। এ ছাড়া ও আই সির তালিকাভুক্ত কিছু প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে। যেমন-
৯. ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস।
১০. ইসলামিক কমিটি ফর দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিসেন্ট।
১১. অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক ক্যাপিটাল এন্ড সিটিজেনস।
১২. স্পোর্টস ফেডারেশন অব ইসলামিক সলিডারিটি।

---

২১. ওআইসি চার্টার, ধারা-২৫.

২২. www.oic-ocl.org.com.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ও আই সি-র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ও আই সি-র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৩.১ ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র

ও আই সি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি সংগঠন। জাতিসংঘের পর এ সংগঠনটির অবস্থান। বিভিন্ন রাষ্ট্র সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে একটি সংগঠন আন্তর্জাতিক সংগঠনের চরিত্র অর্জন করতে পারে। সে হিসাবে ওআইসি'র সনদের প্রতি অঙ্গীকারসহ এর সদস্যপদ লাভের সকল শর্ত পূরণ করার পর একটি রাষ্ট্র উক্ত সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে থাকে। এটি জাতিসংঘের দুই শ্রেণীর সদস্য পদ- মূল সদস্য (Original Member) এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র (Other Member Country)[১] না রেখে বরং সংস্থাটি চার্টার এ সদস্য রাষ্ট্রকে যেভাবে উল্লেখ করেছে তা হলো (ক) ৫৭ সদস্য রাষ্ট্র (57 states Member) (খ) অন্যান্য রাষ্ট্র (Others states) যারা এ Charter-এর অধীনে সদস্য হবে। এছাড়া (গ) পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্র ও (ঘ) পর্যবেক্ষক সদস্য- আন্তর্জাতিক সংস্থায় এই অতিরিক্ত দু'ধরনের সদস্যপদের বিধান রাখা হয়েছে। সনদের ধারা ৩ এর (১)-এ বলা হয়েছে [২] ঃ The Organization is made up of 57 States member of the Organization of the Islamic Conference and other States which may accede to this Charter in accordance with Article 3 paragraph 2. ধারা ৩-এর (২)-এ বলা হয়েছে [৩] ঃ Any State, member of the United Nations, having Muslim majority and abiding by the Charter, which submits an application for membership may join the Organization if approved by consensus only by the Council of Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the council of Foreign Ministers. ধারা ৪-এর (১)-এ- বলা হয়েছে[৪] ঃ Decision on granting Observer status to a State, member of the United nations, will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Minister এবং ধারা ৪ এর (২)-এ বলা হয়েছে[৫] ঃ Decision on granting Observer status to an international organization will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers

---

১. তোফাজ্জল হোসেন, *জাতিসংঘ*, আগামী প্রকাশন, ঢাকা-২০০৭, পৃ-১৩৬
২. ওআইসি সনদ, *ধারা ৩-এর (১)*
৩. পূর্বোক্ত, ধারা-৩-এর (২)
৪. পূর্বোক্ত, ধারা-৪-এর (১)
৫. পূর্বোক্ত, ধারা-৪-এর (২)

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত নীতিমালার আলোকে ১৯৬৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী ২৪টি দেশ[৬] প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বিবেচিত হয়। [৭] আমন্ত্রিত ২৫টি দেশের মধ্যে ১০টি দেশের[৮] রাষ্ট্রপ্রধানগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য দেশ [৯] সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করে[১০]। ২৫টি দেশ যথাক্রমে আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, শাদ, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, মরক্কো, সৌদি আরব, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, নাইজার, পাকিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মিশর, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, সেনেগাল পরবর্তীতে আরও অনেক রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে সদস্যপদ লাভ করে এবং বর্তমানে ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ৫৭ টিতে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ঃ ০৪
ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সদস্যপদ লাভের সন

ক্রমিক নম্বর	দেশের নাম	সদস্যপদ লাভ
১	আফগানিস্তান	১৯৬৯
২	আলজিরিয়া	১৯৬৯
৩	শাদ	১৯৬৯
৪	গিনি	১৯৬৯
৫	ইন্দোনেশিয়া	১৯৬৯
৬	ইরান	১৯৬৯
৭	জর্দান	১৯৬৯
৮	মরক্কো	১৯৬৯
৯	সৌদি আরব	১৯৬৯
১০	কুয়েত	১৯৬৯
১১	মৌরিতানিয়া	১৯৬৯
১২	নাইজার	১৯৬৯
১৩	পাকিস্তান	১৯৬৯
১৪	সোমালিয়া	১৯৬৯
১৫	দক্ষিণ ইয়েমেন	১৯৬৯
১৬	সুদান	১৯৬৯
১৭	তিউনিসিয়া	১৯৬৯
১৮	তুরস্ক	১৯৬৯
১৯	মিশর	১৯৬৯
২০	উত্তর ইয়েমেন	১৯৬৯

৬. ২৪টি দেশ হল– আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, শাদ, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, মরক্কো, সৌদি আরব, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, নাইজার, পাকিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মিশর, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, সেনেগাল

৭. Noor Ahmad Baba, *Ibid, p-65*

৮. ১০টি দেশ হল– আলজিরিয়া, ইরান, জর্দান, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদিআরব, সোমালিয়া, উত্তর ইয়েমেন. (Noor Ahmad Baba, *Ibid*),

৯. বাকি দেশগুলো হল– আফগানিস্তান, শাদ, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনেশিয়া, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত. (Noor Ahmad Baba, Ibid),

১০. Noor Ahmad Baba; *Ibid, p-65.*

Dhaka University Institutional Repository

২১	লেবানন	১৯৬৯
২২	লিবিয়া	১৯৬৯
২৩	মালয়েশিয়া	১৯৬৯
২৪	মালি	১৯৬৯
২৫	সেনেগাল	১৯৬৯
২৬	বাহরাইন	১৯৭০
২৭	ওমান	১৯৭০
২৮	কাতার	১৯৭০
২৯	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৯৭০
৩০	সিরিয়া	১৯৭০
৩১	সিয়েরালিওন	১৯৭২
৩২	বাংলাদেশ	১৯৭৪
৩৩	গ্যবন	১৯৭৪
৩৪	গাম্বিয়া	১৯৭৪
৩৫	গিনিবিসাও	১৯৭৪
৩৬	উগাণ্ডা	১৯৭৪
৩৭	বারকিনা ফাসো	১৯৭৫
৩৮	ক্যামেরুন	১৯৭৫
৩৯	ইরাক	১৯৭৬
৪০	কমোরুস	১৯৭৬
৪১	মালদ্বীপ	১৯৭৬
৪২	জিবুতি	১৯৭৮
৪৩	বিনিন	১৯৮২
৪৪	ব্রুনেই	১৯৮৪
৪৫	নাইজেরিয়া	১৯৮৬
৪৬	আজারবাইজান	১৯৯১
৪৭	আলবেনিয়া	১৯৯২
৪৮	কিরগিজিস্তান	১৯৯২
৪৯	তাজিকিস্তান	১৯৯২
৫০	তুর্কমেনিস্তান	১৯৯২
৫১	মোজাম্বিক	১৯৯৪
৫২	কাজাখস্তান	১৯৯৫
৫৩	উজবেকিস্তান	১৯৯৫
৫৪	সুরিনাম	১৯৯৬
৫৫	টোগো	১৯৯৭
৫৬	গায়ানা	১৯৯৮
৫৭	আইভরিকোষ্ট	২০০১

তথ্যসূত্র ঃ গবেষক কর্তৃক বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত।

উল্লেখ্য যে, মুসলমান প্রধান না হয়েও ওআইসি'র সদস্য দেশ হ'ল উগাণ্ডা (মোট জনসংখ্যার ১২.১% মুসলমান), ক্যামেরুন (মোট জনসংখ্যার ১৭.৯% মুসলমান), বেনিন (মোট জনসংখ্যার ২৪.৪%মুসলমান) মোজাম্বিক (মোট জনসংখ্যার ২২.৮% মুসলমান), গায়ানা (মোট জনসংখ্যার ৯% মুসলমান) ও সুরিনাম (মোট জনসংখ্যার ১৯.৬% মুসলমান)[১১]। নিম্নে সদস্য দেশগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল।

১১. The Asian Age, Calcutta, October 19, 1999

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১ আইভরিকোষ্ট

আইভরিকোষ্টের সাংবিধানিক নাম Republique De Cote Divoire এবং ইংরেজি নাম The Republic of IvoryCoast রাজধানী স কোতি আবিদজান, নতুন সরকারী রাজধানীর নাম ইয়ামউসুক্রো, তবে এটি খুব বেশি চালু নয়। আবিদজান একটি বড় সামুদ্রিক বন্দর। দেশটির আয়তন ৩,২২,৪৬২ বর্গকিমি (১,২৪,৫০২ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৫ হাজার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ২ শতাংশ। দেশের লোকেরা আইভোরিয়ান নামে পরিচিত। আইভোরিয়ানরা ষাটটি ট্রাইবে বিভক্ত, জন্মহার (প্রতি হাজারে) ৩৮, মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৬ জন, সরকারি ভাষা ফরাসি, সাধারণ লোক নিজ ট্রাইবের ভাষায় কথা বলে। সাক্ষরতার হার ৪০ শতাংশ। প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক (ফ্রাঁ সি এফ এ) [১২]।

ভৌগোলিক পরিচয়ঃ- দেশটি পশ্চিম আফ্রিকার দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। দেশটির পশ্চিমে লাইবেরিয়া ও গিনি, উত্তরে মালি ও বারকিনা ফাসো, পূর্বে ঘানা ও দক্ষিণে গিনি উপসাগর অবস্থিত। ফ্রান্সের উপনিবেশ থাকাকালে ১৮৯৩ খৃঃ বর্তমান আকারে গঠিত হয়। দেশটির দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চল ঘন বনে আবৃত। সারা দেশে বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।[১৩]

ঐতিহাসিক পরিচয়ঃ গিনি উপসাগরের উত্তর উপকূলবর্তী এ দেশটি ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। দেশটি ১৯৫৮ সালে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে ও স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালের ৭ আগস্ট। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি থেকে বর্তমান নামে পরিচিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে অত্যন্তত জোরালোভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হয়। দেশের অধিবাসীদের ৩৪ শতাংশ খৃষ্টান, রোমান ক্যাথলিক ২৭ শতাংশ, মুসলিম ২১ শতাংশ, বাকিরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, প্রকৃতি উপাসক। দেশটি ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।

অর্থনৈতিক পরিচয় ঃ আইভরিকোষ্ট একটি কৃষিপ্রধান দেশ ৮৫ শতাংশ লোকের জীবিকা চাষাবাদ, পশু পালন, মাছ শিকার। কফি, কোকো, কলা প্রধান ফসল। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রধান শিল্প সিমেন্ট, টেক্সটাইলস, টিম্বার। তূলা, ধান, তৈলবীজের চাষ বাড়ছে। কলা, আনারস প্রচুর রফতানি হয়। খনিজ পদার্থর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ, হীরা, লোহার সন্ধান মিলেছে। দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬৬১ ডলার।

১২.The Europe world year Book (2004); Europa Publication (London- 2004) Volume-1 (Part Two) *P.2311* (বিস্তারিত ১৩১৩-১৩৩৩ দেখুন)

১৩. Encyclopaedia of the world; The Unversital Academy Documentary Publishing & Research Centre; Dhaka-2012 (সম্পাদিত) *(ঢাকা-২০১২), পৃ.১৮৭*

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পরিচয় ঃ প্রশাসনিক প্রয়োজনে আইভরিকোষ্ট ১৯ বিভাগে এবং ৫৭টি উপ-বিভাগে বিভক্ত হলেও দেশে এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বলবৎ আছে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দেশের মুখ্য শাসক। তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে একটি মন্ত্রিসভার সহযোগিতায় দায়িত্ব পালন করেন। এক-কক্ষ বিশিষ্ঠ জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ১৯৭। প্রধান রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ দ্য আইভরিকোষ্ট (ইউডিপিসিআই)। অন্যান্যর মধ্যে আইভরিয়ান পপুলার ফ্রন্ট (এফপিআই), আইভরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি, আইভরিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি দল রয়েছে।[১৪]

৪.১.২. আজারবাইজান

আজারবাইজানের সাংবিধানিক নাম The Republic of Azerbaijan। রাজধানী বাকু। এটি কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত শহর। দেশটির আয়তন ৮৬,৬০০বর্গ.কি.মি. (৩৩,৪৩০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ ২ হাজার ৫ শত (২০০৩) প্রতি বর্গ.কিমি. লোকসংখ্যা ৯৪.৭ জন। অধিবাসীদের বলা হয় আজেরবাইজানি। দেশের লোকসংখ্যার ৯৩.৬ শতাংশ আজেরি, ৭.৮ শতাংশ রাশিয়ান, ৬.৫ শতাংশ আর্মেনিয়ান। এছাড়া ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান তবে খৃস্টান ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্যও আছে। অধিবাসীদের ৭০ শতাংশ শিয়া এবং ৩০ শতাংশ সুন্নী মুসলিম, রাশিয়ান ও আর্মেনিয়ানরা খৃস্টান। আজার বাইজান-এর রাষ্ট্রভাষা আজেরি তুর্কি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সাক্ষরতা ৯৭ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ। প্রচলিত মুদ্রা–মানাত।[১৫]

ভৌগোলিক পরিচয় ঃ আজারবাইজান মধ্য এশিয়ার একটি ভূমিবন্ধ দেশ। উত্তরে রাশিয়া, উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া, পশ্চিমে আর্মেনিয়া, দক্ষিণে ইরান ও সমগ্র পূর্ব সীমান্তেকাস্পিয়ান হ্রদ। আর্মেনিয়ার সঙ্গে নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ রয়েছে। জর্জিয়ার সঙ্গে সীমান্তবিরোধেরও নিষ্পত্তি হয়নি।[১৬]

ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ আজারবাইজান একটি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যগতভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, পরবর্তীতে বিদেশী শক্তির নিকট পরাভূত হয়। এক পর্যায়ে ১৯১৮ সালে তুর্কমানচী চুক্তির ফলে দক্ষিণ আজারবাইজানের শাসনভার পারস্য (বর্তমান ইরান) এবং উত্তর আজারবাইজানের শাসনভার রাশিয়ায় হস্তান্তড়র হয়। পরে ১৯২৮ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত ১৯২০ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী দেশটি দখল করে। অনেক ঘটনার পর ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি রিপাবলিকের মর্যাদা পায়।

---

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ.১৩২৭
১৫. The Europa world year Book (2004), ibid, P,637, 644
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৩৭, (বিস্তারিত Agerbaijan ৬৩৭-৬৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালে আজেরবাইজান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশটি ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৯৪ সালে ন্যাটো-এর সদস্য হয়।[১৭]

অর্থনৈতিক পরিচয় ঃ দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও আজেরবাইজানের সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত নয়। দেশ থেকে রপ্তানি হয় তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও মূল্যবান ধাতব পদার্থ রাসায়নিক, তূলা ও বস্ত্র। আমদানি করতে হয় যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইস্পাত, সিমেন্ট, রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যালস, ট্রেক্সটাইল প্রভৃতির কলকারখানা গড়ে উঠেছে। কৃষিপণ্যের মধ্যে উৎপন্ন হয় তূলা, দানাশস্য, সামান্য চাল, তামাক। ব্যবসা বাণিজ্য মুখ্যত প্রতিবেশী প্রাক্তন সোভিয়েত রিপাবলিকগুলোর সঙ্গে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আমলের বাকুকে সে রাষ্ট্রের 'অয়েল ক্যাপিটাল' বলা হতো।। দেশটির মাথাপিছু জাতীয় আয় ৭১০ ডলার। তবে শুষ্ক আবহাওয়া ও জমি অনুর্বর হওয়াসত্ত্বে ১৫.২% জিডিপিতে অবদান রেখে আসছে।[১৮]

প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পরিচয় ঃ নভেম্বর ১৯৯৫-এর সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান শাসক এবং সামরিক বাহিনীর কমান্ডার । তিনি পাঁচ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার সহায়তায় প্রেসিডেন্ট শাসনভার পরিচালনা করেন। দেশটির জাতীয় সংসদের নাম 'মিল্লি মজলিস' এটি ১২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় দেশটির স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।[১৯]

৪.১.৩. আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের সাংবিধানিক নাম Jamhuria Afghanistan এবং ইংরেজি নাম The Republic of Afghanistan, রাজধানী কাবুল, দেশটির আয়তন- ৬,৫২,২২৫ বর্গ.কি.মি.। লোকসংখ্যা ১৮কোটি ৬১ লক্ষ ৪ হাজার। প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব ২৮.৫ জন।[২০] অধিবাসীরা আফগান নামে পরিচিত । তারা নানা উপজাতিতে বিভক্ত। পাকিস্তানের সীমান্তভ্রবর্তী পূর্ব আফগানিস্তানের অধিবাসীরা পাঠান বা পুশতু নামে পরিচিত। উত্তর আফগানিস্তানের অধিবাসীরা তাজিক ও উজবেক গোষ্ঠীর, আর ইরানের সীমান্তভ্রবর্তী পশ্চিম আফগানিস্তানের অধিবাসীরা দারি।

---

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.২৯১,

১৮. www.oic-oci.org.com

১৯. *Europa (2004)*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪২

২০. The Europa world year Book (2004); *ibid, P-432* (১৯৮৬ সালের আফগানিস্তানের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, তবে জাতিসংঘের জনসংখ্যার হিসাব অনুযায়ী এতথ্যের পার্থক্য রয়েছে। সর্বশেষ ২০০২ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ২২ কোটি ৯৩ লক্ষ লোকসংখ্যা রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এছাড়া অনেক আফগান পাকিস্তান ও ইরানে উদ্বাস্তু এবং অনেক যাযাবর রয়েছে।.

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানের সরকারি ভাষা দুটি 'পুশতু' ও 'দারি' (ফার্সি)। আফগানদের ৯০ শতাংশ সুন্নি ও ১০ শতাংশ শিয়া মুসলমান। জন্মহার প্রতিহারে ৪৭.৭, মৃত্যুহার ২৮৩। প্রচলিত মুদ্রা- আফগানি।

ভৌগোলিক পরিচয় ঃ আফগানিস্তান পর্বতময় ভূমিবদ্ধ দেশ। চারদিকে ঘিরে আছে বিভিন্ন দেশ, এগুলো হ'লঃ রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান এবং ইরান। উত্তরে মধ্য এশিয়ায় তুর্কেমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান, পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পূর্বকোনে চীন, পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান। হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুভাগ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ছাড়া সারা আফগানিস্তান তুষারময়।[২১]

ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ আফগানিস্তান বহু উপজাতিতে বিভক্ত এক দেশ। দেশটির ইতিহাস বলে এই দেশটি বার বার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্তহয়েছে, কিন্ত বিদেশীরা কোন দিনই সাফল্য লাভ করতে পারেনি।[২২] আফগানিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটিশ ও রুশরা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটিশরা তিন তিনটি যুদ্ধ করে। ১৮৩৯-৪২, ১৮৭৮-৮১ ও ১৯১৯ সালে এই তিনটি ইঙ্গ-আফগান দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রতিবারই বৃটিশরা আধিপত্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়। রাশিয়া মধ্য এশিয়ার আমুদরিয়া পর্যন্তমুসলিম দেশগুলো দখল করে নিয়েই তখনকার মতো ক্ষান্তহয় এবং ১৯২৬ সালে আফগানিস্তানের সংগে নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে তৃপ্ত হয়। বৃটেনও ১৯১৯-এর যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে আফগানিস্তানের উপর আধিপত্যের আশা ছেড়ে দেয় এবং মনে না হউক, অন্তড়ত মুখে ও কাগজপত্রে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা মেনে নেয়।

১৯১৯ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বাদশা আমানুল্লাহ আফগানিস্তানে রাজত্ব করেন। আধুনিকমনা আমানুল্লাহ (ও রাণী সুরাইয়া) ছিলেন প্রগতি ও সংস্কারপন্থী। বৃটিশ বিরোধী বলেও আমানুল্লাহর একটা আন্তর্জাতিক পরিচয় ছিল। তাই তিনি বিষে বিষক্ষয় নীতিতে রাশিয়াকে হাতে রাখতে চেষ্টা করেন। এটাও সত্য, রাশিয়া তাঁকে তেমন কোনো 'ট্রাবল' দেয়নি। কারণ বিপ- বোত্তর রাশিয়া তখন নিজেকে সামলাতে ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর উপর তার গ্রাস মজবুত করতেই ব্যস্ত। কিন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তলে তলে চক্রান্তচালিয়ে যাচ্ছিল বস্তুত বৃটিশ চক্রান্তও রাণী সুরাইয়াকে জড়িয়ে তাদের অপপ্রচারে আফগান উপজাতীয় অসন্তেড়াষ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২৯ সালে তা বিদ্রোহের আকার ধারণ করে ভগ্নমনোরথ বাদশা আমানুল্লাহ সিংহাসন ত্যাগ করে ইতালী চলে যান। তাঁর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় নাদির খান হন নতুন বাদশা। নাদির খান আমানুল্লাহর প্রগতিবাদী নীতির পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিশেষ সতর্ক, সংযত ও রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করতে থাকেন।

২১.৩১ (একত্রিশ) প্রদেশ রয়েছে বলে The Europa world year Book (2004) উল্লেখ রয়েছে। (দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০% পাঠান, ২০% তাজিক, ৯% উজবেক, ৯% হাজারা, ৩% চাহার- আইমাক, ২% তুর্কি এবং ১% বেলুচি)।

(২২) তারেক শামসুর রেহমান, *নয়াবিশ্ব ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, *ঢাকা*, ২০০৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ-১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ১৯৩৩ সালে তিনি ঘাতকের হাতে নিহত হন। তাঁর পুত্র মুহাম্মদ জহীর ১৯৩৩ সালের ৮ নভেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে ১৯৫৩ সাল পর্যন্তবাস্তবক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতাশীল স্বজনরাই শাসনকার্য চালাতেন।[২৩]

ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে রুশপন্থী কিছু কিছু গ্রুপ গড়ে উঠতে থাকে। যথাঃ উইখ-ই খালমায়া, নিদায়ে খালেক, ওয়াতন প্রভৃতি গ্রুপ। এরা সবাই কম্যুনিস্ট না হলেও, সংস্কারপন্থী সেইসব সংস্কারের পথে দাঁড়ান জহীর শাহ'র পাশ্চাত্য-ঘেঁষা প্রধানমন্ত্রী শাহ মাহমুদ খান। সংস্কারপন্থীরা জহীর শাহের নিকট-আত্মীয় (ফাস্ট কাজিন ও ব্রাদার ইন ল) লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ দাউদ খানের সাহায্যে 'রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মাহমুদ খানকে অপসারণ করে। সর্দার দাউদ ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী হন, তবে বাদশাহ জহীরকে সরালেন না। কারণ তাঁর উত্তরের বুদ্ধিদাতা ও মদদদাতাদের বিবেচনায় বাদশা জহীরের মতো সজ্জন ও জনপ্রিয় রাজাকে সরানোর সময় তখনও আসেনি।[২৪]

জহির শাহ ১৯৬৪ সালে 'লয়া জিরগা' (গ্রেট ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী) কর্তৃক প্রণীত একটি শাসনতন্ত্র (যাতে একটি নির্বাচিত নিম্ন পরিষদ, একটি নির্বাচিত ও মনোনীত উচ্চ পরিষদ, একজন রাজ মনোনীত প্রধানমন্ত্রী ও একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়) প্রবর্তন করেন। সেই শাসনতন্ত্র অনুসারে দেশে দুটো নির্বাচনও ১৯৬৫ ও ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৩-এর আগস্ট–সেপ্টেম্বরে যে নির্বাচন হবার কথা ছিলো, তা হতে পারেনি। তার আগেই বামপন্থী 'খালুক' ও 'পারচাম' প্রভাবিত সর্দার দাউদ বাদশাহ জহীর শাহকে ১৯৭৩ সালের ১৭ই জুলাইয়ে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করে রাজতন্ত্র বিলোপ ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং জেনারেল দাউদই হলেন রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী।[২৫]

466316

দাউদ ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্তএক দশকে বেশ কিছু সংস্কারমূলক কাজ করেন এবং বাদশাহ তাতে সমর্থনও দান করেন। জহীর শাহ'র সম্ভবত লক্ষ্য ছিলো অনেকটা বৃটিশ টাইপের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। কিন্তু আফগানিস্তানের মতো কট্টর রক্ষণশীল ও অনগ্রসর দেশে তিনি তা এক সংগে বেশি ডোজ না দিয়ে ক্রমে ক্রমে দিতে চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সর্দার দাউদ যাদের হাতে খেতেন, তাদের কাছে জহীর শাহ'র এই নীতি পছন্দ হলো না। তারা রাজনৈতিক দলের অবাধ কর্মকান্ডের অধিকার সংক্রান্তএমন এক আইন 'লয়া জিরগা'কে দিয়ে তৈরী করালেন, যা জহীর শাহ'র কাছে সময়োপযোগী মনে হলো না। এতে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে, এই যুক্তিতে তিনি এর অনুমোদনে অসম্মতি জানিয়ে সিংহাসনই ছেড়ে দিলেন বা দিতে বাধ্য হলেন। বাদশাহ জহীর ৪০ বছর রাজত্বের পর সিংহাসন ছেড়ে বাদশাহ আমানুল্লাহর মতো ইতালী চলে গেলেন।[২৬]

---

(২৩) The Europa world year Book (2004) ibid, p.432 (বিস্তারিত ৪৩২-৪৪০ দেখুন)

(২৪) আব্দুল লতিফ খান; *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলি, সিড়ি বই বিতান*, ঢাকা-২০০৯, পৃ.৩১১

(২৫) খোন্দকার আব্দুল হামিদ, আফগানিস্তান সোভিয়েতের ভিয়েতনাম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (২৩ বর্ষ-চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল জুন-১৯৮৪) সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুর, পৃ.৭৭০

(২৬) পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ খৃ. আহমদ শাহ নামে এক উপজাতীয় নেতা প্রথম আফগানিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করেন ও প্রজাদের অনুমোদনে রাজা হন। ১৯৬৪ সালে রাজা জাহির শাহ যে সংবিধান বলবৎ করেন তাতে রাজা হন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। এ সময় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের সূচনা হয়। কিন্তু ১৯৭৩ খৃ. ২০ সেপ্টেম্বর এক অভ্যুত্থানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। ১৯৭৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখলের জন্য সৈন্য পাঠায়। কিন্তএক দশকে ধরে রক্তক্ষয়ি সশস্ত্র যুদ্ধ করেও আফগানিস্তান দখল করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু আফগানিস্তানে বিদ্রোহ, সংঘর্ষ ও অভ্যূত্থানের অবসান হয়নি। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।[২৭]

অর্থনৈতিক পরিচয় ঃ আফগানিস্তান অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ। মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমি চাষযোগ্য। তাতে গম, তূলা, ফল বাদামের চাষ হয়। কুটির শিল্পের মধ্যে বিখ্যাত কার্পেট ও তাঁত। রপ্তানি হয় তাজা ও শুকনো ফল, বাদাম, কার্পেট। আমদানি করতে হয় খাদ্য, তেল ও আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। তবে দেশটি খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ- কয়লা, তামা, সালফার, সীসা, দস্তা, লোহা, লবণ, দামি পাথর পাওয়া গেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল আকর রয়েছে এবং তেল পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। আফগানিস্তানের মানুষের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ২১৪ মাথাপিছু জিএনপি ৭২৫ ডলার।

প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পরিচয় ঃ আফগানিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য ৫ ডিসেম্বর ২০০১ সালে ২৮ জন আফগান নেতা একটি চুক্তি সই করেন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান, সংসদীয় গনতন্ত্রের আদলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সহায়তায় রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[২৮]

৪.১.৪. আলজেরিয়া

আলজেরিয়ার সাংবিধানিক নাম AL Jumhrityah Al Jagaigiyah Ad Dimuqratiyah Ashshabiyah এবং ইংরেজি নাম Democratic and peoples Republic of Alageria.দেশটির আয়তন ২৩,৮১, ৭৫১ বর্গকিমি (৯,১৯,৫৯৫ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৭০ হাজার।[২৯] অধিবাসীদের ৮৩ শতাংশ আরব ও ১৭ শতাংশ বার্বার। বার্বাররা আলজেরিয়ার আদিবাসী। কিছু সংখ্যক ফরাসির এখনও বসতি আছে দেশটিতে। আরব ও বার্বাররা সকলেই সুন্নি মুসলিম। ইসলাম সে দেশের রাষ্ট্রধর্ম। ফরাসি ভাষা সরকারি কাজে প্রচলিত তবে রাষ্ট্রভাষা আরবি। অধিবাসীরা আলজেরিয়ান নামে পরিচিত। শিক্ষার হার ৬৭.৮% ভাগ। গড় আয়ু ৬৯.৭ বছর। রাজধানী আলজিয়ার্স, প্রচলিত মুদ্রা দিনার।[৩০]

---

(২৭) অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব তুরস্ক-ইরাক* আফগানিস্তান, নভেল পাবলিশিং হাউস, তৃতীয় সংস্কার,(পুনর্মুদ্রণ-২০১২) ঢাকা; পৃ.৩০১-৩০৫

(২৮) *Europa (2004)*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩২

(২৯) প্রবাসি আলজেরিয়ান ব্যতীত, প্রায় ৮২ লক্ষ ৮ হাজার আলজেরিয়ান অন্যদেশে বসবাস করেন

(৩০) The Europa world year Book (2004) ibid; p.461 (বিস্তারিত ৪৬৯-৪৮৫ দেখুন)

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক পরিচয় ঃ আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ আলজেরিয়া। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে মালি ও নাইজার; পূর্বে তিউনিসিয়া ও লিবিয়া, মরুক্ক এবং মৌরিতানিয়া, দেশটির পশ্চিমে অবস্থিত আলজেরিয়ার ৯৯৮ কিমি দীর্ঘ উপকূল।

ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ বার্বারদের দেশ আলজেরিয়ায় অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা দলে দলে প্রবেশ করে এবং দেশটিকে নিজের করে নেয়। দক্ষিণপূর্ব আলজেরিয়ার পর্বতগাত্রে যেসব ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে আলজেরিয়া একদা শ্যামল ও প্রাণচঞ্চল ছিল বলে নৃতাত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলামের আগমন-পূর্ব ইতিহাস

আলজেরিয়া একটি প্রাচীন দেশ। তবে ১৫১৮ সালের পূর্বে বর্তমান ভৌগোলিক সীমানা ছিলো না। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত আমলেই এ ভূখন্ডের আলজেরিয়া নামকরণ হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি দেশটি দখল করেছে। এ দেশ ফিনিশীয়, রোমান ও ভান্ডালদের শাসনাধীন ছিলো। অতীতে আলজেরিয়া ছিলো উত্তর আফ্রিকার একটি অংশ মাত্র আর এর শাসনে ছিলো ফিনিশীয়রা। খৃস্টপূর্ব ১৪৬ সাল পর্যন্তএ ভূখন্ডটি তাদেরই শাসনাধীন ছিলো এবং কার্থজ ছিলো তাদের রাজ্যের রাজধানী। খৃস্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে খৃস্টপূর্ব ১৪৬ সাল পর্যন্তউত্তর আফ্রিকা সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলো ফিনিশীয়রা। খৃস্টপূর্ব ১৪৬ অব্দে এ ভূখন্ডে আগমন ঘটে রোমানদের। ফিনিশীয় এবং রোমানদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফিনিশীয়রা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। রোমানরা কার্থেজ নগরী ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর এ অঞ্চলটি রোমানদের দখলীকৃত উত্তর আফ্রিকা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সে সময়ে ঐ এলাকাকে বলা হতো নুমিদিয়া। আবার আসে রাজনৈতিক পরিবর্তন সেই ভূভাগ থেকে ৪২৮ খৃস্টাব্দে রোমান শাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় স্পেনের ভান্ডাল শাসন। রোমানদের বিতাড়িত করা হয়। স্পেনের শাসনকাল প্রায় একশ' বছর স্থায়ী ছিলো। ৫৩৩ খৃস্টাব্দে ভান্ডাল শাসনেরও অবসান ঘটে। সম্রাট জাস্টিনিয়ান বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে ভান্ডালদের পরাস্ত করেন। ফলে আলজেরিয়াসহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ৬৭০ সালে মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্তআলজেরিয়া বাইজেন্টাইন শাসনাধীনে ছিলো।

ইসলামের পতাকাতলে আলজিরিয়া

হযরত 'উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বাইজেন্টাইন শাসনাধীন থেকে মিশরকে উদ্ধারের জন্য সেনাপতি আমরের (রাঃ) নেতৃত্বে ৬৩৯ খৃস্টাব্দে মিশর অভিমুখে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করা হয়। এ সেনা-বাহিনী নিয়ে সেনাপতি আমর পর্যাক্রমে প্রাচীন মিসরের ফারাসা, বিলবেস, ফেউম প্রভৃতি শহর জয় করেন। এর পর দূর্ভেদ্য বেবিলন দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়ে নীল-নদ ও মকাত্তাস পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করেন। এখানেই মিসরের রাজধানী ফুসতাস নগর স্থাপিত হয়। ৬৪০-৪১ খৃস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া ও হেলিপলিস জয় করেন। এভাবে বাইজেন্টাইন শাসন থেকে মিশরকে মুক্ত করে ইসলামী দুনিয়ার সীমানাভুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাইজেন্টাইন শাসনের উপর এ আঘাত আফ্রিকার উত্তর ও পশ্চিম ভূ-ভাগে নাড়া দেয়। ইসলামের এ বিজয় বার্তা আলজিরিয়ার শাসক ও শাসিতদের কাছে গিয়েও পৌঁছেছে। মিশর বিজয়ের পর দলে দলে মিশরবাসী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ফলে ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে মুবাল্লিগরা বের হয়ে পড়েন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আলজিরিয়া বিজয়ের পূর্বেই আলজিরিয়াতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। সেনাপতি আমর মিশর বিজয়ের পর আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানকার শাসকদের পরাজিত করে। বার্কসহ আফ্রিকার সমগ্র উপকূলভাগে মুসলিম আধিপত্য স্থাপন করেন। আলজিরিয়া সেই ভূ-ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ বিজয়ে আলজিরিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাইজেন্টাইনদের উৎপাত মোটেই বন্ধ হয়নি। ফলে ইসলামের প্রচার প্রসারও বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ৬৭০ খৃস্টাব্দে সেনাপতি উকবা ইবন নাফের নেতৃত্বে যে বিজয় ঘটে, সেই বিজয়ই সব দিক দিয়ে সাফল্যমন্ডিত হয়। এ বিজয়ের ফলে উত্তর আফ্রিকা থেকে বাইজেন্টাইন শাসন সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হয়ে যায়। সেনাপতি উকবার এ বিজয় ছিলো ইসলামের বিজয়। এ বিজয়ের সাথে সাথে উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটে। (আলজরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া এবং লিবিয়া ' উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ভু-ভাগের নামকরণ করা হয় মাগরিব (পশ্চিম)। দুর্ধর্ষ বার্বাররা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম সমর শক্তিকে অধিকতর বলীয়ান করে তোলে। স্পেন অভিমুখে মুসলিম সৈন্যদের অভিযান বার্বারদের যোগাদানের ফলে অনেকখানি সহজতর হয়েছিলো।[৩১] কথিত আছে যে, 'উকবা ইবন নাফে' মরক্কো বিজয়ের পর আফসোস করে বলেছিলেন, ' যুদ্ধে পরাজয় কাকে বলে, সে অভিজ্ঞতা আমার কোন দিন হলো না। তিনি মাগরিবের শেষ প্রান্তবিন্দু পর্যন্তজয় করে নিজ অশ্ব-পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আটলান্টিকের বিশাল জলরাশির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হে পরওয়ারদিগার! আটলান্টিকের এই বিশাল উত্তাল তরঙ্গমালা যদি আমার অগ্রযাত্রায় বাধার সৃষ্টি না করতো, তা হলে হে সর্বশক্তিমান, তোমার নামের মহিমা প্রচার করতে করতে আমি আরো অগ্রসর হতে পারতাম।' ঐতিহাসিক হিট্টি লিখেছেন, `Uqbah advanced until the waves of the Atlantic stepped his hors..' ইসলামের এই মর্দ-ই-মুজাহিদ ৬৮৩ সালে শাহাদত লাভ করেন। আলজিরিয়ার বিসকারার নিকটে তাঁন সমাধি রয়েছে।[৩২]

---

(৩১) সালেহ উদ্দীন আহমদ, আলজেরিয়া-তিউনিসয়া মক্কো, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (তেইশ বর্ষ- চতুর্থ সংখ্যা; এপ্রিল-জুন-১৯৮৪) সম্পাদক, অধ্যাপক আব্দুল গফুর, পৃ.৯২৭-৩০

(৩২) ফিলিপ কে হিট্রি, *আরব জাতির ইতিহাস*, (অনুবাদ অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা, সম্পদনা হায়াৎ মাসুদ), অবসর প্রকাশনা, ঢাকা-২০০২ পৃ.৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হারুন-উন-রশীদের শাসনামলে মাগরিবের শাসনভার ইবন আগলাবের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং নবম শতাব্দী পর্যন্তআগলাবাইদদের শাসনাধীন থাকে। ৯৭২ সালে আলজিরিয়া ফাতিমীদের শাসনাধীনে আসে। অতঃপর একে একে ১০৮৭ সালে মুরাবিতুন, ১১০৭ সালে মুয়াহিদগণ , ১৩৫৯ থেকে ১৫৫৩ সাল পর্যন্তবনি জিয়াদরা আলজিরিয়া শাসন করন। ১৫৫৩ সালে আলজিরিয়া তুরস্কের 'উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তুর্কী এডমিরাল খয়ের উদ্দীন বার্বারোস দ্বারাই এ অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন হয়। ১৮৩০ সালের পূর্ব পর্যন্তআলজিরিয়া ' উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ ছিলো। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ৬৭০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্তঅর্থাৎ ১২ শত বছর পর্যন্তআলজিরিয়া ইসলামী দুনিয়ার একটি দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[৩৩]

ফরাসী শাসনাধীনে আলজিরিয়া

১৮৩০ সালের কথা। আলজিরিয়ায় তখন তুর্কী শাসন চলছে। ফরাসীরা তুর্কী শাসকের সংগে গভীর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। কূটনৈতিক সম্পর্কের সূত্র ধরে ফরাসীরা গোটা আলজিরিয়া দখলের অভিপ্রায়ে ১৮৩০ সালের ১৪ জুন ৬ শত স্টীমযানে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে জাহাজগুলো নোঙর করলো আলজিয়ার্স বন্দরে। দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে পড়লো। ' আবদুল কাদীর নামে ২২ বছরের এক যুবক আলজিরিয়াবাসীকে জিহাদের জন্য আহবান জানালেন। ইতিমধ্যে ফরাসীরা তাদের অবস্থান মজবুত করে নেয়।[৩৪] ১৮৩৫ সালের ২৬শে জুলাই ফরাসীদের সংগে' আবদুল কাদীরের নেতৃত্বে আলজিরিয়াবাসীর তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ফরাসীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী ১৮৩৭ সালের ৩১ মে উভয় পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। দু'বছর পর ফরাসীরা সেই চুক্তি ভংগ করে। বাধ্য হয়ে আবদুল কাদীর যুদ্ধের পথ বেছে নেন। দশ বছর এই সংগ্রাম চলে। ১৮৪৭ সালে তিনি বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এ সময় কথা ছিলো, তাঁকে হজ্জ করতে দেয়া হবে; কিন্ত তা আর দেয়া হয়নি। ৫ বছর তাঁকে বন্দী রাখা হয়। অতঃপর ১৮৫২ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৮৮৩ সালে তিনি ইন্তিড়কাল করেন।[৩৫]

'আবদুল কাদীরের মুত্যুর পর স্বাধীনতা সংগ্রাম থেমে যায় নি বরং আরো বেগবান হয়ে ওঠে। ওদিকে দখলদার বাহিনীর দ্বারা জুলুম-নির্যাতনও চরমে ওঠে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি মিছিলের উপর ফরাসীরা গুলীবর্ষন করলে গোটা আলজিরিয়া নতুনভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আটবার গেরিলা যুদ্ধ চলে। ১৩২ বছর পর ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আলজিরিয়া আবার মুসলিম শাসনে আসে। ৮ বছরের গেরিলা যুদ্ধে আলজিরিয়ার দশ লাখ নরনারী নিহত হয়। ৫ লাখ নারী-পুরুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। আলজিরিয়া ১৯৬২ সন থেকেই একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

(৩৩) খোন্দকার আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯২৯
(৩৪) *Europa (2004)* ibid, P.469
(৩৫) খোন্দকার আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৩০

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা লাভের পর বড় রকমের রাজনৈতিক উত্থান-পতন কয়েক বারই হয়েছে। দেশটি ওআইসি-এর অন্যতম সদস্য। ১৮৪৭ সালে আলজেরিয়া ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হয়। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬২সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।[৩৬]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- আলজেরিয়ার মাত্র ৩ শতাংশ জমি কৃষি-যোগ্য। আলজেরিয়ার ৯৯৮ কিমি দীর্ঘ উপকূল । উপকূল অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ ও উর্বর। সেখানে ব্যাপকভাবে আঙুরের চাষ হয়। ফরাসি শাসনকালে আঙ্গুর ছিল প্রধান ফসল এবং তা থেকে ফ্রান্সে মদ প্রস্তুত হতো। এখন আঙ্গুর ছাড়াও গম, যব, আলু, তামাকের চাষ হয়। পশুপালন ও ব্যাপকভাবে বাড়ছে। অ্যাটলাস পর্বতঞ্চলে যে এসপার্টো ঘাস হয় তা থেকে দড়ি ও কাগজের মন্ড তেরি হয়। দেশটির মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল সাহারা মরুভূমির অংশ। তবে ওই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। তাছাড়া লোহা, দস্তা, সীসা, ফসফেট, ইউরেনিয়ামের খনি আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে আলজেরিয়া সমৃদ্ধ দেশ। দেশের ৪০ শতাংশ লোক কাজ করে তেল, গ্যাস পেট্রোক্যামিক্যালস ও সার কারখানায়। আলজেরিয়ানদের মাথাপিছু গড় বার্ষিক জাতীয় আয় ১৭২০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- প্রেসিডেন্ট আলজেরিয়ার প্রধান শাসক, তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের সদস্য ২৮১ জন। প্রেসিডেন্টের কাজে সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন হতে হয়। নাগরিকদের ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৮। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। প্রধান রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এফ এল এন)। আলজেরিয়ার এখন কার্যত সামরিক শাসন কায়েম রয়েছে।[৩৭]

---

(৩৬) তারেক শামসুর হোসেন, *বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, (বুকস ফেয়ার), ঢাকা-২০১১, পৃ.১৩১-১৩২

(৩৭) *Europa (2004)*, ibid, P.459-461

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫. আলবেনিয়া

আলবেনিয়ার সাংবিধানিক নাম Republic of Albania দেশটির আয়তন-২৮,৭৪৮ বর্গমিকি (১১,১০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা- ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৭৫ জন।[৩৮] আধিবাসীদের ৭০ শতাংশ সুন্নী মুসলিম। খৃস্টান(২০ শতাংশ গ্রিক আর্থোডক্স, ১০ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক), বাকিরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩০%। জাতীগোষ্ঠির বিচারে ৯৬ শতাংশ আলবেনিয়ান, ২শতাংশ গ্রিক, অবশিষ্টরা মেসেডোনিয়ান (Mecidonian) ভাচ (Blach) জিপসি (Gypsy) এবং বুলগেরিয়ান (Bulgarian)। রাষ্ট্রীয় ভাষা আলবেনিয়ান, গ্রিক। অধিবাসীরা 'আলবেনিয়ান' নামে পরিচিত। শিক্ষার হার ৮৫.৩ %। তবে অন্যান্য প্রধান ভাষা হল ঘেগ (Gheg) এবং টাস্ক (Task), রাজধানী তিরানা, প্রচলিত মুদ্রা- লেক।[৩৯]

ভৌগোলিক পরিচয়:- ইউরোপের দক্ষিণপূর্ব দেশটির উত্তর ও উত্তর পূর্বে সাবেক যুগো৹াশ৹াভিয়ার সার্বিয়া এবং মন্টিনেগ্রো, পূর্বে মেসেডোনিয়া, দক্ষিনে গ্রীস এবং পশ্চিমে আড্রিয়াট্রিক উপসাগার। আড্রিয়াটিক উপসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত আলবেনিয়া পর্বতময় ক্ষুদ্র দেশ। পাহাড়ের খাঁজ ও উপত্যকাগুলি উর্বর বলে দেশের বেশিরভাগ লোক ঐসব স্থানে বাস করে। উল্লেখযোগ্য নদী হ'ল সেমানি, দ্রিনি। অন্যান্য শহর-শকোদার, এলবাসান, ভে-ারে, দারেস (প্রধান বন্দর)।[৪০]

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৪৬৮ সালে আলবেনিয়া তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। ২৮ নভেম্বর ১৯১২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ও ১৯২৫ সালে দেশটিকে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্ত ১৯২৮ হতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্তরাজতন্ত্র বহাল থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দেশটি প্রথমে ইতালি, পরে জার্মানির দখলে থাকে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে আলবানিয়াকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৪৬ সালে আলবানিয়ায় কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়, ১৯৬৭ সালে আলবেনিয়া বিশ্বে প্রথম নিজেকে নিরীশ্বরবাদী (atheist) রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। ফলে সব চার্চ ও মসজিদ বন্ধ হয়ে যায়। এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে। প্রায় পাঁচ দশক পর ১৯৯০ সালে ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়। ২২ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে জাতীয় পরিষদে নতুন করে সংবিধান অনুমোদিত হয়। কিন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর আলবেনিয়াতেও কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটে। এখন ধর্মের অধিকার ফিরে এসেছে ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। দেশটি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।[৪১]

---

(৩৮) Europa (2004), ibid, P.449 (২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতিসংঘের ২০০২ সালের পরিসংখ্যানে ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার বলে উলেখ ররেছে)

(৩৯) *Europa (2004)*, ibid, P.44

(৪০) *Europa (2004)*, ibid, P.441, বিস্তারিত দেখুন-৪৪১-৪৬০

(৪১) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ (সম্পাদিত) রাষ্ট্র অভিধান, বর্তমান সময় প্রকাশনা, ঢাকা-২০০৭, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- আলবেনিয়া ইউরোপের দরিদ্রতম দেশ। সারা দেশের ২১ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আলবেনিয়া ছিল কৃষি-নির্ভর। তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা,ক্রোমিয়াম, তামা, নিকেল প্রভৃতি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়ায় আলবেনিয়ার অর্থনীতির ভীত শক্ত হয়েছে। ভালো জাতের কাঠ সেদেশের আর একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। ভূমিকম্প এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উপকূলে সামুদ্রিক ঝড় মাঝে মাঝেই আলবেনিয়াকে বিপর্যস্ত করে। শিল্পসম্পদ ও খনিজ সম্পদ একেবারে কম নয়। তবু বারবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে দেশটির অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় হতে পারেনি। তেল, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, অ্যাসফ্যাল্ট, আকরিক লোহা, তামা রপ্তানি করে। বিনিময়ে আমদানি করে যন্ত্রপাতি, টেক্সটাইল, রাসায়নিক, ওষুধ প্রভৃতি। মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৩৮০ ডলার। জিডিপি ৪১ কোটি ডলার। গড় প্রবৃদ্ধি ৪.৩%।[৪২]

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯৮ সালে অনুমোদিত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে। ১৯৪৬ সালের ১৪ মার্চের সংবিধান অনুযায়ী দেশটির রাজনৈতিক কাঠামো বলবৎ আছে। প্রেসিডেন্ট নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, প্রকৃত শাসনভার প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। মন্ত্রিসভা সকল কাজের জন্য জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী। ১৪০ জন ডেপুটি নিয়ে এককক্ষ বিশিষ্ঠ জাতীয় সংসদ (Kuvendi Popullor) গঠিত। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রয়েছে আলবেনিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি (এএসপি), ডেমোক্রেটিক পার্টি, আলবানিয়ান রিপাবলিকান পার্টি প্রভৃতি। নাগরিকদের সরাসরি ভোটে প্রতি চার বছরের জন্য ডেপুটিগণ নির্বাচিত হন।[৪৩]

৪.১.৬. ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার সাংবিধানিক নাম Republic of Indoinesia দেশটির আয়তন- ১৯,২২,৫৭০ বর্গকিমি (৭,৪২,৩০৮ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪৭ হাজার। গড় আয়ু- ৬৬.৮ বছর। অধিবাসীরা ইন্দোনেশিয়ার নামে পরিচিত। মালয়ী জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপজাতি বাস করে বিভিন্ন দ্বীপে; জাভানিজ ৪৫ শতাংশ, সুদানিজ ১৪ শতাংশ। অধিবাসীদের ৮৭ শতাংশ মুসলিম, ৬ শতাংশ প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান, ৩ শতাংশ ক্যাথলিক, ২ শতাংশ হিন্দু, ১ শতাংশ বৌদ্ধ। শিক্ষিত ৮৭.৩ শতাংশ। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র। রাজধানী জার্কাতা। রাষ্ট্রীয় ভাষা-বাহাসা ইন্দোনেশিয়া (Bahase Indonesia) এছাড়া ৫৮৩টি আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে।[৪৪]

---

(৪২) www.oic-oci.org.com.
(৪৩) *Europa*, *পূর্বোক্ত*, *পৃ.৪৫১*
(৪৪) *Europa (2004)*, ibid, P.2116 (বিস্তারিত পৃ.২১১৬-২১৫২ দেখুন)

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক পরিচয়:- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার, ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্তমহাসাগর পর্যন্তবিস্তৃত দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়া। মোট ১৩,৬৭৭ টি দ্বীপ ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। দ্বীপমালার দেশ ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবেশী দেশ মালয়েশিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনি।[৪৫] পূর্বে সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমাংশ শেষ হয়েছে বঙ্গোপসাগরে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে।

পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া উত্তরে অবস্থিত নিউগিনি দ্বীপ। নিউগিনি দ্বীপের পশ্চিমার্ধ ইন্দোনেশিয়ার অংশের নাম ইরিয়ান জয়া। অন্যান্য দ্বীপের মধ্যে উল্লেখ্য উত্তর পশ্চিমাংশ বাদে বোর্নিও (কালিমান্তান), জাভা, মাদুরা, সুলায়ুয়েশি বেলিতাং, বালি, লোম্বক প্রভৃতি। উত্তর পূর্বে অবস্থিত তিমুর দ্বীপের পশ্চিমাংশ প্রথম থেকেই ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ। ইন্দোনেশীয় দ্বীপমালায় জাবা, সুমাত্রা, কালিমন্তান, সিলিবিস এবং ইরিয়ানে লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক তবে জাবা দ্বীপটিই সর্বাধিক ঘনবসতি পূর্ণ। জাবার লোক সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ১,৫০০ জন। দ্বীপমালার পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলের আবহাওয়া অন্যান্য এলাকার চেয়ে অনেকটা শীতল। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো হল বান্দুং, সেমারাং, মেদান ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলির সভ্যতা সুপ্রাচীন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়ায়। একই ভাবে চীনের সভ্যতাও প্রভাবিত করে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিকে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ার জনগণ বিভিন্ন গ্রুপের সংমিশ্রণে গঠিত। এর মধ্যে জাভানী, সুদানী ও চীনা ধরনের লোক রয়েছে। এরা প্রধানত ইসলাম, খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের অনুসারী। তবে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। মুসলমানরা সংখ্যায় মোট শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদেরই এদেশে প্রথম আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা হল ২০০০ বছরেরও আগেকার কথা। তারা প্রথমে জাভা দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। মুসলমানগণ আসে ত্রয়োদশ শতকে। মুসলমানরা প্রথমে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এলাকায় আগমন করে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা, প্রভাব ও ইসলাম ধর্মের আবেদন ইন্দোনেশীয় জনগণের মধ্যে এত বেশী ক্রিয়াশীল হয় যে, মাত্র এক শতকের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্ম হিসেবে ইসলামের সার্বজনীন আবেদন ইন্দোনেশিয়ায়ই সর্বাধিক লক্ষ্য করা গেছে। ভারতীয় প্রভাব এখনও মেলে ইন্দোনেশিয়ার মানুষের সুকর্ন, সুব্রজ, সুশান্তপ্রভৃতি নামগুলির মধ্যে। পর্তুগাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ার উপস্থিত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫৯৫ সালে দ্বীপগুলি যায় হল্যান্ডের দখলে। ১৯২২ সালে হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়াকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করে।

---

(৪৫) তারেক শামসুর রেহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬০-১৬১

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দোনেশিয় দ্বীপমালার রাজনৈতিক ইতিহাসও চরম সংঘাত ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম এ এলাকায় বাণিজ্য করতে আসে। সপ্তদশ শতকের দিকে ওলন্দাজা পর্তুগীজদের প্রাধান্য কেড়ে নেয় এবং ১৭৬০ সালে প্রকৃত প্রস্তাবে জাভা দ্বীপে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করে। তবে জাভার পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কাজে তাদের আরো ২০০ বছরেরও বেশী সময় লাগে। বিশ শতকের প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়।

১৯৪২ থেকে ৪৫-এর জাপানী অববোধের পরে ডঃ সুকার্নো ও ডঃ হাতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরু করে ইন্দোনেশিয়াকে রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করেন। চার বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের পর ১৯৪৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ড নতি স্বীকার করে। কিন্তু এর পরও পশ্চিম ইরিয়ান ওলন্দাজদের অধীনেই থেকে যায়।

পশ্চিম ইরিয়ান থেকে ওলন্দাজদের বিতাড়িত করার জন্য ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯৫৭ সালে সারা দেশে ওলন্দাজদের সম্পত্তি বাজেয়াফত ঘোষণা করলে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং গৃহীত এক পরিকল্পনা মুতাবিক ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘ এলাকাটি ইন্দোনেশিয়ার নিকট অর্পণ করে গণভোট অনুষ্ঠানের শর্ত সাপেক্ষে। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত এ ভোটের মাধ্যমে পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

১৯৬০ সালে ডঃ সুকার্নো ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্ট বাতিল ঘোষণা করেন এবং ১৯৬৩ সালে দেশের আজীবন প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। সোভিয়েত রাশিয়া ও এসময়ে ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে তোলে এবং ১৯৬৪ সালে ইন্দোনেশীয় বাহিনী মালয়েশিয়া আক্রমণ করে। ডঃ সুকার্নো এ কাজে যুক্তরাষ্ট্রের চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেন।

ইন্দোনেশিয়ায় এ সময় চরম রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং সেখানে চীন সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। এই বিদ্রোহীরা জাবার কতিপয় জেলা দখল করেও নিয়েছিল। কিন্ত শেষ পর্যন্তপরাজিত হয়। এই সঘর্ষে ৩ লক্ষ্যেরও অধিক চীন সমর্থক ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট নিহত হয়েছিল। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুহার্তো ১৯৬৮ সালে ৫ বছরের জন্য দশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গৃহীত হন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ ও ১৯৭৮ সালেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি পুনঃ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ১৬ বছর পর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। তবে উল্লেখযোগ্য যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর প্রভাব এখনও অক্ষুন্ন রয়েছে। ১৯৬৬ সালে মালয়েশিয়ার সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘর্ষের সমাপ্তি হলে ইন্দোনেশিয়া পুনরায় জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে। তবে ১৯৬৭ সালে চীনের সাথে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। এই সময়ে দেশে চীনা বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালেও একবার ইন্দোনেশিয়ায় চীনা ও জাপানীদের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় গৃহযুদ্ধের পর তিমুর প্রদেশটিও পুর্তুগীজদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশে পরিণত হয়।[৪৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপান ইন্দোনেশিয়াকে দখল করে। জাপান আত্মসমপর্ণ ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর ইন্দেনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় হল্যান্ড। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুর দখল করে নেয় ১৯৭৫ সালে। বর্তমারে পূর্ব তিমুর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা তবে তার যথাযথ ব্যবহার হয়নি।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই। তেল, টিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, নিকেল, বক্সাইট, তামা, কয়লা, লোহা, সোনা, রুপো, প্রভৃতি খনিজ পদার্থর সন্ধান মিলেছে। ভালো জাতের কাঠের বিশাল বনভূমি আছে। তাছাড়া চাষ হয় ধান, রবার ও কফি। টেক্সটাইল, সিমেন্ট, রাসায়নিক, প-াইউড, রবার প্রভৃতির কারখানা আছে। ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানির মধ্যে প্রধান তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস (৪০ শতাংশ) টিয়ার (১৫ শতাংশ) টেক্সটাইল (৭ শতাংশ) রবার (৫ শতাংশ) কফি (৩ শতাংশ)। আমদানি করে যন্তড়পাতি, রাসায়নিক, ভোগ্যপণ্য। মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ১,৪৫৩ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৮১০ ডলার।

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং চরম সংঘর্ষের পরও প্রধানত রফতানী বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নগতির কারণে ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যত ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। জাপাান, যুক্তরাষ্ট্র এবং সিঙ্গাপুরই ইন্দোনেশীয় রফতানী দ্রব্যাদির প্রধান ক্রেতা/ দেশের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে চাল, ভূট্টা, বাদাম, সয়াবীন, তামাক, কফি, নারিকেল তেল, চা, চিনি ইত্যাদি।

ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এখন ক্রমেই উন্নত হচ্ছে। প্রায় বাড়ীতেই রয়েছে রেডিও, টেলিভিশন ও টেলিফোন। ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ক্রমশ অনেক উন্নত হচ্ছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে ইন্দোনেশিয়া মুসলিম বিশ্ব তথা সারা বিশ্বের সমস্যাবলী নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। পেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির প্রশাসন বিদ্যমান। জাতীয় সংসদ, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস- এককক্ষ বিশিষ্ট। সদস্য সংখ্যা ৫০০। প্রধান দল গোলকার। অন্যান্য দল ইন্দোনেশিয়ার ডেমোক্রেসি পার্টি (পিডিআই) ডেভেলপমেন্ট ইউনিটি পার্টি (ডিইউপি)।

---

(৪৬) এ কে এম মহিউদ্দিন, *ইন্দোনেশিয়া*, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭০৪-৭০৬

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৭. ইয়েমেন

ইয়েমেনের সাংবিধানিক নাম Al Jumhuriyah Al Yamaniyah এবং ইংরেজি নাম Republic of Yemen দেশটির আয়তন ৫,৩৬,৮৬৯ বর্গকিমি (২০৭২৮৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৮০৭৭ জন।[৪৭] দেশের অধিবাসীরা ইয়েমেনি নামে পরিচিত। ৯০ শতাংশ আরব, ১০ শতাংশ আফ্রো-আরব। প্রধান বন্দর এডেনে কিছু ভারতীয়, সোমালি ও ইউরোপিয়রা বাস করে। শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ মুসলিম, তার মধ্যে সুন্নি ৪৫ শতাংশ, শিয়া ৫৫ শতাংশ। কিছু সংখ্যক ইহুদি, খৃষ্টান ও হিন্দু বাস আছে। সাক্ষরতার হার ৪৭,৭ শতাংশ, পুরুষ ৬৮.৫% এবং মহিলা ২৬.৯%।[৪৮] গড় আয়ু ৬০.৪০ বছর, পুরুষ ৫৮.৭ এবং মহিলা ৬২.২%।[৪৯] রাষ্ট্রভাষা আরবি। রাজধানী সানা, প্রচলিত মুদ্রা রিয়াল।

ভৌগোলিক পরিচয়:- আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত দেশ, পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর, দক্ষিণে এ্যাডেন উপসাগর, পূর্বে ওমান, উত্তরে সৌদি আরব। উপকূলবর্তী অঞ্চল উর্বর। অধিকাংশ এলাকা মরুভূমি, অভ্যন্তড়র অঞ্চল পর্বতময়, মাঝে মাঝে বাসযোগ্য উপত্যকা। এডেন বৃহৎসমূহ বন্দর। তারিখ, ঘানা, এডেন, হুদায়দা, ইব প্রভৃতি প্রধান শহর ও প্রধান বন্দর।[৫০]

ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ ইয়েমেন একটি প্রাচীন জনপদ। এখানে প্রাচীন সভ্যতার নানা নির্দশন রয়েছে। এ অঞ্চলে প্রাচীন সালের বিভিন্ন রাজ্যের নির্দশন পাওয়া যায়। খ্রিষ্টাব্দ পূর্ব ৯৫০ সাল হতে খ্রিষ্টাব্দপূর্ব ৬৫০ সাল পর্যন্তমিনিয়ান রাজ্যের উদ্ভব হয়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে মিনিয়াম রাজ্যের ২৬ জন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ ইয়েমেনের উত্তর পূর্বে প্রায় একই সময়ে কাতাবান নামক রাজ্যের সৃষ্টি হয়। কাতাবান রাজ্যের কিছু পরে হাজবামাক্তি উপত্যকায় হাজবামাউত রাজ্য সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টাব্দপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ সুবিখ্যাত সাবিয়ান রাজ্যের উদ্ভব হয়। সাবিয়ান রাজ্যের পর হযরত ঈসা আঃ এর জন্মের কিছু পূর্বে হিমারিত রাজ্যের উদ্ভব হয়। খ্রিষ্টাব্দ দশম শকরের মধ্যে হিমারিয়া ব্যবসা বানিজ্যের অবনতি ঘটে এবং এ রাজ্যের ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়।[৫১]

---

(৪৭) ১৯৯৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী। ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯ কোটি ৩১ লক্ষ ৫ হাজার এবং জনসংখ্যায় ঘনত্ব ৩৬ জন প্রতি বর্গকিমি (সূত্র- Europa (2004), ibid, P.4707
(৪৮) Human Development Report, UNDP, Year 2001, P-21
(৪৯) World Health Report, WHO, Year 200, P-43
(৫০) *Europa (2004)*, ibid, P.4700 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪৭০০-৪৭১৭)
(৫১) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৬-২০৭

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৯ সালে উত্তর ইয়েমেন অটোম্যান তুর্কিদের এবং দক্ষিণ ইয়েমেন ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে যায়। পরে ১৯১৮ সালে উত্তর উয়েমেন তুর্কীদের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ইয়েমেন স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৭০ সালে দেশের সবকিছু জাতীয় করণ করা হয়। অনেক উত্থান পতনের ও সংঘাতের পর ১৯৯০ সারের ২৩ মে ইয়েমেন আরব রিপাবলিক দক্ষিণ ইয়েমেন এবং পিপল'স ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন (উত্তর ইয়েমেন) একত্রিত হয়।[৫২] শুরু হয় নতুন ভাবে পথচলা। প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন আছে। ১৫৩৮ সালে তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ হয়, মুক্ত হয় ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর। ইয়েমেনের দক্ষিণ অংশ ছিল বৃটেনের রক্ষণাধীন, ১৯৬৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। নতুন রাষ্ট্রের নাম হয় ফেডারেশন অফ সাউথ আরাবিয়া। এডেন হয় রাজধানী। উত্তর ইয়েমেন স্বতন্ত্রভাবে সৌদি আরব ও বৃটেনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- স্বাধীনতা লাভের পর পর ইয়েমেন অর্থনৈতিক সমস্যায় সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে কখনো এ সমস্যা প্রখট হয়। পরবর্তীতে উভয় ইয়েমেন একত্রিত হবার পর থেকে দেশটির অর্থনৈতিক সুদৃঢ় হয়েছে। আরব দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ছিল। তেল আবিস্কৃত হওয়ার পর ইয়েমেন এখন সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। রপ্তানি করে তেল, তুলা, কপি, চামড়া, সবজি। আমদানি করে খাদ্যশস্য, ভোগ্যপণ্য, চিনি, সিমেন্ট। এডেন বিখ্যাত বন্দর, সেখানে তেল শোধনাগার আছে। এখনও কৃষি নির্ভর দেশ, দানাশস্য, ফল, সবজি, কফি, তুলার চাষ হয়। ডেইরি, পোলট্রির সংখ্যা বাড়ছে। মাছ চাষ ব্যাপকভাবে গয়, মধু অন্যতম রপ্তানিযোগ্য পণ্য। জিডিপি ৯৩ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫২০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- পাঁচজনকে নিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, উত্তর ইয়েমেনের দুই প্রতিনিধি ও দক্ষিণ ইয়েমেনের এক প্রতিনিধি তার সদস্য। তদারকির দায়িত্ব প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিলের। প্রেসিডেন্ট ৭ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। শাসন দায়ীত্ব প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার হাতে। এককক্ষ জাতীয় সংসদ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর সদস্য ৩০১ জন। আইন পরিষদের সদস্য সরাসরি ৬ বছরের জন্য ভোটে নির্বাচিত হন। কনসালটেটিভ-কাউন্সিল নামে উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের-১১১ জন সদস্যকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ প্রদান করেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রধান জেনারেল পিপলস কংগ্রেস, ইয়েমেন সোশ্যালিষ্ট পার্টি। নাগরিকদের ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৮ বছর।

---

(৫২) *Europa (2004)*, ibid, P.4700-4706

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৮. ইরাক

ইরাকের সাংবিধানিক নাম Al Jumhuriah Al Iraqiyah এবং ইংরেজি নাম Republic of Iraq দেশটির আয়তন- ৪,৩৮,৩১৭ বর্গকিঃ মিঃ (১,৬৯,২৩৫ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২কোটি ২০ লক্ষ ১৭ হাজার ৯ শত ৮৩ জন।[৫৩] অধিবাসীরা ইরাকি নামে পরিচিত। তাদের ৭৯-৮০ শতাংশ আরব, ১৬-২০ শতাংশ কুর্দি, ৩ ভাগ পারসিয়ান এবং ২ ভাগ তুর্কি। ৯৫ শতাংশ মুসলিম (শিয়া ৬৩-৬৫ শতাংশ , সুন্নি ৩২-৩৭ শতাংশ), খৃষ্টান অন্যান্য ৩ শতাংশ। শিক্ষিতের হার ৬০ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা আরবি। কুর্দি অঞ্চলে কুর্দিস সরকারি ভাষা। প্রায় ৮০ ভাগ লোক আরবীতে এবং ১৫ ভাগ লোক কুর্দীতে কথা বলে। গড় আয়ু ৬৯.৪ বৎসর। রাজধানী বাগদাদ। প্রচিলিত মুদ্রা- ইরাকি দিনার।

ভৌগোলিক পরিচয়:- দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার ত্রিভুজাকৃতি পর্বত ও মরুময় দেশ। পূর্বে ইরান, উত্তরে তুরস্ক পশ্চিমে সিরিয়া ও জর্দান, দক্ষিণে সৌদি আরব ও কুয়েত। দেশের উত্তরাংশ পর্বতময়, পশ্চিমাংশ মরুভূমি, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী বিধৌত উর্বর সমতল ভূমি। দেশের প্রধান সম্পদ তেল, তাছাড়া পশম ও খেজুর রপ্তানি হয়। সারা পৃথিবীর খেজুর রপ্তানি ৮০ শতাংশ ইরাক সরবরাহ করে।[৫৪]

ঐতিহাসিক পরিচয়:- সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ ইরাকের পূর্ব নাম মেসোপটেমিয়া, গ্রিক ভাষার এই শব্দের অর্থ হল মধ্য পদী অর্থাৎ ইরাকের ফোরাত এবং দজলা দুই নদীর মধ্যবর্তী দোয়াশ অঞ্চল।[৫৫] ইরাকে চার হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন মেলে যা ব্যাবিলিয়ান ও অ্যাসিরিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। ৬১২ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দি অ্যাসিরীয় যুগের পত্তন হয় এবং ৫৩৯ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে নব্য ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পত্তন ঘটে।[৫৬]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯২৪-১৯১৮) সালে ইরাক তুর্কীর ও অটোমান সামজ্যের অন্তড়ভূক্ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হওয়ার পর ১৯২০ সালে ইরাক বৃটেনের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৩২ সালে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ইরাক 'লিগ অফ নেশনস'- এর সদস্য হয়। ১৯৫৮ সালের অভ্যুত্থানে ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ১৯৮৯ সালে ১২ আগষ্ট ইরাক তার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত তেল সমৃদ্ধ কুয়েত দখল করলে ১৭ জানুয়ারী ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রবল যুদ্ধ হয়। ইরাক শেষ পর্যন্তপিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য লাভ করে। ২০০৩ সালে যুদ্ধরাষ্ট্র ইরাক আক্রমন করে এবং পরবর্তীতে সাদ্দাম হোসেনের পতন হয়।

---

(৫৩) ১৯৮৭ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী OIC জাতিসংঘের ২০০২ সালের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, লোকসংখ্যা ২ কোটি ৪৫ লক্ষ দশ হাজার। প্রতি বর্গ কিমি জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫৫.৯ জন (*Europa (2004)*, ibid, P.2193)
(৫৪) *Europa (2004)*, ibid, P-2181 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২১৮১-২২০৫)
(৫৫) অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুস হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৩
(৫৬) পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৫ ও ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশের রপ্তানি ৯৫ শতাংশ অপরিশোধিত তেল। সার ও সালফার ও রপ্তানি হয়। খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য, যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয়। জিএনপি ৩৫০০০ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ২০০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- দেশটিতে একটি কঠিন কঠোর একনায়কতন্ত্র বলবৎ ছিল। ১৯৭৯ সালের ১৬ জুলাই থেকে সাদ্দাম হোসেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর কথাই শেষ কথা ছিল। তাঁর কাজে সহায়তা করতে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ২৫০। দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল বাথ পার্টি। উত্তরে কুর্দিস্তান অঞ্চলে কুর্দিস ডেমোক্রেটিক পার্টি আছে। ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৮। বর্তমানে যুদ্ধ বিধস্ত একটি দেশে ও অন্তর্ভুর্বর্তী কালীন সরকার দেশটি শাসন করছে।[৫৭]

৪.১.৯. ইরান

ইরানের সাংবিধানিক নাম Jumhuri-Ye Eslami-Ye Irin এবং ইংরেজি নাম Islamic Republic of Iran দেশটির আয়তন- ১৬,৪৮,০৪০ বর্গকিমি (৬,৩৬,৩৩৩ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ। অধিবাসীরা ইরানি নামে পরিচিত। লোককসংখ্যার ৫১ শতাংশ পার্শিয়ান, ২৭ শতাংশ আজেরবাইজানি, ৯ শতাংশ কুর্দি, জিলাকি ও মাজানদারানি ৮ শতাংশ, লুর ২ শতাংশ, বালুচ ১ শতাংশ। শিয়া মুসলিম ৯৫ শতাংশ, সুন্নি ৪ শতাংশ ও জোরোয়াস্ত্রিয়ান, ইহুদী খৃষ্টান ও বাহাই ১ শতাংশ। ৫৮ শতাংশ পার্শিয়ান ভাষী, ২৬ শতাংশ বিশুদ্ধ ও কথ্য তুর্কিভাষী, ৯ শতাংশ কুর্দিস, অবশিষ্টরা লুরি বালুচ ও আরবি ভাষী। শিক্ষিতের হার ৭৭.১% শতাংশ। গড় আয়ু ৭০.৩ বৎসর। রাজধানী তেহরান, রাষ্ট্রভাষা- ফার্সি (পার্শিয়ান)। প্রচিলত মুদ্রা- রিয়াল।[৫৮]

ভৌগোলিক পরিচয়:- ইরান সুউচ্চ পর্বত শৃংঙ্গ বেষ্টিত একটি দেশ। পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগরের পূর্বে তীরে অবস্থিত দেশটি। পূর্ব সীমান্তেআফগানিস্তান ও পাকিস্তান, উত্তরে তুরস্ক, আর্মেনিয়া, আজেরবাইজান। পশ্চিমে ইরাক ও তুরস্ক, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ওমান উপসাগর। পর্বত ও মরুময় দেশ, কর্ষণযোগ্য জমি মাত্র ৮ শতাংশ। শুষ্ক আবহাওয়া, উত্তরে কাস্পিয়ান হ্রদ ও পশ্চিমে উপসাগরীয় অঞ্চল কিছুটা আর্দ্র। খনিজ সম্পদে দেশটি সমৃদ্ধ।[৫৯]

(৫৭) *Europa (2004)*, ibid, V-2, PP.2181 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২১৮১-২২০৬)
(৫৮) *Europa (2004)*, ibid, V-2, PP.2153 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২১৫৩-২১৮০)
(৫৯) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়- সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ ইরান। ৫২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে সাইরাস দ্য গ্রেট-এর নেতৃত্বে পূর্বে সিন্ধু নদী, পশ্চিমে নীল নদ পর্যন্তবিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ওই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের আক্রমণে ৩৩১-৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ইরানের পরবর্তী কালের ইতিহাস রাজ্য ভাঙা গড়ার কাহিনী। পারস্যদেশ ১৯৩৫ সালে ইরান নাম গ্রহণ করে। ইরানের দীর্ঘ ইতিহাস বংশ ভিত্তিক শাসনের উত্থান-পতনের কাহিনীতে পূর্ণ। আব্বাসীয়া শাসনামলেই এই এলাকায় বুয়াইয়া ও সেলজুক বংশ প্রকৃত ক্ষমতায় অধিকারী হয়। ১২৫৮ সালে আব্বাসীয়া বংশের পতনের পর এই এলাকার উপর ইলখান বংশের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। চতুদর্শ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই বংশের পতনের পর ইরানে বিভিন্ন অংশে কয়েকটি ছোট ছোট বংশ রাজস্ব করতে থাকে। আমির তাইমুরের অভ্যুদয় ও ফিগিজয়ের ফলে সাময়িক ঐক্য স্থাপিত হলেও পরে কৃষ্ণ মেষ বংশ ও শ্বেত মেষ বংশের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের শাসন ও তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ চলতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত শিয়া মতাবলম্বী সাফাভী বংশের প্রধান ও বিখ্যাত শাসক শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) রাজনৈতিক ঐক্য পুন: প্রতিষ্ঠিত করলেও এই বংশের পতনের পর আবার রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয়। ১৭৯৪ সালে কাজার বংশ ক্ষমতা অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে যদিও যান্দ বংশের করিম খান যান্দ (১৭৫০-১৭৭৯) কিছু দিনের জন্য শান্তিড়-শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজার বংশের সময় হতে ইরানের আধনিক যুগের সূচনা হয়েছে বলা যায়।[৬০] ইরানের শেষ রাজা শাহ দেশত্যাগ করেন ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারী। তারপর থেকে ইরান একটি ইসলামিক রিপাবলিক। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর, ইরান-ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়। ওআইসিসহ অনেক সংস্থার প্রচেষ্টার পর ১৯৮০ সালে ২০ আগষ্ট যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়।[৬১] ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- ইরানের মাত্র ৮ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য। তেল ইরানের প্রধান সম্পদ। দেশটির রপ্তানির ৯০ শতাংশ তেল। তাছাড়া রপ্তানি হয় ফল, বাদাম, চামড়া আর ইতিহাস প্রসিদ্ধ কার্পেট। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, সামরিক সরঞ্জাম, ধাতব পদার্থ খাদ্যসামগ্রী, ঔষুধ, পরিশোধিত তৈলজাত পণ্য। জিডিপি ২,০৪৭ কোটি ডলার ও মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৭০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ধর্মশাসিত সাাধারণতন্ত্র। ইসলামি নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালে সংবিধান প্রণীত হয়। পরে ১৯৮৯ সালে সংবিধান সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রী পদ বাতিল করা হয়। প্রধাণনির্বাহী হিসেবে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সচিবমন্ডলী রাজ্য শাসন করেন। প্রেসিডেন্ট ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ সদস্য ২৯০ জন, দনাম 'মজলিস-ই-সূরা-ইয়ে ইসলামি'। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৮। তবে প্রধান দলগুলি সবই ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ১৫ বছর বয়সে ভোটাধিকার। দেশের সকল নাগরিক বর্ণ কিংবা গোষ্ঠি পরিচয়হীনভাবে সমনাধিবকার ভোগ করে।

---

(৬০) পূর্বোক্ত, পৃ.৪
(৬১) নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, ১৯৯৫, পৃ.৬৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১০. উগান্ডা

উগান্ডার সাংবিধানিক নাম Republic of Uganda দেশটির আয়তন- ১৯৭০৫৮ বর্গ কিমি (৯১,১০৪ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা- ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৭৭ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ। লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার। প্রতি মায়ের প্রত্যাশিত সম্ভ্রন ৭.২। প্রধান উপজাতি বাগান্ডা, যা থেকে দেশের নাম। অন্যান্য উপজাতির মধ্যে প্রধান ল্যাঙ্গি ও আচেলি। বান্টু (Bantu) নিলোটিক (Nilotic) এবং হ্যামিটিক(Hamitic)। ৯৯ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ, ১ শতাংশ ইউরোপিয়, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে মুসলিম, ভারতীয়, রোমান ক্যাথলিক, প্রোষ্ট্যান্ট ও প্রকৃতি উপাসক। জনগণের মধ্যে ৩৩ জন রোমান ক্যথলিক, ৩৩ জন প্রোটেষ্ট্যান্ট, ১৬ জন মুসলিম এবং অন্যান্য ১৮ জন। গড় আয়ু ৪৬.২ বছর। শিক্ষিতের হার ৬৮.০ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি। সোয়াহিলি, লুগান্ডা প্রমুখ আফ্রিকার কথ্যভাষাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রাজধানী কাম্পালা, প্রচলিত মুদ্রা- উগান্ডা শিলিং।

ভৌগালিক পরিচয় ঃ উগান্ডা পূর্ব আফ্রিকার ভূমিবন্ধ আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দেশ। উত্তরে সুদান, দক্ষিণে তানজানিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে রুয়ান্ডা, পূর্বে কেনিয়া, পশ্চিমে জায়ারে। ভূমিবন্ধ দেশ। অধিকাংশ অঞ্চল উপত্যকা, চারদিকে পাহাড়, সর্বোচ্চ পর্বত শৃংগ মার্গাবিটা উচ্চতা-৫১১০ মিটার। খনিজ সম্পদ তামা, কোবাল্ট, লাইমষ্টোন, লবণ। দেশের ২৩ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য। প্রধান ফসল কফি, তুলো, চা। রপ্তানির ৯৭ শতাংশ চা।[৬২]

ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ ১৮৯৪ সালে বৃটেনের উপনিবেশ হয়। বৃটিশ চলে যাওয়ার পর ওবোটে প্রশাসনও উপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে চলে ও মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা প্রদান করে। এটা যদিও আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবুও মুসলমানরাই ব্যাপক আকারে ওবোটের নব্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়িয়েছিলো। ১৯৬৬ সালে কাবাকা শাসনের উচ্ছেদ এবং কমন ম্যানস চার্টার এর প্রতিষ্ঠা দুটোই ছিল ইসলামের প্রতি সরাসরি হুমকি। এ জাতীয় উচ্ছেদের উদ্দেশ্য ছিলো বুগান্ডা মুসলমানদের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক সংহতি ধ্বংস করা, অপরপক্ষে ছদ্মবেশী চার্টারের আবরণে খৃস্টীয় ধারায় সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া । এছাড়াও ইসরাইলের সাথে ওবেটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং এ এলাকায় ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বড় এজেন্ট হিসেবে ব্যাপকতর ভূমিকা পালনও একইভাবে আরো বিরাট উদ্বেগের কারণ ।

ইহুদীদের উগান্ডার কৌশলগত গুরুত্ব বুঝতে দেরী হয়নি। ৯ অক্টোবর ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা অব্যবহিত পরেই ওবোটে ১৯৬৩ সালে ইসরাইলে এক রাষ্ট্রীয় সফরে যান। একই বছর ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাল্ডামায়ারও কাম্পালা সফরে আসেন।

---

(৬২) *Europa (2004)*, ibid, V-2, PP.4275 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪২৭৫-৪২৯১)

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী এস্কল এবং ১৯৬৯ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবা ইভান উচ্চ পর্যায়ের সরকারী সফরে কাম্পালা আসেন। ঔপনিবেশিকদের মতোই ইহুদীরা মিশর পর্যন্তণীল নদের তীরের মুসলমানদের ব্লাকমেইল করার উদ্দেশ্যে নীল নদের উৎপত্তি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করছিলো। দক্ষিণ সুদানে আনিয়ান সন্ত্রাসবাদীদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ঘাঁটি হিসেবে ইসরাইলীরা উত্তর উগান্ডাকে ব্যবহার করতো। এখান থেকেই পূর্বে ঔপনিবেশিক আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণ এলাকা থেকে ইসলাম ধর্ম উচ্ছেদ করার জন্য খৃস্টান প্রধান দক্ষিণাঞ্চল সৃষ্টি করছিলো। ইদি আমীনের মাধ্যমে উগান্ডায় ওবোটে শাসনের অবসান এবং ইসরাইলীদের উগান্ডা থেকে বহিস্কারের পর সুদানের দক্ষিণী সমস্যার একটি শান্তিড়পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উগান্ডার ক্ষমতায় ওবোটের ফিরে আসার পর সুদানে আবার নতুন করে 'দক্ষিণী সংকট' মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ওবোটের প্রশাসন ক্রমেই জন-অপ্রিয় হয়ে উটতে থাকে। ১৯৭১ সালে জেনারেল ইদি আমীন একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর নিকট এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিলো যে, তার ক্ষমারোহণ সাময়িক ব্যাপার, যার জন্য ইসরাইলে প্রশিক্ষিত সৈন্যদের উপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি।

সেনাবাহিনীতে শুদ্ধি অভিযানের পর তিনি জন-সমর্থন অর্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সংখ্যালঘু কাকাওয়া গোত্র থকে আসার কারণে কোন বৃহত্তর জন-সমর্থন তাঁর ছিলো না, যে জন্য তিনি মুসলমানদের সমর্থনের আশায় তাদের নিকট প্রিয় হতে চেষ্টা করেন। তিনি রোববারের পরিবর্তে শুক্রবারকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করেন এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার মোসেস আলীর সভাপতিত্বে উগান্ডা মুসলিম সুপ্রিম কাউন্সিল গঠন করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য গৃহীত এসব আপাত পন্থা ইসলামের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দিকটির নিশ্চয়তা বিধান করেছিল। মুসলমান হত্যার বর্তমান অভিযান প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সালেই শুরু হয়, যখন তাঞ্জানিয়া ভিত্তিক ওবোটের সন্ত্রাসবাদী দল উগান্ডা আক্রমণ করে। তখন কাউকে খাতনা করা ও টুপী মাথায় দেখলেই হত্যা করা হত। মুসলমানদের হত্যা করার অজুহাতে তারা ইদি আমীনের সামরিক শাসনকে সমর্থন করতো। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোই তাঞ্জানীয় আক্রমনকারী সৈন্যদের ইদি আমীনকে উচ্ছেদ করে ওবোটকে ক্ষমতায় আসীন করার পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। ওবোটর ক্ষমতারোহণের পর সেনাবাহিনীর নির্বাসিতরা বড় আকারের ক্রশ চিহ্ন ধারণ করতো। খৃস্টান বাড়ীঘর ও গীর্জায় রুস চিহ্ন অঙ্কিতছিল। সেগুলোর কোন ক্ষতি করা হয়নি। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মসজিদ ও গ্রামগুলোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং মৃতদেহগুলোকে জলাভুমির পানিতে কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। এরা সবাই ছিল মুসলমান।[৬৩] ১৯৬২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।

---

(৬৩) রুহুল আমীন কুরায়শী উগান্ডা মুসলমান (অনুবাদ), *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃ.৮৯৬-৮৯৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- উগান্ডার মাটি উর্বর, বৃষ্টিপাত নিয়মিত হয়। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদেও উগান্ডা সমৃদ্ধ। তবু মূখ্যত রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য উগান্ডার প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক উন্নত হয়নি। কৃষিপ্রধান অর্থনৈতিক দেশটি। দেশের ৮০ শতাংশ লোক কৃষিজীবি। বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ৫৬০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৫০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- বৃটিশ ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র দিয়ে সূচনা হলে ও তা স্থায়ী হ'তে পারেনি। প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক তিনি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট প্রধান শাসক। তাঁর সহকারী ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী। আইন সভাকে বলা হয় ন্যাশনাল রেজিষ্টেট কাউন্সিল', এ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ২৭৮ জন, তন্মধ্যে ২০০ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৭ জন মনোনীত সদস্য। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে। দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল রেজিস্টান্স মুভমেন্ট।

৪.১.১১. উজবেকিস্তান

উজবেকিস্তানের সাংবিধানিক নাম Uzbekiston Respublikas এবং ইংরেজি নাম Republic of Uzbekistan দেশটির আয়তন- ৪,৪৭,৪০০ বর্গকিমি (১,৭২,৭৪০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৩ হাজার। অধিবাসীরা উজবেক নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৭১ শতাংশ উজবেক, ৮ শতাংশ রাশিয়ান, ৫ শতাংশ তাজিক ও অন্যান্য ১৬ শতাংশ। অধিবাসীদের ৭৫-৮০ শতাংশ মুসলিম (সুন্নী হানাফি মাযহাবভূক্ত তবে বর্তমানে অন্যান্যরা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গড় আয়ু ৪৬.২ বছর। শিক্ষার হার ৯৯.২%। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রিমিয়া থেকে উৎখাত তাতারদের ৭০ শতাংশ এখন উজবেকিস্তানের অধিবাসী। রাষ্ট্রভাষা উজবেক, এছাড়া তুর্কি গোষ্ঠীর ভাষা, রাশিয়ান ভাষাও প্রচলিত। রাজধানী তাসখন্দ (Tashkent) ২২ লক্ষ লোকের আধুনিক শহর। প্রচলিত মুদ্রার নাম সোম।[৬৪]

ভৌগেলিক পরিচয়:- মধ্য ও এশিয়ার ভূমিবদ্ধ দেশ। দক্ষিণে আফগানিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান, উত্তর ও পশ্চিমে কাজাকিস্তান, পূর্বে কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান। অধিকাংশ স্থান মরুভূমি, মরুভূমির মাঝে মাঝে মরুদ্যানে জনবসতি। উজবেকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী আমু দরিয়া, শির দরিয়া। ফরগনা উপত্যকা খনিজ সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- প্রাচীন কিবা নগরীর ঐতিহ্য মন্ডিত দেশ উজবেকিস্তান, ১২২০ সালে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা এ অঞ্চলে আঘাত হানে, ফলে প্রাচীন স্থাপনাসমূহ ধ্বংস হয়। চর্তুদশ শতাব্দীতে তৈমুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে কয়েক শতাব্দী মুসলিম সামন্ত প্রথা বিদ্যমান থাকে।

---

(৬৪) *Europa (2004)*, ibid, V-1, PP.4612 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪৬১২-৪৬২৮)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সালে রুশ বিপ-বের পর উজবেকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তভুর্ক্ত হয়। ১৯২৫ সালে উজবেক-সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালে রোমান বর্ণমালা উঠিয়ে দেয়া হলে উজবেকিস্তানের জনগণ তা মেনে নেয় নি, তা পূনর্বহালের জন্য প্রথমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এবং পরে বৃহৎ পরিসরে আন্দোলন শুরু করে।

পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে ১৯৯১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি সদস্য পদ লাভ করে এবং ১৯৯৪ সালে রোমান বর্নমালা প্রচলন পুনরায় শুরু হয়। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী তাসখন্দ অন্যান্য শহর সমরখন্দ, বুখারা, নামানগান।

অর্থনৈতিক পরিচয়: প্রধান ফসল তুলা। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালে ওই বিশাল দেশের দুই তৃতীয়াংশ তূলা উৎপন্ন হ'ত উজবেকিস্তানে। স্বাধীনতার পর তূলা উপাদান হ্রাস করে ফসল ও সবজি উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়। 'সোনা' প্রধান খনিজ সম্পদ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ৩০ শতাংশ সোনা সংগৃহীত হ'ত উজবেকিস্তান থেকে। দেশটিতে ইউরেনিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। রপ্তানি পণ্য হ'ল তূলা, সোনা, টেক্সটাইল সামগ্রী, রাসায়নিক, খনিজ সার, বনস্পতি। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, দানাশস্য ও অন্যান্য খাদ্য। জিডিপি মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৪৩০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ২০০২ সালের রেফারেন্ডামের মাধ্যমে ২০০৪ সালে সংবিধান গৃহীত হয়। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট মুখ্য শাসক, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সহায়তায় তিনি শাসনকার্য পরিচালান করেন। প্রেসিডেন্টকে ৫ বছর থেকে সময় বৃদ্ধি করে ৭ বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়। জাতীয সংসদ এককক্ষ বিশিষ্ট সুপ্রিম সোভিয়েত ওলি মাজলিস (Oly Majlis)। ২৫০ ডেপুটি বিশিষ্ট ওলি মাজলিসই সর্বোচ্চ আইন পরিষদ। প্রধান রাজনৈতিক দল পিপলস ডেমোক্রিটিক পার্টি অফ উজবেকিস্তান (প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টি)।

৪.১.১২.ওমান

ওমানের সাংবিধানিক নাম Sultanat Uman এবং ইংরেজি নাম Sultanate of Oman দেশটির আয়তন- ৩,০৯,৫০০ বর্গকিমি (১,১৯,৫০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ ১৫৮৩ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ। অধিবাসীরা ওমানি নামে পরিচিত। অধিকাংশ আরব, অল্প সংখ্যক বেলুচ ও জাঞ্জিবারি। এছাড়া তেলের খনিতে কাজ করতে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বহু লোকের বসবাস আছে দেশটিতে তাদেরকে ইবাদি বলা হয়। ইবাদি অধিকাংশ বাকী এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু। প্রত্যাশিত আয়ু পুরুষ ৭০ ও নারী ৭৩ বছর। গড় আয়ু ৭১ বৎসর। রাজধানী মাস্কট। রাষ্ট্রভাষা আরবি। ইংরেজি, উর্দু ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা প্রচলিত। প্রচলিত মুদ্রা ওমানি রিয়াল।

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক পরিচয়:- ওমান মরুঅঞ্চলীয় দেশ। দেশটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরব সাগর এবং উত্তর পূর্ব দিকে ওমান সাগার। পশ্চিমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, স্ৌদি আরব এবং ইয়েমেন। আরব উপদ্বীপের এ দেশটির ১৬০০ বর্গ কিলোমিটার উপসাগরীয় উপকূলীয় রেখা। অন্যভাবে বললে-ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূলে, সৌদি আরবের দক্ষিণে, আরব উপদ্বীপের একটি দেশ। তার পশ্চিমে অবস্থিত ইয়েমেন। তেল সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- খ্রিষ্টাপূর্ব তৃতীয় সহাস্রাবাদ থেকে বর্তমান ওমানে ম্যাসোপটেমীয় সভ্যতার অংশ হিসেবে সভ্যতার বিকাশ লাভ করে। খ্রিষ্টাপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় ৭ম শতক পর্যন্তএ দেশটি পারস্য সাম্রাজ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওফাতের পরপরই ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে এবং পার্সিয়ান আধিপত্য মুক্ত হয়ে আরব চরিত্র লাভ করে। পরবর্তীতে ১৫৪৭ থেকে ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ওমান পর্তুগালের শাসনাধীন থাকে। পরে ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আল বুসাইদ পরিবার এ দেশটির শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওমান বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৯৫১ সালে 'সুলতানেট অফ মাস্কেট অ্যান্ড ওমান' বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭০ সালে নাম বদল করে 'সুলতানেট অফ ওমান' রাখা হয়। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী মাস্কট একটি বন্দর শহর, অন্যান্য শহর সালাহা, নিজওয়া।[৬৫]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশের রপ্তানি ৯০ শতাংশ তেল। সরকারের রাজস্বের ৮০ শতাংশ আসে তেল থেকে। তেল ছাড়া রপ্তানি হয় মাছ, ফল, সবজি ও তামা। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, পরিবহন সরঞ্জম, ভোগ্যপণ্য, খাদ্য। জি ডি পি ১০৬০ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৭৮৩০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- দেশটিতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। সুলতান তার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ করেন। সুলতান বিভিন্ন ডিক্রির মাধ্যমে আইন প্রনয়ণ করেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর জারীকৃত ডিক্রি দেশের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা রয়েছে। সুলতান সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদ বছরে ৪ বার সভায় মিলিত হয়। চরম রাজতন্ত্র। সুলতানই দেশের সর্বক্ষমতা সম্পন্ন শাসক। কোন সংবিধান নেই। কোন রাজনৈতিক দল নেই। ভোটাধিকার নেই।

---

(৬৫) *Europa (2004)*, ibid, V-1, PP.3243 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩২৪৩-৩২৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১৩. কমোরো দ্বীপপুঞ্জ

কমোরো দ্বীপপুঞ্জের সাংবিধানিক নাম Federal Islamic Republic of the comoros তবে The Union of the comoros নামেও পরিচিতি। দেশটির আয়তন- ১৮৬২ বর্গকিমি (৭১৯ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ । অধিবাসীরা কমোরান নামে পরিচিত। ৮৬ শতাংশ সুন্নি মুসলমান ১৪ শতাংশ ক্যাথলিক। শিক্ষিতের হার ৫৭ শতাংশ। গড় আয়ু ৬৩.৩ বছর। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। সরকারি ভাষা আরবি ও ফ্রেঞ্চ তবে অধিকাংশ লোক কমোরান ভাষায় কথা বলে, যা সুয়াহিলি ও আরবি ভাষার সংমিশ্রণ। রাজধানী মরোনি,প্রচলিত মুদ্রা- কমোরোন ফ্রাঁ ।[৬৬]

ভৌগোলিক পরিচয়:- দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে, মাদাগাস্কার ও আফ্রিকার মূল ভূখন্ডর মধ্যবর্তী ভারত মহাসাগরের চারটি ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র । দ্বীপগুলির নাম নিজাজিদজা, আনজুয়ান,ময়েটো ও মেয়লি। দ্বীপগুলি আগ্নেয়গিরির দ্বারা সৃষ্ট। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ সামান্য।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ দ্বীপগুলি ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে কোমোরস তার প্রতিবেশি অঞ্চল মেওতিকে নিয়ে মাদাগাসকারের প্রশাসনভুক্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪ দ্বীপ ফরাসী বৈদেশিক অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে অঞ্চলটি অভ্যন্তড়ীণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত গণভোটে পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি দ্বীপ যথাক্রমে নিজাজিদজা, আনজুয়ান ও মোহেলি বাসিন্দারা নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু মেত্তিতি ফান্সের সাথে থেকে যেতে চায়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করে । তিনটি দ্বীপে মুসলিম প্রাধান্য রয়েছে, শুধু মেয়ৎ দ্বীপে খৃষ্টনরা সংখ্যাগুরু। তাই স্বাধীনতার পর মেয়ৎ দ্বীপ স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্রান্সের রক্ষণাধীন থাকে। বারবার অভ্যূথানও রক্তপাতে কমোরো দ্বীপপুঞ্জের আর্থিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় সংহতি ব্যাহত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য লাভ করে। রাজধানী মরোনি, ন্যাজিদজা (Njuzidja) দ্বীপে অবস্থিত ২২ হাজার লোকের একটি ছোট শহরও স্বাভাকি বন্দর। অন্যান্য শহর-মুৎ সামুদু, দমোনি, সামবাজি।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দরিদ্র, অনুন্নত দেশ। কৃষি, মাছ, বনজ সম্পদ থেকে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জি ডি পি) ৩৪ শতাংশ আসে এবং দেশের ৮০ শতাংশ লোক ওইসব কাজে নিযুক্ত। তবে পর্যটন শিল্পের বেশ প্রসার ঘটেছে বছরে প্রায় ৫ হাজার পর্যটক দেশটি ভ্রমণ করে। খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। আমদানির ৯০ শতাংশ চাল। প্রধান কৃষিজ পণ্য নারিকেল, কলা, লবঙ্গ। বিশেষ এক ধরনের সুগন্ধি প্রস্তুত হয় যার বিশ্বব্যাপী চাহিদা আছে। সুগন্ধ ভ্যানিলা নির্যাস উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ। মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ২৬ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৭০০ ডলার।

---

(৬৬) *Europa (2004)*, ibid, V-1, PP. (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪২৭৫-৪২৯১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়- দেশটির সংবিধান বারবার সংশোধিত হয়েছে। ফরাসি ধাঁচের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। দেশটিতে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য শাসক। তিনি জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা আছে। এককক্ষ জাতীয় সংসদ, নাম ফেডারেল অ্যাসেমব্লি। সদস্য সংখ্যা ৪২। সদস্যগণ ৫ বছরের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রধান জাতীয় দলগুলির নাম কোমোরান সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফ্রেটারনিটি অ্যান্ড ইউনিটি পার্টি, ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইত্যাদি। ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৮।

৪.১.১৪. কাজাকস্তান

কাজাকস্তানের সাংবিধানিক নাম Republic of Kazaknstan তবে ১৯৯১ সাল পর্যন্তএর নাম ছিল The Kajajh Soviet Sociclist Republic। দেশটির আয়তন- ২৭,১৭,৩০০ বর্গকিমি (১০,৪৯,১৫০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫২ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৫ শতাংশ । অধিবাসীরা কাজাক নামে পরিচিত। ৪০ শতাংশ কাজাক, ৩৮ শতাংশ রাশিয়ান, ৭ শতাংশ অন্যান্য স্লাভ গোষ্ঠী, ৬ শতাংশ জার্মান, ৯ শতাংশ অন্যান্য। ৪৭ শতাংশ মুসলিম, অন্যানরা রাশিয়ান অর্থোডক্স ও লুথেরান চার্চের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যাশিত আয়ু ৬৩.৭ শতাংশ, পুরুষ ৫৮.৯ ও নারী ৬৮.৯ বছর। রাষ্ট্রভাষা কাজাক, তবে জার্মান ও রাশিয়ান প্রচলিত আছে। শিক্ষার হার ৯৯.৪ ভাগ। গড় আয়ু ৬৬.৩ বৎসর । ১৯৯৭ সালে রাজধানী আলমাআতা থেকে পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে রাজধানী আকমোলা আস্তানা নামেই পরিচিতি। প্রচিলত মুদ্রা টেঙ্গে।[৬৭]

ভৌগোলিক পরিচয়:- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র মালভূমি অঞ্চল। মধ্য এশিয়ার ভূমিবদ্ধ দেশ। তবে আরল হ্রদ (তটরেখা ১,০১৫ কিমি) ও কাস্পিয়ান হ্রদ (তটরেখা ১,৮৯৪ কিমি) ছুঁয়ে আছে তার দক্ষিণ ও পশ্চিম- দক্ষিণ সীমান্ত। দেশটির উত্তরে রাশিয়ার, দীর্ঘ সীমান্ত পূর্বে চীন, দক্ষিণে কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান অবস্থিত। বিস্তীর্ণ অঞ্চল মালভূমি, শুষ্ক অবহাওয়া, অর্ধেক মরুভূমি। তবে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- কাজাখরা মূলত তুর্কি ও মোঙ্গল হানাদারদের বংশীর। শত শত বছর তারা যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চল মোঙ্গলদের অধীনে চলে যায়। ১৭৩০ থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্তরুশদের শাসনাধীনে থাকে। ১৯২০ সালের ২৬ আগষ্ট উরালস্ক, তুরগাই, আকমোলিস্ক ও সেমিপালাতিনস্ক প্রদেশগুলো এর অধীনে কিরগিজ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সোসালিষ্ট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২৫ সালে কিরগিজ নাম পরিবর্তন করে 'কাজাখ' নামকরণ করে। ১৯২০ সালে সোভিয়েত সৈন্য কাজাকস্তান অধিকার করে। ১৯৩৬ সালে কাজাকস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি রিপাবলিকের মর্যাদা পায়।

---

(৬৭) Ibid, V-2, PP.2411 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৪১১-২৪৩১)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০ এর দশকে দলে দলে রাশিয়ানরা কাজাকস্তানে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। কাজাকরা সংখ্যালঘু হয়ে যায়। ১৯৮৬ সালে কাজাকস্তানে রুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নি ভেঙ্গে গেলে এটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।[৬৮] রাজধানী আলমা-আতা (আলমাতি) শিল্পসমৃদ্ধ শহর, লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ। অন্যান্য শহর কারাগান্দা, সেমিপালাতিনস্ক পেত্রোপাভলস্ক।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- খনিজ ও কৃষিজ পণ্যে সমৃদ্ধ দেশ। খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা, তামা, টাঙ্গষ্টন, সীসা, লবন, দস্তা, লোহা, কোবাল্ট নিকেল, ফসফেট, স্বর্ণ ও ক্রোমিয়াম রয়েছে। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে গম, তামাক, রাবার, আলু, আঙ্গর, শাকসবজী ও ফলমুল উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত অর্থনীতি ভেঙে পড়ার পর নিজস্ব অর্থনীতি এখন ও সমপূর্ণ গড়ে ওঠেনি। লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দীর্ঘকাল ভোগ করে এসেছে তা নিয়েও সংঘাত ঘটছে কাজাকদের সঙ্গে। রপ্তানি করে তেল, লোহা ও অন্যান্য ধাতু, রাসায়নিক দানাশস্য, পশম, মাংস। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য। জিডিপি ২৪,৭৯৪ কোটি ডলার এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৭৮০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯৩ সালে প্রনিত সংবিধানটি ১৯৯৫ সালে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গ্রহীত হয়। ১৯৯৮ সালে এর অনেকগুলি সংশোধিত আনা হয়। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য শাসক । তিনি তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভার একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন বিভাগ, সিনেট (উচ্চকক্ষ) এবং মাজলিস (নিম্নকক্ষ) সিনেটের সদস্য ৩৯ এবং মাজলিসের সদস্য ৬৭ জন ডেপুটি। কমিউনিস্ট পার্টি বিলুপ্ত হওয়ার পর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল হলো ডেমোক্রোটিক সোশ্যলিস্ট পার্টি অফ কাজাকস্তান, পিজেন্ট এন্ড সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব কাজাকাস্তান। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

৪.১.১৫. কাতার

কাতারের সাংবিধানিক নাম Dawlat Qatar এর ইংরেজি নাম State of Qatar দেশটির আয়তন- ১১,৪৩৭ বর্গকিমি (৪,৪১৬বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৩০৫১জন। অধিবাসীদের কাতারি বলা হয়। অধিবাসীদের মধ্যে আরব ৪০ শতাংশ, পাকিস্তানী ১৮ শতাংশ, ভারতীয় ১৮ শতাংশ, ইরানিয়ান ১০ শতাংশ, অন্যান্য ১৪ শতাংশ। দেশের নাগরিক কাতারিদের চেয়ে বহিরাগতর সংখ্যা বেশি। বহিরাগতরা সেখানে তেলের খনিতে বা তৎসংলগ্ন বিভিন্ন কোম্পানীতে কাজে নিয়ুক্ত। বহিরাগতদের সঙ্গে কাতারিদের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

---

(৬৮) Ibid, V-2, PP.3498 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩৪৯৮-৩৫০৮)

Dhaka University Institutional Repository

কারণ বহিরাগতদের মতোই কাতারিরা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ৯৫ শতাংশ মুসলিম এবং অন্যান্য ৫ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা আরবি। গড় আয়ু ৭৪.৩ বৎসর। পুরুষ ৭৪.৮ এবং মহিলা ৭৩.৮। রাজধানী দোহা প্রচলিত মুদ্রা- রিয়াল (কিউ এ আর)।

ভৌগোলিক পরিচয়:- কাতার পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। দেশটির উত্তরে পারস্য উপসাগর, পূর্বে সংযুক্ত আরব আমিরাত, পশ্চিমে বাহরাইন ও সৌদি আরব এবং দক্ষিণে সৌদি আরব অবস্থিত।[৬৯] উপসাগরীয় অঞ্চলের মরুময় দেশ। ভূমিসীমান্ত৬০ কিমি দীর্ঘ, ৪০ কিমি সৌদি আরব ও ২০ কিমি সংযুক্ত আমিরাতের (ইউ এ ই) সঙ্গে। পারস্য উপসাগরের তটরেখা ৫৬৩ কিমি দীর্ঘ। শুষ্ক মরুভূমি, গ্রীষ্মকালে বাতাসের আর্দ্রতা অত্যন্তবেশি। মরুময় সমতল জমি কোথাও কর্ষণযোগ্য নয়। কিছু তৃণভূমি ও গোচারণ ক্ষেত্র আছে। পানীয় জল সামান্য, সমুদ্রের পানি লবণমুক্ত করে পান করা হয়। শুধু তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য দেশটি সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- কাতারে জনবসতি অতি প্রাচীন। প্রস্তর যুগে কেনান উপজাতীরা প্রথমে এখানে বসবাস শুরু করে। প্রাচীন আক্কাদ সাম্রাজ্যের রাজা সারগণ খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৩৫ থেকে ২২৭৯ পর্যন্তএ অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের পতাকাতলে এলে কাতার ও ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উনবিংশ শতকে উসমানীয় শাসকদের খেলাফতের আওতাধীনে ছিল। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর কাতার ১৯১৬ সালে বৃটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪০ সালে তেলের সন্ধান মেলে ও' ৬০ সালের মধ্যে কাতার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে ২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী দোহা শিল্পসমৃদ্ধ নগর ও বন্দর। উপসাগরীয় এলাকার সকল দেশের প্রধান ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। লোকসংখ্যা ২,৮৩,০০০। অন্য শহর দুখন তেল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- কাতার বিশ্বের ১৭ তম বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশ। এর রপ্তানির ৯০ শতাংশ এবং রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসে তেল থেকে। কাতারের ভূগর্ভে ৩৩০ কোটি ব্যারেল তেল সঞ্চিত আছে এবং বর্তমান হারে তেল উত্তোলিত হলে পঁচিশ বছরে সঞ্চিত তেল শূন্য হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের রপ্তানি বাড়ছে। কাতার রপ্তানি করে তেল, ইস্পাত, সার। আমদানি করে খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি। জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) আর্থিক মূল্য ৯২০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২০, ৮২০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- দেশটিতে রাজতন্ত্র বহাল রয়েছে। আমীর হলেন দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা ও এক উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে আমির রাজ্যশাসন করেন। কোন রাজনৈতিক দল নেই, নির্বাচন নেই, নাগরিকদের ভোটধিকার নেই।

---

(৬৯) Ibid, V-2, PP.983 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৯৮৩-১০০০)

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১৬. ক্যামেরুন

ক্যামেরুনের সাংবিধানিক নাম Republic Du Cameroun এবং ইংরেজি নাম Republic of Cameroon দেশটির আয়তন- ৪,৭৫,৪৪২ বর্গকিমি (১,৮৩,৫৬৯ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭ শতাংশ। অধিবাসীরা ক্যামেরুনিয়ান নামে পরিচিত। দুই শতাধিক আফ্রিকান উপজাতি নিয়ে ক্যামেরুনিয়ান জাতি। ক্যামেরুন হাইল্যান্ডার ৩১ শতাংশ, ইকুয়েটোরিয়াল বান্টু ১৯ শতাংশ, কির্দি ১১ শতাংশ, ফুলানি ১০ শতাংশ, নর্থ ওয়েস্টার্ন বান্টু ৮ শতাংশ, ইস্টার্ন নিগ্রিটিক ৭শতাংশ, অন্যান্য আফ্রিকান ৭ শতাংশ, ধর্মে প্রকৃতি উপাসক ৫১ শতাংশ, খৃস্টান ৩৩ শতাংশ, মুসলিম ১৩ শতাংশ। স্বাক্ষর ৭২.৪ শতাংশ। গড় আয়ু ৪৮.১ বছর, পুরুষ ৪৭.২ ও নারী ৪৯ বছর। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি ও ফরাসি। স্থানীয় অন্যান্য ভাষার প্রচলন আছে। রাজধানী ইয়াউন্দে,প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঁ সি, এফ, এ।

ভৌগোলিক পরিচয়:- মধ্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত দেশ। পশ্চিমে গিনি উপসাগর ও নাইজেরিয়া, পূর্বে শাঁদ ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, উত্তরে শাদ হ্রদ এবং দক্ষিণে গ্যাবন ও নিরক্ষীয় গিনি অবস্থিত। অন্যভাবে বললে উত্তরে মরুভূমি, পশ্চিমে পাহাড়, মধ্যবর্তী অঞ্চল শুস্ক তৃণভূমি, দক্ষিণে গভীর বনভূমি। পশ্চিম উপকূলে মাউন্ট ক্যামেরুন ১৩,৩৫৮ ফুট উঁচু। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ।

ঐতিহাসকি পরিচয়:- ১৮৮৪ সালে ক্যামেরুন জার্মানির উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনী ১৯১৬ সালে ক্যামেরুন দখল করে। ১৯২২ সালে ক্যামেরুনকে দুভাগ করে বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ ক্যামেরুনের উত্তরাংশ নাইজেরিয়ার সঙ্গে ও অবশিষ্ট ক্যামেরুন ফ্রেঞ্চ ক্যামেরুনে অছি নিযুক্ত করে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন লাভ করে এবং ১৯৬০ সালে ফ্রেঞ্চ ক্যামেরুন স্বাধীন হয়। ১৯৬১ সালে বৃটিশ ক্যামেরুনের উত্তরাংশ নাইজেরিয়ার সঙ্গে ও অবশিষ্ট ক্যামেরুন ফ্রেঞ্চ ক্যামেরুনে মিশে যায়। এ সংযুক্তির মাধ্যমে নতুন দেশের নাম হয় ফেডারেল রিপাবলিক অফ ক্যামেরুন। ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারী দেশটির নাম হয় রিপাবলিক অব ক্যামেরুন। ১৯৬০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী ইয়াউন্দে, লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার। অন্যান্য শহরের মধ্যে প্রধান বন্দর দৌআলা, এনকংসাম্বা, গারোবা।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- বনাঞ্চল ৫৩ ভাগ। ক্যামেরুন বিশ্বের ৫ম কোকো উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির প্রধান খনিজ সম্পদ তেল, এছাড়া বক্সাইট ও ক্রোমাইট রয়েছে। দেশের প্রধান শিল্প অ্যালুমিনিয়াম গলানোর কারখানা। জুতা, বিয়ার, সাবান, তৈল, খনিজ ও কৃষিভিত্তিক কারখানা রয়েছে। মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন (PPP) ৪৬২০ ডলার, মাথাপিছু প্রকৃত দেশজ উৎপাদন (GNP) ৬৭৪৯ ডলার এবং দেশজ উৎপাদন (GDP) ২১৮০ কোটি ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে ১৯৯০ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। মন্ত্রী পরিষদের সহায়তায় তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এককক্ষ বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের নাম ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। দেশটিতে ফরাসি ধাঁচের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। ক্যামেরুন পিপলস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (আর ডি পি সি) একসময় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল। ১৯৯০ সালের পর অনেক নতুন দল জন্ম নিয়েছে। ভোটাধিকার ২০ বছর বয়সে।

৪.১.১৭ কিরঘিজিস্তান

কিরঘিজস্তানের সাংবিধানিক নাম Kyrgyz Respublikasy এবং ইংরেজিতে **Republic of Kurgyzstan** আয়তন ১,৯৯,৯০০ বর্গকিমি (৭৭,১৮২ বর্গমাইল) লোকসংখ্যা ৫১ লক্ষ ৪৬২৬৯ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা 'কিরঘিজ' নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৫২ শতাংশ কিরঘিজ, ২১ শতাংশ রাশিয়ান, ১৩ শতাংশ উজবেক, অন্যান্য ১৪ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ, মুসলমান এবং বাকী ২৫ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলী। গড় আয়ু ৬৪.৫ বছর পুরুষ-৬০.৪ এবং মহিলা ৬৮.৯। সরকারি ভাষা কিরঘিজ, রাশিয়ান ভাষাও রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। শিক্ষার হার ৯৭%। রাজধানী বিশকেক, প্রচলিত মুদ্রা- সোম।[৭০]

ভৌগোলিক পরিচয়:- মধ্য এশিয়ার ভূমিবদ্ধ পর্বতময় দেশ। পূর্ব সীমান্তেচীন, উত্তরে কাজাকস্তান, পশ্চিমে উজবেকিস্তান, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে তাজিকিস্তান। রুক্ষ মাটি, চাষ সামান্য পরিমাণে হয়।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- প্রাচীনকালে কিরগিজিস্তানের অধিবাসীরা টিয়েন সান পবর্তমালায় স্থায়ীভাবে বসবাস করত। পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দীতে তুর্কীরা এখানে বসবাস করে এবং শাসন করে। পরবর্তীতে মোঙ্গল ও চিনারাও এ অঞ্চল শাসন করে। একপর্যায়ে এখানে কাইরিশ অধিবাসীদের অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়। কিন্ত এতে পুরোপুরি সফলতা অর্জন না করায় ১৯১৭-২৪ সালে স্বাধীন তুর্কিস্তানের অংশে পরিণত হয়। ১৯২৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বয়ংশাসিত রিপাবলিকের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৩৬ সালে সোভেয়েত ইউনিয়নের শাসনাধীন রিপাবলিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯১ সালে কিরঘিজিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী বিশকেক, সোভিয়েত আমলে নাম ছিল ফ্রুঞ্জ। এটি শিল্প সমৃদ্ধ শহর, লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ২৫ হাজার। অন্যান্য শহর ওশ, প্রেভালস্ক, ফিজল-কিয়া, তোরমাক।

অর্থনৈতিক পরিচয়:-দরিদ্র দেশ, দুর্বল অর্থনীতি। ছাগল ভেড়া পালন করে অধিকাংশ লোক জীবিকা নির্বাহ করে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। দস্তা, সীসা, সোনা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতিও পাওয়া গেছে। রপ্তানি করে পশম তূলা, তামাক, জুতা, বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ও রাসায়নিক। আমদানি করে শিল্পজাত পণ্য, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র প্রভৃতি। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে তূলা, বীট ও আঙ্গুর। এখনও ৭০ শতাংশ বাণিজ্য রাশিয়ার সঙ্গে। জিডিপি ১৭০ কোটি ডলার এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৩০ ডলার।

---

(৭০) Ibid, V-2, PP.2545 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৫৪৫-২৫৬০)

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে প্রেসিডেন্ট মুখ্য প্রশাসক, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সাহায্যে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ বা সুপ্রিম কাউন্সিল। সদস্য সংখ্যা ১০৫ নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৪৫ এবং উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা ৬০। বর্তমানে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯০ সালের পরে অনেক নতুন দলের সৃষ্টি হয়েছে।

৪.১.১৮. কুয়েত

কুয়েতের সাংবিধানিক নাম Dawlat Al Kuwayt এবং ইংরেজি নাম State of Kuwait দেশটির আয়তন- ১৭,৮১৮ বর্গকিমি (৬,৮৮০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২৩,৩৫৬৪৮ জন। অধিবাসীদের কুয়েতি বলা হয়। ৪১ শতাংশ কুয়েতি, অন্যান্যরা আরব ও আনারব কুয়েতি। তন্মধ্যে ইরানী, ভারতীয় ও পাকিস্তানি বৃহদাংশ অন্যান্য দেশীয় কিছু জনগণ রয়েছে। আরবগোষ্ঠী ৩৫ শতাংশ, দক্ষিণ এশিয়ার লোক ৯ শতাংশ, ইরানিয়ার ৪ শতাংশ, অন্যান ২ শতাংশ। মুসলিম ৮৫ শতাংশ (সুন্নি ৪৫ শতাংশ, শিয়া ৩০ শতাংশ, অন্যান্য বছর। সাক্ষর ৮২.৪ শতাংশ। আয়ু, শিক্ষার হার বিদেশি কর্মপ্রার্থীর সমাগম কুয়েতের সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার উন্নমানের সাক্ষ্য বহন করে। রাষ্ট্রভাষা আররি তবে ইংরেজি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। গড় আয়ু ৭৬.৬ বৎসর। রাজধানী কুয়েত সিটি,প্রচলিত মুদ্রা- কুয়েতি দিনার। এক কুয়েতি দিনার প্রায় চার মার্কিন ডলারের সমান।[৭১]

ভৌগোলিক পরিচয়:- কুয়েত দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ, দেশটির পূর্বে পারস্য উপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে ইরাক, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে স্ৌদী আরব। দেশটির ভৌগালিক এ অবস্থান অত্যান্তগুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়-এর গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমে ইরাক (সীমান্ত২৪০ কিমি), দক্ষিণে স্ৌদি আরব (২২২ কিমি), পূর্বে উপসাগর। উপসাগরের ফাইলাকা, বুবিয়ান ও ওয়ার্বা দ্বীপ কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভূর্ক্ত। দেশে কোনো নদী নেই, বৃষ্টিপাত সামান্য। সমুদ্রের পানি লবণমুক্ত করে পান করা হয়। শুধু তেল সম্পদের জন্য কুয়েত বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্র।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- কুয়েতের ইতিহাস অতি প্রাচীন নয়। সাধারণত মনে করা হয় 'আনাজা' গোত্র গুলোর খাবাহ গোত্র এ স্থানে বাসতি স্থাপন করে আত্মরক্ষার জন্য একটি 'কুত' বা দুর্গ গড়ে তুলে এবং এ থেকেই কুয়েত নামের উৎপত্তি। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৭৯ সাল পর্যন্তঅবরোধের পর পারস্য বসরা দখল করলে বাগদাদ, আলোপ্পো, স্পার্না ও কনসট্যান্টিনোপলের সাথে ভারতের বাণিজ্য বসরার পরিবর্তে কুয়েতের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এ সময় কুয়েত অন্যতম বন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৭২]

---

(৭১) Ibid, V-2, PP.2524 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৫২৪-২৫৪২)
(৭২) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬১

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতকে কুয়েত ওসমানী সাম্রাজ্যের শাসনাধীন হয় এবং কিছুদিন পর শাসয়ত্ব শাসন লাভ করে স্থানীয় শাসক ১৮৯৯ সালে শেখ মুবারক যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, এতে কুয়েত বৃটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৩০ সালে কুয়েতে তেলের সন্ধান মেলে এবং জানা যায় যে পৃথিবীর মোট সঞ্চিত তেলের ২০ শতাংশ আছে ক্ষুদ্র কুয়েত রাজ্যে।

১৯৬১ সালের ১৯ জুন এক চুক্তির ফলে কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করে। এ সময় ইরাকী শাসক করিম কাশেম ইরাককে কুয়েতের অংশ বলে দাবি করে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটান। ১৯৪৬ সাল থেকে কুয়েত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল উৎপাদন করতে থাকলে ইরাকের এ দাবী আরো জোরালো হলেও বিশ্বের অপরাপর দেশ তাতে বাধ সাধে।

সে কারণে কুয়েত নিজের নিরাপত্তার জন্য বৃটেনের সাহায্য চাইলে বৃটেন আবার সৈন্য পাঠায়। পরে আবরলিগের সদস্য দেশগুলি কুয়েতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে ও বৃটেনের সৈন্যের বদলে তাদের সৈন্য পাঠায়। ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত দখল করে ও কুয়েতের রাজা দেশত্যাগ করে সৌদি আরবে আশ্রয় নেন। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্সের নেতৃত্বে উনিশটি দেশ মিলিতভাবে আক্রমণ করে কুয়েতকে ইরাকের দখলমুক্ত করে।

১৯৬৩ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী কুয়েত সিটি, রাজ্যের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত বন্দর ও কর্মব্যস্ত শহর। লোকসংখ্যা ৫৩ হাজার। পার্শ্ববর্তী হাওয়ালি, জাহরা আসসালিমিয়া প্রভৃতি শহরগুলি রাজধানী কুয়েত-এর শহরতলী ধরা হয়। ওইসব শহরে প্রায় পাঁচলক্ষ লোকের বাস।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- সঞ্চিত তেলের পরিমাণে কুয়েত বিশ্বের তৃতীয় স্থানাধিকারী দেশ, সৌদি আরব ও ইরাকের পরেই দেশটির অবস্থান। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া উপসাগরের মাছ ও চিংড়ি তার প্রাকৃতিক সম্পদ। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে তরমুজ, টমেটো, পিয়াজ, খেজুর-মুলা ইত্যাদি। রপ্তানির ৯০ শতাংশ তেল। আমদানি করে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, মোটরকার ও যন্ত্রাংশ। পানীয় জলের ৭৫ শতাংশ সমুদ্রে লবণমুক্ত অথবা আমদানি করা পানি। তবু কুয়েত বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। তার বাৎসরিক উৎপাদনের অর্থমূল্য (জিডিপি) ২৫২০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৬,৩৪০ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- দেশটিতে নিয়ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে আমির, প্রধানমন্ত্রী, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসনদায়িত্ব। আইন প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদ। কোনো রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি নেই। ভোটাধিকার সীমিত। ১৯২০ সালের আগে যারা কুয়েতে বাস করতেন সেইসব পুরুষ ও তাদের ২১ উত্তীর্ণ বংশধররা ভোটের অধিকারী। ৫০ সদস্য বিশিষ্ট মজলিস আল ওলামা নামে জাতীয় সংসদ রয়েছে। চার বছরের জন্য তারা নির্বাচিত হন। ৬৯ শতাংশ নারী শিক্ষিত ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কুয়েতের সংবিধান গণতান্ত্রিক হলেও শেখের ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত এবং সাবাহ বংশের সদস্যবৃন্দ বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী।

৪.১.১৯. গ্যাবোন

গ্যাবনের সাংবিধানিক নাম Republique Gabonaise এবং ইংরেজি নাম Gabonese Republic দেশটির আয়তন- ২,৬৭,৬৬৭ বর্গকিমি (১,০৩,৩৪৭ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ ৯৪৩০৭ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা গ্যাবেনিজ নামে পরিচিত। অধিবাসীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ কাঙ্গ (Fang), ২৫ শতাংশ ইশিবা (Eshira), ১০ শতাংশ বাটেক (Bateke), এবং বাপওনউ (Bapou-Nou), অন্যান্যরা ইউরোপ ও আফ্রিকার বংশোদ্ভুত গ্যাবনিজ।। অধিবাসীদের ৬০ শতাংশ খৃষ্টান, ১ শতাংশ মুসলিম, অন্যরা সনাতন ধর্মী। সাক্ষর ৭১.০ শতাংশ। সরকারি ভাষা ফরাসি, কিন্ত ফ্যাবঙ্গ (উত্তরে) ও বাস্টু (দক্ষিণে ব্যাপকবাবে উপজাতীয় ভাষা প্রচলিত। গড় আয়ু ৫৬.৬ বৎসর। রাজধানী লিবরেভিল, প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঁ।[৭৩]

ভৌগোলিক পরিচয়:- মধ্য আফ্রিকার পূর্বদিকে, আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত দেশ। দেশটির পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে ইকুয়েটারিয়াল গিনি ও ক্যামেরুন, পূর্বে কঙ্গো অবস্থিত। একদা সারা দেশ ছিল বিষুব বনভূমি। তটভূমি সংকীর্ণ ও সমতল। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে মধ্য অঞ্চলের পাহাড়ে মিশেছে। পূর্ব ও দক্ষিণে তৃণভূমি। দেশের মাত্র ১ শতাংশ বনভূমি।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৮৮৯ সালে ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হয়, ১৯৫৯ সাল পর্যন্তফ্রান্সের দখলে থাকার পর ১৭ আগস্ট ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয়। ১৯৬৮ সালে একদলীয় শাসন কায়েম হয়। ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্ট বঙ্গো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, নাম হয় ওমর বঙ্গো। ১৯৯০ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী লিবরেভিল, গ্যাবোন নদীর মেহনায় অবস্থিত শহর। কাঠ, তেল, ও ধাতব পদার্থের বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা চার লক্ষ ৩৭ হাজার। অন্যান্য শহর পোর্ট-জেন্টিল, মাসুকু।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে চিনিকল, খাদ্য ও খনিজ পদার্থ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান। রপ্তানি ৭০ শতাংশ তেল, ১১ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ, বনজ সম্পদ ১২ শতাংশ, ইউরেনিয়াম ৬ শতাংশ। এছাড়া সোনা, লোহা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। আমদানি করে খাদ্য, রাসায়নিক, পরিশোধিত তেল প্রভৃতি। মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির ভাগ ১০ শতাংশ (মাছ ও বন সহ)। কোকো, কফি, পাম অয়েল প্রভৃতির চাষ হয়। গবাদি পশুপালন যথেষ্ট উন্নত হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন ৪৩০ কোটি ডলার। মাথাপিছু আয় ৫৯৯০ ডলার।

---

৭৩. *Europa (2004)*, Ibid, PP.1776 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১৭৭৬-১৭৯১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা শাসনকাজে প্রেসিডেন্টের সহায়ক। প্রেসিডেন্ট পাঁচ বছরের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি-র সদস্য সংখ্যা ১২০। প্রধান রাজনৈতিক দল গ্যাবেনিজ ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিজি) ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশের একমাত্র দল ছিল। বর্তমানে অন্য দলগুলির মধ্যে আছে, ন্যাশনাল রিকভারি মুভমেন্ট, অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যালিজম ইন গ্যাবোন (এপিএসজি), ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রসি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউ ডি ডি) ইত্যাদি।

৪.১.২০. গাম্বিয়া

গাম্বিয়ার সাংবিধানিক নাম Republic of The Gambia দেশটির আয়তন ১১,২৯৫ বর্গকিমি (৪,৩৬১ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ ৬৪৫০৭ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ। অধিবাসীরা গাম্বিয়ান নামে পরিচিত। বিভিন্ন আফ্রিকান উপজাতির বসবাস দেশটিতে। অধিবাসীদের ৪০ শতাংশ ম্যানডিংকা (Mandingka), ১৯ শতাংশ ফুলা (Fula), ১৫ শতাংশ ওলো (Wolof), ১০ শতাংশ ডিয়োলো (Dyolo), এবং ৮ শতাংশ সোনিক (Sonike)। ৮০ শতাংশ মুসলিম, ১০ শতাংশ খৃস্টান অন্যারা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। সাক্ষর ৩৯ শতাংশ। গড় আয়ু- ৫৪.১ বছর। সরকারি ভাষা ইংরেজি, বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষা ও প্রচলিত। রাজধানী বানজুল, [৭৪] প্রচলিত মুদ্রা- দালাসি।

ভৌগোলিক পরিচয়:- আফ্রিকার মহাদেশের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র গাম্বিয়া। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সেনেগালের মধ্যে, গাম্বিয়া নদীর দুইতীরে অবস্থিত দেশ। গাম্বিয়া নদী আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পড়েছে। গাম্বিয়া কোথাও ৩৩ কিমি এর বেশি প্রশস্ত নয়। গাম্বিয়ার তিন দিকে সেনেগাল, এক দিকে আটলান্টিক মহাসাগর।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- পর্তুগীজ নৌ অভিযাত্রীরা গাম্বিয়া আবিস্কার করে কিন্ত তারা সেখানে বসতি স্থাপন করেনি। ক্রীতদাস সংগ্রহের উদ্দেশ্য ইংরেজ নাবিক ও বণিকরা সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে এসে ঘাটি গাড়ে। ১৮৪৩ সালে গাম্বিয়া ইংরেজদের স্বাধীন রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে উপনিবেশ হয়। স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬৫ সালে। ১৯৭০ সালে গাম্বিয়া নিজেকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করে। ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী বানজুল, গাম্বিয়ার প্রধান শহর ও বন্দর। গাম্বিয়া নদীর মোহানায় এক ছোট দ্বীপে অবস্থিতি, লোকসংখ্যা ৪৫ হাজার। অন্যান্য শহর সেরেকুন্তা, বাকাউ, জর্জটাউন।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- গাম্বিয়ায় গোমেদ, ইলাম নাইট ও রুটাইল খনিজ পদার্থ বা প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। দেশের ৭৫ শতাংশ লোক কৃষি ও পশুপালনের কাজে নিযুক্ত। রপ্তানি ৭৫ শতাংশ বাদাম। খাদ্যের এক-তৃতীয়াশ, জ্বালানির সবটুকু ও যাবতীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হয়। পর্যটন বৃহৎ শিল্প হয়ে উঠেছে। জি ডি পি ২১ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২০৫০ ডলার।

---

৭৪. গাম্বিয়ার রাজধানী বানজুল ঔপনিবেশিক যুগে 'বেথারস্ট' নামে পরিচিতি ছিল। গাম্বিয়ার নদীর মোহনায় সেন্ট মেরী দ্বীপে রাজধানী অবস্থিত। বর্তমান রাজধানীর নাম 'বানজুল'।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- গাম্বিয়ায় সংবিধান নারী শিশু ও বিশেষ ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ করে। দেশটিতে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। তাঁকে সহায়তা করেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভা। পালামেন্ট গঠিত হয় ৪৮ জন সরাসরি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি, ৫ জন প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি এবং সরাসরি নির্বাচিত স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে নিয়ে। প্রধান রাজনৈতিক দল পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি, পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি। ভোটাধিকার ২১ বছর বয়সে।[৭৫]

৪.১.২১. গায়ানা

গায়ানার সাংবিধানিক নাম Co- operative Republic of Guyana দেশটির আয়তন- ২,১৪,৯৬৯ বর্গকিমি (৮৩০০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ ৫৮৬১৯ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা গায়ানিজ নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে ৫১ শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কৃষ্ণাঙ্গ ও সংমিশ্রিত ৪৩ শতাংশ, তন্মধ্যে আফ্রিকান বংশোদ্ভুত ৪১ শতাংশ পর্তুগীজ ও চায়না ২ শতাংশ, আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান ৬ শতাংশ, শ্বেতাঙ্গ ও চীনা ২ শতাংশ। ৫০ শতাংশ খৃস্টান, হিন্দু ৩৩ শতাংশ, মুসলিম ১০ শতাংশ, অন্যান্য ৭ শতাংশ। সাক্ষর ৯৯ শতাংশ। গড় আয়ু- ৬৪.৩ বছর পুরুষ ৬১.৯ এবং মহিলা ৬৬.৫। সরকারি ভাষা ইংরেজি, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষা ও প্রচলিত। রাজধানী জর্জটাউন প্রচলিত মুদ্রা- ডলার।

ভৌগোলিক পরিচয়:- দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তেঅবস্থিত দেশ। দেশটির উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর পশ্চিমে ভেনিজুয়েলা ও ব্রাজিল, দক্ষিণে ব্রাজিল এবং পূর্বে সুরিনাম। উপকূল এলাকা সমতল, দক্ষিণে ধীরে ধীরে উঁচু পর্বতে মিশেছে। বিশাল বনভূমি, সমতল এলাকায় তৃণভূমি।[৭৬]

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৪৯৮ সালে কলম্বাস দেশটি আবিস্কার করেন। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ গড়ে তুলে। ১৮১৪ সালে বৃটেনের উপনিবেশ হয়, তখন নাম ছিল বৃটিশ গায়ানা। বৃটিশ সাম্রাজ্যে ১৮১৪ সালে বৃটেনের ক্রীতদাস প্রথার অবসান হলে আখ চাষের জন্য শ্রমিকের অভাব হয় এ সময় ভারত থেকে আখ চাষীদের নিয়ে যাওয়া হয় সেদেশে, তারাই এখন গায়ানার লোকসংখ্যার ৫১ শতাংশ। স্বাধীন গায়ানার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডাঃ ছেদ্দি জগন। ১৯৬৬ সালে গায়ানা স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৭০ সালে কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়। ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী জর্জটাউন প্রধান শহর ও বন্দর। ক্যারিবীয় সাগরের দক্ষিণ উপকূলে ডেমেরারা নদীর মোহনায় অবস্থিত জর্জটাউন শহরের লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ। অন্যান্য শহর নিউ অ্যামস-টারডম, মাবারুমা।

---

৭৫. *Europa (2004)*, Ibid, PP.1792 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১৭৯২-১৮০৪)
৭৬. Ibid, PP.1978 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১৯৭৮-১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- খনিজ সম্পদ ও উর্বর মাটিতে সমৃদ্ধ দেশ। গায়ানার প্রধান খনিজ সম্পদ বক্সাইট, কিছু পরিমাণ সোনাও পাওয়া যায়। তবে কৃষি প্রধান জীবিকা। আখ ও ধানের চাষ হয়, চাল, চিনি, গুড়, রাম, চিংড়ি ও বনজ সম্পদ রপ্তানি হয়। আমদানি করতে হয় তেল, ভোগ্যপণ্য, যন্ত্রপানি। মোট জাতীয় উৎপাদনের (জি ডি পি) অর্থমূল্য ৭৫ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৭৮০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধান। তিনি পাঁচ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী মুখ্য প্রশাসক। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী। জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমবি-র সদস্য সংখ্যা ৬৫। প্রধান রাজনৈতিক দল পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি (পিপিপি), পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস (পিএনসি), ওয়ার্কিং পিপলস অ্যালয়েন্স (ডব্লিউ পি এ) প্রভৃতি।

৪.১.২২. গিনি

গিনির সাংবিধানিক নাম Republique De Guinee এর ইংরেজি নাম Republic of Guinea দেশটির আয়তন- ২,৪৫৮৫৭ বর্গকিমি (৯৪,৯২৬) বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৮৫ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা গিনিয়ান নামে পরিতিত। অধিবাসীদের ফুলানি Fulani ৪০ শতাংশ, মালিনকে Malinka ২৫ শতাংশ, সউসউ Soussou ১ শতাংশ, Kissi ৬ শতাংশ, Kpelle ৫ শতাংশ অন্যান্য আফ্রিকান উপজাতি ১৩ শতাংশ। ৮৫ শতাংশ মুসলিম, ৮ শতাংশ খৃষ্টান, সনাতনধর্মী ৭ শতাংশ। স্বাক্ষর ৩৯.৬ শতাংশ। গড় আয়ু- ৪৫.৩ বছর। সরকারি ভাষা ফরাসি। তবে বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষা ও প্রচলিত। রাজধানী কোনাক্রি (Conakry), প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঁ (সি এফ এ)।

ভৌগোলিক পরিচয়:- দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ। সমতল উপকূল ক্রমে উঁচু হয়ে অভ্যন্তড়রস্থ পার্বত্য অঞ্চলে মিশেছে। নাইজার, গাম্বিয়া ও সেনেগাল নদী শুরু হয়েছে গিনির পার্বত্য অঞ্চল থেকে। দেশটির উত্তরে পশ্চিমে গিনি বিসাউ ও সেনেগাল, উত্তর-পূর্বে সালি, দক্ষিণ-পূর্বে আইভরি কোষ্ট, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। দেশের ৪২ শতাংশ স্থান বনভূমি।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৯৮২ সালে গিনি ফরাসির আশ্রিত রাজ্যে এবং ১৮৯৩ সালে উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯০৪ সালে ফরাসির একটি সাংবিধানিক অঞ্চলের মর্যাদা পায়। ১৯৫৮ সালে ২ অক্টোবর সেকুতুরের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৮৪ সালে তুরের মৃত্যু হলে সামরিক অভুত্থান ঘটে। ১৯৯০ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী কোনাক্রি প্রধান শহর ও বন্দর। আটলান্টিক মহাসাগেরর উপকূলে, মূল ভূখন্ড সংগগ্ন তুম্বো দ্বীপে শহরটি অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষর কিছু বেশি। অন্যান্য শহর লাবে, এনজেরেকার, কঙ্কন।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- গিনি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। বক্সাইট, লোহা , হীরা, সোনা, ইউরেনিয়ামের সন্ধান মিলেছে। জলবিদ্যুতেরও বিপুল সম্ভাবনা। তবু কৃষি প্রধান জীবিকা, মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ কৃষি থেকে আসে আর ৮০ শতাংশ লোক কৃষিকাজে নিযুক্ত। কৃষি পণ্যের মধ্যে রয়েছে ধান, আখ, কলা, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, ভুট্টা, পামঅয়েল, আনারাস, কফি, নারিকেল প্রভৃতি। সারা পৃথিবীর সঞ্চিত বক্সাইটের ২৫ শতাংশ আছে গিনির মাটির তালায় আর তার রপ্তানির ৩০ শতাংশ বক্সাইট। অন্যান্য রপ্তানির মধ্যে আছে হীরা, কপি আনারস, কলা, পাম কারনেল। আমদানি করে তেল, ধাতব পদার্থ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন সরঞ্জাম, খাদ্যশস্য, টেক্সাটাইল। মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) অর্থমূল্য ৩০০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯৬০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯১ সালে দেশে তৃতীয় বারের মত সংবিধান গৃহীত হয় রেফাভেদের মাধ্যমে। দেশটিতে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। তিনি ৭ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ফরাসি ধাঁচের শাসনব্যবস্থা। প্রেসিডেন্টকে দায়িত্ব নির্বাহে সহযোগিতা করতে মন্ত্রিসভা আছে। ১১৪ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ পিপলস ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি রয়েছে। দেশটিতে বহুদলীয় গণতন্ত্র সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত রয়েছে।[৭৭]

৪.১.২৩. গিনি- বিসাউ

গিনি- বিসাউর সাংবিধানিক নাম Republica Da of Guinea Bissau এর ইংরেজি নাম Republic of Guinea Bissau দেশটির আয়তন- ৩৬,১২৫ বর্গকিমি (১৩,৯৪৮ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৪৯০০০ জন।[৭৮] জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ। জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ ব্যালাণ্টে (Balarta), ২০ শতাংশ ফুলানি (Fulan), ১৪ শতাংশ মানজাকা (Mandjak), ১৩ শতাংশ মান্ডিগো (Mandinka), ১০ শতাংশ পোপেন (Pepel), বাকী ১৩ শতাংশ অন্যান্য আদিবাসি।[৭৯] অধিবাসীরা 'গিনি-বিসাউন নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৩০ শতাংশ বালান্তড়, ২০ শতাংশ ফুলানি, ১৪ শতাংশ মানজাকা, ১৩ শতাংশ মানদিঙ্গা। শ্বেতাঙ্গ ও সংমিশ্রিত লোকের সংখ্যা ১ শতাংশ। ৫ শতাংশ প্রকৃতি উপাসক, ৮৫ শতাংশ মুসলিম, ১০ শতাংশ খৃষ্টান। সাক্ষর ৫৫ শতাংশ। সরকারি ভাষা পর্তুগিজ, ১৯টি আফ্রিকান ভাষার প্রচলন রয়েছে তন্মধ্যে ব্যাসোন্টে বহুল প্রচলিত। রাজধানী বিসাউ।[৮০]

---

৭৭. Ibid, PP.1949 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১৯৪৯-১৯৬৪)

৭৮. ২০০২ সালের জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯১ সালের গিনি বিসাউ আদমশুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৬৭ জন। জাতিসংঘের ২০০২ সালের হিসাব যথাযথ হলে ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত১০ বছরের জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ/এভাবে প্রয়োজনে দেখা যাবে ২০১১ সালে জনসংখ্যা হবে প্রায় ২০ লক্ষ। তবে এ হিসাব সম্পূর্ণরুপে অনুমান নির্ভর (বিস্তারিত UN: World Population Porspects; Renision 2002)

৭৯. *Europa (2004)*, Ibid, V-I , PP.1955 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১৯৫৫-১৯৭৭)

৮০. Ibid, V-I; PP.1965 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১৯৬৫-১৯৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক পরিচয়- পশ্চিম আফ্রিকায় দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলের দেশ। উত্তরে সেনেগাল, পূর্ব ও দক্ষিণে গিনি, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। উপকূল অঞ্চল সমতল, ক্রমে উঁচু মালভূমিতে মিশেছে। পশ্চিম উপকূলে 'আর্কিপেলাগো অফ বিজাগোজ' নামে অনেকগুলি দ্বীপ গিনি-বিসাউ-এর রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে রয়েছে।

ঐতিহাসিক পরিচয়- পর্তুগিজ অভিযাত্রী নুনো ত্রিস্তভ্রও ১৪৪৬ খৃ গিনি-বিসাউতে অবতরণ করেন। চার শ' বছরের বেশি পর্তুগিজ উপনিবেশ থাকার পর ১৯৫১ সালে গিনি বিসাউ পর্তুগালের একটি বিদেশী প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্তওপনিবেশ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ২৪ সেপ্টেম্বরের ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৪ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৯২ সাল থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী বিসাউ, জেবা নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত শহর ও দেশের প্রধান বন্দর। লোকসংখ্যা দেড় লক্ষ। অন্যান্য শহর মানোসা, সাও দোমিনগোও।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশটির জমি উর্বর, খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। কৃষি প্রধান দেশ, দেশের ৯০ শতাংশ লোক কৃষিকাজে নিযুক্ত। মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬২ শতাংশ কৃষিজ পণ্য, শিল্প ১২.৭% রপ্তানি সবটাই কৃষিপণ্য নির্ভর। কিন্ত খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। বনভূমি, মাছের চাষ যথেষ্ট উন্নত নয়। রপ্তানি করে কাজুবাদাম, চীনাবাদাম, তালশাঁস, মাছ। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, আধা তৈরি, খাদ্যশস্য ও পেট্রোলিয়াম। মোট জাতীয় উৎপদানের আর্থিক মূল্য ২০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৬০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৮৪ সালের গৃহীত সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধিত হয় ১৯৯৯ সালে।উক্ত সংবিধান অনুযায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধামন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের সহযোগিতায় প্রেসিডেন্ট দেশ শাসন করেন। দেশটিতে 'আফ্রিকান পার্টি ফর দি ইন্ডিপেন্ডেস অফ গিনি-বিসাউ অ্যান্ড তেপ ভার্দে' (পিএআইজিসি) ১৯৯৩ সাল পর্যন্তদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল। ওই বছরেই বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। এককক্ষ জাতীয় সংসদ ন্যাশনা পিপলস অ্যাসেমবি- সদস্য সংখ্যা ১৫০। ভোটাধিকার ১৫ বছর বয়সে।

৪.১.২৪. জর্দান

জর্দানের সাংবিধানিক নাম Al Mamlakah Al Urduniyah Al Hashimiyah এবং ইংরেজি নাম Hashemite Kingdom of Jordan হাশেমীয় জর্দান রাজ্য। দেশটির আয়তন- ৯১,৮৮০ বর্গকিমি (৩৪,৪৩৪ বর্গমাইল)। জর্দান নদীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থান পশ্চিমতীর, আয়তন ৫,৮৭৯ বর্গ কিমি (২,২৬৯ বর্গমাইল) জর্দান রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইজরাইলের দখলে আছে। লোকসংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৫৯৭৩২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ। বিচ্ছিন্ন পশ্চিমতীরে লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ। প্রত্যাশিত আয়ু ৭১.০ বছর। মুসলিম ৯২ শতাংশ (সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

সুন্নি) খৃষ্টান ৮ শতাংশ। সাক্ষর ৯০.৩ শতাংশ। জর্দানের অধিবাসী জর্দানিয়ার নামে পরিচিত। জর্দানের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু। রাষ্ট্রভাষা আরবি, তবে ইংরেজি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রাজধানী আম্মান,প্রচলিত মুদ্রা দিনার।[৮১]

ভৌগোলিক পরিচয়:- পশ্চিম এশিয়ার আরব উপদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত দেশ। দেশটি জর্দান নদীর {নাহরুল উর্দুন} উভয় তীরে অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলে প্রায় সবটাই মরুভূমি। কর্ষনযোগ্য জমি মাত্র ৪ শতাংশ। স্বাভাবিক পানির উৎসের অভাব রয়েছে। বনভূমি উৎখাত ও অত্যাধিক গোচারণের ফলে নিস্ফলা জমির এলাকা বাড়ছে। জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয়।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- প্রাচীন সভ্যতার দেশ জর্দান। ১৯৪৬ সালে বৃটেনের অধীনে মুক্ত হয়। তখন নাম ছিল ট্রান্স জর্দান। ১৯৪৯ সালে জর্দান নিজেকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে, নাম হয় জর্দান। ১৯৫০ সালে পশ্চিম তীর জর্দানের দখলে আসে। ইসরাইলের সাথে জর্দানের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্তরয়েছে। এ সীমান্তরক্ষা করার মত প্রয়োজনীয় শক্তি জর্দানের নেই। ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইহুদীরা জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের সমগ্র এলাকা {২৭৭০ বর্গমাইল} জর্দানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। একই যুদ্ধে ইহুদীরা সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান ,মালভূমি, {৪৫৮ বর্গমাইল} দখল করে নেয়। গোলান দখল করতে অবশ্য ইসরাইলকে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। বরং সিরীয় বাহিনীই এটাকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়। আর এই তুলে দেয়ার কাজটি করেছেন সেদিনের দেশ রক্ষা মন্ত্রী এবং আজকের প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ। হুলে উপত্যকায় দাঁড়িয়ে ইসরাইলী সৈন্যরা যখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গোলান মালভূমিতে সাজানো সিরিয়ার দূরপাল্লার কামানগুলো দেখছিলো, ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে সিরীয় বাহিনীকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ইসরাইলী হানাদাররা গোলানে পৌছার ২৪ ঘন্টা পূর্বেই দামেশক বেতার থেকে গোলান মালভূমির পতনের কথা প্রচার করা হয়। এ যুদ্ধে চরম ভাবে পরাজিত হয়ে জর্দান শক্তিহীন ও নীরব হয়ে গেছে।[৮২] ১৯৬৭ সালে ইজরাইলের অধিকারে যায়।

১৯৭৬ সালে জর্দানের জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়, নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। ১৯৯১ সালে রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৯২ সালে নতুন করে রাজনৈতিক দলগুলিকে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হয়। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী আম্মান জর্দানের প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ। অন্যান্য শহর, জরকা, আরবিদ ও দেশের একমাত্র বন্দর আকাবা।

---

(৮১) Ibid, V-2; PP.2372 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৩৭২-২৩৯৪)
(৮২) মুহাম্মদ মুসা; সিরিয়া-লেবানন, জর্দান; *ইফা পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩৬-৮৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- প্রাকৃতিক সম্পদ সামান্য, আরব দেশ হলেও তেল নেই। আরব দেশগুলির সাহায্য ও তেলের যোগান জর্দানের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। তবে দেশটিতে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে এখনও উত্তোলন শুরু হয় নি। দেশের লোকেরা যে অন্যসব আরব দেশে তেলের খনিতে কাজ করে টাকা পাঠায় সেটাই বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস। রপ্তানি করে ফসফেট, সার, পটাশ, কৃষিপণ্য। আমদানি করে, তেল যন্ত্রপাতি, পরিবহন সরঞ্জাম, খাদ্য পশু ও ভোগ্যপণ্য। মোট জাতীয় উৎপাদন ৩৬০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৮৫০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে রাজতন্ত্র। রাজাই প্রধান শাসাক তবে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সহযোগিতায় শাসনকার্য চালান। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ। উচ্চকক্ষর সদস্যরা বাদশাহ কর্তৃক মনোনীত। সিনেটের সদস্য-সংখ্যা ত্রিশ। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৮০। ১৮বছর বা তদুর্ধ বয়সের লোকদের ভোটে তাঁরা চার বছর মিয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে মুসলিম ব্রাহারহুড জয়ী হয়। ভোটাধিকার ২০ বছর বয়সে। নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত। জর্দান আটটি মুহাফাজায় বিভক্ত।

৪.১.২৫. জিবুতি

জিবুতির সাংবিধানিক নাম Jumhouriyya Djibout এবং ইংরেজি নাম Republic of Djibouti দেশটির আয়তন- ২৩,২০০ বর্গকিমি (৮,৯৫৫ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৯৩০০০ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭ শতাংশ। অধিবাসীরা প্রধানত দুটি নৃ-গোষ্টির অন্তর্ভুক্ত। ১টি ইসা (Issa) সোমালিয় বংশোদ্ভুত ৫০ শতাংশ অন্যটি অফার (Afar) ইথোওপিয়া বংশোদ্ভুত ৪০ শতাংশ এ উভয় গোষ্টি মুসলিম, অন্যরা ১০ শতাংশ। অধিবাসীরা জিবুতিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৬০ শতাংশ সোমালি, আফার ৩৫ শতাংশ, অবশিষ্ট ৫ শতাংশ ফরাসি, আরব, ইথিয়পিয়ান, ইতালিয়ান। ৯৪ শতাংশ মুসলিম, ৬ শতাংশ খৃস্টান। স্বাক্ষর ৬৫.৫ শতাংশ। গড় আয়ু ৪৫.৭ বছর। ফরাসি ও আরবি সরকারি ভাষা; সোমালি ও অপর আরবী অন্যান্য স্থানীয় ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রাজধানী জিবুতি,প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঙ্ক।[৮৩]

ভৌগোলিক পরিচয়:- আফ্রিকার উত্তরপূর্ব কোণে এডেন উপসাগর ও লোহিত সাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত দেশ। দক্ষিণ পূর্বে সোমালিয়া এবং বাকি অংশ জুড়ে ইথিওপিয়া। ক্ষুদ্র দেশটির অধিকাংশ প্রস্তরময় মরুভূমি, মাঝে মাঝে উপত্যকা ও মালভূমি। দেশটিতে সারা বছর প্রচন্ড গরম থাকে।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- জিবুতি এক সময় ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য ছিল পরে উপনিবেশে রুপান্তর্ড়রিত হয়। ১৮৮৬ সালে সম্পূরূপে ফ্রান্সের অধিকারে আসে। স্বাধীনতার আগে নাম ছিল ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যান্ড। ফরাসি শাসনকালে জিবুতি বন্দর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে দেশটি রাজধানীর নাম অনুসারে জিবুতি নামে পরিচিত হয়। ১৯৭৯ সালে দেশের সব রাজনৈতিক দল এক হয়ে পিপলস প্রগ্রেস

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাসেমব্লি (আরপিপি) নাম নেয়। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘেরর সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী জিবুতি প্রধান বন্দর, লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ। অন্যান্য শহর তাজুরা ওবক, দিখিল।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- শুধুমাত্র জিবুতি বন্দরের ওপর দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। উত্তর পূর্বে আফ্রিকার একমাত্র মুক্ত বন্দর। সুয়েজ খাল এবং আরব সাগার দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের জ্বালানি নেওয়ার কেন্দ্র হিসাবে জিবুতি গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর্মহীন লোকের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের অর্ধেক লোক পশুপালক ও যাযাবর। বৃষ্টিপাত সামান্য হওয়ায় ফসল সামান্যই ফলে। একমাত্র কৃষিজাত পণ্য হচ্ছে টমেটো। দেশটির খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে জিপসাম, সালফার মাইকা ইত্যাদি। রপ্তানি করে পশুর চামড়া,কফি,শাকসবজি। আমদানি করে খাদ্য,পরিবহন সরঞ্জাম, রাসায়নিক, তেল। মোট জাতীয় উৎপাদন ৩৪ কোটি ডলার, মাথাপিছু, বার্ষিক আয় ২৩৭০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-১৯৯২ সালে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। দেশটিতে ফরাসি ধাঁচের প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট প্রধান ও মুখ্য প্রশাসক, তিনি ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁকে সহায়তা করেন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা। জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি, সদস্য সংখ্যা ৬৫ তারা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন । দেশে অনেক রাজনৈতিক দল রয়েছে তন্মধ্যে প্রধানতম রাজনৈতিক দল আরপিপি।

৪.১.২৬. টোগো

টোগোর সাংবিধানিক নাম **Republique Togolaise** এবং ইংরেজি নাম **Republic of Togo** দেশটির আয়তন-৫৬,৭৮৫ বর্গকিমি (২১,৯২৫ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ৫৪ লক্ষ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা টেগোলিজ নামে পরিচিত। মোট সাঁয়ত্রিশটি আফ্রিকান উপজাতি বাস করে, যার মধ্যে প্রধান মিনা Mina, কাবেয়ি Kabiye, ইউই Ewe। ১ শতাংশ কম ইউরোপিয় এবং সিরিয়া-লেবাননের লোকের বাস। প্রায় ৫০ শতাংশ আদিম ধর্মে বিশ্বাসী, ৩৫ শতাংশ খৃস্টান, ১৫ শতাংশ মুসলমান। গড় আয়ু ৪৯.৭ বছর। সাক্ষর ৫৮.৪ শতাংশ। সরকারি ভাষা ফরাসি। ক্যাবেয়ি ও ইউই অফিস ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ চলে ফরাসি ভাষায়। স্থানীয় ভাষার মধ্যে ইউই ও মিনা চলে দক্ষিণ অংশে, উত্তরে চলে দাগোম্বা, কাবেয়ি ভাষা। রাজধানী লোম,প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঁসিএফএ।[৮৪]

---

(৮৩) *Europa (2004)*, ibid, V-I, PP.1459 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১৪৫৯-১৪৬৭)
(৮৪) Ibid, V-2, PP.4156 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪১৫৬-৪১৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৮৯৪ সালের জুলাই থেকে জার্মানির আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় এবং উপনিবেশ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর বৃটেন ও ফ্রান্সের রক্ষণাধীন ছিল। ১৯৫৬ সালে বৃটিশ টোগোল্যান্ড ঘানার সঙ্গে মিশে যায়। ফরাসি রক্ষণাধীন অংশটি গণভোটের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়ে রিপাবলিক অফ টোগো নাম নেয়। প্রেসিডেন্ট হল সিলভানাস অলিম্পিও। সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৬৩ সালে ওলিম্পিও নিহত হন। তারপর বারবার অভ্যুত্থান ও একদলীয় শাসন চলে টোগোয়। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী লোম দেশের প্রধান বন্দর। সোনা, রূপা ও মার্বেল পাথরের শিল্পসামগ্রীর বড় বাজার লোম শহর। লোকসংখ্যা চার লক্ষ। অন্যান্য শহর, সোকেদে, কেপালিমে।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- কৃষিনির্ভর দেশ। শ্রমশক্তির ৭৮ শতাংশ, কৃষিককাজে নিযুক্ত, মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩৫ শতাংশ কৃষিপণ্য। রপ্তানির ৩০ শতাংশ কফি, কোকো ও তূলা। ফসল স্বাভাবিক হলে দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর থেকে। ফসফেট প্রধান খনিজ সম্পদ, এছাড়া বক্সাইট, লবন, চুনাপাথর মার্বেল ও স্ট্রেইহ রয়েছে। দেশের রপ্তানির ৪০ শতাংশ ফসফেট। রাজনৈতিক অশান্তির জন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ১৫০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৮০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯২ সালে গণভোটে দেশে সংবিধান গৃহীত হয় এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট সরাসরি ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বাচিত হতে পারে এমন ব্যাক্তি প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। এক-কক্ষ জাতীয় সংসদ-হাই কাউন্সিল ফর দি রিপাবলিক। এর সদস্য পাঁচ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। সদস্য সংখ্যা ৮১। প্রধান রাজনৈতিক দল র‍্যালি অফ দি টোগোলিজ পিপল (আরপিটি) ১৯৯১ সালের ১২ এপ্রিল পর্যন্ত একমাত্র স্বীকৃত দল ছিল। বর্তমানে অনেক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৪.১.২৭. তাজিকিস্তান

তাজিকিস্তানের সাংবিধানিক নাম Jumhuri Tojikiston এবং ইংরেজিতে of Tajikistan Republic of Tajikistan বলা হয়। দেশটির আয়তন ১,৪৩,১০০ বর্গকিমি (৫৫,২৫১ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৭১ লক্ষ ৬৩৫০৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.০ শতাংশ। অধিবাসীরা তাজিক নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৬২ শতাংশ তাজিক, ২৪ শতাংশ উজবেক, ৮ শতাংশ রাশিয়ান, ২ শতাংশ তাতার ও অন্যান্য ৪ শতাংশ। ৮০ শতাংশ সুন্নি মুসলমান, ৫ শতাংশ শিয়া, বাকিরা খৃষ্টধর্মী। প্রত্যাশিত আয়ু ৬৮.৮ বছর। সাক্ষর ১০০ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা তাজিক। ফার্সি ভাষার সঙ্গে মিল আছে। রাজধানী দুশানবে (Dushanbe) প্রচলিত মুদ্রা তাজিক রুবল।[৮৫]

---

(৮৫) Ibid, V-2, PP.4078 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪০৭৮-৪০৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগলিক পরিচয়ঃ-আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্ত বরাবর অবস্থিত মধ্য এশিয়ার ভূমিবদ্ধ দেশ। দেশটির পূর্বে চীন, দক্ষিণে আফগানিস্তান, পশ্চিমে উজবেকিস্তান এবং উত্তরে কিরঘিজিস্তান সীমান্ত রয়েছে।

ঐতিহাসিক পরিচয়ঃ- পামির পর্বতমালার শাখা প্রশাখায় পর্বতময় দেশ। তাজিকরা প্রাচীন যাযাবর সংস্কৃতির অনুসারি দেশটির বিভিন্ন সময়ে আফগানিস্তান ও ফারসিয়ানদের দ্বারা শাসিত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯২১ সালে। ১৯২৯ সালে এই রাষ্ট্রের অন্যতম রিপাবলিক হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী দুশানবের (Dushanbe) ১৯২৯-৬৯ সালে নাম ছিল স্তালিনাবাদ। প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। লোকসংখ্যা ছয় লক্ষ। অন্যান্য শহর খোদঝেন্ট (প্রাক্তন লেনিনাবাদ), কুরগান-তাইয়ুব, কুর্লিয়াব।

অর্থনৈতিক পরিচয়ঃ- সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন পনেরোটি রিপাবলিকের মধ্যে তাজিকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। মাত্র ছয় শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য। তবে খনিজ সমৃদ্ধ দেশ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা।কৃষি ও বন বিভাগের কাজে দেশের ৪৩ শতাংশ লোক নিযুক্ত আর শিল্প ও কনস্ট্রাকশনের কাজে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ২২ শতাংশ। বাকিরা অন্যান্য কাজে। প্রধান ফসল তূলা, দানাশস্য, ফল, আঙ্গুর, সবজি। ব্যাপকভাবে গবাদিপশু পালন হয়। অ্যালুমনিয়াম, দস্তা, সীসা, রাসায়নিক, সার, সিমেন্ট, ভোজ্য তেল, রেফ্রিজারেটর কারখানা আছে। জিডিপি ২২০ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়ঃ- ১৯৯৪ সালে গৃহীত সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সাল ও ২০১৩ সালে পরিবর্তন করা হয়। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। তিনি সরাসরি ভোটে ৪ বছরে জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নির্বাহে সহায়ক। এক-কক্ষ জাতীয় সংসদ, নাম সুপ্রিম সোভিয়েত, সদস্য সংখ্যা ২৩০। দেশটিতে কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র থেকে ধীরে ধীরে বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরছে। প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টির নাম হয়েছে সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ তাজিকিস্তান। তাছাড়া আছে তাজিক ডেমোক্রেটিক পার্টি, রাস্তোখেজ (পুনরুত্থিত) ও ইসলামিক রিভাইভ্যাল পার্টি।

৪.১.২৮. তিউনিসিয়া

তিউনিসিয়ার সাংবিধানিক নাম Al Jumhuriyah At Tunisiyah এবং ইংরেজি নাম Republic of Tunisia দেশটির আয়তন ১,৫৪,৫৩০ বর্গকিমি (৬৩,১৭০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭৪,৯৫১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা তিউনিসিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীদের মধ্যে আরব/বার্বার ৯৮ শতাংশ, ইউরোপিয় ১ শতাংশ, ইহুদি ১ শতাংশেরও কিছু কম। মুসলিম ৯৮ শতাংশ, খৃষ্টধর্মী ইহুদী অবশিষ্ট ২ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষর ৭২.১ শতাংশ। গড় আয়- ৭১.৬ বছর। রাষ্ট্রভাষা আরবি, তবে সরকারী ভাবে ফারসী ভাষা ব্যবহৃত হয়। রাজধানী তিউনিস,প্রচলিত মুদ্রা- দিনার।[৮৬]

ভৌগলিক পরিচয়: উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরের দক্ষিই উপকূলে আলজেরিয়া ও লিবিয়ার মধ্যবর্তী দেশ। দীর্ঘ প্রলম্বিত দেশটির উত্তরদিকে ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া, দক্ষিণাংশ মরুভূমি।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ইসলামের আগমণ পূর্ব ইতিহাস

তিউনিসিয়া উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতই একটি প্রাচীন দেশ। ভৌগোলিক যে সীমানায় আজকের তিউনিসিয়া অবস্থিত, সে সীমানা অতীতে ছিলো না। বিভিন্ন জাতির শাসনাধীনে বারবার সীমানার রদবদল হয়েছে। তিউনিসিয়ার দূর-অতীতের ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, তিউনিসিয়ার সমুদ্র-উপকূলে প্রথম বার্বারদের আগমন ঘটে খৃস্ট-পূর্বে ১৩০০ অব্দে। বার্বারদের পর আসে ফিনিশীয়রা Phoenicions। তাদের আগমন ঘটে খৃস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে। ফিনিশীয়রা বার্বারদের সংগে যুদ্ধ করে উপকূল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তিউনিসিয়া, আলজিরিয়াসহ উত্তর আফ্রিকা নিয়ে যে একটি সাম্রাজ্য ফিনিশীয়রা গড়ে তুলেছিলো, সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো কাথেজিয়া Carthagisians রাজ্যে। কার্থেজ নগরী তিউনিসিয়াতেই অবস্থিত। ফিনিশীয়দের শাসনামলের কিছু দিন পর খৃস্ট-পূর্ব ২৬৪ থেকে ২৪১, ২১৮ থেকে ২০১ এবং ১৪৯ থেকে ১৪৬ অব্দে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুনিক যুদ্ধ হয়। তৃতীয় পুনিক যুদ্ধে কার্থেজের পতন ঘটে এবং দেশটি রোমানদের দখলে চলে যায়। তিউনিসিয়া রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ রূপে পরিগণিত হয় এবং গম উৎপাদনকারী একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল বলে তৎকালীন জগতে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। রোমানদের পর স্পেনের ভান্ডাল শাসন শুরু হয়। ভান্ডাল শাসনের অবসান ঘটে ৫৩৩ খৃস্টাব্দে। ৫৩৩ থেকে শুরু করে মুসলমানদের দ্বারা তিউনিস বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৭০ সাল পর্যন্ত তিউনিসিয়া বাইজেন্টাইন শাসনাধীন ছিলো।[৮৭]

ইসলামের পতাকাতলে তিউনিসিয়া

আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে তিউনিসিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৭০ খৃস্টাব্দে সেনাপতি উকবা ইবনে নাফে, বাইজেন্টাইনদের উৎখাত করেন ও তিউনিসিয়ায় ইসলামী পতাকা উত্তোলন করেন। সে সময় তিউনিসিয়ায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। তিউনিসিয়া ' উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ড়ভুক্ত ছিলো ৬৭০ থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্তড়। তারপর তিউনিসিয়া ছিলো একে একে আগলিবী, ফাতিমী, আল-মাহদী হুসায়নী ও তুর্কী শাসনাধীনে। হাবশী বংশের রাজত্বকালে {১২২৮-১৫৭৪} তিউনিসিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে। ১৫৭৯ সালে তুরস্ক কর্তৃক তিউনিসিয়া অধিকৃত হওয়ার পর তুর্কী 'বে' উপাধিধারী শাসনকর্তাদের অধীনে দেশটি শাসিত হলেও এটি জলদস্যুদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল।

---

(৮৬) Ibid, V-2, PP.4201 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪২০১-৪২১৮)
(৮৭) সালেহ উদ্দিন আহমেদ, আলজিরিয়া-তিউনিসিয়া-মরক্কো, *ইফা-পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৩০-৯৩৩

Dhaka University Institutional Repository

তবে এ কথা সত্য, ৬৭০ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ততিউনিসিয়া সুমলিম শাসনাধীনে থাকলেও রাস্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবশ্য, এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অত্যন্তজোরদার ছিলো। ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে নির্মিত কয়েকটি মসজিদ এখনো বিদ্যমান। হাবশী শাসনামলে তিউনিসিয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হতো।

ফরাসী শাসনাধীনে তিউনিসিয়া

১৮৮১ সালে ফ্রান্স তিউনিসিয়াকে একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে। ফরাসীরা কৌশলে এ কর্মটি সম্পাদন করে ফেলে। তুর্কী 'বে'কে আনুষ্ঠানিক প্রধানরূপে রেখে একজন ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেলের অধীনে সেখানে ফরাসী আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তুর্কী 'বে'দের রাষ্টপ্রশাসনে অদুরদর্শিতার ফলেই তিউনিসিয়া ফরাসী শাসনাধীনে চলে যায়। তিউনিসিয়ায় অধিকাংশ উর্বর ভূমি এবং খনিজ সম্পদ ফরাসী জমিদাররা দখল করে বসে।

১৯২০ সালে নয় দফা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ফরাসীদের বিরুদ্ধে জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। ১৯২৩ সালে তিউনিসীয় নেতা যারিবিকে নির্বাসন দেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালীয় এবং জার্মানরা দেশটি দখল করে নেয়, কিন্ত মহাযুদ্ধে তাদের পরাজয়ের পর ফরাসীরা আবার তিউনিসিয়ার অধিপতি হয়। আমেরিকা এ সুযোগে তিউনিসিয়ার বৃহত্তম নৌ- ঘাঁটি বিজার্তা দখল করে নেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জনাব হাবীব বারগুইবার নেতৃত্বে দস্তর পার্টি প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্ত সীমাহীন ফরাসী নির্যাতনের কারণে আন্দোলন মাঝে মাঝে থেমে যায়। ১৯৫০ সালের আগষ্ট এবং ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী সরকার তিউনিসিয়ার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এ সংস্কার পরিকল্পনার প্রধান কারণ ছিলো এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধিকার আন্দোলন অত্যন্তপ্রবল হয়ে ওঠে। এমন কি, কয়েকবার বড় রকমের রক্তাক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। সুতরাং উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সংস্কার-পরিকল্পনা ঘোষণা করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। ১৯৫৩ সালের মে মাসে ফরাসীরা তাদের স্বার্থের অনুকূলে পৌরসভা সংস্কার ঘোষণা করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অবরোধের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের নামে সেটা অবশ্য ছিলো এক প্রহসন মাত্র। ফলে ১৯৫৩ সনের আগষ্ট মাসে নতুনভাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯৫৪ সালের ৪ মার্চ পুনরায় ফরাসীরা স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ঘোষণা করে, কিন্ত তিউনিসিয়াবাসী সে ঘোষণাও মেনে নেয়নি। কারণ এ ঘোষণা দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ফরাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ১৯৫৫ সালের ২৯শে মে ফরাসীরা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গীকার প্রদান করে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। এ চুক্তি অনুযায়ী দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণের ভার ফরাসীদের হাতেই থেকে যায়। ১৯৫৫ সালের ৯ জুলাই আইনসভা তিউনিসিয়ার স্বায়ত্বশাসন আইন মঞ্জুর করে। ফরাসী ঘোষণায় স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হলেও কার্যত কোন অধিকার প্রদান করা হয়নি। বাধ্য হয়ে তিউনিসিয়ায় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট স্বাধীনতার দাবীতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫৬ সালের ২০ মার্চ তিউনিসিয়াকে স্বাধীনতা দিতে ফরাসীরা বাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই রাজতন্ত্র বাতিল করে হাবীব বারগুইবা তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। তিউনিসিয়া ওআইসি-র সদস্য। ওআইসি-র সেক্রেটারী জেনারেল জনাব হাবীব সাত্তি তিউনিসিয়ার অধিবাসী।

তিউনিসিয়ায় ইসলামী আন্দোলন

তিউনিসিয়ায় ইসলামী আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ইসলামী ট্রেন্ড মুভমেন্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান এ আন্দোলন পরিচালনা করছে। দলের চেয়ারম্যান জনাব রশীদ ঘ্যানোসি এবং সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল ফাত্তাহ মুরো। জনাব রশীদ ঘ্যানোসির অভিমত ঃ সত্তর দশকের প্রথম থেকেই তিউনিসিয়ায় ইসলামী পুনর্জাগরণের সুত্রপাত ঘটে এবং আজ তার ভিত্তি-মূল অত্যন্তশক্তিশালী হয়েছে।

তিউনিসিয়ায় ইসলামী জাগরণ আন্দোলন ইসলামী দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৬ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৮৭ সালে ৮৪ বছরের বৃদ্ধ হাবিব বরবিদা বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার অভিযোগে গদিচ্যুত হন। রাজধানী তিউনিস দেশের প্রধান শহর ও বন্দর। প্রাচীন কার্থেজ শহরের জীর্ণাবশেষ, ভুমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলবর্তী এই শহরে দেখা যায়। বর্তমানে শিল্পসমৃদ্ধ, লোকসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। অন্যান্য শহর স্ফাক্স, সৌনে, বিজের্তা।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- খনিজ সমৃদ্ধ দেশ, মাটিও উর্বর। দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক কৃষিকাজে নিযুক্ত ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৬ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। অলিভ, খেজুর, কমলালেবু, এলাচ, আঙ্গুর, মাংস, দুগ্ধজাত পণ্য রপ্তানি করে। মাছ ধরার পরিমাণও ভালো। তবে খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। রপ্তানি করা খনিজ পদার্থ ও শিল্পজাত পণ্যর মধ্যে আছে তেল, ফসফেট, আকরিক লোহা, বস্ত্র, জুতা, প্রস্তুত খাদ্য, মদ। পর্যটন ব্যবস্থা উন্নত। মোট জাতীয় উৎপাদন ১,০৯০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২২৪০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৫৯ সালে তিউনোসিয়ার সংবিধান গৃহীত হয়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১২ জুলাই ১৯৮৮ এবং ২৬ মে ২০০২ সালের সংশোধনী। প্রেসিডেন্ট শাসিত শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান, প্রেসিডেন্ট সরাসরি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তিনি অবশ্য ৪০-৭৫ বছরের মধ্যে হবেন, তিনি একবারে ০৩ বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। প্রধানমন্ত্রী সরকার-প্রধান ও শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টের সহকারী। এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ-চেম্বার অফ ডেপুটিজ (মজলিশ অল-নুয়ার)। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ১৪১ তারা ০৫ বছরের জন্য নির্বাচিত। দেশটিতে বহুদলীয় গণতন্ত্রের স্বীকৃতি আছে। ভোটাধিকার ২০ বছর বয়সে।

৪.১.২৯.তুরস্ক

তুরস্কের সাংবিধানিক নাম Turkiye Cumhuriyeti এবং ইংরেজিতে Republic of Turkey দেশটির আয়তন- ৭,৭৯,৪৫২ বর্গকিমি ৩,০০,৯৪৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬০৫৫৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫ শতাংশ। অধিবাসীরা তুর্কী নামে অভিহিত অধিবাসীদের ৮০ শতাংশ তুর্ক, ১৭ শতাংশ

Dhaka University Institutional Repository

কুর্দি, অন্যান্য ৩ শতাংশ। সাক্ষর ৮৫.৫ শতাংশ। গড় আয়ু- ৭০.৫ বছর। ৯৯.৮ শতাংশ সুন্নি মুসলিম, খৃষ্টধর্মী ও ইহুদি ০.২ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা তুর্কি, কুর্দিশ ও আরবি ভাষা প্রচলিত। রাজধানী আঙ্কারা প্রচলিত মুদ্রা- তুর্কি লিরা।

ভৌগলিক পরিচয়- দেশটির পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর ও গ্রীস, উত্তরে বুলগেরিয়া ও কৃষ্ণ সাগর, পূর্বে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও ইরান এবং দক্ষিণে ইরাক, সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভৌগালিক বৈশিষ্ট্য ভূমধ্যসাগরের উত্তরপূর্ব ও ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় অবস্থিত দেশ। ব্ল্যাক-সি থেকে প্রবাহিত সংকীর্ণ প্রণালী তুরস্ককে দ্বিখন্ডিত করে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। প্রণালীর (মর্মর সাগর) পশ্চিম অংশ ইউরোপে তুরস্কর অবশিষ্ট অংশ এশিয়ায়। তুরস্ককে ইউরোপের দেশ বলে গণনা করা হয়। এশিয়ার অংশ আনাতোলিয়া নামে পরিচিত। পর্বতময় দেশ, উপকূলে সংকীর্ণ সমতল ভূখন্ড। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মাউন্ট আরারত, তিউরাস পর্বতমালা। সর্বোচ্চ শিখর কালদি দাগ ১২,২৫৫ ফুট উঁচু। পূর্বদিকে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উৎস।[৮৮]

ঐতিহাসিক পরিচয়ঃ- দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যে অটোমান আম্পায়ার। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দিলে পরাজয়ের পর তার সাম্রাজ্য কেড়ে নেয়া হয়। বিষয়টি এরূপ যে, ১৫১৭ সাল উসমানী সুলতান প্রথম সেলিম সিরিয়া ও মিশর জয় করে তুর্কী মামলুক সালতানাতের আশ্রিত আব্বাসীয় খিলাফতের বিলোপ সাধন করেন ও পরিবর্তীতে ইস্তাম্বুলের উসমানী তুর্কী সালতানাতকে খিলাফতে রূপান্তর্ভরিত করা হয়। গাযী কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সনে তুর্কী খিলাফতের বিলোপ ঘোষণা করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। বিশ্বে তুরস্ক দেশ ও জনসম্প্রদায় হিসেবে একটি পৃথক পরিচয় বহন করে। মধ্য এশিয়ার তুর্কী ভাষাভাষী তুর্কী জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত এশিয়া মাইনর ও রুমিলিয়ার তুর্কীরা একটি পৃথক সত্তা . মধ্যএশিয়া থেকে আগত তুর্কীরা এশিয়া মাইনরে ত্রয়োদশ শতকের শেষে উসমানের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। কালক্রমে উসমানী বংশরে রাজপুরুষগণ ধর্মযোদ্ধা বেশে সমগ্র এশিয়া মাইনর, থ্রেস, বলকান উদ্বীপ ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ দখল করে উসমানী তুর্কী ইসলামী সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৫০ খৃঃ দ্বিতীয় মুহাম্মদের নিকট কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর বাইজেন্টাইনীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে উসমানিগণ স্থলাভিষিক্ত হন। সুলতান দ্বিতীয় বায়জিদের রাজত্বকালে সীমান্তসংঘর্ষ থেকে প্রতিবেশী মামলুক সুলতানগণের সংগে সংঘর্ষের সুত্রপাত হয়, যার প্রিণতিতে মিসরের মামলুক সালতানাতের মধ্য দিয়ে ১৫১৭ সালে উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় উসমানী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে; অপরদিকে ষোড়শ শতাব্দিতে পারস্য দেশে সাফাভী রাজত্বের অভ্যুদয়ে উসমানী সাম্রাজ্য দীর্ঘকালের জন্য সাফাভিগণের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

---

(৮৮) *Europa (2004)*, Ibid, V-2, PP.4219 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪২১৯-৪২৫২)

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলশ্রুতিতে সমস্ত ইরাক, কুর্দিস্তান, আর্মেনিয়া ও আযারবাইজানের অংশ বিশেষ উসমানিগণের দখলে আসে। মহামতি সুলায়মানের রাজত্বকাল উসমানী সাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগ। এ সময়ে তুর্কীরা ভিয়েনার দ্বারদেশে উপনীত হয় এবং দস্যু করমেয়ারগণের সহায়তায় পুষ্ট তর্কী নৌবাহিনী সমগ্র উত্তর আফ্রিকা উপকুল তথা ভুমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব গ্রহণ কর। এর পর শুরু হলো ভাটির টান। ১৬৮৩ খৃঃ ভিয়েনা দুর্গের পাশে তুর্কী বাহিনী ব্যর্থ হয়ে পশ্চাদপসরণ শুর করলো। ১৬৯৯ খৃঃ কার্লোভিজ, ১৭১৮ খৃঃ প্যাসারোভিজ, ১৭৩৯ খৃঃ বেলগ্রেড ও ১৭৭৪ খৃঃ কুচক মাইনোর চুক্তিতে ক্রমাগত নিজস্ব এলাকা অস্টো-হাংগেরীয় হ্যাপসুবর্গ ও রাশিয়ার রোমানভ সাম্রাজ্যের নিকট সমর্পনের পালা শুরু হলো। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তুর্ক সাম্রাজ্য ইউরোপের 'উইকম্যান' বা দুর্বল ব্যক্তি নামে অভিহিত হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের পরাক্রম ও সামরিক শক্তির মূলে ছিলো তার সামরিক বাহিনী ও বিশেষত জেনিসারী দল।[৮৯] নিয়ম শৃঙ্খলার অবর্তমানে তুর্কীবাহিনী ক্রমাগত অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ে। সুলতান তৃতীয় সেলিম ও দ্বিতীয় মাহমুদ ইউরোপীয় বিশেষ করে ফরাসী কায়দায় একটি নতুন সৈন্য ইউনিট গঠনের চেষ্টা চালান এবং ১৮২৬ সনে দ্বিতীয় মাহমুদ জেনিসারী বাহিনীকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেন। তুরস্কের অভ্যন্তড়ীণ দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তড়ের বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রত হয়। ১৮২৭ সনে গ্রীস স্বাধীন হয়ে যায়। মিসরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী আরব দেশ, মিশর সিরিয়া সমেত একটা রহত অঞ্চল প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন খেদিভীয় শাসনে আনয়ন করেন।

তুর্কী সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য

ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতক পর্যন্তএশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সংযোগ স্থলে অবস্থিত তর্কী সাম্রাজ্যের কতকগুলো দিক বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ক. পশ্চিম এশিয়ার ইরাক, আর্মেনিয়া, আযারবাইজান, কুদীস্তান, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, আরব, ইয়েমেন, আফ্রিকার মিশর, লিবিয়া, তিউনিস, আলজিরিয়া ও মরক্কো ভুমধ্যসাগরের ছোট দ্বীপসমূহ ও ইউরোপের বলকান উপদ্বীপ, গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ- াভিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ড়র্ভূক্ত ছিল। খ. ;তুর্কী সম্প্রদায় হিসেবে মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্কী বংশোদ্ভূত হলেও কালক্রমে এনাতোলিয়া ও থ্রেসে গ্রীক খৃস্টানগণের মধ্যে সংমিশ্রণে একটি সংকর মুসলিম জাতিতে পরিণত হয়। ইসলামী জীবনযাত্রা, যুদ্ধ, রাজ্য জয়, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আরো রাজ্যজয় ও সামাজিক বিস্তৃতি ছিল তুর্কী জীবনের মূলমন্ত্র। প্রতিটি তুর্কী নাগরিক আল্লাহর দাস বা দাসী এবং তুর্কী সালতানাত এমন একটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে ধর্মান্তরিত সকলেই সমগোত্রিয় এবং সমান সুযোগ ও সম্ভাবনার অধিকারী। গ. তুর্কী জীবন যাত্রার মধ্যে এশিয়ার যাযাবর জীবনের বৈশিষ্ঠ্য বাইজেন্টাইনীয় খৃস্টীয় বা ইসলামী জীবন ধারায় সমন্তত। ঘ. বিস্তৃত সামাজ্যের ভিন্নতর জাতি ধর্ম প্রশাসন ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিকভাবে বিভক্ত ছিল। ঙ. রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি বিজয় ও যুদ্ধ জয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।

---

৮৯. ডাঃ শামসুদ্দীন মিয়া, তুরস্কের ইতিহাস এক নজর, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শক্তি হ্রাস ও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সংগে সংগে তুর্কী সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে উঠলো। তানজিমাতের সংস্কার অথবা তরুণ তুর্কী আন্দোলন তুর্কী রাষ্ট্রের দ্রুত অবক্ষয় ও ধ্বংস রোধ করতে পারে নাই। ছ. কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোতে যমন গ্র্যান্ড ভিজির, শেখুল ইসলাম, সিরাগলি ও হারিম প্রভৃতি বাইজেন্টাইনীয় শাসন কাঠামোর পরিবর্তিত রূপ মনে করা যায়। জ. জেনিসারী প্রথা অবাধ ক্রীতদাস প্রথার দলগুলো তুর্কী শাসক সম্প্রদায় একটি সমন্বিত শঙ্কর গোষ্ঠী, কিন্ত জীবন যাত্রায় উদারনৈতিক।

তুর্কী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আরবী হরফে লিখিত তুর্কী ভাষা অসংখ্য ফার্সী ও আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'আরবী' ফার্সী ব্যাকরণের ধাচে ব্যবহৃত হলেও তুর্কী ভাষার নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রাণকেন্দ্র বর্তমান; যে কারণে কামাল আতাতুর্কের রোমান হরফে তুর্কী ভাষা পরিবর্তনে তেমন কোন অঙ্গহানি হয় নাই। তূর্কী সাম্রাজ্য তুর্কী বহুজাতীয়তাবাদ বা উসমানী কৃস্টি তুর্কী সাহিত্যকে একটি পূর্ণ স্বাতন্ত্রী প্রদান করেছিলো। ইস্তাম্বুল ছিলো পূর্ব-পশ্চিম জগতের সেতুবন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় জীবন ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে তুর্কী সাহিত্য আঙ্গিকে, যেমনটি ঘটেছে এশীয় আশা আকাংখ্যা ভাবধারা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থায়। উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাধনা, রাজনৈতিক মতাদর্শ যেমন ফরাসী বিপ-বের ফসল, বৃহত্তর জীবন বোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রী, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীন চিন্তড্র, তুর্কী সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করে।

উনবিংশ শতাব্দিতে তানজিমাতের ঘোষণাসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে তুর্কী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ কোন পরিবর্তন সাধন না করলেও তুর্কী সমাজের চিন্তড্রায় এক বিপ-ব আনয়ন করে। ঘুণে ধরা জাতীয় চত্বরে, স্থবির সমাজ জীবনে গতি ও প্রগতির আহবান জানানো হয়। রাষ্ট্র প্রশাসনে দায়িত্বশীল সরকার, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র তথা গণতন্ত্র ধীরে ধীরে নব্য তুর্কী জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তুর্কী শাসকগোষ্ঠী মুখে নিয়মতান্ত্রিকতার দোহাই দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ষণশীলতা আকড়ে ধরার চেষ্টা করে, যে কারণে মেদহাত পাশার আপোষমুখী নিয়মতান্ত্রিকতা সুলতান খলীফার মনঃপুত হয় নই। ইসলামী সাম্য ভ্রাতৃত্ব প্রগতির নিছক আহবান তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মুসলমান গোষ্ঠীকে একত্রে করতেও সমর্থ হয় নাই। সি. ইউ. পি বা কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস আদর্শ তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে এক আদর্শে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় নাই। এর আংশিক পরিণতি তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া।

১৯১২ সনে বলকান যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তূর্তী সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিণ। ভার্সাই সন্ধি, সিভার্স চুক্তি ও যুদ্ধকালীন মৈত্রী শক্তিবর্গের মধ্যে সম্মানিত গোপন চুক্তি তুর্কী সাম্রাজ্যকে বিশেষত এশিয়া মাইনরকে ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদ ও গ্রীক সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হাতে তুলে দেয়।

স্বাধীন সার্বভৌম তুরস্ক, তুর্কী জাতীয়তাবাদ

ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলশ্রুত জাতীয়তাবাদী 'আরব ও সউদী রাজতন্ত্র অথবা শরীফ হুসায়নের 'আরবী সাম্রাজ্য, 'আমীর আবদুল্লার ট্রান্স জর্দান রাজতন্ত্র, বাদশা, ফয়সলের জাতীয়তাবাদী রাজতন্ত্র সিরিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

নিকটে এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ম্যান্ডেট শেষে ইরাক রাজতন্ত্র ঝেড়ে ফেলেছে। ফিলিস্তিনী আন্দোলন তুর্কী ইসলামী জাতীয়তাবাদের রূপ থেকে ইসলামী জাতীয়তাবাদ এবং পরবর্তিতে আরবী জাতীয়তাবাদে রূপান্তর্ড়রিত হয়েছে। মিশর খেদিভীয় রাজতন্ত্রের আবরণে মিশরীয় আরবী জাতীয়তাবাদে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ সব জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাষ্ট্রের আদল থেকে একটু পৃথক ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে নব্য স্বাধীন সার্বভৌম তুরস্কোর রূপান্তড়র একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। বীর তুর্কী জনগণের দৃঢ় মনোবল ও কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্ব তুর্কীদেরকে ১৯২২ সনে সাকারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক দখলদার বাহিনীকে পরাস্ত করতে সহায়তা করে। একটি পরাজিত জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করার ফলেই এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল। পলায়নপর গ্রীক বাহিনীকে থ্রেস থেকে সম্পূর্ণ বাহিস্কার করার পথে বৃটিশ নৌবাহিনী বাধা সৃষ্টি করেছিল। মাদানিয়া কনভেনশন ও পরে লুজান চুক্তিতে ইংরেজ কুটনীতিক সার্জন তুরস্কের ভৌগোলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। ১৯৩৬ সনের মন্ট্র কনভেনশনে তুরস্ককে দার্দানেলিস, মার্মোরা ও বসফোরাস প্রণালীতে শান্তিও যুদ্ধকালীন একক কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌমত্ব প্রদান করেছে। নতুন কৃষি, শিল্প অর্থনীতি জাতিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও প্রগতির পথে নিয়ে যাবে। ঐতিহাসিক কারণেই তুরস্ক রাশিয়ার সর্বগ্রাসী ছায়া সম্বন্ধে সতর্ক এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার সক্রিয় অনুভূতি রয়েছে।[৯০]

নয়া গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রে কামালের একনায়কত্ব কিছুকাল স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নেয়। তবুও তুরস্ক আবার গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। কামালের মৃত্যুর পর ইমেত বিরোধী ডেমোক্রেট দল প্রধান জালাল বায়ারকে ক্ষমতা হস্তান্তড়র করা হয়। দুঃখজনক যে, গণতন্ত্রের পরীক্ষা সব সময় সফল হয় না। জালাল বায়ারের কারাভোগ ও আদনান মান্দারেসের ফাঁসী ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক বারবার ক্ষমতা দখল গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করে। তবুও আশার কথা, তুরস্ক আবার গণতন্ত্র পথ যাত্রী। সুসংহত তুর্কীরা একটি সামরিক জাতি হিসেবে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি গোষ্ঠীর শামিল হয়েছে। তুরস্ক ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য। উত্তর সাইপ্রাসে তুর্কী প্রজাতন্ত্র স্থাপন আন্দোলনে তুরস্কের ভূমিকা বলিষ্ঠ। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী আঙ্কারা তুরস্কের এশিয় ভূখন্ডে শিল্পসমৃদ্ধ শহর। ১৯২৩ সালে ইস্তাম্বুল থেকে আঙ্কারায় রাজধানী স্থানান্তর্ড়রিত হয়। ইস্তাম্বুল ও ইজমির দুটি বন্দর শহর।[৯১]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- তুরস্ক কৃষিনির্ভর দেশ। দেশের অর্ধেক লোক কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এবং মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৯ শতাংশ ও রপ্তানির ১৯ শতাংশ কৃষিজাত পণ্য। প্রধান ফসল তামাক, তূলা, দানাশস্য, অলিভ, বিট, সাইট্রাস ফল ও পশু মাংস। খাদ্যে মোটামুটিভাবে স্বনির্ভর।

---

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩৯-৮৪১
৯১. *Europa(2004)*, V-2, ibid, PP.4220

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের প্রধান ৪টি ক্রোমিয়াম ধাতু উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে তুরস্ক অন্যতম কলকারখানায় কাজ করে দেশের শ্রম শক্তির ১ শতাংশ। উৎপন্ন করে টেক্সটাইল, তৈরি খাবার, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম, বাস্তু নির্মাণের সরঞ্জাম প্রভৃতি। তাছাড়া কয়লা, ক্রোমাইট, তামা প্রভৃতির খনিতে কাজ হয়। তুরস্কের ১৫ লক্ষ বিদেশে কর্মে নিযুক্ত। রপ্তানির ৮১ শতাংশ ইস্পাত, রাসায়নিক প্রমুখ শিল্পজাত পণ্য। মোট জাতীয় উৎপাদন মূল্য (জিডিপি) ১৯,৮০০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২৭৯০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর সর্বশেষ সংবিধান বলবৎ হয়। প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান। এককক্ষ জাতীয় সংসদ গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কাউন্সিল। সংসদের সদস্য সংখ্যা ৫৫০ সদস্যগণ ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তারা ৭ বছরের জন্য ১ জন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। প্রধান রাজনৈতিক দল কারেক্টওয়ে পার্টি (ডিওয়াই পি), জ্যাষ্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পপুলিষ্ট পার্টি (এলএইচপি), রেফা পার্টি (আরপি)। ভোটাধিকার ২১ বছরের সকল নর নারী রয়েছে বয়সে।[৯২]

তুর্কমেনিস্তান

তুর্কমেনিস্তানের সাংবিধানিক নাম Republic of Turkmenistan দেশটির আয়তন ৪,৮৮,১০০ বর্গকিমি (১,৮৮,৪৫৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা তুর্কমেন নামে অভিহিত। অধিবাসীদের ৭২ শতাংশ তুর্কমেন, রাশিয়ান ১০ শতাংশ, উজবেক ৯ শতাংশ, অন্যান্য ৯ শতাংশ। মুসলিম ৮৫ শতাংশ, ইষ্টার্ণ অর্থোডক্স খৃস্টান ১০ শতাংশ, অন্যান্য ৫ শতাংশ। প্রত্যশিত গড় আয়ু ৬৭.১ বছর। স্বাক্ষর ১০০ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা তুর্কমেন ৭২ শতাংশ লোকের ভাষা, ১২ শতাংশ রাশিয়ান, অন্যান্য ১৬ শতাংশ। তুর্কমেন রাষ্ট্র ভাষা। রাজধানী আশকাবাদ, প্রচলিত মুদ্রা- মানাত।[৯৩]

ভৌগলিক পরিচয়- দেশটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ন্তগত মধ্য এশিয়ার ভূমিবদ্ধ দেশ। উত্তরে উজবেকিস্তান, দক্ষিণে ইরান ও আফগানিস্তান, পূর্বে উজবেকিস্তান এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর। তবে পশ্চিম সীমান্তেকাস্পিয়ান হ্রদ আছে। দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মরুভূমি। বিখ্যাত ব্ল্যাক ডেজার্ট কারাকুম তার অন্তর্ভূর্ক্ত (আয়তন ১ লক্ষ ২০ হাজার বর্গমাইল)। কারাকুম মরুঅঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার জীর্ণবিশেষ, পিরামিডের মতো স্থাপত্যশিল্প দেখা যায়। দেশের নদী আমুদরিয়া।

---

৯২. ডাঃ শামসুদ্দীন মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৪০
৯৩. *Europa*, Ibid, V-2, PP.4253 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪২৫৩-৪২৬৮)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়- ১৯২১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন এর আওতাধীন হয় সাবেক ট্রান্সকাস্পিয়ান অঞ্চল, বোখারার চরজিউই ভিলায়েত এবং খিভার অংশ বিশেষ। ১৯২৫ সালে রিপাবলিকের স্বীকৃতি পায়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯০ সালে তুর্কমেন সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা গৃহীত হয়। ১৯৯২ সালের মে মাসে নতুন সংবিধান বলবৎ ও জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী আশকাবাদ শিল্পসমৃদ্ধ শহর, প্রসিদ্ধ বুখারা কার্পেট এখানে তৈরি হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর জন্য বিখ্যাত তাই অনেক দেশ থেকে চলচ্চিত্রকররা এখানে আসেন। লোকসংখ্যা চার লক্ষ ২০ হাজার। অন্যান্য শহর চার্দঝোভ, মেরি, নেবিত-দাগ, ব্রাসনোভদস্ক। অর্থনৈতিক পরিচয়:- প্রচুর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, সালফার ও নানা শিল্পের কাঁচামাল সঞ্চিত আছে। কৃষি ও বন বিভাগে কাজ করে দেশের শ্রমশক্তির ৪২ শতাংশ। কলকারখানা ক্ষুদ্র শিল্প ও নির্মাণাদির কাজে নিযুক্ত ২১ শতাংশ। সোভিয়েত অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ ও দেশের প্রয়োজন ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সময় লাগছে। তূলা উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়নের পনেরোটি রিপাবলিকের মধ্যে তুর্কমেনিস্তান ছিল দ্বিতীয়। দেশ রপ্তানি করে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, রাসায়নিক, তুলা, টেক্সটাইল, কার্পেট। আমাদানি করে যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, প্লাষ্টিক, রবার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২২৫০ ডলার জিডিপি, ৪০ কোটি ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রে প্রধান ও মূখ্য শাসক। রষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রী, দুজন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন দায়িত্ব। এক-কক্ষ জাতীয় সংসদ মজলিস। মজলিসের সদস্য সংখ্যা ১৭৫। ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ তুর্কমেনিস্তান আগজিবিরলিক (Agzybirlik) ঐক্যসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল রয়েছে। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

৪.১.৩১. নাইজার

নাইজারের সাংবিধানিক নাম Republic Du Niger এবং ইংরেজিতে Republic of Niger দেশটির আয়তন ১২,৬৭,০০০ বর্গকিমি (৪,৮৯,১৯১ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ৬২৮৫৬ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা নাইজারিয়ান নামে পরিচিত। নানা আফ্রিকান উপজাতির বাস। তার মধ্যে হাউসা Hausa, ও সংখ্যাই Songhai ৫৬ শতাংশ, জেরমা Djerma ২২ শতাংশ, ফুলা Fulari ৮.৫ শতাংশ, তুয়ারেগ Tuareg ৮ শতাংশ, বেরি বেরি Beriber (কানউরি) ৪.৩ শতাংশ। অবশিষ্ট লোক আরব ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর। প্রায় চার হাজার ফরাসি নাইজারের স্থায়ী বাসিন্দা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক, প্রতি নারীর গড়ে ৭.৪ সন্তান হতে পারে। গড় আয়ু- ৪৬.২ বছর। ৮০ শতাংশ লোক মুসলিম, অবশিষ্ট খৃষ্টধর্মী ও প্রকৃতি উপাসক। স্বাক্ষর ১৬.৫ শতাংশ। সরকারি ভাষা ফরাসি, হাউসা ও জেরমা ভাষা ব্যাপকভাবে। রাজধানী নিয়ামে, প্রচলিত মুদ্রা- সিএফফ্রাঁ।

ভৌগলিক পরিচয়- পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যভাগে অবস্থিত ভূমিবদ্ধ দেশ। উত্তরে আলজেরিয়া ও লিবিয়া পূর্বে শাদ, দক্ষিনে নাইজেরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে বেনিন ও বারকিনা ফাসো ও পশ্চিমে মালি। দেশটির ভৌগালিক বৈশিষ্ট্য হল উত্তর ভাগ পর্বতময় ও তার মাঝে মাঝে বালুকাময় সমতল, দক্ষিণ অঞ্চল তৃণভূমি, দক্ষিণ পশ্চিমে

Dhaka University Institutional Repository

নাইজার নদী ও দক্ষিণ-পশ্চিমে শাদ হ্রদ। আবহাওয়ায় সাহারা মরুভূমির প্রভাব। অনাবৃষ্টি প্রায় সারা বছর। প্রাকৃতিক সম্পদ সামান্য।[৯৪]

ঐতিহাসিক পরিচয়- নাইজার ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৯৯ পর্যন্তফ্রান্সের উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭৪ সালে সামরিক শাসন কায়েম হয় ১৫ এপ্রিল নাইজারের প্রথম প্রেসিডেন্ট হামানি দিওরি এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন। এ সময় সংবিধান বাতিল করে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯২ সালে গণভোটের সিদ্ধান্তঅনুসারে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী নিয়ামে, নদী তীরবর্তী বন্দর ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র। লোকসংখ্যা চার লক্ষ। অন্যান্য শহর জিন্দার, মারাদি, তাহোউয়া।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশটি খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ইউরেনিয়াম, ফসফেট, কয়লা, লবন ও ন্যাট্রন। দেশের শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশ কৃষিকাজে নিযুক্ত ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ কৃষিপণ্য। পশুপালন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অনাবৃষ্টি না হলে খাদ্যে স্বনির্ভর। শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিমেন্ট, ইট, টেক্সটাইল, খাদ্যপ্রস্তুত, রাসায়নিক। রপ্তানির ৭৫ শতাংশ ইউরেনিয়াম, তার বাইরে গবাদিপশু, বাদাম, পেঁয়াজ। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ২৪০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। ১৯৯৯ সালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। উক্ত সংবিধান অনুযায়ী ১২ সদস্যের সুপ্রীম মিলিটারী কাউন্সিল নাইজারের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কাউন্সিলের প্রধান প্রেসিডেন্ট। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা শাসন কার্য পরিচালনায় উক্ত কাউন্সিলকে সহায়তা করে থাকেন। জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমবি- র সদস্য সংখ্যা ১৫০। দেশের প্রধান দল ন্যাশনাল মুভমেন্ট অফ দি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। অন্যদলের মধ্যে আছে নাইজার প্রগ্রেসিভ পার্টি, আফ্রিকান ডেমোক্রোটিক র্যালি, ইউনিয়ন অফ পপুলার ফোর্সেস ফর ডেমোক্রেসি অ্যাড প্রগ্রেস, নাইজেরিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন প্রভৃতি। সার্বজনীন ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

৪.১.৩২. নাইজেরিয়া

নাইজেরিয়ার সাংবিধানিক নাম The Federal Republic of Nigeria আয়তন ৯,২৩,৭৬৮ বর্গকিমি (৩,৫৬,৬৬৯ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ। অীধবাসীরা নাইজেরিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীরা আড়াইশ আফ্রিকান উপজাতি দেশটিতে বসবাস করে। তাদের মধ্যে হাউসা (Hause) ২০.৯ শতাংশ, ইয়োরুবা (Yoruba) ২০.৩ শতাংশ, ইবো (Ibo) ১৬.৬ শতাংশ ফুলানী (Fulani) ৮.৬ শতাংশ, উল্লেখযোগ্য হাউসা ও ফুলানি, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়োরুবা, দক্ষিণ-পূর্ব ইবো।

---

৯৪. Ibid, V-2, PP.3171 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩১৭১-৩১৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

মোট লোকসংখ্যার ৬৫ শতাংশ এই কয়টি উপজাতি। এছাড়া ২৭ হাজার নন-আফ্রিকানের বাস। মুসলিম ৫০ শতাংশ, খৃস্টান ৩০ শতাংশ, আদি ধর্মে বিশ্বাসী ১০ শতাংশ। গড় আয়ু ৫১.৫ বছর। সাক্ষর ৫৭ শতাংশ। রাজধানী- আবুজা। প্রচলিত মুদ্রা- নাইরা।

ভৌগলিক পরিচয়- পশ্চিম আফ্রিকার দক্ষিণে, গিনি উপসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত দেশ। নাইজেরিয়ার উত্তরে নাইজার, পূর্বে শাদ ও ক্যামেরুন, দক্ষিনে গিনি উপসাগর এবং পশ্চিমে বেনিন। উত্তরভাগ শুষ্ক তৃণভূমি, দক্ষিণে ঘন বন, পূর্ব-দক্ষিণে পর্বতমালা। নাইজার নদীর পানিতে বিস্তীর্ণ এলাকা উর্বর। সাহারা মরুর শুষ্ক বায়ু হারমট্রোন নাইজেরিয়ার আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে রাখে। নাইজারের প্রধান নদনদী বেনু ক্রস রিভার ইয়োবে, ওসে।

ঐতিহাসিক পরিচয়- ১৯১৪ সালে উত্তর ও দক্ষিণ নাইজেরিয়া মিলিত হয়ে আফ্রিকায় বৃহত্তম বৃটিশ উপনিবেশ হয়। ১৯৫৪ সালে নাইজেরিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তর্ত্তরিত হয়, স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬০ সালে। ১৯৬৩ সালে সাধারণতন্ত্র হয়। তারপর থেকেই বিদ্রোহ ও সামরিক অভ্যুত্থান নাইজেরিয়ার জনজীবন ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। ১৯৯২ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী- আবুজা। ১৯৬১ সালের ১২ ডিসেম্বর লেগস থেকে আবুজায় রাজধানী স্থানান্তর্ত্তরিত হয়। আবুজার লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার। অন্যান্য শহর আবিদজান,ওগবোমোশো, কানো, লেগস, পোর্ট হারকোর্ট, ওয়ারি, কালাবর বড় বন্দর শহর। দেশে ৩৬টি অঙ্গরাজ্য রয়েছে ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে বর্তমানে ফেডারেল সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র।[৯৫]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশটি খনিজ তেল ও কৃষিজ সমৃদ্ধ। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক পেট্রোলিয়াম আছে নাইজেরিয়ায়। তাছাড়া আছে কোকো, বাদাম, তুলা, রাবার, টিন, পাম অয়েল (আফ্রিকায় সর্বাধিক উৎপাদনকারী দেশ)। নাইজেরিয়ার রপ্তানির ৯৫ শতাংশ তেল, বাকিটা কোকো ও রাবার। দেশের ৫৪ শতাংশ লোক কৃষিজীবী ও জাতীয় উৎপাদনে কৃষির ভাগ ৩২ শতাংশ। মোট জাতীয় উৎপাদন ৩০০০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু আয় ২৩৯৪ ডলার। মোটামুটি হিসাবে এক ডলার সমান দশ নাইরা।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে ১৯৮৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে সাময়িক শাসন কায়েম ছিল, ১৯৯২ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। ১৯৯৯ সালে গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী দেশটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট মুখ্য প্রশাসক, মন্ত্রিসভার সহযোগিতায় শাসন দায়িত্ব পালন করেন। ফেডারেল নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হয়। প্রেসিডেন্ট হলেন ফেডারেলের প্রধান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের তিনি নিয়োগ দিয়ে থাকেন, তাদের সকলের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ ৩৬০ সদস্য বিশিষ্ট নিম্ন-কক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ।

---

৯৫. Ibid, V-2, PP.3189 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩১৮৯-৩২১৫)

Dhaka University Institutional Repository

১০৯ সদস্য বিশিষ্ট সিনেট উচ্চ-কক্ষ সকলেই চার বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়। ৭৭৪টি স্থানীয় সরকার ও ৩৬টি প্রদেশিক সরকার রয়েছে। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও ন্যাশনাল রিপাবলিকান কনভেশন। নাগরিকদের ভোটাধিকার ২১ বছর বয়সে।

৪.১.৩৩. পাকিস্তান

পাকিস্তানের সাংবিধানিক নাম Islam-i Jamhuriya-e Pakistan এবং ইংরেজিতে বলা হয় Islamic Republic of Pakistan দেশটির আয়তন-৭,৯৬০৯৫ বর্গকিমি (৩,০৭,৩৭৪ বর্গমাইল)। জম্মু ও কাশ্মীর[৯৬] রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের দখলে আছে, তা পাকিস্তানের আয়তনের মধ্যে ধরা হয়নি। লোকসংখ্যা ১৬ কোটি ২৪ লক্ষ ১৯,৯৪৬ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ। অধিবাসীরা পাকিস্তানি নামে পরিচিত। অধিবাসীরা পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পুশতুন (পাঠান), বালুচ ও মুহাজির (ভারত থেকে স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমান ও তাদের বংশধররা)। প্রতি প্রদেশে নিজ নিজ ভাষায় শাসনকার্য চলে। দেশের লোক সংখ্যার ৬৪ শতাংশ পাঞ্জাবী, ১২ শতাংশ সিন্ধি, ৮ শতাংশ পুশতু ও ৭ শতাংশ উর্দুভাষী। বালুচি ও অন্যান্য ভাষাভাষী অবশিষ্ট ৯ শতাংশ। অধিবাসীদের ৯৭ শতাংশ মুসলিম (৭৭ শতাংশ সুন্নি, ২০ শতাংশ শিয়া), অবশিষ্ট তিন শতাংশ হিন্দু, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। সাক্ষর ৪৪ শতাংশ। গড় আয়ু ৬১.০ বছর। রাষ্ট্রভাষা উর্দু তবে সকল কাজেই ইংরেজি ব্যবহৃত হয়। রাজধানী ইসলামাবাদ, প্রচলিত মুদ্রা- পাকিস্তানি রুপি।[৯৭]

ভৌগলিক পরিচয়- উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে আজকের পাকিস্তান। এদেশের সাধারণ সীমান্তভারত, ইরান, আফগানিস্তান ও চীনের সাথে যুক্ত। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল হিমালয় পর্বত শ্রেনী দ্বারা বেষ্টিত এবং চীনের সাথে সাধারণ সীমান্তেঅবস্থিত। ওয়াযান নামে আফগানিস্তানের একটি সংকীর্ণ ভূখন্ড পাকিস্তানকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পৃথক করেছে। পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমানা রক্ষা করে চলেছে উঁচু-নীচু পাহাড় ভেদী সর্পিল ঐতিহাসিক ডুরান্ড লাইন। বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অবস্থান এবং ঠিক পূর্ব সীমান্তেরয়েছে ভারতীয় ভূখন্ড। দক্ষিণ পশ্চিমে ইরান এদেশের নিকটতম প্রতিবেশী। এর সমগ্র দক্ষিণ অংশ জুড়ে আছে বিপুলায়তন আরব সাগর। পাকিস্তানের উত্তর দক্ষিণের বিস্তৃতি হচ্ছে প্রায় এক হাজার মাইল এবং পূর্ব হতে পশ্চিমের বিস্তৃতি গড়ে প্রায় তিন শত মাইল। এখানকার ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতর তারতম্যের দরুন আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে খুব বেশী পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। এছাড়া আছে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশের সঙ্কীর্ণ গিরিপথ খাইবার পাস। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জীর্ণাবশেষ পাকিস্তানের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ।

---

৯৬. জমু ও কাশ্মীর রাজ্যের যে অংশ পাকিস্তানের সাথে আছে সে অংশকে আযাদ কাশ্মীর বলা হয়। এর আয়তন ১১৬৩৯ বর্গ কিমি বা ৪৪৯৪ বর্গ মিটার। গিলগিট এবং বালটিসতান, জুনাগারদ এবং মানচিত্র ভারতের দখলে রয়েছে যার আয়তন ৭২৫৭০ বর্গ কিমি বা ২৮০০০ বর্গ মাইল। পাকিস্তান এবং ভারতের দখলে থাকা উভয় অংশ উল্লেখিত তথ্য থেকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের আয়তনের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

(৯৭) *Europa (2004)*, ibid, V-2, PP.3273 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩২৫৬-৩২৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়- তিন হাজার খৃস্ট-পূর্বাব্দে এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়। এ যুগে সিন্ধু অববাহিকায় একটি ঐশ্বর্যশালী নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। বস্তুত সিন্ধু-সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা বলে অনেকে মনে করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক প্রাচীনতম কৃষ্টির লালনক্ষেত্র ছিল এ অঞ্চল। প্রাচীন সভ্যতার এ কেন্দ্রস্থলগুলো ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরী মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু তাদের প্রভাব উত্তরে হিমালয়ের পাদেশ থেকে দক্ষিণের সাগর সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সিন্ধূ সভ্যতার পরে প্রায় হাজার বছরে ইতিহাস সম্পর্কে যদ্দুর জানা যায়, তা প্রত্নতাত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত মূল্যবান তথ্যাদি নির্ভর। প্রাচীন তক্ষশীলা নগরী {খোদিত প্রস্তাব নির্মিত} খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হতে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলো বলে বিশ্বাস করা হয়। এ নগরীটি হাজারা ও রাওয়ালপিন্ডির মধ্যবর্তী সুদৃশ্য উপত্যকায় অবস্থিত। অষ্টম শতকের প্রারম্ভে এ অঞ্চলের কিছু অংশ আরবীয় মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং এখানকার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সুচনা ঘটে।[৯৮]

আরব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে প্রাচীন যোগসূত্র

আরব এবং বর্তমান পাকিস্তান তথা পশ্চিম ভারতের সর্ম্পক অতি প্রাচীন। এ দুটি ভূখন্ডে বিশেষ করে সিন্ধু এবং দক্ষিণ আরব উপকুলীয় অঞ্চল ভৌগোলিক নৈকট্যের দরুন উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য যোগসূত্র কায়েম থাকা ছিলো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার," কাসাসুল আম্বিয়া " ইত্যাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে এসে প্রথমে দক্ষিণ ভারতীয়"সরনদ্বীপ" সিললে(শ্রীলঙ্কা) আগমন করেন আর মা হাওয়া আগমন করেন'আরবে'। আরাফাত ময়দানে উভয়ের সাক্ষাত ঘটে। এভাবেই আরব ও ভারত থেকে আগতদের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে প্রথম সাক্ষাত হয়। 'সাবাহাতুল মারজান'গ্রন্থে মওলানা আযাদ বিলগ্রামী এ ধরনের কতিপয় বর্ননা একত্রিত করেছেন। এগুলোর সাহায্যে তিনি নিজের জন্মভুমির মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তার লেখায় ইঙ্গিত করেন যে, যখন হযরত আদম(আঃ) জান্নাত থেকে বের হন, তখন হাজরে আসওয়াদ তার সাথেই ছিলো। সেই হাজরে আসওয়াদই শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ ভারত হয়ে মুসমানদের পবিত্র স্থান কা'বাগৃহে গিয়ে স্থান পায়।এছাড়া আরব ঐতিহাসিকদের মতে দক্ষিণ ভারত থেকে যেসব রং-বেরংয়ের সুগন্ধী মসলাজাত দ্রব্য আরবের বাইরে রফতানি হতো এবং সেখান থেকে গোটা পৃথিবীতে ছড়াতো, মূলত এগুলো হচ্ছে সেই জান্নাতী স্মৃতি, যা হযরত আদম(আঃ) সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। কথিত আছে যে, 'তোবা' বলতে আরবী এবং ফার্সী ভাষায় বেহেস্তের যে বৃক্ষটিকে বুঝানো হয়, সেটির নাম ভারতের কয়েকটি ভাষায় রয়েছে। তা'ছাড়া,মহানবীর(সাঃ) এক হাদীছ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এবং তার সাহাবা-ই-কেরাম সাবেক পশ্চিম-ভারত তথা উপমহাদেশ সর্ম্পকে অবহিত ছিলেন।[৯৯]

---

(৯৮) এম রুহুল আলী, ইতিহাসের আলোকে আজকের পাকিস্তান, *ইফা পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪৫
(৯৯) পুর্বোক্ত, পৃ.৭৪৬

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা হলো 'আরব এবং ভারত উপমহাদেশ-এর মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এমন বাণিজ্যিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে, সে সম্পর্ক উভয় অঞ্চল বরং গোটা দুনিয়ার ইতিহাসে প্রভাব ফেলেছিলে,যা ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেছেন। এ অঞ্চলের উৎপন্ন ফসল ও অন্যাণ্য পন্য-সামগ্রী সকল সময়ই ইউরোপ এবং মিশরবাসীর প্রয়োজন পূরন করে আসছে। আরব বনিকরা এ সমস্থ পন্য জাহাজ যোগে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বন্দর থেকে ইয়েমেন এবং সেখান থেকে স্থলপথে সিরিয়া নিয়ে যেতো। সিরিয়া থেকে ঐ সব পন্য জাহাজযোগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। এ ক্ষেত্রে বর্তমান পাকিস্তান অধ্যুষিত এলাকা অত্যন্ত নিয়ামক হিসেবে কাজ করতো।

ইসলাম ও মুসলামনের আগমন

ইসলামী 'আরব এবং উপমহাদেশের মধ্যকার যে যোগাযোগের কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, তার সূত্রপাত হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আবির্ভাবের সামান্য কিছুকাল পর হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে। সেই যোগাযোগ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলো না; বরং ভিন্নরূপ ছিলো। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হাকাম ইবন আমর তাগাল্লুবী ইসলামী ফৌজ নিয়ে ইরান যাচ্ছিলেন। পথে ইরানী ফৌজের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। ইরানীরা সিন্ধুর রাজার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলো। সিন্ধুরাজ ইতিমধ্যেই ' আরবদের বিরুদ্ধে সৈন্য-সামন্তঐক্যবদ্ধ করেছিলো। কিন্ত ইরান ও সিন্ধুর সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে পরাস্ত হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে 'আরবরা অনেক পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হয়। এগুলোতে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে হাতীও ছিল। হযরত 'উমরের খিলাফতকালে এ সময়ে {৬৩৬ খৃঃ) কয়েকটি সংঘর্ষ বাঁধে)। বাহরাইনের ' আরব শাসনকর্তা 'উসমান ইবন আবিল আস সাকাফী হযরত ' উমর (রা.)-এর বিনা অনুমতিতে ওমানের পথে ভারত সীমান্তেসৈন্য প্রেরণ করেন। বোম্বাই এলাকায় থানা নামক স্থানে তিনি একটি নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। খলীফা 'উমর এ নৌ-অভিযানের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি সাকাফীকে তিরস্কার করেন এবং অন্যান্য যে সকল নৌবহর ব্রোচ, দেবল ও আলফিকানে প্রেরিত হয়েছিল, তা ফিরিয়ে আনার জন্য আদেশ দেন। স্থলপথে উত্তর পশ্চিম ভারতে আগমনের প্রচেষ্টা অবশ্য হযরত 'উমর (রা.)-এর সময়েই হয়েছিলো। এ প্রচেষ্টার ফলেই স্থলপথে সেখানে ইসলামের আগমনের পথ সুগম হয়ে উঠে। হযরত 'উসমান (রা.) এবং হযরত 'আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল হতে স্থলপথে সেখানে আগমনের আরও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অবশেষে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'আরব মুসলমানরা দক্ষিণ আফগানিস্তান ও পারস্যের মধ্য দিয়ে বেলুচিস্তানের মাকরানে পৌঁছানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং এ প্রচেষ্টারই পরিণতি ৭১২ খৃস্টাব্দে 'আরবদের সিন্ধু বিজয়। মাকরানের মুসলমান শাসক সাঈদ ইব্ন আসলামকে এক শ্রেণীর লোক ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিলো। সেই হত্যাকারীদেরকে সিন্ধুর হিন্দুরাজা দাহির আশ্রয় দিয়েছিলো। আরবদের সাথে পশ্চিম-ভারতীয় এই রাজা এমনিভাবে বিরোধের বীজ বপন করে রাখে। অন্যথায় পূর্ববর্তী খলীফাগণের মধ্যে হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) যেমন সিন্দুদেশের উপর আক্রমনের পক্ষপাতি ছিলেন না, তেমনি পরবর্তীকালে (৭১২

Dhaka University Institutional Repository

খৃঃ) উমাইয়া শাসক ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকও এ এলাকায় হামলার কোন অভিপ্রায় পোষণ করতেন না। তিনি রাজা দাহিরের সাথে সংঘাতে যাবার কোন প্রয়োজনই বোধ করেননি।[১০০]

কিন্তু আজকের পাকিস্তান তথা উপমহাদেশের বিশাল ভূখন্ড দীন ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হবার জন্য কোন একটি উপলক্ষের প্রয়োজন ছিল বৈ কি ! সম্ভবত এজন্যই সে সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়, যার সূত্র ধরে মুসলমানদের এ অঞ্চলের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। এর সামুদ্রিক এলাকা হয়ে কিছু সংখ্যক মহিলা ও বালক বালিকা সমুদ্র পথে ইরাক যাচ্ছিলো । ঐ জাহাজসমূহে সিংহল (শ্রীলংকা)-এর রাজা ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসূফের উদ্দেশ্যে কিছু উপঢোকনও পাঠিয়েছিলেন। পশ্চিম ভারতের দক্ষিণ দিক দিয়ে যখন জাহাজগুলো যাচ্ছিলো, তখন কচ্ছের জলদস্যুরা এ জাহাজ লুণ্ঠন করে এবং মহিলা ও ছেলেমেয়েদের অপহরণ করে। হাজ্জাজ দেবল তথা সিন্ধুরাজ দাহিরের কাছে এর পুনরুদ্ধারের দাবী করেন। কিন্তু দাহির এতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। হাজ্জাজ তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একটি স্থলবাহিনী প্রেরণ করেন। সমুদ্র পথে একটি নৌবাহিনীও এ অভিযানের সহায়ক হিসেবে প্রেরণ করেন।

'আরব মুসলমানদের পশ্চিম ভারতে আগমনকে স্থানীয় জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছিলো। বর্ণবৈষম্য ও বিজাতীয় আচরণের জন্য ব্রাহ্মণ রাজা দাহির অব্রাহ্মণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিরাগবাজন হয়েছিলো। এ কারণে অব্রাহ্মণ অধিবাসিরা আরব মুসলমানদের ত্রাণকর্তা মনে করে এবং জয়যুক্ত করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। এছাড়া মুসলমানদের সততা, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী স্থানীয় জনগণকে ইসলামের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু এলাকা জয়ের সাথে সাথে আরব ভূমি থেকে এ এলাকায় অনেক ধর্মীয় বিশেষজ্ঞেরও আগমন ঘটতে থাকে, যাঁরা নিজেদের উন্নত চরিত্র, ইবাদত-বন্দেগী, ওয়াজ নসীহত এর মাধ্যমে নানাভাবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে তাদের সামনে তুলে ধরেন এবং তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিম অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলের সিন্ধু, বাহওয়ালপুর ও মুলতান পূর্ণ দখল করতে সমর্থ হন এবং সিন্ধু অববাহিকায় চিরদিনের জন্য ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। কচ্ছ কাথীরাওয়ার এবং গুজরাট ও রাজপুতনারও কিছু অংশ আরব মুসলমানরা জয় করে। করাচীর অদূরে অবস্থিত ভাম্বোর নামে যে দুর্গটি অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে, সম্ভবত সেখানেই দাহিরের দেবল অবস্থিত ছিলো। আরব মুসলমানদের অধীনেও এ শহরটির ব্যবহার অব্যাহত থাকে। ভাম্বোর, হায়দরাবাদ, মুলতান, রোড়ি, সেহওয়ান, উচ ও ব্রাহ্মণাবাদের প্রাথমিক প্রাক-ইসলামী শিল্পকলা প্রাক আরবীয় সংস্কৃতিরই নিদর্শণ।

(১০০) পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-মুসলিম যুগের উপমহাদেশে দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক বিশৃংখলা এবং সামাজিক বিক্ষোভ বিদ্যমান ছিলো। অবিরাম ধর্মীয় সংঘাত সাধারণ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। প্রাধান্য লাভের দ্বন্দ্বে নব্য হিন্দুবাদের সাথে বৌদ্ধ ও জৈনদের যুগব্যাপী সংঘর্ষ জনগণকে ধৈর্যহারা করে তুলেছিলো। অব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করেছিলো।

অপরদিকে মুসলিম শাসকবৃন্দ স্থানীয় জনসাধারণের উপর শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। তাদের চিরাচরিত ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো। মূলত আরব মুসলমানরা হিন্দুদের ইসলামী রাষ্ট্রে {আকদ-ই-জিম্মতের} সুযোগ-সুবিধাসহ বসবাসের অধিকার দিয়েছিল। অমুসলমান নাগরিকদের ধর্ম, জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক অমুসলমান পুরুষদের নিকট হতে জিযিয়া কর গ্রহণ করা হত। জিযিয়া প্রদানকারীকে রক্তের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য ছিল এবং সেক্ষেত্রে অমুসলমানদের কোন সামরিক বাধ্যবাধকতা থাকত না।

ফলে বহিরাগত মুসলমান এবং স্থানীয় অমুসলমানরা পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিও স্থৈর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বসবাস করত। মুসলমানদের সহনশীল শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। পরন্ত ইসলাম ধর্মের সহজ সরল নিয়ম কানুন, এর সুস্পষ্ট ও জীবনমুখী ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও ঘণমুখী আদর্শ অমুসলমান জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। একই সাথে সমসাময়িক উলামা, সুফী ও পীর বুযুর্গদের মহত চরিত্র ও শান্তিপূর্ণ প্রচার কাজ এদের মনে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হাজার হাজার লোক স্বেচ্ছায় দীন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমান শাসনামলে এ ধারা অব্যাহত থাকে। এভাবে এক হাজার বছর যেতে না যেতেই এ অঞ্চলে মুসলমানরা বিস্ময়করভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্তসিন্ধু এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন রাজধানী দামেশকের 'উমাইয়া খলীফার সরাসরি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল বটে, কিন্ত অষ্টম, নবম শতাব্দীর আরব মুসলমানরা পশ্চিম ভারত অঞ্চলে তাদের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য স্থানীয় মুসলিম জনসাধারণের অন্তঃকরণ ছিল ঈমানী আলোকে প্রদীপ্ত।

একাদশ শতকের প্রারম্ভে গজনীর সুলতান মাহমুদ পেশওয়ার, পাঞ্জাব, মুলতান এবং উত্তর ভারতের কিছু অংশ মুসলিম শাসন কায়েম করেন। সে সময় আরবীয় মুসলমান, উলামা-ই কেরাম, সুফী ও মুবাল্লিগণ আজকের পাকিস্তান ও সংলগ্ন ভারতীয় বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করতেন। ইসলামের পতাকাবাহী ও হিন্দু ধর্মের ঘোর শত্রু এমন কি স্থায়ী বিজেতা হিসেবেও সুলতান মাহমুদ গজনভী উপমহাদেশে এসেছিলেন বলে প্রমাণ মিলে না। ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরাই উপমহাদেশে তাঁর আগমনের হেতু বলে মনে হয়। মাহমুদ যেমন এদেশের জনগণকে নিজে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি তারাও নবাগত মুসলমানদের বুঝতে চেষ্টা করুক, তিনি তা চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঘোরের মুঈজুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সাম ওরফে মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোরীর অধীনে উপমহাদেশে মুসলমানদের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা দিল্লী অভিযান করে এবারই মুসলমানরা উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম রাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেয়। পৃথীরাজ চেওহান মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেন এবং তার নেতৃত্বও দেন। কিন্তু তরাইন-এর যুদ্ধক্ষেত্রে এ বাহিনী মুসলমানদের হাতে পরাভূত হয়।

তরাইন বিজয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ঘোড়া পত্তন করে। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে লাহোর হতে উত্তর ভারতের কেন্দ্রস্থল দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর্ত্তরিত করা হয়। তাই বলে উপমহাদেশের ইতিহাসে লাহোর নগরীর গুরুত্ব কখনো ক্ষুন্ন হয়নি। তখন থেকে নিয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃক জবর দখলকৃত হওয়া পর্যন্তমুসলিম বাদশাহগণই দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মুহাম্মদ ঘোরী-এর মাধ্যমে এ দেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার পর তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেক ও ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী তাঁর শাসন নীতি সার্থক করে তুলেন।

অতঃপর ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন গরিমার চুড়ান্তনির্দেশক মোগল রাজত্বকাল (১৫২৬-১৮৫৭ খৃঃ)। তিন শতাব্দীরও অধিককাল মোগলরা উপমহাদেশ শাসন করে। তাদের আমলেই পাক-ভারত বাংলাদেশের ভাগ্যকাশে একটি নতুন বিপদরূপে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে। এ আমলে ফরাসী ও ইংরেজ বণিকরা দেশের অভ্যন্তড়ীণ ব্যাপারে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। জিন্দাপীর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পরবর্তীকাল উপ-মহাদেশে মুসলিম শাসনের পতনের যুগ। সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা ছিল অযোগ্য। ফলে সাম্রাজ্য বিনষ্টের পথে তাদের অনৈক্য, অযোগ্যতা ও অন্যান্য দুর্বলতার সুযোগ নেয় হিন্দুরা। তাদের উপর ভর করে শেষ আঘাত হানে ইংরেজরা। ইংরেজরা বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে জলে স্থলে প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীতে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ দ্দৌলাকে এ দেশীয় কিছু সংখ্যক সেবাদাসের ষড়যন্ত্রে এবং যুদ্ধ নামক প্রহসন ও ছল-চাতুরীর মাধ্যমে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে ইংরেজরা গোটা পাক ভারত তাদের কব্জায় নেয়ার অভিযান শুরু করে। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে সেরিঙ্গাপত্তনের যুদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয় ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান সূচনা করে। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত ডুরান্ড লাইন দ্বারা বৃটিশ ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে চূড়ান্তড়ভাবে সীমানা নির্ধারিত হয়। ১৮৫৬ সালে বর্তমান পাকিস্তানের সকল অঞ্চলসহ উপমহাদেশে পূর্ণ ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী আন্দোলনের সূচনা

১৮০৫ খৃস্টাব্দে শাহ আবদুল আযীয দেহলভী তাঁর পিতা মহান ইসামী ব্যক্তিত্ব শাহওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলন সংগঠনের সূচনা করেন। ইংরেজ শাসন অঞ্চলকে দারুল হারব, ঘোষণা দিয়ে তিনি গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে তোলেন। বাংলাদেশে পীর দুদু মিয়া ও হাজী নিসার আলী তিতুমীর এবং পশ্চিম ভারতে তিতুমীরের মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ ও তাদের এ দেশীয় মদদপুষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। সাইয়েদ আহমদ এবং তিতুমীর একই বছর (১৮৩১ খৃঃ) যথাক্রমে বালাকোটের জিহাদে এবং বাংলায় শহীদ হন। শহীদ সাইয়েদ আহমদ সীমান্তএলাকায় স্বল্পকাল স্থায়ী একটি ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পরই

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমভাগে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুর হয়। বাংলায় এর পূর্বেই তাঁর অনুসারীদের দ্বারা এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় এবং যুগপৎ মুক্তিসংগ্রাম ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলে। সংগ্রামীদের সামনে পীর দুদু মিয়া, তিতুমীর ও সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী ছিলেন প্রেরণার উজ্জল প্রতীক।[১০১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

উপমহাদেশকে ইংরেজ কবলমুক্ত করে স্বাধীন হবার জন্য মুসলমানরাই প্রথম আযাদী সংগ্রামের সূচনা করলে হিন্দুরাও পরে তাতে যোগ দেয়। পরবর্তীতে কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। অত:পর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ইংরেজরা মুসলমানদের দাবী মেনে নেয় এবং হিন্দু নেতারাও ভারত বিভাগে রাযী হন। ১৯৪৬ এর ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমান ভোটারদের সামনে দুটি প্রশ্ন থাকে ঃ তারা পাকিস্তান চায় কি না, ভোটের মাধ্যমে জানাতে হবে। মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিলে পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের অভ্যূদয় ঘটে। ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করে ভারত। উপমহাদেশে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। **পাকিস্তানে আন্দোলন {১৯৪৭-১৯৮৪}**

উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের দুটি ভূ-খন্ড নিয়ে পাকিস্তান দাবীর প্রতি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, আল কুরআনই হবে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র। তাঁর এই আশ্বাসের ফলে উপমহাদেশের জনগণ টেকনাফ থেকে খাইবার পর্যন্তপাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই শাসক মহলের একটি শ্রেণী সেই প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করতে শুরু করে, যে প্রতিশ্রুতির প্রতি আশান্বিত হয়ে দেড় হাজার মাইল দুরের বাংলাদেশ পাকিস্তানভুক্ত হয়েছিল। ফলে এ দেশের জনগণের মধ্যেও নৈরাশ্য দেখা দেয়। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নেতার উক্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উভয় অংশের নেতৃত্বের ও জনগণের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে ! ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তার ভিত্তিতে দেশের সকল অঞ্চলে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বারবার ব্যাহত হতে থাকে। যে গণ-অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা হরণ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক ক্ষমতায় বসেছেন। তাদের আমলে ইসলামের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি, বরং দীর্ঘ দুরত্বের দুই ভূখন্ডের এ দেশটির মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল যে ইসলাম, তার প্রতি অন্যায় আক্রমণ চলতেই থাকে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্তএকটি শাসনতন্ত্র রচনার প্রক্রিয়া চলে। প্রথম গণ পরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৪৯ সনের মার্চ মাসে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ভিত্তি স্বরূপ কতকগুলো মূলনীতি নির্ধারণী প্রস্তাব পাশ করে। এ প্রস্তাবগুলো আদর্শ প্রস্তাব রূপে অভিহিত হয়। আদর্শ প্রস্তাবাবলীর চতুর্থ দফায় ছিল পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র রূপে পরিগণিত হবে।

(১০১) পুর্বোক্ত, পৃ.১৫১

Dhaka University Institutional Repository

এতে ইসলামের নির্দেশিত মানবিক অধিকার, সাম্য, স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের নীতিসমূহ সম্পূর্ণভাবে মেনে চলার ওয়াদা দেয়া হয়। বলা হয়, মুসলিম নাগরিকগণ পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিজেদের জীবনযাত্রা পরিচালনা করবেন।

অতঃপর ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ আকস্মাৎ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে দেন। তারপর বগুড়ার মুহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করে শাসনতান্ত্রিক ফরমূলা তৈরী করেন। কিন্তু এবারও এটি যড়যন্ত্রের শিকার হয়। ১৯৫৪ সনের ২৪ অক্টোবর গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ দেশে জরুরী অবস্থা জারি করে প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৫৫ সালে গণপরিষদ গঠনের আদেশ জারি করা হয়। স্বাস্থ্যগত কারণে গোলাম মুহাম্মদ ইস্তফা দিলে মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা গভর্ণর জেনারেল এবং চৌধুরী মুহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত ও অনুমোদিত হয়। এটি ছিল একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র। বিভিন্ন ইসলামী বিধান এতে সন্নিবেশিত করে একে ইসলামী চরিত্র দান করা হয়। পকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হিসেবে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়। মুসলমান নাগরিকই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারবেন এবং ইসলাম ধর্মের আদেশ ও বিধি-বিধান বিরোধী কোন আইন প্রণীত বা পাশ হতে পারবে না, পরন্তু দেশের প্রচলিত আইনকে ইসলামী নীতি ও নির্দেশের সংগে সামঞ্জস্যশীল করে তুলতে হবে বলে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হয়।

গণবিমুখ ও শাসন-ধারার পরিণতিতে বারবার সামরিক শাসনের অবাঞ্ছিত জগদ্দল পাথর জাতির বুকের উপর চেপে বসেছে। পাকিস্তানের কপট নেতৃত্ব গোটা দেশবাসীর মৃধু দুঃখ দুর্দশারই কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি, দেশটির ভাংনেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশের ঐক্য, সংহতির মূল যোগসূত্র ইসলামের প্রতি অনিহা, এর ফলে অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য, রাজনৈতিক আধিপত্য ইত্যাদি পরিণতিতে গণ-অসন্তেড়ষ দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাবেক পূর্ব পকিস্তান ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙ্গালীর উপর বর্বর হামলা চালায়। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে। এ নিষ্ঠুর বাহিনীর মধ্যযুগীয় পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে প্রতিরোধের আশ্রয় গ্রহন করে।[১০২]

তারপর জুলফিকার আলী বুট্টোর শাসনামলে পুনরায় সারা পাকিস্তানে জামাতে ইসলামী ও জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠনের সহযোগিতায় মুফতী মাহমুদের নেতৃত্বে সম্মিলিত রাজনৈতিক জোটের দ্বারা নিযাম-ই-মুস্তফার দাবীতে প্রচন্ড গণআন্দোলন গড়ে ওঠে।

---

১০২. নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সে দুর্বার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতাচ্যুত হন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে জনৈক রাজনৈতিক নেতাকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জুলফিকার আলী ভুট্রো মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হন। জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন এবং কিছু কিছু ইসলামী আইন কানুন চালু ও কিছু প্রক্রিয়া শুরু ও করেছেন। কিন্তু জনগণ ইসলামী শাসনের সমর্থক হলেও তার স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের ফলে সেখানে ইসলামের তেমন কোন কল্যাণ সাধিত হতে পারছে না। তিনি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বহুবার ঘোষণা করেও তা কার্যকর করেন নি। তারপর থেকে পাকিস্তানের বারবার সামরিক শাসন কায়েম হয়েছে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে ব্যর্থ হয়েছে।

যেসব সামরিক শাসক দীর্ঘকাল একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন পাকিস্তানে তাঁরা হলেন আয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউল হক। ১৯৭৯ সালে জিয়াউল হকের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফঁসি হয়। হকের শাসনকালেই ১৯৮৮ সালে পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক হয়। ওই বছরেই বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়, বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হন ও পাকিস্তানে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। ১৯৯৯ সালে পারভেজ মুশাররফ সামরিক শাসন জারি করেন।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- কৃষিনির্ভর দুর্বল অর্থনীতি। দেশের শ্রমশক্তির ৫৬ শতাংশ কৃষিকাজে নিযুক্ত ও জাতীয় উৎপাদনের ২৫ শতাংশ কৃষিপণ্য। প্রধান ফসল গম, তুলা, ধান, আখ, ফল, সবজি ও গবাদিপশু। খাদ্যেশস্য স্বনির্ভর। প্রধানশিল্প কাপড়কল, খাদ্য প্রস্তুতি, গৃহনির্মাণ সরঞ্জাম, কাগজ কল। রপ্তানি করে তুলা, কাপড়, চাল, চিংড়ি ও আমদানি করে তেল, যন্ত্রপাতি, পরিবহন সরঞ্জাম, ভোজ্যতেল, রাসায়নিক। পাকিস্তানের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ৬৩৪০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৪৭০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-দেশটিতে ১৯৭৩ সালের ১০ এপ্রিল প্রবর্তিত সংবিধান অনুসারে দেশ শাসিত হচ্ছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সংবিধান স্থগিত এবং সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ১৫ নভেম্বর ২০০২ সালে সংশোধনী আনা হয়। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রশাসনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। দেশের শাসন দায়িত্ব জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভা প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করেন। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ উচ্চকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। সিনেটের সদস্য ১০০ জন, নিম্নকক্ষর সদস্য সংখ্যা ৩৪২। ২৭২ টি আসনে সরাসরি নির্বাচন হয়, ৬০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এবং ১০টি সংখ্যালঘু জন্য সংরক্ষিত তারা ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। দেশটি চারটি প্রদেশে বিভক্ত, যথা ঃ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, মুহাজির কউমি মুভমেন্ট, আওয়ামি ন্যাশনাল পার্টি। ভোটাধিকার ২১ বছর বয়সে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩৪. ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিনের প্রস্তাবিত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নাম The State of Palestine। ফিলিস্তিনের আয়তন ১০,৪২৯ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৩১ লক্ষ সকলে মুসলিম, মাত্র ২ শতাংশ খ্রীষ্টান, রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ফিলিস্তিন উসমানীয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ১৯১৮ সনের পর এটি বৃটিশ ম্যান্ডেটভুক্ত হয়। তখনই শুরু হয় বৃটিশ প্রশ্রয়ে ইহুদী আগমন। অথচ ১৯১৯ সনে ফিলিস্তিনের জনসংখ্যা প্রায় সবই ছিল আরব। ফলে ইহুদী আগমনের বিরুদ্ধে আরবদের বিক্ষোভ চলতে থাকে। ১৯২১ ও ১৯২৯ সনে আরব বিক্ষোভ বৃটিশ শাসকচক্র নির্মম হাতে দমন করে। ১৯৩০ সনের জোপ সিমসন ও পাসফিল্ড রিপোর্ট ইহুদী আগমন বন্ধ করা এবং আরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা রেখে একটি বিধানসভা গঠনের সুপারিশ করে। কিন্তু ইহূদীদের চাপে এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এদিকে ইহুদী আগমন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে, ফিলিস্তিনে ইহুদী বা আরব রাষ্ট্র স্থাপন তাদের লক্ষ্য নয়, বরং তাদের লক্ষ্যে ফিলিস্তিনে আগামী দশ বছরে যেন এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন হয় আরব ও ইহুদী স্বার্থ রক্ষার নিশ্চতায় প্রদান করা হয়।[১০৩]

ফিলিস্তীন মুক্তি সংস্থা পি.এল,ও-র প্রতিও সিরীয় সরকারের আচরণ মোটেই সন্তেভ্রষজনক নয়। পি,এল,ও-র বিরাট শক্তিশালী সংগঠন আজ যে দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতি কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে-এর পেছনেও সিরীয় সরকারের ভূমিকা কার্যকর ছিলো। পি.এল,ও নেতা জনাব তাইয়্যেব অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ১৯৭৬ সালে সিরিয়া যখন পি.এল. ও-র উপর আঘাত হানার চেষ্টা করে, তখন ইসরাইল ছিল দর্শকের ভূমিকায়। আর আজ যখন ইহুদীরা ফিলিস্তিনীদের নির্বিচারে হত্যা কর যাচ্ছে সে সময় সিরিয়া চুপ থেকে ইহুদীদের সহায়তা করছে। ১৯৬৮ সালে সিরীয় সরকার তাদের দেশের পি.এল.ও ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৯ সালে পি.এল.ও যোদ্ধাদের ব্যাপক হারে আটক করা হয়। ৭১ সালে সিরিয়া থেকে ইসরাইলের উপর গেরিলা তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। '৭৩ সালে সিরিয়া ইসরাইল যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করা পি.এল.ও-র জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। '৭৪ সালে পি.এল.ও যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়া হয় এবং তাদেরকে ব্যাপক হারে বন্ধী করা হয়। ১৯৮২ সনে ফিলিস্তিনীদের ওপর ইসরাইলী বর্বরোচিত হামলার সময় ফিলিস্তিনীদের জন্য আসা রসদপত্র, অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সিরীয় বাহিনী কেড়ে নিয়ে যায়। ১৯৮৩ সনের ১৫ নভেম্বর সিরীয় গোলন্দাজ বাহিনীর ছত্রছায়ায় পি.এল.ও-র বাদাভী ঘাঁটির পতন ঘটানো হয়। ৪০ লক্ষ ফিলিস্তিনীর প্রাণপ্রিয় সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান পি.এল.ও-কে ছিন্নভিন্ন করে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত আকারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

---

১০৩. হারুন্নার রশিদ ভূইয়া ও আব্দুল হামিদ (সম্পাদিত), *রাষ্ট্র অভিধান*, ঢাকা,২০০৭, পৃ.১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফিলিস্তিনে ইহুদীরা বৃটিশ উপস্থিতির বিরুদ্ধে চলে যায়। বৃটেন বিষয়টি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতিসংঘে প্রেরণ করে। জাতিসংঘ বিশেষ কমিটি ফিলিস্তিন বিভক্ত করার সুপারিশ করে, যা সাধারণ পরিষদও গ্রহণ করে। কিন্ত জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্তবাস্তবায়ন না করে ১৪ মে ১৯৪৮ সালে বৃটিশ হাই কমিশনার ফিলিস্তিন ত্যাগ করে এবং ইহুদীরা ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা করে। সাথে সাথে তথাকার আরব জনগণকে রক্ষার জন্য মিশর, ইরাক, জর্দান, লেবানন ও সিরিয়া সৈন্য পাঠায়। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্তযুদ্ধে ইসরাইল প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দকৃত ভূ-ভাগের ৪০ শতাংশ দখল করে। মিশর গাজা এবং জর্দান তীর দখল করে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের যুদ্ধে ইসরাইল গাজা ও পশ্চিম তীর দখল করে নেয়। জাতিসংঘের রেজলেশন সত্ত্বেও ইসরাইল পশ্চিম তীর এবং গোলান মালভূমি হতে সৈন্য প্রত্যাহার করছে না। বরং অন্যায়ভাবে গোলান মালভূমি গ্রাস করেছে এবং পশ্চিম তীর ও গাজায় ইহুদী বসতি বাড়াচ্ছে। ১৯৯৩ সালে পিএলও ইসরাইল চুক্তির ফলে ইসরাইল পশ্চিম তীর পিএলওর সীমিত স্বায়ত্তশাসন মেনে নেয়। ২০১২ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভোটাধিক্যের মাধ্যমে ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।[১০৪]

৪.১.৩৫. বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ইংরেজিতে বলা হয় People's Republic of Bangladesh দেশটির আয়তন১,৪৭,৫৭০ বর্গকিমি, ভূমি অঞ্চল ১,৩৩,৯১০ বর্গ কিমি (৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ৪৩১৯৬২৮। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ। সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশগুলির তালিকায় বাংলাদেশ নবম স্থানে। অধিবাসীরা বাংলাদেশী নামে পরিচিত। বঙ্গভাষী ৯৮ শতাংশ, অবাঙ্গালী (বিহারি) আড়াই লক্ষ, আদিবাসী প্রায় দশ লক্ষ। ৮৩ শতাংশ মুসলিম (সুন্নী), ১৬ শতাংশ হিন্দু, বৌদ্ধ খৃস্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বী লোক এক শতাংশ কম। গড় আয় ৫৫। সাক্ষরতা ৫৪.৮ শতাংশ। পুরুষ ৪৭ শতাংশ, নারী ২৬ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা বাংলা, তবে ইংরেজি মোটামুটিভাবে প্রচলিত। রাজধানী ঢাকা , প্রচলিত মুদ্রা- টাকা। একশ পয়সায় এক টাকা।[১০৫]

ভৌগলিক পরিচয়:- মোট সীমান্তরেখা ৪,২৪৬ কিমি, তার মধ্যে ১৩৯ কিমি মিয়ানমার (বার্মা) সীমান্তেড় , বাকি ৪,০৫৩ কিমি ভারত সীমান্ত। বঙ্গোপসাগরের তটরেখা ৫৮০ কিমি। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীস্ম, প্রবল বর্ষা- এই তিন ঋতুই প্রধান। দেশটির অধিকাংশ এলাকা সমতল ও পলিমাটির সৃষ্টি তাই উর্বর। দক্ষিণ-পূর্ব পর্বতময়। দেশের ৬৭ শতাংশ জমি চাষযোগ্য। বনভূমি ১৬ শতাংশ, বনজ সম্পদের মধ্যে প্রধান কাঠ। প্রাকৃতিক গ্যাস ও ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘ বিশিষ্ট বন্যপ্রাণী, মধু অন্যতম বনজ সম্পদ।

---

১০৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ ডিস্মেবর, ২০১২
১০৫. *Europa (2004)*, Ibid, V-1, PP.680 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৬৮০-৭০৩)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম, বাংলার কংগ্রেসের অন্যতম অসাম্প্রদায়িক নেতা শরৎ চন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায় সহ আরও অনেকে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানান। এ প্রস্তাবটি বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে পরিচিত। ঐ সকল নেতৃবৃন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে,কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই নিজেদের স্বার্থে বাংলার স্বার্থকে পদদলিত করতে কুণ্ঠিত হবে না। সে ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু পরিকল্পিত স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে বাংলার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একটি প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশালী অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের গোরাপত্তন করতে পারত। কিন্ত এ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।[১০৬]

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট মুহম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা নাম নিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশর ইতিহাসে পাকিস্তানি আমল।

ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের জন্ম ছিল অভূতপূর্ব ও অবাস্তব। এর দুটি অংশ পরস্পর থেকে ১৫০০ মাইল বিদেশী অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতি ছিল পরস্পর থেকে পৃথক। একমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা যে শুভ হয়নি পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ।[১০৭]

ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি

পাকিস্তানের জনক মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বাঙ্গালীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রথম ভাষার উপর আঘাত হানেন। পাকিস্তানের শতকরা ৫৪ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দু কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। অথচ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালান হয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে যে মহান আন্দোলন শুরু হয় তাই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। বদরুদ্দীন উমর প্রণীত পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি নামক গ্রন্থে স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ঘোষণা পত্রে বাংলাভাষাকে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা রুপে গ্রহণ করার দাবি করেন তার উল্লেখ আছে।

---

১০৬. কে এম রাইছ উদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, (নবম সংস্করন), পূর্নমুদ্রণ-২০০১, ঢাকা, পৃ.৬৩৬

১০৭. আবু দেলোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হলে পূর্ব বাংলার ছাত্র শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পরের বছর জানুয়ারী মাসে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল ঃ (১) বাংলা ভাষাই পূর্ব বাংলার শিক্ষার বাহন এবং অফিস আদালতের ভাষা; (২) পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা দুটি 'বাংলা ও উর্দু'। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। মুসলিমলীগ সদস্যগণ এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। এমন কি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও প্রস্তাবটির সমালোচনা করেন। ঢাকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হলে ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়।[১০৮]

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সংগঠন বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে এক সভায় মিলিত হয়। কামরুদ্দীন আহম্মদ এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং সরকারের বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ১১ মার্চ সংগ্রাম পরিষদ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ঐদিন সমগ্র পূর্ব বাংলার ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা শুরু হয়। পুলিশ অনেককে গ্রেফতার করে এবং বহু ছাত্র আহত হয়। এর প্রতিবাদে পুনরায় ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয় এবং এ ধর্মঘট ১৫ মার্চ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পূর্ব বাংলার অন্যান্য জেলাতেও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। তৎকালীন মুখ্য মন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। পরপর দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনেক বাকবিতন্ডার পর খাজা নাজিমউদ্দিন ও সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্তগুলোর মধ্যে ছিল ঃ (১) রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে এ পর্যন্ত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি দান; (২) পুলিশি জুলুমের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠান (৩) পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন (৪) প্রদেশে ইংরেজি উঠে যাবার পর সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলা প্রবর্তন; (৫) সংবাদ পত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি।[১০৯] গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জিন্নাহ এক জনসভায় ঘোষণা করেন উর্দু এবং উর্দুই হবে পকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। তার এরূপ উক্তিতে আপামর বাঙালী জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তিনদিন পর ঢাকার কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ পুনরায় একই কথা জোরের সাথে ঘোষনা করলে ছাত্ররা না না বলে তার ঘোষণার প্রতিবাদ করে।

---

১০৮. কে এম রাইছ উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৩৮
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ,৬৪০

Dhaka University Institutional Repository

জিন্নাহ ঢাকায় অবস্থান কালে ভাষা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কয়েক দফায় আলোচনায় বসেন। কিন্তু তিনি ভাষার প্রশ্নে কোন রকম আপোষ করতে রাজি হননি। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু হয়। তার স্থলে গভর্নর জেনারেল পদে অভিষিক্ত হন উর্দু ভাষী বাঙ্গালী খাজা নাজিমউদ্দিন (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিঃ)। পূর্ব বাংলার স্বার্থের দিকে খাজা নাজিমউদ্দিনের বিশেষ নজর ছিল না। তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন তা তার মধ্যে ছিল না। মার্কিন লেখক তার সম্পর্কে বলেন যে, দুর্বল চিত্তের অধিকারী খাজা নাজিমউদ্দিন নুরুল আমিনকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত নুরুল আমিন এ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে ঘোষণা করেন, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে। পূর্ব বাংলার জনগণ এর প্রতিবাদে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে গণপরিষদে ভাষার প্রশ্ন আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর তারিখে লিয়াকত আলী খান অততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তখন খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তার এই নিযুক্তি ছিল বেআইনি ও অগণতান্ত্রিক। কারণ লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর তিনি এমন একটি মন্ত্রীপরিষদ দ্বারা নিযুক্ত হন যার কোন বৈধ অস্তিত্ব ছিল না। যাহোক সমস্যার সমাধান অপেক্ষা সমস্যা সৃষ্টি করার ব্যাপারেই নাজিমউদ্দিনের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।[১১০]

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী নাজিমউদ্দিনের জিন্নাহ সাহেবের অনুসরণে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বলে ঘোষণা করেন। খাজা সাহেবের এ ঘোষনায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি মহলে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। শুরু হয় প্রদেশব্যাপী হরতাল ধর্মঘট ও ছাত্র বিক্ষোভ। ভাষা আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এর সদস্য ছিলেন আতাউর রহমান খান, আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমদ, তোয়াহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১১ ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশে প্রস্তুতি দিবস এবং ২১ ফেব্রুয়ারীতে সারাদেশে হরতাল সভা ও শোভাযাত্রার ডাক দেয়া হয়। অপর দিকে পুর্ব বাংলার নুরুল আমিন সরকার ২১ ফেব্রুয়ারী কর্মসুচি বানচাল করার উদ্দেশ্যে ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল থেকে ঢাকায় মিছিল ও জন সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দীর্ঘ এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্ত ২১ ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে শোভাযাত্রা বের করে দিকে দিকে শ্লোগান দেয় রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। ঐ দিন পূর্ব বাংলা সরকারের বাজেট অধিবেশনের দিন ছিল। ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজের সম্মুখে ছাত্ররা সমবেত হয়। দুপুর দু'টার সময় পুলিশ বাহিনী ছাত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করে এবং কাদুন গ্যাস নিক্ষেপ করে। তবুও আন্দোলনের প্রচন্ডতা কিছুমাত্র প্রতিহত করা সম্ভব হল না দেখে এক পর্যায়ে তারা মিছিলের উপর গুলিবর্ষন করে।

---

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বার, সালাম, শফিউর রহমান এবং আরও অনেকে প্রাণ হারায় এবং আহত হয় অসংখ্যা। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের ধর্মঘট পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করার অপরাধে মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অলি আহাদ, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, এম ওসমান আলী প্রমূখকে গ্রেফতার করা হয়। সর্বত্র ধড়পাকড় শুরু হয়। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবিতে সে দিনের বাঙালির আত্মত্যাগ ছিল অতুলনীয়। বাংলার দেয়ালে দেয়ালে পথে প্রান্তরে যে রক্ত শপথের বীজ ছড়িয়ে পড়ে তার কাছে শেষ পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টাকে হার মানতে হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন স্বয়ং বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা করার প্রস্তাব করেন (এপ্রিল, ১৯৫২ খ্রিঃ)। অতঃপর বাংলা ভাষা উর্দু ভাষার পাশে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায়।[১১১]

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের শাসন অব্যাহত ছিল। মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জনমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এ পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন যুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ কঠিন বিবেচনা করে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি ঐক্যজোট গঠিত হয়। ফজলুল হক ইতিমধ্যে কৃষক শ্রমিক পাটি নামে একটি নতুন দল গঠন করেছিলেন। ঐক্যজোটের দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পাটি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং একুশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। একুশ দফার মধ্যে দুটি বিশেষ দফা ছিল পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবি। অন্যান্য দফার মধ্যে ছিল নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দী মুক্তি, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা, পাট শিল্পকে জাতীয়করণ এবং পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রদানের ব্যবস্থা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ পরিকল্পনা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণ, উচ্চপদস্থ ও নিম্নসরকারী কর্মচারীদের বেতনের সমতা আনয়ন বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা পৃথকীকরণ এবং ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা।

১১১. কে এম রাইছ উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে একুশ দফা ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তিসনদ। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশ ব্যাপী সফর করে ২১ দফাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। পূর্ব বাংলার আপামর ছাত্র-জনতা যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়ের ব্যাপারে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করে। প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি। সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। যুক্তফ্রন্টের এ বিজয় ছিল মুসলিম লীগের সাত বছরের কুশাসন ও শোষনে জর্জরিত পূর্ব বাংলার জনগণের পুঞ্জিভূত বেদনা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। দেশবিদেশের পত্র পত্রিকায় একে ব্যালট বাক্সে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১১২]

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল (১৯৫৮-৬৮ খ্রিঃ)

এ ঘটনার মাত্র অল্প কয়েকদিন পর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্যার একান্ত বিশ্বস্ত সহচর আইয়ুব খান এক অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইস্কান্দার মীর্যা বহু উচ্চাশা করে সেনাপতি আইয়ুব খানকে দেশে গণতন্ত্র হত্যার কাজে গোপন ষড়যন্ত্র ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে, সামরিক আইন ঘোষনার মাত্র ২০ দিন পর অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান রাজনৈতিক অবস্থার অবনতির অপরাধে ইস্কান্দার মীর্যাকে অপসারণ করেন এবং নিজেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেও বহাল থাকবেন। আইয়ুব খান এ ক্ষমতা গ্রহণকে অক্টোবর বিপ্লব নামে অভিহিত করেন। ক্ষমতাসীন হয়ে আইয়ুব খান তার স্বঘোষিত অক্টোবর বিপ্লবের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য দেশের ও দশের মঙ্গলের দিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার আরম্ভ করেন এবং অনেকের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও দুনীতির অভিযোগ আনেন। সস্তা জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থণ লাভের জন্য তিনি ব্যবসায়ীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দ্রব্যমূল্যে স্বাভাবিক করেন, দুর্নীতি দমনের জন্য মারপিট ও গ্রেফতার করেন এবং দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তিনি সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবেন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। আইয়ুব খান সুচতুর রাজনীতিবিদ ছিলেন। দেশের জনগণ তার কার্যকলাপে ও প্রতিশ্রুতিতে সহজে বিশ্বাস করে ও তাকে সত্যিকার জনদরদি শাসক মনে করে এ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানায়। প্রথম অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানেরও তিনি কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তিনি নানা পন্থা উদ্ভাবন করেন। জনগণের কিছু আস্থা অর্জন করে তিনি রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট তিনি পেডো (Public Office Disqualification Order) এবং এবডে (Elective Bodies Disqualification Order) নামে দুটি আদেশ জারি করে দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নির্বাচনে অংশ গ্রহনের অযোগ্য ঘোষণা করেন।

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও এই আইনের আওতায় পড়েন। এর অল্প কিছুদিন পরই ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর তার বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে গণতন্ত্রের প্রতি তার নিজস্ব চিন্তাধারা ও বহুদিনের উদ্ভাবিত পরিকল্পনা পেশ করেন, যা মৌলিক গণতন্ত্র নামে অভিহিত হয়।[১১৩]

রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বৈষম্য নীতি অনুসরণ করে আসছিল। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এক বিরাট আর্থিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষে পুর্ব পাকিস্তানের জনমনে শাসকগোষ্ঠির সীমাহীন উদাসীনাতা এবং দু অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যমুলক আচরণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাধতে থাকে এবং একই সাথে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবিও জোরদার হতে থাকে। এ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ঐতিহাসিক লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স আহবান করেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সম্বলিত এক কর্মসূচী পেশ করেন যা ঐতিহাসিক ৬ দফা নামে পরিচিতি।

আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনের সূচনা

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী শহীদ সোহরাওয়াদী ও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ আতাউর রহমান খানের বাড়িতে পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের উপায় বের করার জন্য মিলিত হন। এ ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পরেই দেশকে ধ্বংশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ অভিযোগে সোহরাওয়ার্দীর করাচিতে গ্রেফতার করা হয়। আইয়ুব খান এ সময়ে ঢাকা সফরে আসেন। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্র সমাজও প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আইয়ুব খান তখন জননিরাপত্তা অর্ডিনেন্সের বলে বেশির ভাগ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে গণআন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিয়া), আবুল মনসুর আহমদ, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, তাজ উদ্দিন, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, কোরাবান আলী প্রমুখ এ দমন নীতির শিকার হয়েছিলেন।[১১৪]

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন

আওয়ামী লীগ নিজেদের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। তাই তারা নিজস্ব ৬ দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। অন্যান্য দলগুলো বিশেষ করে মস্কোপন্থী ন্যাপ আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনে বিশেষ আগ্রহী ছিল।

---

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫০
১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫১

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মওলানা ভাসানী পরিচালিত ন্যাপের ভিতর প্রথম থেকেই নির্বাচন প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দেয়। অবশেষে প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী দলগুলো একত্রিত হয়ে ইসলাম পছন্দ নামক নির্বাচনী ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে। ৫ অক্টোবর নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পুর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। অতঃপর সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ স্থির করেন ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর তারিখ ১৭ ডিসেম্বর।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সরকারের মোটামুটি একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল। সরকারের মতে, জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ৪৬টি আসন অথবা বেশি হলে ৬০ থেকে ৭০টি, মুসলিম লীগের ৩ দল মিলে ৬০ এবং মাওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও জামায়াতে ইসলামসহ বাকি দলগুলো অবশিষ্ট আসনগুলো পাবে। পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তার উপদেষ্টাদের ধারণা জন্মে যে, জাতীয় পরিষদের ১৪৪টি আসনের মধ্যে জেড.এ. ভূট্টোর পিপলস পার্টি ২০ থেকে ৩০টি আসন পাবে এবং বাদবাকী আসনগুলো ওয়ালী খানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও জামায়াতে ইসলাম পাবে। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী অধ্যাপক জি.ডব্লিউ.চৌধুরী লন্ডনে পাকিস্তান সোসাইটিতে ভাষণ দানকালে বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন দলেরই একক সংখ্যা গরিষ্টতা লাভের সম্ভাবনা নেই। প্রেসিডেন্ট ও তার উপদেষ্টাদের ধারণা ছিল যে, বিভিন্ন পার্টি কিছু কিছু আসন পাবে। ফলে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নির্বাচনের ফলাফল তারা নিজেদের অনুকূলে মনে করে এতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করেননি।[১১৫]

শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ বিকেল ৩টায় রেসকোর্স ময়দানে(সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিব এক বিশাল জনসভায় ভাষন দেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশ তখণ এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। ইতিপূর্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রকাশ্যে স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছে। জনগণও মানবিক দিক থেকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এখন সকলের দৃষ্টি শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নিবদ্ধ তিনি কি বলেন। রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষনা করেন ঃ ''এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি আরও বলেন ''রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরও রক্ত দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান ''ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ জনতা নেতার এ উদাত্ত আহবানকে স্বাগত জানায় এবং দেশের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দেয়।[১১৬]

পাকিস্তানি আক্রমন ও মুক্তিযুদ্ধ

২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরাস্ত্র বাঙ্গালীর উপর আক্রমন করার পর পরই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয় চট্টগ্রামে রাত ৮.৩০ মিনিটে। এতে অংশ গ্রহণ করেছিল ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, আনসার, যুব সম্প্রদায় ও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। এভাবে দেশের সর্বত্র বাঙালিরা দলমত নির্বিশেষে মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। এদের নিয়ে গঠিত হয় মুক্তি বাহিনী। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ থেকে পরবর্তী নয় মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলতে থাকে সে সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিকেল ৪-২১ মিনিটে পাক হানাদার বাহিনীর ইষ্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল এ.এ.কে,.নিয়াজী ৯৩ হাজার সহযোগী সৈন্য নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোঁরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এভাবে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় এবং বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।[১১৭]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ভারত ভাগের সময় বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অংশ, তখন নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের এবং ওআইসি'র সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব নিহত হন, দেশে সামরিক শাসন কায়েম হয়। ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র ফিরে আসে। ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে, প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বৃহত্তর দল হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে, প্রধানমন্ত্রী হয় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। রাজধানী ঢাকা একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ শহর। পাট, তৈলবীজ, চিনি ও চায়ের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, তাতবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। রাসায়নিক, কাঁচ, ধাতব সামগ্রীর কারখানা ও কুটির শিল্প আছে শহরে ও গ্রামে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর- রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও বন্দর শহর চট্রগ্রাম, খুলনা, বরিশাল।

---

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৭২
১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতি পরিচয়:- কৃষিনির্ভর দেশ। দেশের শ্রমশক্তির ৭০ শতাংশ কৃষিজীবি ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ কৃষিপণ্য। রপ্তানিরও এক-তৃতীয়াংশ কৃষিপণ্য। ১০ শতাংশ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পাট রপ্তানিকারী দেশ। পাট ছাড়াও ধান, গম, চা, আখ, আলুর চাষ হয়। গম ও বনস্পতি, তেল আমদানি করতে হয়। মাছ ধরাতেও অগ্রণী দেশ, বছরে প্রায় আট লক্ষ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদানর ২০ শতাংশ। গার্মেন্টস শিল্প, পাটকল, কাপড়কল, সার কারখানা, খাদ্য প্রস্তুতি ও ইস্পাত প্রধান শিল্প। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া গেছে। মোট জাতীয় উৎপাদন ২,৩১০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু বার্ষিক ড় আয় ৪০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের শাসন দায়িত্ব নির্বাহ করেন। এককক্ষ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩০০। নির্বাচিত সদস্যরা ৩০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত করলে সংসদের সদস্য সংখ্যা হয় ৩৩০। প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দল আওংয়ামী লীগ, বাংলাদেশের ন্যাশনালিষ্ট পার্টি (বিএনপি), জাতীয় পার্টি, জামাত-ই-ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কস পার্টি, বাসদ, জাসদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। সার্বজনীন ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

৪.১.৩৬. বারকিনা ফাসো

বারকিনা ফাসোর[১১৮] সাংবিধানিক নাম Burkina Faso এবং ইংরেজি Republic of Burkin Faso, আয়তন ২,৭৪,২০০ বর্গকিমি (১,০৫,৮৭০ বর্গমাইল)। দেশটির লোকসংখ্যা- ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯১৭৩৬, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ। অধিবাসীরা বার্কিনাবে নামে পরিচিত। পঞ্চাশটি আফ্রিকান ট্রাইবের বাস এই দেশে, যাদের সংখ্যা মোসি ট্রাইব প্রায় ২৫ লক্ষ, মোসি (Mossi), ৪৭.৯ শতাংশ, পাউল(Peul) ১০,৩ শতাংশ, বাবু (Bobo) ৬.৯ শতাংশ, লোবি Lobi ৬.৯ শতাংশ, মান্দি Mandi ৬.৭ শতাংশ বাকীরা অন্যান্য উপজাতী। অন্যান্য উপজাতীয় গুরুনসি, সেনুফো, লোবি, বোবো, মান্দি, ফুলানি। ৬৫ শতাংশ লোক আবিধর্মে বিশ্বাসী, মুসলিম ২৫ শতাংশ, ক্যাথলিক ১৯ শতাংশ (সাক্ষর ২৪.৮ শতাংশ)। গড় আয়ু ৪৫.৭ বছর। রাষ্ট্রভাষা ফরাসি। রাজধানী আওগাডওগউ (Ouagadougou), প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঁ।

ভৌগলিক পরিচয়- পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত ভূমিবদ্ধ দেশ। দেশটির উত্তর ও পশ্চিমে মালি, পূর্বে নাইজার, দক্ষিণে বেনিন, টোগো ঘানা ও আইভরিকোষ্ট অবস্থিত। তবে দক্ষিণে গিনি উপসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত দেশ আইভরি কোষ্ট এর সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব পর্বতময়। ভোল্টা নদীর উৎস। উত্তরদিকে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে শুষ্ক, দক্ষিণ দিক উর্বর ও বনাচ্ছন্ন। অত্যধিক গোচারণ ও বন উচ্ছেদের ফলে দেশে বৃষ্টিপাত কমছে। কৃষি ও পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল দেশ।

---

১১৮. বারকিনা ফাসোর পূর্বের নাম আপার ভোল্ট। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করার সময় আপার ভোল্ট নামেই দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৮৩ সালে ক্যাপ্টেন টমাস শঙ্করের নেতৃত্বে দেশটিতে যে সরকার গঠিত হয় সে সরকার দেশের নাম, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি পরিবর্তন করেন। ১৯৮৪ সালে দেশের নতুন নামকরণ করা হয় বারকিনা কাসো।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত নাইজার ও আপার সেনেগালের উপনিবেশ থেকে ১৯১৯ সালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অঞ্চলটি আপার ভোল্টা উপনিবেশ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩২ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আওতাভূক্ত হয়ে যায় পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পূনর্গঠিত হয়। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। তখন নাম ছিল 'আপার ভোল্টা'', ১৯৮৪ সালে 'বারকিনা ফাসো' নাম হয়। ঘন ঘন সামরিক অভুত্থানের ফলে গণতন্ত্র স্থায়ী হয়নি। ১৯৯১ সালে সর্বশেষ সংবিধান গৃহীত হয় ও তার ভিত্তিতে ১৯৯২ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী Ouagadougou প্রাচীন শিল্পসমৃদ্ধ শহর, লোকসংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ।[১১৯]

অর্থনৈতি পরিচয়:- অরন্যাঞ্চলে ৫০.৪ শতাংশ, কৃষিযোগ্য জমি ১৩ শতাংশ পানিসিঞ্চিত জমি ০.৬ শতাংম এ ধরনের জমিও কৃষি জমির অংশ। কৃষি, পশুপালন ও সামান্য শিল্প নিয়ে জাতীয় অর্থনীতি। কৃষি কাজে দেশের ৮২ শতাংশ লোক নিযুক্ত ও জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ কৃষিপণ্য। প্রধান ফসল বাদাম, তুলা, তৈলবীজ। খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। শিল্পকাজে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ১৩ শতাংশ ও জাতীয় উৎপাদনে শিল্পজাত পণ্যের অবদান ১৫ শতাংশ। পশুপালন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পশু চামড়া, তেলবীজ ও তুলা রপ্তানি হয়। কিন্ত সোনা পাওয়া যায় ও যার সম্পূর্ণই রপ্তানি হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন ২৯০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৮৭০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯১ সালে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান গৃহীত হয়ে ১৯৯৭,২০০০ এবং ২০০২ সালে সংশোধিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপধান ও মুখ্য শাসক। সচিব মন্ডলীর সহায়তায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এককক্ষ জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল অর্গানাইজেশন ফর পপুলার ডেমোক্রেসি (ও ডি পি), কো-অর্ডিনেশন অফ ডেমোক্রেটিক ফোর্সেষ (সিএফডি) ইত্যাদি।

৪.১.৩৭. বাহারাইন

বাহারাইনের সাংবিধানিক নাম Memleket Ul Bahrayn এবং ইংরেজিতে বলা হয় Kindom of Bahrain দেশটির আয়তন ৭১৭.৫ বর্গকিমি (২৭৭ বর্গমাইল)। মোট পরিধি ১৬১ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা 'বাহারাইনি' নামে পরিচিত। অধিবাসীদের মধ্যে বাহরাইনি ৬৩ শতাংশ, এশিয়ান ১৩ শতাংশ, অন্য আরব দেশের লোক ১০ শতাংশ, ইরানিয়ান ৮ শতাংশ, অন্যান্য ৬ শতাংশ। সকলেই মুসলিম-শিয়া ৭০ শতাংশ, সুন্নি ৩০ শতাংশ। সাক্ষর ৮৭.৯ শতাংশ। গড় আয়ু ৭৩.২ বছর। সরকারি ভাষা আরবি, তবে ইংরেজি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ফার্সি ও উর্দু চলে। রাজধানী মানামা,প্রচলিত মুদ্রা- বাহারাইনি দিনার।

ভৌগলিক পরিচয়:- পারস্য উপসাগরে বালুকাময় অনুর্বর ৩৫টি দ্বীপের সমষ্টি। এটি সৌদি আরবের পূর্বে বাহরাইন উপসাগরের একটি দ্বীপ। বাহারাইন দ্বীপের দক্ষিণে পশুপাখির জন্য বনভূমি সংরক্ষিত আছে, অভিজাত শেখদের শিকারের জন্য। শীতকালের আবহাওয়া মনোরম। দ্বীপে পানীয়জলের উৎস শেষ হয়ে আসছে, সমুদ্রের পানি লবণমুক্ত করে পান করা ছাড়া উপায় নেই।

---

১১৯) *Europa (2004)*, Ibid, V-1, PP.929 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৯২৯-৯৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- সউদী 'আরব ও কাতার উপদ্বীপের মধ্যবর্তী উপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন নাম আল বাহরাইন। বর্তমানে স্বাধীন এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি কেবল বাহরাইন নামে পরিচিত। এটি কাতারের পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন। প্রাক-ইসলামী যুগে ও ইসলামী যুগের প্রথম দিকে আল বাহরাইন বলতে বোঝাতো পূর্ব আরবের মূল ভূখন্ডকে। আল কাতিফ ও আল হাজার { বর্তমানে আল হাসা} মরূদ্যান নিয়ে গঠিত ছিলো এই অঞ্চল। পরবর্তীকালে সমুদ্র মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জই কেবল বাহরাইন নামে অভিহিত হতে থাকে।[১২০] প্রাচীন দ্বীপ। খ্রষ্ট্র পূর্বাব্দ ২০০০-১৮০০ পর্যন্ত এটি আরব বণিকদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন হিসেবে শাসিত হয়েছে সুদীর্ঘকাল। সপ্তদশ শতক পারস্য শাসনাধীন হয়। ১৭৮৩ সালে আল খলিফা রাজবংশ দেশটি শাসন করতে প্রস্তুত করে। ১৮৬১ সালে বৃটিশ রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬৮ সালে বৃটেন সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তঘোষণা করে। ১৯৭১ সালে বাহরাইন স্বাধীন রাষ্ট্র হয় ও জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৭৩ সালে প্রবর্তিত সংবিধানে জাতীয় সংসদ গঠনের ব্যবস্থা হয়। কিন্ত নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ হলে রাজ্যপ্রধান শেখ ইসা সংবিধান বাতিল করে দেন। রাজধানী মানামা বাহরেইন দ্বীপে অবস্থিত মুক্তা বন্দর। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার। অন্য শহর-মুহারক, জিদ হাফস, ইসা টাউন। তেল রপ্তানির বন্দর মিনা সুলমান।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- তেল দেশের রপ্তানির ৮০ শতাংশ, রাজস্বের ৬০ শতাংশ ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩১ শতাংশ। তাই তেলের আন্তর্জাতিক দর ওঠনামার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উন্নতি অবনতি অনিবার্য। বাহারাইনের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এখানে অনেক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী গড়ে উঠেছে। চাষ সামান্য, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও মাছ প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ৫৩০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু আয় ১৩১১১ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- সংবিধান বাতিল হওয়ার পর চরম রাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে।[১২১] আমীর ১৪ ফেব্রয়ারী ২০০২ সালে নিজেকে বাহরাইনের রাজা হিসেবে ঘোষণা দেন। এর পূর্বে দেশের সুপ্রীম ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক তৈরীকৃত এবং আমীর কর্তৃক ২০০০ সালে ডিগ্রী হিসেবে জারীকৃত ''জাতীয় কার্যনীতি ২০০১ সালের ১৪-১৫ ফেব্রয়ারীতে গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়। এতে বাহরাইনের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র কায়েম রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ রয়েছে। নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ ৪০ সদস্য বিশিষ্ট এবং উচ্চ কক্ষ মজলিস আস-শুরা ৩৪০ সদস্য বিশিষ্ট।

---

১২০. সানাউল্লাহ নুরী, উপসাগরীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ, *ইফা পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯৭
১২১. *Europa (2004)*, Ibid, V-1, PP.673 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৬৩৬-৬৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩৮. বেনিন

বেনিনের সাংবিধানিক নাম Republique Du Benin এবং ইংরেজিতে বলা হয় Republic of Benin দেশটির আয়তন -১,১২,৬২২ বর্গকিমি (৪৩,৪৮৩ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ ৪৯,৩৬০ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.০ শতাংশ। অধিবাসীরা বেনিনিজ নামে পরিচিত। চল্লিশেরও বেশি আফ্রিকান উপজাতির দেশ বেনিন। তাদের মধ্যে প্রধান ফন, আদ্জা, ইয়োরুবা, বারিবা। পাঁচ হাজারের বেশি শ্বেতাঙ্গ উপনিবেসীর বাস আছে বেনিনে। ফোন (Fon) ৪০ শতাংশ, ইউরোবা (Yoruba) ১০ শতাংশ, বারিবা (Bariba) ২০ শতাংশ, ফুলনি ১৫ শতাংশ বাকীরা অন্যান্য উপজাতী। অধিবাসীদের ৩৫ শতাংশ প্রকৃতি পুজারী, ৩৫ শতাংশ খৃষ্টান, ৩০ শতাংশ মুসলমান। সরকারি ভাষা ফরাসি, তবে ফন ও ইয়োরুবা ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রাজধানী পোর্টো নোভো,প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঁ।[১২২]

ভৌগলিক পরিচয়:- পশ্চিম আফ্রিকায় গিনি উপসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত দেশ। পূর্বে নাইজেরিয়া, উত্তরে নাইজার ও বারকিনা ফাসো, পশ্চিমে টোগো ও গিনি উপসাগর। দক্ষিণ উপকূল ১২১ কিমি দীর্ঘ। দক্ষিণভাগ উষ্ণ আর্দ্র। উত্তরভাগে সাহারা মরুর শুষ্কতা। প্রায়ই অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৯৮৩ সালের ৬ থেকে ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত চৌদ্দতম ইসলামী পররাষ্টমন্ত্রী সম্মেলনে বেনিনকে ও আই.সি-র সদস্য করা হয়। সে উপলক্ষে এ দেশটির নাম আমাদের সংবাদপত্রর শিরোনামে, রেডিও, টিভির খবরে বিশেষ গরুত্বসহ স্থান পায়। পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন প্রাপ্ত এ ছোট্ট দেশটি আগে এখানকার জনগণের কাছে বড় একটি পরিচিত ছিলো না। মুসলিম উম্মাহর অভিন্ন কাফেলায় শামিল হবার পর বাংলাদেশসহ দুনিয়ার সকল মুসলিম জনপদে বেনিনের গুরুত্ব ও আবেদন এখন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে।[১২৩]

গ্যাবন ও উগান্ডার পর বেনিন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তৃতীয় 'ব্যতিক্রমী' সদস্য। পাশ্চাত্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুসলমানরা বেনিনে সংখ্যালঘিষ্ঠ। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড আলমানাকের ১৯৭৯ সালের সংখ্যাটিতে বেনিনের মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র শতকরা তেরো ভাগ দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে, খৃস্টানদের সংখ্যা শতকরা পনেরো ভাগ। বাকী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নাকি সেখানকার হাজারটা প্রাচীন ধর্ম ও গোত্রের অন্তভূর্ভুক্ত। অপরদিকে মুসলমানদের প্রকাশিত কোন কোন তথ্যে বেনিনের মোট জনসংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ মুসলিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, ওয়ার্ল্ড আলমানাকেরই ১৯৮৪ সংখ্যাটি বেনিনের মুসলমান, খৃস্টান কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সম্পর্কে নীরব। বেনিনের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট ম্যাথিও কেরেকো কয়েক বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলীতে আনুষ্ঠাকিভাবে তিনি আহমদ কেরেকো নাম গ্রহণ করেন।

---

১২২. *Europa (2004)*, ibid, V-1, ibid, PP.774 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৭৭৪-৭৭৮)

১২৩. আব্দুল মান্নান, মুসলিম উম্মার কনিষ্ট সহোদর, *ইফা পত্রিকা*, পৃ.৯০৭।

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের বিরাট অংশ ও রাষ্ট্রপ্রধান মুসলামন হবার কারণে বেনিন ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় ৪৩ তম সদস্য-রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। বেনিনের সরকারী কাগজ পত্র প্রেসিডেন্টকে এখনো ম্যথিও কেরেকো কিংবা শুধু কেরেকো নামে উল্লেখ করা হয়। ঢাকা সম্মেলনে বেনিনের প্রতিনিধি বলেছেন, তাঁর দেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সনদ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে এবং সংস্থার নীতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে।

বর্তমান বেনিন আগে বেশ কিছু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। তার মধ্যে একটি রাজ্য ছিলো এবোমি। এ রাজ্যটি সতের শতকে সমর-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পাশের রাজ্যগুলো একে একে পদানত করে। ফলে গড়ে ওঠে এক ক্ষুদে সাম্রাজ্য। এভাবেই বর্তমান বেনিনের অখন্ড ভৌগোলিক কাঠামোর সৃষ্টি। উনিশ শতকের শেষভাগে ফরাসীরা এ 'সাম্রাজ্য' করতলগত করে। এটিকে ১৯০৪ সালে ফরাসী কর্তৃক পশ্চিম অফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ভূখন্ডটি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করে ১৯৫৮ সালে। পরে দাহেমী নামে এটি ১৯৬০ সালের ১ আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৮২ সাল পর্যন্ত আক্রা, আলজিয়ার্স, পিকিং, বন, ব্রাসেলস, বুখারেস্ট, হাভানা, কিনসাসা, লাগোস, মস্কো, নিয়ামী, অটোয়া, প্যারিস, ত্রিপোলী ও ওয়াশিংটনে বেনিনের দূতাবাস সীমিত ছিলো। অপরদিকে উক্ত সময় পর্যন্তচীন, মিশর, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্কানী, উত্তর কারিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও জায়েরে বেনিন দুতাবাস প্রতিষ্ঠা করেছে। বেনিন গ্যাট,আই.এল.ও. আই.এম.এফ.ও এ.ইউ. ডব্লিউ এইচ.ও আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আরব ব্যাংক ইকনোমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, ফ্রেঞ্চ মনিটারি এরিয়া, ওয়েস্ট আফ্রিকান ইকনোমিক কমিউনিটি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং ও আই. সি. প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে জড়িত।

বেনিনে ইসলাম

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের স্বর্ণযুগে বেনিন নামক বর্তমান অখন্ড দেশটির অস্তিত্ব ছিলো না। এমন কি সতেরো শতকের আগেও এ দেশটি বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। তাই বেনিনে ইসলামের আলো কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো, সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা দূরূহ । তবে সে অঞ্চলে ইসলামের অগ্রযাত্রার সাধারণ ইতিহাস আফ্রিকার বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়।

আফ্রিকার অর্ধ-শতাধিক দেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ২৬ কোটি। তার মধ্যে ১৬ কোটি মুসলমান, আড়াই কোটি খৃস্টান, ৫৯ লাখ ইহুদী ও হিন্দু। বাদবাকী প্রায় ৭ কোটি লোক আফ্রিকার নানা প্রাচীন ধর্মের অনুসারী। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ জনপদে ইসলামের ব্যাপক প্রভাবের কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইসলাম প্রচারের যুগেই হযরত উসমান (রাঃ) এর নেতৃত্বে ১৫ জন মুসলিম নর-নারী লোহিত সাগরের সংকীর্ণ জলরাশি পাড়ি দিয়ে মূলকে হাবাশ বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এই আফ্রিকার মিশর হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতকালে ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখান থেকে উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের দিগন্তপ্রসারিত হয়। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা.) আমলে লিবিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো পর্যন্তইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ছড়িয়ে পড়ে। আমীরে মুআবিয়ার শাসনকালে পুরাতন এলাকায় সুসংহত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বহু নতুন এলাকা বিজিত হয়। মুসলিম সেনাপতি ওকবা ইবনে নাফে তুরাবুলাসের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করেন এবং তিউনিসিয়া তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর ধীরে ধীর আলজিরিয়া ও মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীনে এসে যায়। আফ্রিকায় ইসলামের প্রভাব সীমা বিস্তারিত হবার এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইসলামের সত্য সমুজ্জল আদর্শের ছোঁয়া সে যুগেই বর্তমান বেনিনের বুককেও আলোকিত করেছিল। ওয়ার্ল্ড আলমানাকের ১৯৭৯ সংখ্যার তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নাইজার ও নাইজেরিয়ার সীমান্তবর্তী বেনিনের উত্তরাংশে মুসলমানদের প্রভাব বেশী।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতোই বেনিনে আজো গণতান্ত্রিক ইন্সটিটিউশন গড়ে ওঠেনি। ১৯৬০ সালে স্বাধীন হবার পর মাত্র এক যুগ সময়ের মধ্যে বেনিনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে পাঁচবার। প্রেসিডেন্ট কেরেকো চরমপন্থী তরুণ সামরিক অফিসারদের একটি গ্রউপের নেতা হিসেবে ৭২ সালের ২৬ অক্টোবর ক্ষমতা দখল করেন। সামরিক সরকারের পথম নেতা হিসেবে ক্ষমতাসীন হয়ে দু'বছর পর তিনি বেনিনকে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ভিত্তিক একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন।[১২৪] ক্ষমতাসীন পার্টি 'দ্য রেভল্যুশন পপুলার দ্য বেনিন' স দেশের একক রাজনৈতিক সংগঠন। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় পাঁচ বছর পর ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত এ পার্টির এক কংগ্রেসে কেরেকোকে পরবর্তী মিয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়। ৭৭ সালের কংগ্রেসে আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তার মধ্যে বেনিনের ন্যাশনাল রেভল্যুশনারী কাউন্সিল কর্তৃক একটি ন্যাশনাল রেভ্যূল্যুশনারী এসেম্বলী গঠন গুরুত্বপূর্ণ । এসেম্বলীতে ৩৩৬ জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়।

প্রেসিডেন্ট কেরেকোর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সরকারে আট বছরের সামরিক শাসন এবং তারপর প্রায় সাড়ে তিন বছরের বেসামরিক শাসনের পর আজ বেনিনের রাজনীতির এক ধূসর চিত্রই চোখে পড়ে। সেদেশে সরকারী মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের দর্শনের সাথে প্রাত্যহিক জীবনের গরমিল ও দূরত্ব এখন অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী। পার্টি নেতাদের দুর্নীতি, সরকারী আমলাদের দুর্নীতি ও অযোগ্যতা প্রেসিডেন্ট করেকোকে গত কয়েক বছর অস্থির রেখেছে। ১৯৮০ সালের নভেম্বরে ছয়টি আঞ্চলিক রাজনৈতিক কমিশনের রিপোর্টে দেশের সার্বিক সমস্যার কারণ হিসেবে পার্টি ও সরকারী কর্মকর্তাদের অকার্যকর ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করা হয়। এ রিপোর্ট প্রকাশের পর কেরেকো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকস্মিক তদন্তের ব্যবস্থা করেন। এসব তদন্তের মাধ্যমে অবাধ দুর্নীতি, 'ব্যবস্থিত মদদ', স্বজনপ্রীতি এবং অব্যবস্থাপনার অনেকগুলো ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮২ সালে প্রেসিডেন্ট কেরোকো ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে রদবদল এবং প্রাদেশিক প্রশাসনেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন।

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৯১১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহ পুনর্গঠনের আদেশ দেন। জাতীয় পর্যায়ে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পনেরোটি থেকে চারটিতে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে ত্রিশটি থেকে মাত্র ছয়টিতে কমিয়ে আনা হয়। প্রেসিডেন্ট কেরোকার এসব পুনর্গঠন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত উদার ও নমনীয় ব্যক্তিগণ ক্ষমতার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাধান্য লাভ করেন। কট্টরপন্থীদের কেউ কেউ মন্ত্রীসভা থেকেও বাদ পড়েন। জাতীয়করণ সীমিত রাখা ও বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর পক্ষপাতি বলে পরিচিত কাউকে কাউকে মন্ত্রীসভায়ও ডেকে আনা হয়। কেরেকো সরকারের সর্বশেষ পদক্ষেপ সংবিধান সংশোধন। ১৯৭৭ সালের ২৬ আগস্ট প্রণীত সংবিধানে ২৬ দফা সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। ন্যাশনাল রেভল্যুশনারী এসেম্বলীর পিপলস কমিশণারগণ কয়েক মাস এ সব সংশোধনী প্রস্তাব পরীক্ষার কাজ শেষ করেন। সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মিয়াদ পাঁচ বছর নির্ধারণ, ন্যাশনাল রেভুল্যুশানারী এসেম্বলীতে।[১২৫]

১. সামাজিক ও আর্থিক স্তর এবং গণ-সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা।
২. সদস্য বাছাই-এর ব্যাপারে গণতান্ত্রিক আলাপ আালোচনার সুযোগ।
৩. বেনিনের পিপল্‌স রেভল্যুশনারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক এসেম্বলীর সদস্য পদপ্রার্থীদের একটি জাতীয় ভিত্তিক প্রস্তাবিত তালিকা প্রণয়ন। এ শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রস্তাব বেনিনের রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
৪. বেনিনে ইসলামের ভবিষ্যত
৫. বেনিনে ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলতে আমাদেরকে সমগ্র আফ্রিকার পটভূমিতে ফিরে যেতে হবে। কোন কোন পাশ্চাত্য পন্ডিত আফ্রিকাকে এক শূন্য ব-াকবোর্ডের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে মুসলমান ও খৃস্টানরা যা খুশী তাই লিখতে পেরেছে। আফ্রিকা সম্পর্কে এ মন্তড়ব্য অবিবেচনা প্রসুত বলা যায়। আফ্রিকার প্রাচীন ধর্মগুলোতে নাস্তিক্যের কোন স্থান ছিলো না। আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা আফ্রিকার আত্মার সাথে মিশে আছে।
৬. আফ্রিকার একটি বিখ্যাত প্রাচীন প্রবাদে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ চিনো শিমু জনে।' স্রস্টার পরিচয় আফ্রিকার শিশুকেও বলে দিতে হয় না। আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ধারণা ইসলামের তওহীদী বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি এ সব ভাষায় স্রষ্টাকে 'সর্বত্র' বিরাজমান', 'সর্বশক্তিমান', 'একবাত্র জ্ঞানী সত্তা', 'সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা','একমাত্র বুদ্ধিমান' প্রভৃতি বিশে-ষণে স্মরণ করা হয়। বাকাংগো ধর্ম গোত্রীয় বচনে স্রষ্টা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি, আর তাঁর আগে কেউ নেই।'[১২৬]

---

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ.৯১২
১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৯১৩

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে মনে করেন আফ্রিকার অন্য সব এলাকার মতোই বেনিনে ইসলামের জন্য পরিবেশ বিশেষ অনুকূল ঃ প্রথমত. যুক্তিভিত্তিক দীন হিসাবে ইসলাম আফ্রিকার বাকী জনগণের মতোই বেনিন বাসীর কাছে অত্যন্তসহজবোধ্য। ইসলামের তওহীদী বিশ্বাস ও পরকালের ধারণা বেনিনের লোকদের কাছে পূর্ব পরিচিত হবার কারণে তা তারা সহজে আত্মস্থ করতে পারে। খৃস্ট ধর্মের চার্চীয় জটিলতা থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ মুক্ত।

দ্বিতীয়. আফ্রিকার অন্যান্য এলাকার মতোই বেনিনে ইসলামকে কোন বিদেশী ধর্ম মনে করা হয় না। সে কারণে কোন সুসংগঠিত মিশনারী কৌশল অবলম্বন না করা সত্ত্বেও এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। আর এ কথা তো অনেকেরই জানা যে, ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত খৃস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে সমগ্র আফ্রিকায় ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে।

তৃতীয়ত. ইসলাম কখনো খৃস্ট ধর্মের মতো ঔপনিবেশিক। শাসন বা বর্ণ বৈষম্যের অংশীদার হয় নি। ঔপনিবেশিক দখলদারীর আমলে আফ্রিকার সমাজে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। আফ্রিকার নিজস্ব মূল্যবোধগুলো ধ্বংস হয়েছে। এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলা আফ্রিকার প্রাচীন ধর্মগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ শূন্যতা পূরণ করতে ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য দর্শন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে বহু লোক মার্ক্স বাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু এতে তাদের অশান্তআত্মা শান্তি পায়নি। বস্তুবাদ আফ্রিকাবাসীর প্রবল সংবেদনশীল হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। আফ্রিকার প্রাচীন ধর্মগুলো মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে কথা বলে। ধর্ম আফ্রিকাবাসীর জীবনে ওতপ্রোত ও অবিচ্ছিন্ন। সেখানকার বহু ভাষায় ধর্ম বুঝানোর জন্য পৃথক কোন শব্দ বুঝানোর প্রয়োজনই হয় না। এ পটুভূমিতে আফ্রিকার কোন লোক খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেও শান্তিপাচ্ছে না। কারণ তা জীবন-সমস্যার সমাধান সেখানে অপুপস্থিত। ফলে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে সে শূন্যতায় ভোগে।

বস্তুবাদী মার্ক্সবাদ ও জীবন-বিমুখ খৃস্টবাদের মুকাবিলায় একমাত্র ইসলামই আজ আফ্রিকাবাসীর হতাশ ও অশান্তআত্মার খাদ্য হতে পারে। আফ্রিকার বাকী অংশের মতোই বেনিন আজ সম্পূর্ণরূপে ইসলামকে গ্রহণ করার জন্যই অপেক্ষমাণ।[১২৭] তবে এতদকিছু সত্যেও বেনিনে ইসলামের বেশ কিছু সমস্যাও আছে। প্রথম হলো মূল্যবোধের সমস্যা। ঔপনিবেশিক আমলে সেখানে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে সেখানকার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে কিছুটা দ্বন্ধ ও অস্থিরতা বিদ্যমান।

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ দীর্ঘদিন সে দেশের শাসন-কাঠামোতে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে। আফ্রিকার সমাজতন্ত্র ইউরোপের মতো অস্তিত্ববাদ-বিরোধী নয় বলা হয়। তবু তা যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে এক নেতিবাচক পদক্ষেপেরই ফল। বেনিন মনে হয়, ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে আসছে। তুব খুব শীঘ্র সে পরিবর্তন সম্পূর্ণ ইতিবাচক রূপ লাভ করবে বলে মনে হয় না।[১২৮]

---

১২৭. পুর্বোক্ত, পৃ.৯১৪
১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ,৯১৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। স্বাধীনতার পর থেকেই রাজনৈতিক অশান্তি।আফ্রিকার সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বেনিন অন্যতম। খাদ্যে প্রায় স্বনির্ভর। উপকূল অঞ্চলে তেলের সন্ধান মিলেছে। কৃষিপণ্য ও অপরিশোধিত তেল বেনিনের প্রধান রপ্তানি পণ্য। জনগণের মাথাপিছু গড় আয় {১৯৭৫ সালের তথ্য অনুযায়ী} ১৭৪ মার্কিন ডলার। ১৯৮০ সালের হিসেবে শতকরা ৪৫ ভাগ লোক কৃষি ও ১৫ ভাগ লোক শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত। প্রধান কৃষিপণ্য পাম অয়েল, তুলা, চীনাবাদাম ও কফি। তাছাড়া ভুট্টা, কাসাভা, মিঠা-আলু, ধান, নারিকেল, কমলা, কলা, আনারস প্রভৃতির চাষ হয়। দেশের ৮০ ভাগ জমি কোন-না কোনভাবে কাজে লাগানো হয়। তার মধ্যে ১১ ভাগ জমি প্রত্যক্ষভাবে কৃষির আওতাধী। বন-জঙ্গল ও ক্রীড়াক্ষেত্রের মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১৮ থেকে ১৯ ভাগ। জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে শিল্পখাতের উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ। শিল্পের বেশীর ভাগই কৃষি ভিত্তিক। সেগুলো পাম অয়েল শোধনাগার, ভুট্টা ও বনস্পতি তেল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, বস্ত্রকল ও সিমেন্ট ফ্যাকটরী। বেনিনের গৃহপালিত পশু-পাখীর মধ্যে আছে ভেড়া, ছাগল, গরু, শুকর, ঘোড়া, গাধা, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি। ১৯৮৩ সালের এক তথ্য অনুযায়ী দশ লাখ ভেড়া, সমসংখ্যক ছাগল, আট লাখ গরু, পঞ্চাশ হাজার শুকর ও ত্রিশ চল্লিশ লাখ হাঁস মুরগী আছে এখানে। বছরে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টন মাছ ধরা হয়।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক:- প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। তিনি পাচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি মন্ত্রী পরিষদের তাদের সহায়তায় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ সদস্যগণ ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি সদস্য সংখ্যা ৮৩। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল অ্যালায়েন্স অফ দি ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন ফর দি ফোর্সেস অফ প্রগ্রেস (ইউডিএফপি), মুভমেন্ট ফর সোশ্যাল ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সোশ্যাল প্রগ্রেস (এমডিপিএস) ইউনিয়ন ফর লিবার্টি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (ইউএলডি), সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এসডিপি) প্রভৃতি।

৪.১.৩৯. ব্রুনাই

ব্রুনাই সাংবিধানিক নাম Negara Brunei Darussalam এবং ইংরেজিতে বলা হয় Sulatanate Of Brunei Darussalam দেশটির আয়তন -৫,৭৬৫ বর্গকিমি (২,২২৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৭২৩৬১ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশ। অধিবাসীরা ব্রুনেনিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৬৪শতাংশ মালে, ২০ শতাংশ চীনা, অন্যান্য ১৬ শতাংশ। মুসলিম ৬৩ শতাংশ, বৌদ্ধ ১৪ শতাংশ। সাক্ষর ৯১.৬ শতাংশ। গড় আয়ু ৭৬.৩ বছর। রাষ্ট্রভাষা মালে, ইংরেজি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত, চীনা ভাষাও প্রচলিত। রাজধানী বন্দরশ্রী বেগাওয়ান, প্রচলিত মুদ্রা- ব্রুনি ডলার।

ভৌগলিক পরিচয়:- ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিও দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত তেলসমৃদ্ধ দেশ। উত্তরে উপকুল অংশ সমতল, ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তপর্বতময়, সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট পাগোন ৫,০৭০ ফুট উঁচু। দেশের ৭৫ শতাংশ বনভূমি। তেম্বুরং, টুটং ও বেলিয়াত নদী দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। তরল প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিতে বিশ্বের এক নম্বর দেশ। [১২৯]

১২৯. হারুনার রশিদ ভূইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ব্রুনেইর ইতিহাস সুপ্রাচীন। ষোল শতকে ব্রুনেই সুলতানাত আকার-আয়তনে ছিল সুবিশাল। তখন সুলু দ্বীপপুঞ্জসহ ফিলিপাইনের এক বৃহদাংশ ব্রুনেইর অধীনে ছিল। তারপর এক এক করে এল ওলন্দাজ ও স্পেনীয় উপনিবেশবাদীরা। এক এক করে বিভিন্ন এলাকা হাতছাড়া হতে হতে ব্রুনেই রাজ্য কেন্দ্রীভূত হল রাজধানী বন্দরশ্রী বেগাওয়ানের চার পাশে। পরিশেষে বৃটিশের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে টিম টিম করে টিকে রইল ব্রুনেই। ৫০ দশকে এসে ব্রুনেইর শাসক ছিলেন আজকের ব্রুনেইর সুলতান স্যার মুদা হাসান আল বলকিয়া মুঈজ উদ্দীন ওয়াদ্দৌলাহর পিতা সুলতান উমর আলী সাইফউদ্দীন। কথা ছিল ১৯৬৩ সালে ব্রুনেই মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সে সময়ে গোটা ব্রুনেই জুড়ে নানা আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বামপন্থী ব্রুনেই পিপলস পার্টি {পি.আর.বি} আগের থেকেই ছিল সক্রিয়। ১৯৫৯ সালে ব্রটিশ শাসনাধীনে ব্রুনেই লাভ করেছিল স্বায়ত্তশাসন এবং একটি শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে ১৯৬২ সালে ব্রুনেইতে যে ইলেকশন হয় সে ইলেকশনে পি,আর,বি, শতকরা ৯৮ ভাগ সিট লাভ করে। তাদের নির্বাচনী ঘোষণা ছিল ব্রিটেনের নিকট থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং পার্শ্ববর্তী সাবা ও সারওয়াকের সাথে একটি ফেডারেশন গঠন।

একদিকে পি.আর.বি-র পিছনে গণ সমর্থন, অন্যদিকে মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যোগদানের ব্যাপারে বৃটেন ও ব্রুনেই সুলতানের আগ্রহ গোটা দেশ জুড়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। পিআরবি-র দুই লীডার আজহারী ও জাইনী সরকারের কোপ দৃষ্টির মধ্যে পড়েন। জাইনীকে গ্রেফতার করা হয়। আজহারী ইন্দোনেশিয়ায় পলায়ন করেন।[১৩০]

যা হোক, পি.আর.বির তথাকথিত বিপ-ব অথবা গোলযোগ একেবারে বৃথা যায়নি ঃ পরবর্তী পর্যায়ে স্থির হয়েছিল, ব্রুনেই আর মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যোগদান করবে না বরং আলাদা রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে সিঙ্গাপুরের সাথে ব্রুনেইর সম্পর্ক গাড় হয়। ব্রুনেইর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এশীয় শরিকদের মধ্যে সিঙ্গাপুরের স্থান প্রথম। ব্রনেইর রফতানী বাণিজ্যের বেলায় সিঙ্গাপুরের স্থান দ্বিতীয় জাপানের পরই। ব্রুনেইর পুলিশ বাহিনীর যে স্পেশাল ব্রুঞ্চ, তা পরিচালিত হয়ে থাকে সিঙ্গাপুরের সহযোগিতায়।

আগেই বলেছি, ব্রুনেইকে বলা চলে রূপকথার সেই 'সব পেয়েছি'র দেশ। দেশের জনসংখ্যা খুবই কম, আয়-উপার্জন সেই তুলনায় অনেক অনেক বেশী। সে দেশের গরীব বলে কেউ নেই, সবাই ফ্রি স্কুলে, ফ্রি মেডিক্যাল ও ইনকাম ট্যাক্স পেয়ে থাকে। উড়ন্তচিকিৎসক দল হেলিকপ্টার সার্ভিস নিয়ে সব সময় প্রস্তুত। টেলিফোন পেলেই হেলিকপ্টারে করে তাঁরা ছুটে যান রোগীর বাড়ীতে। প্রতি বছর বহু সংখ্যক ছাত্র সরকারী খরচে বিদেশে যায় লেখাপড়া শেখার জন্য ।

---

১৩০. আখতার উল আলম, ব্রুনেই, *ইফা পত্রিকা*, পৃ.৭০৭

Dhaka University Institutional Repository

ব্রুনেইর সুলতান এবং জনসাধারণ খুবই ধর্মপরায়ণ। সেখানে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার নেই, কিন্তু যে কেউ যে কোন অভিযোগ নিয়ে সরাসরি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে এবং অভিযোগের প্রতিকার পেতে পারে। রাজধানী বন্দরশ্রীতে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সুন্দরতম মসজিদ- এই মসজিদের গোটা গম্বুজটাই স্বর্ন দ্বারা তৈরী।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী ব্রুনেই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। সুলতান হাসান মহান আল্লাহর নামে এই স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করেন এবং পরে সমবেত লোকজনসহ মসজিদে গিয়ে মুনাজাত আদায় করেন। এই স্বাধীনতার জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রহিসেবে ব্রুনেইর আত্মপ্রকাশ শুধু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য আনন্দের এবং গর্বের। স্বাধীনতা লাভের পর পরই ব্রুনেই আসিয়ান জোটের ৩নং সদস্যে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় ব্রুনেই অন্তর্ভুক্ত হয়। ওপেক এবং কমন ওয়েলথের সদস্য হিসেবে তো আছেন। স্বাধীনতার আগে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সাথে সম্পর্কের যে শীতলতা ছিল, এখন তার অবসান হয়েছে। অবশ্য নতুন পুরাতন যাই হোক, কোন মুসলিম দেশের স্বাধীনতাই নিরাপদ নয়। সুতরাং এই আশংকা প্রকাশ অসঙ্গত হবে না যে, ব্রুনেইতে স্বাধীনতার পর ষাট দশকের মত রাজনৈতিক অসন্তেভ্রষ পুনরায় মাথা চাড়া দিতে পারে। এর মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যকার অসদ্ভাব এবং নাগরিকত্বহীন শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার অভাবই অসন্তোষের কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। অবশ্য সবাই স্বীকার করেন যে, সুলতান একটা বিষয়ে বেশ উদার। তাঁর সরকার প্রাইভেট সেকটরে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন না খাদ্য আমদানীতে প্রচুর সাবসিডি দিয়ে থাকেন। প্রধান খাদ্য চাল আসে থাইল্যান্ড থেকে। অধিবাসীদের গোশতের প্রয়োজনে সুলতান অস্ট্রেলিয়ার এক বিরাট পশু খামার ক্রয় করেছেন- গরুর গোশ্‌ত আসে প্রধানত সেই খামার থেকে । তা ছাড়া জনসাধারণের ঘরবাড়ী নির্মাণ, গাড়ী ক্রয় ও টেলিভিশনসহ প্রয়োজনীয় যে কোন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা আছে। যে কোন নাগরিক বৃদ্ধি ও অক্ষম হয়ে পড়লে তার জন্য রয়েছে মোটা হারের পেনশনের সুবিধা।[১৩১]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশের সামান্য ধান, কাসাভা ও কলার চাষ হয়। ৮০ শতাংশ খাদ্য আমদানি করতে হয়। পশুপালন ও মাছ ধরা নিয়ে কৃষি মাত্র ৪ শতাংশ লোকের জীবিকা। মোট জাতীয় আয়ের (জি ডি পি) ৫০ শতাংশ আসে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল বিক্রি করে। কাঠ অন্যতম জাতীয় সম্পদ। তেলশোধন ও নির্মাণ প্রধান শিল্প তৎপরতা। দক্ষ শ্রমিকের অভাবে শ্রমশক্তির অভাবে শ্রমশক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ অন্য দেশ থেকে আনতে হয়েছে। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ৪৯০ কোটি ডলার।

---

(১৩১) পূর্বোক্ত, পৃ.৭১০

Dhaka University Institutional Repository

ব্রুনেই অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় গড়ে ২০ থেকে ২২ হাজার মার্কিনী ডলার। এই আয় বিশ্বের সর্বাধিক মাথাপিছু আয়েরও বেশী। নানান ধরণের জনকল্যানমূলক কর্মসূচী সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ধরনের রাষ্ট্রকে বলা হয় কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেট। যেহেতু শেল বা তেল কোম্পানীই এই ওয়েলফেয়ার বা কল্যাণের মূল, সেজন্য বহির্বিশ্বে অনেকের নিকট ব্রুনেই 'শেলফেয়ার স্টেট' নামেও পরিচিত। ১৯৮৩ সালে ব্রুনেইর রাজস্ব খাতে আয় হয়েছিল ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, খরচ হয়েছিল ১.৭ বিলিয়ন ডলার। এ মধ্যে ৬০০ মিলিয়ন ব্রুনেই ডলার { মুদ্রামান সিঙ্গাপুর ডলারের অনুরূপ} বরাদ্দ ছিল উন্নয়ন খাতের জন্য। উদ্বৃত্ত ছিল ৩.৮১ বিলিয়ন ব্রুনেই ডলার। ১৯৮৪ সালের জন্য আশা করা হচ্ছে, রাজস্ব খাতে আয় হবে ৬.৫ বিলিয়ন ডলার, খরচ হবে ২.৬ বিলিয়ন ডলার। বাকীটা উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। উল্লেখ্য যে, তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ ছাড়া খাদ্য দ্রব্যসহ যাবতীয় প্রায়াজনীয় পণ্যের জন্য ব্রুনেইকে আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৮২ সালে আমদানী খাতে ব্রুনেইকে ব্যয় করতে হয়েছিল ১.৫৭ মিলিয়ন ব্রুনেই ডলার। দেশের মজুদ তহবিল মনিটরী রিজার্ভ এর পরিমাণ হচ্ছে ২৮ বিলিয়ন ব্রুনেই ডলার।

এত কিছু সত্ত্বেও ব্রুনেইতে একটি বিষয়ে বেজায় ঘাটতি ঃ তা হল ম্যানপাওয়ার। দেশের দুই লক্ষাধিক জনসংখ্যার অর্ধেকের বয়স ২১ বছরের নীচে। দেশের শ্রমশক্তির পরিমাণ ৭০ হাজার। ২৫,০০০ বিদেশী। ব্রুনেইবাসীর এই অঢেল বিত্ত বেসাতের কারণে বলতে গেলে অলস ও শ্রম বিমুখ। বাড়ী গাড়ী, এয়ারকন্ডিশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সরকারী চাকুরী তাদের সবচাইতে বেশী পছন্দ, কায়িক শ্রমসহ তেল ক্ষেত্রের কিংবা খনিজ শিল্পের কাজে তাদের দারুণ অনীহা। এই ফাকে চীনা ও অন্যান্য এলাকার লোকেরা এই সব শ্রমে অধিক মাত্রায় ঢুকে পড়ার অবকাশ পেয়ে যাচ্ছে। স্মর্তব্য যে, ব্রুনেইতে তেলক্ষেত্রসহ অন্যান্য খনিজ শিল্পের কাজের পরিশ্রমিক অত্যন্ত উঁচু । দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়ার সাবা ও সারওয়াকের মধ্যবর্তী এই ছোট্ট দেশ ব্রুনেইতে রয়েছে অঢেল তেল সম্পদ- সেই সাথে রয়েছে প্রচুর গ্যাস ও রাবার। দৈনিক তেল উত্তোলনের পরিমাণ হচ্ছে ১,৭৫, ০০০ ব্যারেল। ১৯৮৩ সালে দৈনিক তেল রফতানী করা হয়েছিল ১০,০০০ ব্যারেল করে। গ্যাস সম্পদে ব্রুনেইর স্থান বিশ্বের চতুর্থ। ১৯৮২ সালে খনিজ সম্পদ রফতানী করে ব্রুনেই পেয়েছিল ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। তার এই রফতানী আয় বার্ষিক ৬% থেকে ৭% বেড়েই চলেছে।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ব্রুনেইতে শাসনতন্ত্রে অনুগত রাজনৈতিক দল গঠনের বিধান রয়েছে। কিন্ত ১৯৬২ সালের পর ব্রুনেইতে রাজনৈতিক দলের কোন অস্তিত্ব নাই। ব্রুনেই বলতে গেলে ক্ষমাসীন সুলতানের দ্বারা এককভাবে শাসিত হয়ে আসছে। নামকাওয়াস্তে একটা মন্ত্রিসভা আছে বটে, কিন্ত তার বেশীরভাগ সদস্যই হয় রাজ পরিবারের, নয় একান্তঅনুগত কেউ। বর্তমান সুলতান হাসান আল বলকিয়া নিজেই দেশের প্রাইম মিনিস্টর, হোম মিনিস্টার এবং ফাইন্যান্স মিনিস্টার। তাঁর দুই ভাই মুহাম্মদ ও জাফরী যথাক্রমে দেশের ফরিন মিনিষ্টার ও কালচারাল মিনিষ্টার ১৯৬৭ সালে সুলতান উমর আলী সাইফউদ্দীন পুত্র হাসান আল বলকিয়ার অনুকুলে সিংহাসন ত্যাগ করে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্ত বর্তমানে সেই সাবেক সুলতান উমর আলী

Dhaka University Institutional Repository

সাইফউদ্দীন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[১৩২] দেশটিতে রাজতন্ত্র পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা। সুলতান বিশ্বের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। কোনো নির্বাচিত আইনসভা নেই, আছে শুধু সুলতান মনোনীত ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টামন্ডলী।

৪.১.৪০. মরক্কো

মরক্কোর সাংবিধানিক নাম Al Mamlakah Al Maghribiyah এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Kindom of Morocco দেশটির আয়তন ৭১০৮৫০ বর্গকিমি (২৭৪৪৬১ বর্গমাইল) [১৩৩] লোকসংখ্যা ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৯২৬৫ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশ। অধিবাসীদের মধ্যে আরব-বার্বার ৯৯.১ শতাংশ, বহিরাগত০.৭ শতাংশ,অন্যান্য০.২ শতাংশ। ৯৮.৭ শতাংশ মুসলিম.১.১ শতাংম খৃস্টান,ইহুদী০.২ মতাংশ। গড় আয৬৮.৭ বছর । রাস্ট ভাষা আরবি তবে ব্যবসায়িক,সরকারি ও কূটনৈতিক প্রয়োজনে ফরাসি ভাষা ব্যবহৃত হয়। বার্বারদের মধ্যে আরবি কথ্যভাষা প্রচলিত। রাজধানী রাবাত আটলানটিক উপকূলে অবস্থিত বন্দর নগর। কাপড় ,কার্পেট ও চামড়ার নানারকম জিনিসের কারখানা আছে। রোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। মরেক্কোর পূর্ব রাজধানী ফেজ থেকে ১৭ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত শহর। ক্যাসাব্লাঙ্কা, তানজিয়ার ও আগাদির বন্দর। প্রচলিত মুদ্রা দিরহাম।[১৩৪]

ভৌগলিক পরিচয়:- আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত দেশ। দক্ষিণ সীমান্তে পশ্চিম সাহারা (প্রাক্তন স্প্যানিশ সাহারা- আয়তন ২৬৬৮০০রর্গ কিমি বা ১০৩০১১ বর্গমাইল) বর্তমানে মরক্কোর দখলে (কিন্ত এটি আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নয়) মরক্কোর উভয় সীমান্তে সিউটা, মেলিলা, প্রমূখ পাঁচটি উপকূল অঞ্চল কয়েক শতাব্দী ধরে স্পেনের দখলে রয়েছে। ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর মিলিয়ে মরক্কোর তটরেখা ১৮৩৫ কিমি দীর্ঘ। পর্বতময় দেশ,উপকূলভাগ সমতল। উত্তর অঞ্চলের পর্বতগুলো ভূমিকম্পের কারণ। খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ দেশ।[১৩৫]

ঐতিহাসিক পরিচয়:- মরক্কের আদিবাসীদের বার্বার বলা হয়। সপ্তম শতাব্দীতে আরব অভিযান শুরূ হয় এবং বার্বারিরা আরবদের ভাষা ও র্ধম গ্রহণ করে। ১৯০৪ সালে স্পেন ও ফ্রান্স মরক্কের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং মরক্কের দুই অংশ স্পেন ও ফ্রান্স মরক্কো নামে পরিচিতি লাভ করে । তবে মরক্কোয় রাজতন্ত্র অব্যাহত থাকে। ১৯৫৬ সালে স্পেন ও ফ্রান্স মরক্কোর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় ফলে দেশটিতে স্বাধীন রাজতন্ত্র কায়েম হয়। ১৯৫৬ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। দেশটির প্রকৃত ইতিহাস হলো।

---

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ.৭১১
১৩৩. উল্লেখিত ৭১০৮৫০ বর্গ কিমি (২৭৪৪৬১ বর্গমাইল এর মধ্যে বিবদমান পশ্চিম সাহারা অঞ্চলে রয়েছে। বিবদমান পশ্চিম সাহারা অঞ্চলের আয়তন ২৫২১২০ বর্গকিমি (৯৭৩৪৪ বর্গমাইল)
১৩৪. হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৯
১৩৫. হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আগমন-পূর্ব ইতিহাস

ইসলামের আগমনের পূর্বে মরক্কোতে বার্বার সম্প্রদায় বাস করতো। তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিলো। তাদের সামাজিকতাও ছিলো বিচিত্র রূপ। তারা কোন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অধীনে ছিলো না। এই বার্বার সম্প্রদায় কোন সময় থেকে মরক্কোতে বসবাস করতে শুরু করে, তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। বার্বারদের পরে আসে কার্থেজিয়ান। অতঃপর আসে রোমানগণ। মরক্কো যখন রোমান শাসনাধীন, তখনই মুসলিম বাহিনী ৬৮৩ সনে মরক্কো জয় করে।[১৩৬]

ইসলামের পতাকাতলে মরক্কো

হযরত মু'আবিয়ার (রা.) শাসনামলে সেনাপতি উকবা ইবন্ নাফের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী মরক্কো জয় করেন। উমাইয়া বংশীয় প্রথম ওলীদের সময় মুসা ইব্‌ন নুসায়ের মরক্কোতে বিজয়ীর বেশে পদার্পণ করেন। ৬৮৩ সাল থেকেই মরক্কোতে ইসলামের বিস্তার ঘটতে থাকে, কিন্ত নানা কারণে ইসলাম ৭৮৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যে আশানুরূপ প্রসার লাভ করতে পারেনি। ৭৮৮ সালে মরক্কো একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল-মুরাবিতুন ও আল-মুয়াহহিদুন বংশদ্বয়ের শাসনামলে মরক্কো বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ৮০৮ সাল পর্যন্তমরক্কো 'উমাইয়া ও 'আব্বাসীদের শাসনাধীন ছিলো। ইদরিসী বংশও[১৩৭] দেশটি শাসন করে ৮০৮ থেকে ৯৩০ সাল পর্যন্ত। মরক্কো আল-মুরাবিতুন বংশের শাসনে ছিলো ১০৬১-১১৪৯ এবং আল-মুয়াহইহদুন বংশের শাসনাধীন ছিলো ১১৪৯-১২৯৬ সাল পর্যন্ত। ১৪১৫ সালে পর্তুগীজদের দখলে চলে যায় মরক্কোর প্রধান বন্দরগুলো। পুর্তুগীজদের পথ ধরেই দেশটিতে ইউরোপীয়দের হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ১৫৭৮ সালে মুরদের হাতে পতুগীজরা পরাজিত হয়। বনী মোরিন বংশ প্রায় তিন শ' বছর মরক্কোতে রাজত্ব করেন। আধিপত্যের বখরা নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মরক্কোতে প্রচন্ড গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্তমওলানা হাসান মরক্কোর সুলতান ছিলেন। মওলানা হাসানের পর তাঁর পুত্র 'আবদুল আযীয সিংহাসনে আরোহণ করে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। ফলে রাজভান্ডার শূন্য হয়ে পড়ে। নানা জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসক সিংহাসনে আরোহন করেছেন। কিন্ত একথা সত্য যে, দেশটি ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ফরাসী আশ্রিত একটি দেশ ছিলো। ১৯০৪ সালে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি অনুসারে মরক্কোতে ফ্রান্সের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো। ১৯১২ সালে সোজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মরক্কো দুটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। মরক্কোর স্পেন অধিকারভুক্ত অঞ্চলে স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণদাবী ওঠে। এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন গাযী আবদুল কাদীর। স্পেনীয় সরকার পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এ আন্দোলনের ঢেউ ফ্রান্স-শাসিত অঞ্চলেও আঘাত হানে। স্পেন ও ফ্রান্স অনন্যোপায় হয়ে মিলিতভাবে স্বাধীনতাকামীদের মুকাবিলা করে। সম্মিলিত আক্রমনের মুখে স্বাধীনতার আন্দোলন সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয় পড়ে।

---

(১৩৬) সালেহ উদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৩৩
(১৩৭) ইদারিসী বংশ বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর মওলা ইদরিসকে বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে মরক্কো

ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের উপর চললো অকথ্য নির্যাতন। তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। এদিকে মরক্কোতে ফরাসীরা ইসলাম-বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে। জনগণ এতে বিক্ষুব্ধ হয় উঠলো। ১৯২৭ সালে সিদি হোসেন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে আরোহন করে ইসলাম বিরোধী আইন বাতিল করার জন্য ফরাসী কর্মকর্তাদের কাছে দাবী জানন। অপর দিকে গণ-আন্দোলনও প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠতে থাকে। বাধ্য হয়ে ফরাসী সরকার ইসলাম বিরোধী আইন প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৩৫ সালে ন্যাশনাল এ্যাকশান কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মরক্কোকে মিত্র শক্তির সামরিক শাসনাধীনে রাখা হয়। যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা দেয়া হবে, এ অংগীকার করা হলে মরক্কোবাসী প্রাণপণে মিত্রশক্তির সহায়তা করে, কিন্তু ফরাসী সরকার যুদ্ধ শেষে সে ওয়াদা পালন করেনি। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ১৯৪৩ সালে 'ইসতেকলাল পার্টি' গঠন করা হয়। প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ইসতেকলাল পার্টি ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। নিরুপায় হয়ে ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ তারিখে ফরাসী এবং ৭ এপ্রিল তারিখে স্পেন মরক্কোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। ২১ অক্টোবর তাঞ্জিয়ার বন্দর মুক্ত হয়। ১৯৬৯ সালে স্পেন ইফনি বন্দর মরক্কোর কাছে ফিরিয়ে দেয়। ১৯৭৬ সালে স্পেনীয় সাহারার দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাজার বর্গমাইল এলাকায় নিজের সীমানাভুক্ত করে নেয়া হয়। এলাকাটি ফসফেটে ভরপুর।

১৯৬৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন রাবাতে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য স্বাগতিক দেশ হিসেবে অবশ্যই মরক্কো গৌরবান্বিত। মরক্কোতে ইসলাম ও ইসলাম বিরোধী দুটি পরস্পর স্রোতধারা বয়ে চলছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সয়লাব বয়ে যাচ্ছে মরক্কোতে। ইসলামী চেতনা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে মাথা তুলতে শুরু করেছে। মরক্কোর ক্ষমতাসীন কর্মকর্তাদের মৌখিক সমর্থন ইসলামের প্রতি রয়েছে, কিন্তু ইসলামকে একটি জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেই, বরং বিপরীত পক্ষে রয়েছে একটা অনীহা, যার ফলে মরক্কোতে পশ্চিমা সংস্কৃতির বন্যাকে রোধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মরক্কোবাসীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব। তা সেখানকার শাসকদের বাস্তব উপলব্দিতে আসার ব্যাপারটি এখানে দৃষ্টিগোচর নয়।[১৩৮]

অর্থনৈতিক পরিচয়:-দেশের শ্রমশক্তির ৫০ শতাংশ কৃষিজীবী ও জাতীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ কৃষিপণ্য। কিন্তু মরক্কো খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। খনিজ পদার্থের বৃহদাংশ জুরে রয়েছে ফসফেট। মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ২৭৩০ কোটি ডলার মাথাপিছু আয় ১৩২০ ডলার।

---

(১৩৮) সালেহ উদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৩৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯২ সালে গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত সংবিধান ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে সংশোধন করা হয়। দেশটিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র রয়েছে। রাজা দেশটির রাষ্ট্র প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে দেশ পরিচালনা করেন। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ। প্রতিনিধি পরিষদ ৩২৫ সদস্য বিশিষ্ট তারা সরাসরি পাচ বছরের জন্য ভোটে নির্বাচিত হন। উচ্চ-কক্ষ উপদেষ্টা পরিষদ ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে নয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাজা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর চাকুরিচ্যুত করতে পারেন, রাজা দেশটির প্রধান নির্বাহী। রাজা দ্বিতীয় হাসান ১৯৬১ সাল থেকে দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাজা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা নিয়ে প্রসাশন।[১৩৯]

৪.১.৪১. মৌরিতানিয়া

মৌরিতানিয়ার সাংবিধানিক নাম Al Jumhuriyah Al Islamiyah Al Muritaniyah এবং ইংরেজিতে বলা হয় Islamic Republic of Mauritania দেশটির আয়তন -১০,৩০,৭০০ বর্গকিমি (৩,৯৭৯৫৩ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ ৮৬,৮৫৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ। অধিবাসীরা মৌরিতানিয়ান নামে পরিচিত। মৌরিতানিয়ান অধিবাসীদের ৮১.৫ শতাংশ মুর (Moor), ৬.৮ শতাংশ উলুফ (Wolof) ৫.৩ শতাংশ, সারাক হল (Sarakhole), বাকী ৭.৪ শতাংশ অন্যান্য আদিবাসী নৃগোষ্ঠী তবে সকলেই মুসলিম। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। সরকারি ভাষা হাসানিয়া অ্যারাবিক, বহু কথ্যভাষাও প্রচলিত। রাজধানী নওয়াকোচট, প্রচলিত মুদ্রা- অউগিয়া (Ouguiya)।[১৪০]

ভৌগলিক পরিচয়:- পশ্চিম আফ্রিকার মধ্য-পশ্চিমে অবস্থিত দেশ। সাহারা মরুর শেষ অংশ, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে পশ্চিম সাহারা, উত্তর-পূর্বে আলজেরিয়া, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে মালি ও দক্ষিণে সেনেগাল অবস্থিত, অধিকাংশ স্থানে ধুলঝড় বয়। শুধু দক্ষিণে, সেনেগাল নদীর অববাহিকা অঞ্চল ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ ও কর্ষণযোগ্য। আটলান্টিক উপকুল ৭৫৪ কিমি দীর্ঘ। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তৃণভূমি, পশুপালনের উপযোগী।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৯০৩ সালে ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য এবং ১৯২০ সালে ফরাসি কলোনিতে পরিণত হয়। ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃত পায়। ১৯৬০ সালের ২৮ নভেম্বর স্বাধীনতা পায়। ১৯৭৫ সালে স্পেন পশ্চিম সাহারা ছেড়ে চলে গেলে মৌরিতানিয়া তার দক্ষিণাংশ ও মরক্কোর উত্তরভাগ দখল করে। তবে সে দখল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। ১৯৯২ সালে প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন হয়। রাজধানী নওয়াকোচট শিল্প সমৃদ্ধ শহর, লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ। বন্দর শহর নউয়াধিবু, কায়েদি, জউয়েরেত।

(১৩৯) *Europa (2004)*, ibid, V-2, ibid, PP.2960, (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৯৫২-২৯৭৫)
(১৪০) *Europa (2004)*, ibid, V-2, ibid, PP.2839 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৮৩৯-২৮৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- সেনেগাল নদীর অববাহিকায় সামান্য চাষ হয়, মাছ ধরা ও পশুপালন অধিকাংশ লোকের জীবিকা। খাদ্যে ঘাটতির দেশ। তামা ও আকরিক লোহা প্রধান জাতীয় সম্পদ, মোট রপ্তানির অর্ধেক লোহা। তাছাড়া মাছ, গঁদের আঠা, জিপসাম রপ্তানি হয়। আমদানি করতে হয় খাদ্যশস্য, ভোগ্যপণ্য, পেট্রোলিয়াম ও যন্ত্রপাতি। মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ১১০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১৫৬৩ ডলার।[১৪১]

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯১ সালে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান গৃহীত হয়। ইসলামিক আইন ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। তিনি ৬ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ[১৪২] অ্যাসেমব্লি ও সিনেট। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল। ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিপাবলিক পার্টি (পিআরডিএস), ইউনিয়ন অফ ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস- ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

৪.১.৪২. মালদ্বীপ

মালদ্বীপের সাংবিধানিক নাম Dhivehi Raajjeyge Jamhuriya এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Republic of Maldives দেশটির আয়তন- ২৯৮ বর্গ কিমি, ১১৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা- ৩ লক্ষ ৪৯,৬৮৪ জন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.২ শতাংশ। অধিবাসীরা মালদিভিয়ান (Maldivion) নামে পরিচিত। দ্রাবিড়, সিংহলি, আরব প্রভৃতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি একটি জাতি, সকলেই সুন্নি মুসলিম ও এক ভাষাভাষি। সিংহলি হরফে লেখা আরবি শব্দবহুল এই ভাষার নাম দিবেহি (Divehi)। তবে সরকারি কাজে ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে ইংরেজি ব্যবহৃত হয়। ৯৭ শতাংশ সাক্ষর। প্রত্যাশিত আয়ু ৬৭.৪ বছর। রাজধানী মালে,প্রচলিত মুদ্রা- রুফিয়া।[১৪৩]

ভৌগলিক পরিচয়:- ভারতের দক্ষিণ সীমান্তের অদূরে, শ্রীলংকার পশ্চিমে অবস্থিত, উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত একগুচ্ছ প্রবাল দ্বীপ। দ্বীপের সংখ্যা ১,১৯৬, তার মধ্যে ২০৩টি দ্বীপে মানুষ বাস করে। কোনো দ্বীপের আয়তন ১৩ বর্গ কিমি/৫ বর্গমাইলের বেশি নয় এবং দ্বীপগুলির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ১.৮ মিটার/৬ ফুট। সমুদ্রের পানি সামান্য স্ফীত হলেই দ্বীপগুলি প্লাবিত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত।

---

(১৪১) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৬.
(১৪২) আইন পরিষদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। নিম্ন কক্ষের নাম অ্যাসেমবি-এর সংবিধানিক নাম "আল জামিয়া আল ওয়াতানিয়া" এবং উচ্চ কক্ষ সিনেট এর সাংবিধানিক নাম মাজলিস উয়োখ"
(১৪৩) *Europa (2004)*, ibid, V-2, PP. 2792 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৭৯২-২৮০২)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৮৮৭ সালে বৃটিশ রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬৫ সালে মালদ্বীপ স্বাধীন হয় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৬৮ সালে সুলতান উৎখাত হন এবং রাষ্ট্রপ্রধান হন প্রেসিডেন্ট। ১৯৮২ সালে মালদ্বীপ কমনওয়েরথের সদস্য হয় এবং ১৯৮৫ সালে হয় সার্ক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৮৮ সালে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা হলে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আব্দুল গায়ুমের আহ্বানে ভারতীয় সৈন্য সেই অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে। রাজধানী মালে দেশের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, লোকসংখ্যা ৬০ হাজার। অন্য উলে-খযোগ্য শহর সীনু।

অর্থনৈতিক পরিচয়:– মাছ ধরা প্রধান জীবিকা, শ্রমশক্তির ২৫ শতাংশ মৎসজীবি। রপ্তানির ৫৭ শতাংশ মাছ। রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ বস্ত্র। অন্যান্য পণ্য নারিকেল, শুকনো নারিকেল, নারকেলের দড়ি ও মালা থেকে তৈরি হস্তশিল্প। পর্যটন উন্নত শিল্প হয়ে উঠছে। জাহাজ মেরামতের কারখানা একটি বড় শিল্প। মোট জাতীয় উৎপাদন ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ও মাথাপিছু আয় ১,৫০১ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। প্রেসিডেন্ট বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সহায়তায় শাসন দায়িত্ব পালন করেন। আইনসভার দায়িত্ব পালন করে সিটিজেনস কাউন্সিল, সদস্য সংখ্যা ৪৮, তার মধ্যে ৪০ জন নির্বাচিত। কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দল নেই। রাজনীতিতে ডিডি (Didi) উপজাতির প্রাধান্য রয়েছে। ভোটাধিকার ২১ বছর বয়সে।[১৪৪]

৪.১.৪৩. মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার সাংবিধানিক নাম The Federation of Malaysia দেশটির আয়তন ১৩১৬৮৬ বর্গ কিমি (১,২৭,৩৫৫ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩০০০০ জন। অধিবাসীরা মালয়েশিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীদের মধ্যে মালে ৫৯ শতাংশ, চীনা ৩২ শতাংশ, ভারতীয় ৯ শতাংশ। মালিয় উপদ্বীপের অধিবাসীরা মুসলিম ৫৩ শতাংশ, চীনারা বৌদ্ধ ও কনফু সিয়াস ১৭ শতাংশ ও ভারতীয়রা হিন্দু ৭ শতাংশ ও ৬ শতাংশ খ্রীষ্টান ধমাবলম্বী লোকের বসবাস রয়েছে। বোর্নিও দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত সাবা রাজ্যে মুসলিম ৩৮ শতাংশ, খৃস্টান ১৭ শতাংশ, অন্যান্য ৪৫ শতাংশ। সারাওয়াকে উপজাতীয় ধর্ম ৩৫ শতাংশ, বৌদ্ধ ও কনফুসিয়াস ৩৪ শতাংশ, মুসলিম ২০ শতাংশ। গড় আয়ু ৭৩.১ বছর। সরকারি ভাষা মালয় তবে সকল সরকারি ও ব্যবসায়িক কাজে ইংরেজি ব্যবহৃত হয়। চীনা ও তামিল ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রাজধানী কুয়ালালামপুর, প্রচলিত মুদ্রা- রিংগিট।[১৪৫]

---

(১৪৪) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬২
(১৪৫) *Europa (2004)*, Ibid, V-1, PP.2756 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৭৫৬-২৭৯১)

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগলিক পরিচয়.- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মালয় উপদ্বীপ ও নিকটবর্তী বোর্নিও দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত সাবাওয়াক ও সারা নামে দুটি প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশ নিয়ে মালয়েশিয়া। দেশটি ১১টি স্টেট এ বিভক্ত। দেশের ৬৩ শতাংশ বনভূমি। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশি রাষ্ট্র। তেল ও নানা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ।[১৪৬]

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৭৮৬ সালে বৃটেনের নিয়ন্ত্রণে আসে, ১৮২৬ সালে বৃটিশ উপনিবেশ হয়। ১৯৪৮ সালে মালয় উপদ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর ১৯৬৩ সালে মালয়, সিঙ্গাপুর ও উত্তর বোর্নিওর দুই বৃটিশ উপনিবেশ নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৬৪ সালে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়। ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী কুয়ালামপুর শিল্প সমৃদ্ধ শহর, লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ ৫০ হাজার। অন্যান্য শহর জোহর, বাহারু, ইগো, জর্জটাউন (পেনাং), সারাওয়াকে কুচিং ও সাবায় কোট, কিনাবালু।[১৪৭]

অর্থনৈতিক পরিচয়:– অর্থনৈতিকভাবে উন্নত একটি দেশ। দেশটিতে পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ রয়েছে-টিন, লোহা, বক্সাইট, কপার, কয়লা, সোনা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। রাবার, পাম ওয়েল, চাল মালয়েশিয়ার প্রধান কৃষিপণ্য। মাছ ধরার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য, কিন্তু খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। রপ্তানি করে তেল, কাঠ, রাবার, গম অয়েল, বস্ত্র। আমদানি করে খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক। জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আসে শিল্পজাত পণ্য থেকে। মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ৭২৫০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৮১৩৭ ডলার।[১৪৮]

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। এগারটি রাজ্য ও দুটি ফেডারেল টেরিটরি নিয়ে মালয়েশিয়া। রাজ্যগুলি প্রায় সবই রাজতন্ত্র এবং ওই রাজারাই পর্যায়ক্রমে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হন। সে কারণে প্রশাসনিক বিচারে মালয়েশিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। দেশে একজন রাজা নিয়মাতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। দেশের প্রকৃত শাসক প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সহায়তায় তিনি শাসনকার্য পরিচালান করেন। মন্ত্রিসভা সকল কাজের জন্য জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ পার্লাসেন্ট (Parliament)। উচ্চকক্ষ সিনেট (দিওয়ান নেগারা) ও নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টিটিভস (দিওয়ান বাকিয়াত)। নিম্নকক্ষর সদস্য সংখ্যা ২১৯, সকলেই নির্বাচিত, অন্যদিকে উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা ৭০, তন্মধ্যে ২৬ জন নির্বাচিত এবং ৪৪ জন নিয়োগকৃত সদস্য। প্রধান রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল ফ্রন্ট তেরটি রাজনৈতিক দলের জোট। অন্য দল মালয়েশিয়ান ইন্ডিয়ান কংগ্রেস। ভোটাধিকার ২১ বছর বয়সে।

---

(১৪৬) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৪.
(১৪৭) পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৪
(১৪৮) তারেক শামসুর রেহমান, *নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, মাওলানা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০৮, পৃ.২৩১-২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৪৪. মালি

মালির সাংবিধানিক নাম Republique Du Mali এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Republic of Mali দেশটির আয়তন ১২,৪০,১৯২ বর্গকিমি (৪,৭৮,৮৪১ বর্গমাইল) লোকসংখ্যা ১ কোটি ২৬ লক্ষ ২৩ হাজার জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ। অধিবাসীরা মালিয়ান নামে পরিচিত। আফ্রিকার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বাস এখানে। তার মধ্যে বামবারা (Bambara) ৩৬.৬ শতাংশ, মানিকে (Malinke) ৬.৬ শতাংশ, পিউল (Peul) ১৩.৯ শতাংশ, সারাকাল (Sarakale) ২.৯ শতাংশ, সেনেফু (Senofo) ৯ শতাংশ, সেনিনকে (Soninke), ৮ শতাংশ, দুগোন (Dogon) ৮ শতাংশ এবং বাকীরা অন্যান্য উপজাতি। ৮০ শতাংশ মুসলিম, ১৮ শতাংশ প্রকৃতি উপাসক, ২ শতাংশ খৃস্টান। প্রতি গড় আয়ু ৪৮.৬ বছর। সরকারি ভাষা ফরাসি, শতকরা ৮০ জন বাম্বারা ও অন্যান্য উপজাতীয় কথ্যভাষায় কথা বলে। রাজধানী বামাকো ,প্রচলিত মুদ্রা- সি এফ এ ফ্রাঁ।[১৪৯]

মাত্র ৬.৯৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন মুসলিম দেশ মালি প্রজাতন্ত্র। দেশটির রয়েছ এক সংগ্রামী ইসলামী ঐতিহ্য। সুদূর আফ্রিকার এ দূর্গম জনপদের সাথে ইসলামের পরিচয় ঘটে নবম ও দশম শতব্দীর গোড়ার দিকে। সেই থেকে ফরাসী দখল পর্যন্তমালির বহমান ইতিহাস ইসলামী চিন্তাবিকাশের পথে অন্তরায় বহিঃশত্রুর সাথে লড়াই, ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও সংগ্রামে মন্ডিত। ভ্রাতৃপ্রতিম মালির সাথে বাংলাদেশের রয়েছে চমৎকার দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক।

ভৌগলিক পরিচয়:- পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় মধ্যস্থলে ভূমিবদ্ধ দেশ। দেশটির পশ্চিমে সেনেগাল ও মৌরিতানিয়া; উত্তরে আলজেরিয়া, পূর্বে নাইজার এবং দক্ষিণে বারকিনা ফাসো, আইভরিকোষ্ট ও গিনি অবস্থিত। দেশের উত্তরভাগ সাহারা মরুর অংশ, উত্তর-পূর্ব দিক পর্বতময়। দক্ষিণে নাইজার নদী ও তৃণাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব দিক সেনেগাল নদী তার ও শাখা নদীগুলির পানিতে সিঞ্চিত।[১৫০]

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১০৪০ থেকে ১১৪৬ সাল পর্যন্ত শাসনকালে মরক্কোর মোকাবদী বাহিনী মালির কয়েকটি অঞ্চল প্রথম বারের মত ইসলামী নিয়ন্ত্রেণে আনে। মধ্যযুগে মালি সাম্রাজ্য শৌর্য-বীর্য ও শক্তি-সামর্থ্যে সেই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলো। ১২৪০ সালে ঘানা সাম্রাজ্য মালি দখল করে। পরবর্তী সময়ে কতিপয় মুসলিম সালতানাত রাজ্যটি শাসন করে। এদের মধ্যে মানসা সালতানাতের আমলে মালি সার্বিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। এই সালতানাতের জনৈক সুলতানের শাসনামলে প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা মালি সফর করেন। মানসা সালতানাতের পর এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে সোঙ্গাই সালতানাত। অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও দৌর্বল্যের সুযোগে উক্ত শাসনামলে মালির শাসন-কাঠামো, রাষ্ট্রীয় সংগতি হুমকির সম্মুখীণ হয়।

---

(১৪৯) *Europa (2004)*, ibid, V-2,PP.2809 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৮০৯-২৮২০)
(১৫০) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

১৫৯০ খৃস্টাব্দে বিরাজমান অনৈক্যের সুযোগে মরক্কো দেশটি দখল করে। মরক্কোর দখলের পর নাইরেজিয়ার 'উসমান দান ফুদিও, ইমাম সামোরী তুরের মত ব্যক্তিগণ মালিতে মুসলিম শাসন ও শক্তি পুনরুত্থানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত দুঃখজনক ভাবে তাঁরা ব্যর্থ হন। পরিশেষে ১৯০৪ সালে ফরাসীরা দেশটি দখল করে। মালির জনগণ ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় বিদেশী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ থাকার পর ৫৮তে সেনেগাল মালি কনফেডারেশনে যোগ দেয়। অবশেষে '৬০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

রাজনৈতিক অবস্থা

স্বাধীনতা লাভের পর '৬৮তে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত মাদিব কিতা প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন মুসা তুরে। তিনি আনেক দিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মালি শাসন করেন। মালি প্রজাতন্ত্রে কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল নেই।[১৫১]

১৯৭৪ সালে মালিতে একদলীয় শাসন কায়েম হয়। ১৯৯২ সালে প্রবল আন্দোলনের পর বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ ও মালি এক ও অভিন্ন দৃষ্টিকোণের অধিকারী। এশিয়া, আফ্রিকা ছাড়াও পৃথিবীর প্রত্যন্তঅঞ্চলে বর্তমানে ইসলামী উম্মাহ ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং অদৃশ্য অশুভ শক্তির সাথে লড়াই করছে, ঠিক এই মুহূর্তে মালির বর্তমান নেতৃত্ব পরিবর্তিত অবস্থায় ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতির উজ্জীবনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে, এটাই সবচেয়ে বেশী কাম্য।[১৫২] রাজধানী বামাকো নাইজার নদীর তীরে অবস্থিত দেশের প্রধান বন্দর। অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে শহরে। লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ। অন্যান্য শহর মোপতি, কায়েজ,সেগু তিমবুকতু।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী ও যাযাবর। ছাগ, মেষ, গবাদি পশুপালন অধিকাংশ লোকের জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে। উল্লেখ যোগ্য কৃষি পণ্য হলো ধান, তুলা ও বাদাম। তপ্ত ও ধুসর দেশটির কৃষি প্রকৃতির খেয়াল খুশীর শিকার বলে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি দুই'এর খেসারত গরীব জনসাধারণকেই দিতে হয়। অবশ্য কৃষি উন্নয়ন ও খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে আশার আলোক-বর্তিকা সেনেগাল নদী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিতব্য মানাতলি বাঁদ। এ বাঁধ প্রকল্প বয়ে আনবে নয় লক্ষ একর জমিতে সেচ-সুবিধা এবং লোহা ও এলুমিনিয়াম আহরণর সুযোগ।

চারদিকে স্থল বেষ্টিত থাকার কারণে নদী পথে মালি বহির্বাণিজ্যে বেশ কিছু অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার মাধ্যমে। মূল আমদানীর তালিকায় উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি পরিবহন সরঞ্জাম, খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, পেট্রোল ও নির্মাণ-সামগ্রী। রফতানী পণ্যের মধ্যে তুলা, তুলাজাত দ্রব্যাদি, বাদাম, মাছ, চামড়া ও জীববজন্ত উল্লেখ্য।

(১৫১) আবুল বাশার; মাল প্রজাতন্ত্র, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৯১৬-৯১৮

(১৫২) পূর্বোক্ত, পৃ.৯১৬-৯১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিবিধ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কারিগরী সাফল্যের অভাবে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে বিলম্ব হচ্ছে। মালি নিষ্টার সাথে এ অভাব কাটিয়ে ওঠে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং জাতীয় উন্নয়নে এ সম্পদ ব্যবহারের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মালি প্রজাতন্ত্রের মূল দুই নদী সেনেগাল ও নাইজারের মধ্যে সেনেগাল নদী মাছ সম্পদে সমৃদ্ধ। কপোটি ও সেগু নামের দুটি সমবায় ভিত্তিক সংস্থার মাছ আহরণ প্রকল্প বছরে প্রায় ৩০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। ফসফেট, ম্যাঙ্গানিক, স্বর্ণ আকর প্রভৃতি খনিজ সম্পদ দেশটিকে সমৃদ্ধিশালী করেছে, পেট্রোলিয়াম আবিস্কারের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় জোর অনুসন্ধান চলছে। দেশের জমির ৭০ শতাংশ মরুভূমি ও কর্ষণের অযোগ্য। দেশের ১০ শতাংশ লোক কৃষি ও মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত। জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ২২০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু আয় ৬০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯২ সালে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান প্রণীত হয়। দীর্ঘ একনায়কতন্ত্রের পর ১৯৯২ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক, তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা করেন। জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির সদস্য সংখ্যা ১৪৭। সদস্যগণ ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন অফ ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস, ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রমুখ নতুন দল গড়ে উঠেছে।

৪.১.৪৫. মোজাম্বিক

মোজাম্বিকের সাংবিধানিক নাম Repupblic De Mocambique এর ইংরেজিতে বলা হয় The Republic of Mozambique দেশটির আয়তন ৭৯৯৩৮০ বর্গকিমি (৩,০৮,৬৪১ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯৬ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা মোজাম্বিকান নামে পরিচিত। অধিবাসীরা আফ্রিকার বিভিন উপজাতী, অধিবাসীরা মাকয়া (Maknuwa) বা লোমবা (Lomba) ৫২ শতাংশ, থোংগো (Thongo) ২৩ শতাংশ, মালাউয়ি (Malawis), ১২ শতাংশ, শোনা (Shona) ৬ শতাংশ এবং ইয়ও (Yuo) ৩ শতাংশ প্রায় ১০ হাজার শ্বেতাঙ্গ (পর্তুগিজ), ৩৫ হাজার ইউরো-আফ্রিকান ও ১৫ হাজার ভারতীয়। খৃস্টান ৩০ শতাংশ, মুসলিম ১০ শতাংশ, অবশিষ্ট সকলে আদিধর্মে বিশ্বাসী। সাক্ষর ৪৫.২ শতাংশ। গড় আয়ু ৩৮.১ বছর। ভাষা পর্তুগিজ ও স্থানীয় অন্যান্য উপজাতীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। রাজধানী মাপুতো, প্রচলিত মুদ্রা মেটিক্যাল (১৯৮০ সাল পর্যন্তছিল এস্কুদো)।[১৫৩]

ভৌগলিক পরিচয়:- আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে অবস্থিত দেশ। দেশটির পূর্বে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সোয়াজিল্যান্ড, পশ্চিমে-দক্ষিণে আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে এবং উত্তরে জাম্বিয়া, মালাবি ও তাঞ্জানিয়া অবস্থিত। অধিকাংশ সমতলভূমি, পশ্চিমদিকে পাহাড়। দেশের মধ্য দিয়ে জাম্বেসি ও লিম্পোপো নদী প্রবাহিত। ভারত মহাসাগরে উপকূল রেখা ২,৪৭০ কিমি দীর্ঘ।

(১৫৩) *Europa (2004)*,V-2, ibid, PP.2976 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৯৭৬-২৯৯২)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- আরব বনিকরা মোজাম্বিক দ্বীপসহ কয়েকটি অঞ্চলে বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে তোলে। ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮ সালে সমুদ্র পথে ভারতে আসার সময় মোজাম্বিকে পদার্পণ করেন। ১৫০৫ সালে পর্তুগিজরা মোজাম্বিকে আসা শুরু করে ও ১৯৫১ সালে সমগ্র মোজাম্বিক পর্তুগালের উপনিবেশ হয়। ১৯৭৫ সালে মোজাম্বিক স্বাধীনতা অর্জন করে ও জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। দীর্ঘ অভ্যন্তর বিরোধ চলার পর ১৯৯২ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। রাজধানী মাপুতো দেলাগোয়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ ১২ হাজার। অন্যান্য শহর বেইবা, নামপুলা।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশের ৫৬ শতাংশ তৃণভূমি ও গোচারণভূমি। বনভূমি ২০ শতাংশ। প্রায় সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর দরিদ্র দেশ। শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশ কৃষি, পশুপালন ও মাছ চাষের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী, প্রতি নারীর গড়ে ৬.৪ সন্তড়ন প্রত্যাশিত, তার সঙ্গে অভ্যন্তড়রীল সংঘর্ষ দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে রেখেছে। রপ্তানির ৪৮ শতাংশ চিংড়ি, কাজুবাদাম ২১ শতাংশ, চিনি ১ শতাংশ আর শুকনা নারিকেল ও সাইট্রাস। আমদানি করতে হয় খাদ্য, বস্ত্র, কৃষি সরঞ্জাম, তেল। মোট জাতীয় উৎপাদন ১৭০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু আয় ২১০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-১৯৯০ সালের ৩০ নভেম্বর বলবৎ সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট দেশের মূখ্য ও প্রধান শাসক, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট পাঁচ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং ৩৩টি প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ প্রদান করেন। এক-কক্ষ জাতীয় সংসদ অ্যাসেমব্লি অফ দি রিপাবলিক। ২৫০ জন সদস্য সরাসরি ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রধান রাজনৈতিক দল ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ মোজাম্বিক (ফ্রেমিলো)। পরে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ মোজাম্বিক, দি মোজাম্বিক ন্যাশনাল ইউনিয়ন, মোজাম্বিক ন্যাশনাল মুভমেন্ট প্রভৃতি দল গঠিত হয়েছে।[১৫৪]

৪.১.৪৬. মিশর

মিশরের সাংবিধানিক নাম Jumhuriy At Misr Al-Arabiyah এবং ইংরেজি নাম Arab Republick of Egypt দেশটির আয়তন- ১০,০২,৪০০ বর্গকিমি (৩,৮৬,৮৭৪ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা- ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৬ হাজার। অধিবাসীদের ৯৪ শতাংশ আরব মুসলিম (সুন্নি), ৬ শতাংশ কপটিক ক্রিশ্চিয়ান ও অন্যান্য।[১৫৫] অধিবাসীরা ইজিপশিয়ান নামে পরিচিত। রাষ্ট্রভাষা আরবি, তবে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রাজধানী কায়রো, প্রচিলত মুদ্রা- ইজিপশিয়ান পাউন্ড। ১০০ পিয়াস্তরে এক ইজিপশিয়ান পাউন্ড।

---

(১৫৪) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৮

(১৫৫) প্রদত্ত তথ্য ১৯৮৬ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক পরিচয়:-উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় লোহিত সাগরের (রেড সি) পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত দেশ। নীল নদী দেশের একমাত্র পানীর উৎস । তার দুপাশেই চাষবাস। বাকি ৯৫ শতাংশ মরুভূমি। এ কারণে গ্রিক ঐতিহাসকি হেরোডোটাস (৪৬০ খৃ. পূ.) বলেছিলেন ইজিপ্ট নীল নদীর দান। বৃহৎ এ দেশে মাত্র ১৫,৫০০ বর্গকিমি (১৩,৭০০ বর্গমাইল) জমিতে চাষ হয় ও মানুষ বসবাস করে।[১৫৬]

ভূ-প্রকৃতি ঃ মিশরের ভূ-প্রকৃতির সিংহভাগই মরুভূমি, মালভূমি ও নিম্নভূমি সমন্বিত। নীলনদ ও লোহিত সাগরের মধ্যভাগে আরব মরুভূমি অবস্থিত। এ অঞ্চলে ৪ হাজার থেকে ৭ হাজার ফুট উচ্চতা সম্পন্ন কয়েকটি পর্বতশ্রেণী রয়েছে। গৃহ নির্মানোপযোগী পাথর ও কিছু খনিজ তেল এখানে পাওয়া যায়। নিম্নভূমি অঞ্চলে বেশ কিছু মরুদ্যান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মরুভূমি, মালভূমি ও নিম্নভূমিই মিসরের ৯৭% এলাকা দখল করে আছে। বাকী ৩% অঞ্চল নিয়ে নীল অববাহিকা ও ব-দ্বীপ। এ ব-দ্বীপ এলাকার বিস্তৃতি কোথাও ১৫০ মাইল, কোথাও ২২৫ গজ মাত্র।

জলবায়ু ঃ মিশরের জলবায়ূ মূলত শুস্ক। উত্তর উপকূলে বার্ষিক ৮ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কায়রো ও এর সন্নিহিত এলাকায় এ পরিমাণ মাত্র ১ ইঞ্চ। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত শীতকালে হয়ে থাকে। আকস্মিক বৃষ্টিপাতের ফলে কখনো কখনো স্বল্পস্থায়ী বন্যা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্তখামসিন নামক ভয়ঙ্কর ধূলিঝড় প্রবাহিত হয়।

কৃষি ঃ নীল ব-দ্বীপ এলাকায় উৎপন্ন মিসরের প্রধান কৃষি-ফসল কার্পাস। দ্বিতীয় অর্থকরী ফসলের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন আখ। এছাড়া গম,যব,বালি, খেজুর প্রভৃতি ফসলও মিসরে উৎপাদিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, মিসরের কৃষকদের প্রত্যেককেই নিজস্ব জমির ৩০% অংশে কার্পাস এবং ৩৩% অংশে গমের চাষ করতে হয়।

খনিজ সম্পদ ঃ মিশরের প্রধান খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ফসফেট, ম্যাঙ্গানিজ, খনিজ তেল, স্টেইহ আকরিক ও চুনাপাথর। খনিজ তেলের দিক দিয়ে মিশর স্বয়ংসম্পূর্ন।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ মিশরে অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম রেলপথ। ১৮৫১ সালে এদেশে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। বর্তমানে মিসরে ৪ হাজার মাইলেরও বেশী দীর্ঘ রেলপথ রয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থায় এর পরেই গুরুত্ব লাভ করেছে নদীপথ। ভূ-প্রকৃতির কারণে মিসরে সড়ক পথ নির্মাণের কাজ ততটা অগ্রসর হয়নি।

মুসলিম আমলের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তি ঃ এক: মিশর বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি আমর ইব্‌ন আল-আস কর্তৃক ৬৪৩ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্টিত আমর আল্‌ ফুসতাত মসজিদ। এ মসজিদটি আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম গুরুত্বপুর্ণ মসজিদ।

---

(১৫৬) *Europa (2004)*, ibid, P-1517-1544 (বিস্তারিত)

Dhaka University Institutional Repository

দুইঃ আহমদ ইবন্ তুলুন কর্তৃক ৮৭৬ খৃস্টাব্দে নির্মিত মসজিদ। তিনঃ জ্ঞান চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত আল-আজহার মসজিদ(৯৭০-৭২) যা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে।[১৫৭]

ঐতিহাসিক পরিচয়ঃ- বাংলাদেশীদের কাছে ইজিপ্ট মিশর নামে পরিচিত। কয়েক হাজার বছর আগে দুই দেশের মধ্যে বাণিজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। মিশরের পিরাডিম, স্ফিংক্স, আবু সিম্বেল প্রমুখ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সেদেশের সুপ্রাচীন ও উন্নত সভ্যতার সাক্ষ্য বহন কর।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আজ থেকে দুই হাজার তিনশ' বছর আগে গ্রীক ভূগোলবিদ হিরোডটাস মিশরকে অভিহিত করেছিলেন'নীলনদের দান' বলে। আবহমানকাল থেকে বয়ে চলা এই নীলের স্বচ্ছ সুনীল সঞ্জীবনী স্রোতোধারায় আজো স্নাত হয়ে চলেছে পুরনো সভ্যতার পরিচয়বাহী দেশ ইজিপ্ট বা মিশর।

যে সমস্ত স্থানে মানব সভ্যতা প্রথম বিকাশে লাভ করেছিল বলে মনে করা হয় মিশর এর অন্যতম। মিশরের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি বৈচিত্রময়। ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর মধ্যে মিশরই একমাত্র দেশ, যার ছয় হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ ইতিহাস ফারাও এবং টলেমী, পিরামীড এবং পাশা ও মমি এবং মামলুকদের ইতিহাস। তবে মুশকিলের ব্যাপার এই যে, এই ইতিহাসের আনুপুর্বিক বা একটানা বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ফারাও যুগ থেকে গ্রীক যুগে উত্তরণের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনি পাওয়া যায়নি রোমান যুগ থেকে ইসলামী যুগে উত্তরণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। যতদূর জানা যায়, সুপ্রাচীন কালে নীল উপত্যকা ছিলো সেমিটিক জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। নীল নদের তীরে উৎপন্ন নল-খাড়গা থেকে তারা প্যাপিরাস নামক কাগজ তৈরী করতো। এ কাগজ ব্যবহার করা হতো তৎকালে প্রচলিত 'হায়ারোগ্লিফিক' বা চিত্রলেখ পদ্ধতিতে জ্ঞান চর্চার কাজে। প্রাচীন মিসরের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাজ ও সভ্যতা প্রসঙ্গে সিরিল আলড্রড বলেন যে, আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে নীল নদের অববাহিকায় মিশরীয় সভ্যতার অঙ্গর প্রোথিত হয়।[১৫৮]

খ্রিষ্টাপূর্ব প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ মিশর একত্রিত হবার পর ইতিহাসে মিশরের স্থান সুর্নিদিষ্ট হয়। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মিসরে ফারাও বা ফেরাউনের শাসন চালু ছিল। তাদের রাজত্বকালে তৈরী পিরামিড এবং মমি সেকালের শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এগুলো এখনো বিস্ময় উদ্রেককর কীর্তি হিসেবে দৃশ্যমান। পবিত্র কুরআনে হযরত মুসা (আঃ) প্রসঙ্গে ফেরাউন এবং তার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১৫৭) হোসেন মাহমুদ, মিশর, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, *পূর্বোক্ত*, *পৃ.৮৪৭-৮৪৮*

(১৫৮) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

এ ফেরাউন বংশের ৩১ তম রাজার শাসনকালে ৩৩২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার গ্রীক আক্রমন ও অধিকার করেন। এ সময় মিশরে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনার নয় বছর পর আলেকজান্ডারের মৃত্যু হলে তাঁর তিন সেনাপতি বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্যকে নিজের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। মিশর পড়ে সেনাপতি টলেমীর ভাগে। তিনি স্রোতবন্দর আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। একটি পাবলিক লাইব্রেরী ও একটি মিউজিয়ামও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া অবিলম্বেই গ্রীক সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় এথেন্সে পরিণত হয়। সরকারী কাজকর্ম ও সংস্কৃতির একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে গ্রীক ভাষা। সর্বপ্রকার দর্শন, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের শিক্ষা ও চর্চা কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক নগর হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়া বিকশিত হয়ে ওঠে। স্বাধীন চিন্তাধারা ও অবাধ মত প্রকাশের মুক্তভূমি বলে আলেকজান্দ্রিয়া তৎকালে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। কিন্ত এ অবস্থা খুব বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। খৃস্ট পূর্ব ৩০ অব্দে রোমানরা মিশর দখল করার পর এ উৎকর্ষমন্ডিত নগরীর পতনের সূচনা হয় এবং বাইজান্টাইন শাসকদের আমলেই এর মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠে।[১৫৯]

গ্রীক আমলে গ্রীসের বাইরে আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে উঠছিল তৎকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এ যুগে সাহিত্যের চাইতে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে জ্যামিতির জনক ইউক্লিড আলেকজান্দ্রিয়াতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং 'ইলিমেন্টস অব জিওমেট্রি'-এর বিন্যাস সাধন করেন। এ্যারিস্ট্যেটলের ছাত্র থিওফ্রাস্টাস এখানে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতেন। খৃষ্টপূর্ব ২৭০ অব্দে সামোস এর এ্যারিস্টারকাস পৃথিবী থেকে চন্দ্র এবং সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস চালান । বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস আলেকজান্দ্রিয়াতে পড়াশোনা করেন বলে জানা যায়। এখান থেকেই ভূগোলবিদ টলেমীর ভূগোল প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্যালেন এখানকার শিক্ষাকেন্দ্রে বায়োলজি এবং এনাটমি শিক্ষা করেন। এ ছাড়া বাজারে ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে গোড়া ধর্মতাত্ত্বিক, গ্রীক দার্শনিক, জোরেস্ট্রিয়ান পুরোহিত, য়াহুদী রাব্বি, বৌদ্ধ ভিক্ষু সবাই তাঁদের নিজ নিজ বিষয় খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করতে পারতেন। নসটিসিজন (খৃষ্টানদের রহয়াবাদ) নিও পিথারিয়ানিজম এবং নিও প্লাটনিজমের উদ্ভবও এই মিশরের মাটিতে বলে জানা যায়।[১৬০]

মিশরে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমন ও বিকাশ লাভের পূর্বে মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ফারাও এবং গ্রীকদের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। ফারাও যুগে চিত্রলেখ পদ্ধতিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, পিরামিডের মত সু-উচ্চ সমাধি সৌধের প্রতিষ্ঠা এবং মৃতদেহকে মমিকরণের মাধ্যমে হাজার হাজার বছর ধরে অবিকৃত রাখার সাফল্যের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা, স্থাপত্য ও চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষতার পরিচয়টিই ফুটে ওঠে।[১৬১]

---

(১৫৯) ডা. সৈয়দ মাহমুদ হাসান, *মানব সভ্যতার ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করন-২০১০ (বুক চয়েস), ঢাকা, পৃ.১৯৫
(১৬০) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৪
(১৬১) পূর্বোক্ত, পৃ.২১৪-২১৬

Dhaka University Institutional Repository

মিসরে দীন-ই-ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশের শুরু সপ্তম শতাব্দীতে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় ৬২৮ খৃস্টাব্দে মিশরের শাসক মুকাওকাস ইবন ইয়ামীনকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। হাতিব ইবন আবি বুলতা'আ মদীনার দূত হিসেবে উক্ত পত্র নিয়ে ইয়ামীনের দরবারে পৌছেন। ইয়ামীন দূতকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন, তবে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি সুকৌশলে এড়িয়ে যান। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে মুসলিম সেনাপতি আমর ইবন আ'স ৬৩৯ খৃস্টাব্দে রোমক শাসককে পরাজিত করে মিশরকে মুসলিম শাসনাধীনে আনেন। মিশর আরবের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এ সময়ে আধুনিক কায়রোর নিকটবর্তী 'আল-ফুসতাত' নামক স্থানে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনের পর ৯৬৯ খৃস্টাব্দে মিসরে ফাতিমী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের প্রথম শাসক জওহর আল ফুসতাতের পরিবর্তে আল কাহিরা বা কায়রোতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রাজধানীকে সুশোভিত করার জন্য চমৎকার প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়। ১১৭১ খৃস্টাব্দে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ফাতিমী শাসন উচ্ছেদ করে মিসরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

তাঁর সময়কাল মিশর এবং ইসলামের ইতিহাসেও অত্যন্তউল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। এ সময়েই তৃতীয় ক্রুসেড সংঘটিত হয়। সুলতান সালাহউদ্দীন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে পবিত্র জেরুজালেমের উপর মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতকে সুলতান সালাহউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবী বংশের অবসান ঘটে এবং মামলুক বংশ ক্ষমতা দখল করে। এরা প্রায় ৩০০ বছর মিশর শাসন করার পর ষোড়শ শতকে তুর্কী সুলতান প্রথম সেলিম মিশর জয় করেন এবং মিশর উসমানী সাম্রাজ্যের অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হয়। উনিশ শতকে নতুন মিসরের জন্মদাতা বলে আখ্যায়িত মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মিসরে খেদিভ রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আঠারো শতকের একেবারে শেষভাগে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানের মিশর অভিযান মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দের ২১ জুলাই তিনি কায়রো অধিকার করেন। নেপোলিয়ান নিজে মিশর ত্যাগ করেন ১৭৯৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী। ১৮০১ সাল ইংরেজদের সাথে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে ফরাসী বাহিনী মিশর ত্যাগ করলে মিসরে স্বল্পস্থায়ী ফরাসী শাসনের অবসান ঘটে। নেপোলিয়ানের এ মিশর অভিযানের ফলে আধুনিক বিশ্বে মিসরের প্রতি প্রথম বারের মত সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী অবস্থানের জন্য অত্যন্তপ্রয়োজনীয় হয়ে ধরা পড়ে। অন্যদিকে এ অভিযানের ফলে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে মিসরের সংযোগের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। নেপোলিয়ন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে কায়রোতে ইনস্টিটিউট দ্যা ইজিপ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ফরাসী পন্ডিতগণ নেপালিয়ানের নির্দেশে মিসরের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা ও সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এরই ফল হিসেবে রচিত গ্রন্থ ডিসক্রিপশন দ্য ল ইজিপ্ট, আজো মিশরের ইতিহাস ও পুরাকীর্তি বিষয়ক একমাত্র বিশ্বস্ত গ্রন্থ হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

এম, শামপলিন নামক জনৈক পন্ডিত ফরাসী আবিস্কারভিযানে উদ্ধারকৃত রোসেটা পাথরে উৎকীর্ণ চিত্রলেখের অর্থ উদ্ধার করেন। ফলে মিসরের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য আবিস্কারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের্ সূচনা হয়।

মুহাম্মদ আলীর অযোগ্য উত্তরসূরী ইবরাহীম পাশার সময় মিশর ইংরেজদের দখলে চলে যায়। ১৯২২ সালে অবস্থা ও আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে ইংরেজরা মিশরকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলেও সেখানে রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করে যায়। শেষ রাজা ফারুকের সময় ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট ইসরাইলের সাথে ফিলিস্তীন প্রশ্নে মিসরের যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং মিশরসহ আরব দেশগুলো পরাজিত হয়। এ পরাজয় মিশরীয় বহু দেশপ্রেমিক সামরিক অফিসারকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলস্বরূপ ১৯৫২ সালে রাজা ফারুককে সামরিক অভ্যূথানে উৎখাত করা হয়। প্রথমে জেনারেল নগীব এবং কিছুকাল পরে কর্ণেল নাসের মিসরের প্রেসিডেন্ট পদে ক্ষমতাসীন হন। ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল[১৬২] জাতীয়করণ করলে ইংরেজ এবং ফরাসীরা মিসরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্তএ খালের উপর মিসরের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে প্যালেস্টাইন প্রশ্নে পুনরায় মিশর ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মিশর ভীষণভাবে পরাজিত হয়। এরপর ১৯৭০ সালে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতীক বলে আখ্যায়িত প্রসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যু হলে আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭৩ সালে একই কারণে তৃতীয়বারের মত মিশর ইসরাইল যুদ্ধ বাধে। ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে শেষ দিকে বেশ কিছুটা বিপর্যয় সত্ত্বেও এবারই মিশর প্রথমবারের মতো সাফল্য অর্জন করে। ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট সাদাত ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্বমূলক ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পাদন করায় আরব বিশ্বসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে সাদাত একঘরে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আরব লীগ ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা থেকে মিশরকে বহিস্কার করা হয়। ১৯৮১ সালে সাদাত নিহত হলে প্রেসিডেন্ট হুসনী মুবারক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কিছুটা ভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে মিসরের সম্পর্কের উন্নতি হয়। এরই ফল স্বরূপ ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ বৈঠকে মিশরকে পুনরায় সদস্য পদ প্রদান করা হয়।[১৬৩]

ইসলামের আগমন

সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানগণ কর্তৃক মিশর বিজয় মিসরের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক দুদূরপ্রসারী ফলাফলের সূচনা করে। মুসলমানরা শুধু মাত্র একটি রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যেই মিসরে আগমন করেন নি, তাঁরা সঙ্গে বয়ে এনেছিলেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ভিত্তিক দীন ইসলাম এবং তার আদর্শ ও শিক্ষা। উল্লেখ্য যে, এ সময়ের মিসরের অধিবাসীদের কাছে ইসলাম ধর্ম একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্মমত হিসেবে বিবেচিত হলেও ব্যাপারটি আসলে তা ছিলো না।

---

(১৬২) সুয়েজ খাল ঃ প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিশরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ চলাচলের উপযোগী কৃত্রিম খাল হচ্ছে সুয়েজ খাল। খালটি উত্তর ভূমধ্যসাগরে সাথে

(১৬৩) www.oic-oci.org.com

Dhaka University Institutional Repository

মূলত সুদুর অতীতকাল থেকেই আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত বিভিন্ন নবী বিভিন্নি সময়ে মিসরে আল্লাহর দীন প্রচার করেছেন। এদের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রমুখ নবীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযাগ্য। কিন্ত কালের পরিবর্তনে ও উপযুক্ত ধর্মীয় নেতৃত্বের অভাবে পরবর্তীকালের মিশরবাসীরা নবীদের প্রচারিত একত্ববাদ ও তাদের শিক্ষা এবং আদর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। খৃঃ পূর্ব ৩০ অব্দে রোমানগণ কর্তৃক মিশর বিজয়ের একশ' বছরের মধ্যে প্রায় সমস্ত মিশরবাসী খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে।[১৬৪] মুসলমানরা মিশর অধিকার করার পর এ অবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ও উদারতার বাণী অন্য সব ক্ষেত্রের মতো মিশরেও মুসলমানদের বিজয়ের পথকে সহজ করে দেয়। উল্লেখ্য , এ সময়ে মিসরের রোমক শাসকরা ধর্মমতের দিক দিয়ে ছিল বাইজান্টাইন চার্চের অনুসারী। ফলে সংখ্যালঘু মিশরীয় কপ্টিক খৃষ্টানরা তাদের অত্যাচারের শিকার হয় ও সব দিক দিয়েই ভীষণভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। শাসকদের সংগে তাদের সম্পর্ক অত্যন্তবৈরীভাবাপন্ন হয় ওঠে। ইসলামে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানেব উদারতায় তারা আকৃষ্ট হয় এবং মুসলিম অভিযানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এ বিজয়কে সহজসাধ্য করে তোলে। অবিলম্বেই দেশের তৎকালীন জনগোষ্ঠীর সিংহবাগ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমানরা মিসরে একটি সুসংগঠিত সরকার এবং নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচলন করে। দেশের সর্বত্র অসংখ্যা নতুন মসজিদ এবং জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অতীতের সমস্ত আচার আচরণ ছুড়ে ফেলে দিয়ে মিশর একটি নতুন পরিবর্তনের স্রোতধারায় অবগাহন করে উঠে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এ.জে. আরবেরীর কথা সমর্থন করে বলতে হয়, মুসলমানদের মিশর জয়ের ফলে এক আমুল পরিবর্তনের সূচনা হয়। শুধুমাত্র নিরেট পাথরের তৈরী মূর্তি এবং কপ্টিক চার্চগুলো ছাড়া আর কোন কিছুই এ পরিবর্তনের প্রবল জোয়ারের মুখে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, হাজার বছরের কাল পরিক্রমায় মুসলিম তথা আরবীয় সংস্কৃতির প্রভাবে মিসরের সংখ্যালঘিষ্ট খৃস্টান সম্প্রদায়ও এমনভাবে আরবীয় হয়ে পড়ে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিভাবে তাদের আত্ম স্বতন্ত্র কোন অতিত্ব বজায় থাকে নি। বহুকাল পরে মিসরের ইংরেজ শাসক লর্ড ক্রোমার মিসরে এসে মসজিদ এবং চার্জের মত দুটি ধর্মীয় স্থানে সমবেত হওয়া ছাড়া খৃস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান নি।[১৬৫]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাত্র কিছুকাল পূর্বেও আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলে আখ্যায়িত করা হতো। ইউরোপীয় অভিযানকারীদের কল্যাণে বিগত শতকে আফ্রিকার সঙ্গে বহিবিশ্বের সংযোগ সাধিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্তবিশ্বের বাকী অংশ থেকে এ মহাদেশটি প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে আফ্রিকার অংশ হওয়া সত্ত্বেও মিশর কিন্ত এ ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম।

(১৬৪) শফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৬-২৫৭
(১৬৫) হোসেন মাহমুদ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*,পূর্বোক্ত, ৬৫১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আবির্ভাবের পর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত লাভের সঙ্গে সঙ্গে মিশর ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে । ৯৭২ খৃস্টাব্দে নির্মিত কায়রোর আল আজহার মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা কেন্দ্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উম্মোচন করে। মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বে বহুমুখী জ্ঞান চর্চার জন্য তিনটি স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ বলে খ্যাতি লাভ করে। এর একটি হলো স্পেনের কর্ডোভা, অন্যটি বাগদাদ এবং তৃতীয়টি কায়রো। বলা নিস্প্রয়োজন যে, কায়রোর ভিত্তি ছিলো আল আজহার শিক্ষা কেন্দ্র। বস্তুত মিশর তো বটেই, মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে ইসলামী আদর্শ, শিক্ষা ও ভাবধারার প্রচার, প্রসার ও পরিচর্যায় আল আজহারের দান অপরিসীম।

যুগনায়ক বিভিন্ন আলিম-উলামার সমাবেশ আল আজহারকে খ্যাতিমন্ডিত করে তোলে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯০৮,১৯১১,১৯৩০,১৯৩৬ ও ১৯৬১ সালে এর আধুনিকীকরণ প্রয়াসের বিভিন্ন রূপায়ণ ঘটে। সাম্প্রতিক কালে বাণিজ্য, প্রশাসন, প্রকৌশল, চিকিৎসা, প্রবৃতি বিষয়ও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধর্মীয় রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলিম সংস্কারক ও চিন্তড়নায়ক জামাল উদ্দীন আফগানী ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন এটি প্যান ইসলামিজম নামে খ্যাত। আফগানিস্তানসহ ইরান, তুরস্ক, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, মিশর, ভারত, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভ্রমণকারী মধ্যযুগের দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী এ মনীষীকে ভ্রাম্যমান সংগ্রামী বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সমকালীন বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতির পরাধীনতা ও দুঃখ দুর্দশা জামাল উদ্দীন আফগানীকে বিপ□বী হিসেবে গড়ে তুলে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুণর্জাগরণ ভিত্তিক প্যান ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ও আদর্শকে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই তিনি বিভিন্ন দেশে গমন করেন। তাঁর এ আন্দোলনের প্রদান লক্ষ্য ছিল তিনটি। এগুলো হলো এক, বিদেশী শাসনের শৃংখলা থেকে মুসলিম দেশগুলোকে মুক্ত করা; দুই সংস্কারান্ধ মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করে মূল ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসরণ, তিন, মুসলিম দেশগুলোর উপর চেপে বসা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা থেকে মুসলিম বিশ্বকে মুক্ত করা। ১৮৭১ সালে মিসরে আগমনের পর থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ততার অবস্থানে আট বছর কাল তিনি প্যান ইসলামিজমের প্রচার কাজ চালিয়ে যান। মিসরের যুব ও তরুণ সমাজ তার সম্যবাদে বিপুলভাবে প্রভাবিত হন। তাদের মধ্যে কেই কেউ মিসরের পুরুজ্জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আফগানীর চিন্তড়ধারার ক্রমবর্ধমান প্রভাব মিসরের শাসক গোষ্ঠীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। ১৮৭৯ সালে তাকে মিশর থেকে বহিস্কার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আফগানীর পর এ আন্দোলনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন আফগানীর বিশ্বস্ত অনুসারী ও আধুনিক মিসরের চিন্তানায়ক বলে পরিচিত শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু সুশৃঙ্খলভাবে দেশে ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তনের প্রয়াস গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হন। মিশর সরকার তাঁকে ১৮৯৯ সালে মিসরের গ্র্যান্ড মুফতী পদে নিযুক্ত করে।

১৯০৫ সালে আবদুহুর মৃত্যুর পর মিসরের অন্যতম প্রধান সংস্কারক সাইয়িদ রশীদ রিযা এ আন্দোলনের পতাকাকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব পালন করেন। আবদুহুর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ মিসরে বসবাসকারী এই লেবাননী মুসলিম তাঁর মাসিক পত্রিকা আল মানার এর মাধ্যমে এ আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যান। ১৮৯৮-১৯৩৫ সাল পর্যন্তদীর্ঘ সময় এ পত্রিকাটি সমকালীন সংস্কার আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। আরব দেশগুলোর বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন এ পত্রিকার নিবন্ধসহ আল কুরআনের ধারাবাহিক প্রাঞ্জল অনুবাদও প্রকাশ করা হলো। ১৯৩৫ সালে রিযার মৃত্যুর পর সংস্কার আন্দোলনের এ ধারার প্রাবল্য স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং সমকালীন মিসরের প্রায় একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অনুসারী অথচ অধিকতর তীক্ষ্ণ আবেদন মন্ডিত আরেকটি প্রবল আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। এ আন্দোলনটি ইখওয়ানুল মুসলিমুন আন্দালন নামে পরিচিত।

জামাল আবদুন নাসের মিসরের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কিছুকাল পর ইখওয়ান আন্দোলন স্মিমিত হয়। মিশর সরকার ইখওয়ানের প্রখ্যাত নেতা সাইয়িদ কুতুবকে ১৯৬৬ সালের ২৬ আগষ্ট ফাঁসি দেয়। ১৯৭০ সালে নাসেরের মৃত্যু পর্যন্ত ইখওয়ানের প্রতি দমন ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। নাসেরের পর আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট হলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। ২৩ বছর নিষিদ্ধ থাকার পর ইখওয়ান পুনরায় খোলাখুলিভাবে কাজ করে চলেছে। উল্লেখ্য , আনোয়ার সাদাত নিহত হবার পর হুসনী মুবারক মিসরের প্রেসিডেন্ট। হুসনী মোবারকের পর নির্বাচনের মাধ্যমে মোহাম্মদ মুরসী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[১৬৬]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- শিল্প ঃ মিশর আফ্রিকার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৫% আসে শিল্প থেকে। প্রধান উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে কার্পাস, বয়ন ও বস্ত্রশিল্প, স্পেইহ ও ইস্পাত, চিনি,সার-কারখানা সিমেন্ট শিল্প প্রভৃতি। রফতানি সামগ্রী ঃ তুলা ও তূলাজাত দ্রব্য মিসরের প্রধান রফতানি পণ্য। এছাড়া পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, চিনি, সিমেন্ট, সার, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি রফতানি করা হয়ে থাকে। আমদানী দ্রব্যদী ঃ কল-কজা ও যন্ত্রপাতি, গম, কাগজ, কাঠ, স্পেইহ ও ইস্পাত, ঔষধ, পাটজাত দ্রব্য, চা, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি মিসরের আমদানী পণ্য-তালিকার অর্ন্তভুক্ত দেশে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, লোহা, ফসফেট, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, জিপসাম, অ্যাসবেস্টস, সীমা, দস্তার সন্ধান মিলেছে।

(১৬৬) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৫৪

Dhaka University Institutional Repository

নীল নদীর দুই ধারে তুলার চাষ হয়। দেশের মাত্র ৫ শতাংশ জমিতে চাষ হয় অথচ প্রতিবছর দশ লক্ষ হারে লোক আড়ছে। রপ্তানি করে তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, তুলা, সুতা, ধাতব পদার্থ ও রাসায়নিক। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, খাদ্য, সার, ভোগ্যপণ্য। দেশের লোকদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৩৯০ ডলার। জিডিপি পরিমান ৬১৭৮ কোটি ডলার।[১৬৭]

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ফরাসি ধাঁচের সংবিধান, প্রেসিডেন্ট প্রধান শাসক, প্রেসিডেন্ট ছয় বছর মেয়াদে নির্বাচিত হন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহাম্মদ মুরসি। হোসনি মোবারক ১৯৮১ সালের ১৪ অক্টোবর ক্ষমতায় আসেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ছয় বছরের জন্য পুনঃনির্বাচিত হন।১৯৯৩ সালের গণভোটে মোবারক তৃতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে অনুমোদন পান। ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ নির্বাচন সরকারী দল ৪১৬টি এবং প্রধান বিরোধী দল ১৩টি আসন পায়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সহায়তায় রাষ্ট্রশাসন করেন। এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ (মজলিস আল-ছাব)। সদস্য সংখ্যা ৪৪৪। দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন ডি পি)। বহুদলীয় গণতন্ত্র।[১৬৮]

৪.১.৪৭. লিবিয়া

লিবিয়ার সাংবিধানিক নাম Al Jumahiriyah Al Arabiyahal Libiyah Ash Shabiyah Al Ishtirakiyah এবং ইংজেতিতে বলা হয় The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya দেশটির আয়তন ১৭,৭৫,৫০০ বর্গকিমি (৬,৮৫,৫২৪ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৬৫৫৬৩ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ। অধিবাসীরা লিবিয়ান বলে পরিচিত। অধিবাসীদের ৯৬ শতাংশ বার্বার ও আরব। অবশিষ্ট ৪ শতাংশ, গ্রিক, মালটিজ, ইতালিয়ান, ইজিপশিয়ান, পাকিস্তানি, তুর্কি, ভারতীয় ও তিউনেশিয়ান। ৮৭ শতাংশ সুন্নি মুসলিম। সাক্ষর ৮০.৮ শতাংশ। গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। রাষ্ট্রভাষা আরবি, তবে ইতালিয়ান ও ইংরেজি ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রাজধানী ত্রিপোলি, প্রচলিত মুদ্রা- লিবিয়িয়ান দিনার।[১৬৯]

ভৌগলিক পরিচয়:- লিবিয়া এক বিশাল দেশ। মিশর, সুদান, শাদ, নাইজার, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়া সহ ৬টি আফ্রিকী রাষ্ট্রের সাথে এর সীমান্তরয়েছে। আকাশ-পথ , জলপথ ও স্থলপথ সকল পথেই লিবিয়ায় প্রবেশ করা সম্ভব। দেশটি প্রায় বর্গাকৃতির। এর ১৯০০ কিলোমিটার ভূমধ্যসাগরীয় তটরেখা রয়েছে। দেশটির উত্তর পূর্বে রয়েছে ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি। ১৯ থেকে ৩৩ অক্ষাংশ ও ৯ থেকে ২৫ দ্রাঘিমায় লিবিয়ার অবস্থান।

---

(১৬৭) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৫৫

(১৬৮) *Europa (2004)*, ibid, P.1517 (বিস্তারিত জানতে পৃ.১৫১৭-১৫৪৩ দেখুন)

(১৬৯) *Europa (2004)*, ibid, V-2,PP.2657 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৬৫১-২৬৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত দেশ। উপকূল অঞ্চলের আবহাওয়া মনোরম কিন্তু বিস্তীর্ণ সমতল দক্ষিণভাগের সবটাই উষ্ণ মরুভূমি। সারা দেশে খাওয়ার পানি অতি সামান্য তাই সাহারা মরুর গভীরে নলকূপ বসিয়ে পানি তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ওই সঞ্চিত পানির পরিমাণও সীমিত এবং তা পূরণ হওয়ার উপায় নেই। সুতরাং আশংকা, সাহারা মরুর নিচে সঞ্চিত পানি তোলা হয়ে গেলে লিবিয়ায় আরও শুষ্ক ও তাপ অসহনীয় হয়ে উঠবে। কর্ষণযোগ্য জমি ১ শতাংশ, বনভূমি শুন্য। শুধু তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে দেশ সমৃদ্ধ। বিভিন্ন তেলের খনিতে যে দশ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত তার মধ্যে বহিরাগত তিন লক্ষ।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- পৃথিবীর যে কোন দেশেরই ভৌগোলিক ও সামাজিক ইতিহাসের দুটো মৌল বিভক্তি থাকে। এর একটি হচ্ছে প্রাচীন ভাষ্য এবং অপরটি হচ্ছে আধুনিক ভাষ্য। প্রাচীন ইতিহাসের দুটো বিভাজনকেই বর্ণনায় টেনে আনা দরকার। তবে ইতিহাসের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষ্য কোথাও সাংঘর্ষিক নয়, এ দুটো নিতান্তই পরিপুরক সত্যের প্রতিবিম্ব মাত্র।

শুরুতেই বলে নিতে চাই যে, আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে লিবিয়া নানা কারণে একটি উল্লেখযোগ্য দেশ হিসেবে চিহ্নিত। প্রায় ৩৫ লক্ষ জনসমস্টির একটি মরুময় দেশের এই প্রসিদ্ধি কেন ? লিবিয়ার মতো আরও অনেক বিকাশমূখী আরব-আফ্রিকান রাষ্ট্র রয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই সংগ্রামে সাধনায় সংকল্পে বিশিষ্ট নয়, অন্যদিকে ব্যতিক্রমী লিবিয়া বর্হিবিশ্বে ব্যাপক আলোচিত একটি দেশ। তার চেয়েও বড় কারণ বোধ হয় এই যে, আধুনিক লিবিয়ার নির্মাতা কর্ণেল মুয়ামমার আল গদ্দাফী বিশ্ব রাজনীতিতে প্রচন্ড এক আলোড়ন তুলেছেন। এর পাশাপাশি মুয়ামমারের রাজনীতি ও তার সাড়া জাগানো 'সবুজ গ্রন্থ' বর্ণিত তৃতীয় সার্বজনীন তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী যুগপৎভাবে বিতর্কেরও ঝড় তুলেছে। এসব কারণেই সম্ভবত লিবিয়ার প্রতি বিশ্ববাসীর উৎসুক দৃষ্টি একটু বেশী মাত্রায়ই নিবন্ধ।[১৭০]

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল বলতেন, লিবিয়া থেকে সব সময়ই নতুন কিছু উদ্ভাবিত হয়। লিবিয়া নেতা মুয়ামমার আল গাদ্দাফীর দর্শন তৃতীয় সার্বজনীন তত্ত্ব এর উদ্ভাবনা সম্ভব এরিস্টোটলের সেই ভবিষ্যৎ উক্তিকেই সপ্রমাণ করল। প্রাচীন কালেও লিবিয়ানরা অন্যায় অসত্য ও বিদেশী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জীবনপন লড়াই করেছে। সংগ্রামের সেই প্রাচীন ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।[১৭১]

লিবিয়া নামে বর্তমান যে দেশটি আমরা দেখছি, প্রাচীনকালে এ অঞ্চলটি এককভাবে লিবিয়া নামে পরিচিত ছিল না। দেশটি কয়েকটি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলো হচ্ছে ত্রিপলিতানিয়া, সাইরেনিকা এবং ফাজানিয়া (বর্তমান নাম ফেজ্জান) এ সবগুলো এলাকার সম্মিলিত প্রশাসনিক নাম হচ্ছে লিবিয়া। লিবিয়া নামেরও একটি ঐতিহাসিক কাহিনী রয়েছ।

(১৭০) আজিজুর হক বান্না , লিবিয়া, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৫৭-২৬২

(১৭১) পূর্বোক্ত, পৃ.৯১৬-৮৫৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে মিসরের পশ্চিম সীমান্তে'লেবু' নামে একটি গোত্র বাস করত। এই গোত্রের নামানুসারেই কালক্রমে লিবিয়া নামের উৎপত্তি। প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের সীমান্তএবং তিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারীদেরই লিবীয় বলে চিহ্নিত করত। এটাও অনুমান করা হয় যে, কিছু ফারাও খৃস্টপূর্ব অস্টম শতাব্দীতে লিবীয় হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকে। খৃস্টপূর্ব ৪৫০ সালে হিরোডটাস লিবিয়া ভ্রমণ করেছেন। তিনিও তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তেঐ এলাকায় বসবাসকারীদের লিবিয়ান বলে উল্লেখ করেছেন।

লিবীয়া আফ্রিকার দেশ হলো জনগণ আরব বংশোদ্ভূত। ইসলাম সেখানকার জনগণের জীবনে গভীর ও কালজয়ী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জনগণের একাত্মতার বন্ধন ও সংগতি শক্তিশালী করেছে। ইতহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ফিলিশিয়ান, গ্রীক দস্যু, উসমানী {তুরস্কবাসী} ও ইতালীয়রা বিভিন্ন সময়ে লিবিয়া শাসন করেছে। লিবীয় জনগণের দুর্দমনীয় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ইতালীয় ফ্যাসিস্টারা আগ্রাসন চালিয়েছিলো। লিবিয়ার সংগ্রামী মুজাহিদ উমর আল মুখতার জীবনপণ করে আযাদী রক্ষার জন্য দুর্বার যুদ্ধ চালিয়েছেন। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের কারণেই ইতালীয়রা দীর্ঘ বিশ বছর ধরে লিবিয়ায় প্রভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। লিবিয়ার জাতীয় বীর উমর আল মুখতার ইতালীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে শেষ পর্যন্তশহীদ হন। তাঁর এই প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগ শহীদ তীতুর সংগ্রামের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৪২ সালে ইতালীর ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটলেও বৃটেনের ঔপনিবেশিক শাসন তার স্থলাবিষিক্ত হয়। জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী লিবিয়া ১৯৫১ সালে নামমাত্র স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর লিবিয়ার সামরিক বহিনীর তরুণ অফিসার কর্ণেল মুয়াম্মার আল গাদ্দাফীর নেতৃত্বে বাদশাহ ইদরিসের বিরুদ্ধে একটি সফল বিপ-ব সাধিত হয়। সেপ্টেম্বরের এ 'আল ফাতেহ' বিপ-বই লিবিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। গাদ্দফীর মৃত্যু পর্যন্ত লিবিয়া শাসন করেন।

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন

লিবিয়ার মাটিতে ফোয়েনিরসিয়ানরাই প্রথম বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠী বলে জানা যায়। তবে সঠিক সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। এই ফোয়েনিসিয়ানরা খৃস্টপূর্ব অস্টম শতাব্দীতে লেবাননের টায়ার এলাকা থেকে এসে ঐ এলাকায় বসতি স্থাপন করে। রোমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্তদু'শ, বছর ধরে ঐ এলাকায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ফোয়েনিসিয়ানদের প্রতিষ্ঠিত কার্থেজ সাম্রাজ্য দখল করার জন্য রোমানরা স্থানীয় নুমেডিয়া সাম্রাজ্যের বার্বারদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। খৃস্টপূর্ব ১৪৬ সালে এই যৌথ শক্তির হাতে কার্থেজ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই সুবাদে ত্রিপলিতানিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর নুমেডিয়াদের শাসন স্বীকৃত হয়। রোমানরা ত্রিপলিতানিয়া ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অংশকে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। এটা খৃস্টপূর্ব ৪৬ সালের কথা। এলাকাটিকে তারা আফ্রিকার রোমান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে এবং এভাবেই এ এলাকায় রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭২]

(১৭২) পূর্বোক্ত, পৃ.৯১৬-৮৫৯

Dhaka University Institutional Repository

লিবিয়ায় সভ্যতা ও জনপদের গোড়াপত্তন মূলত গ্রীকদের হাতেই হয়েছে। খৃস্টপূর্ব ৬৩০ সালে গ্রীকদের আগমন ঘটে। এ অঞ্চলে পেন্টাপলিস বা পঞ্চ জনপদ গ্রীকদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ নগর জনপদের একটি হচ্ছে হালের বেনগাযী শহর। গুরুত্বের দিক দিয়ে শহরটির স্থান রাজধানী ত্রিপলীর পরই। গ্রীক শাসন ঐ অঞ্চলে প্রায় দুশ বছর পর্যন্তস্থায়ী হয়। পারস্য শক্তির হাতে মিসরের পতন ঘটলে এ অঞ্চলে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে এবং শাসন কর্তৃত্ব চলে যায় পারস্য শক্তির হাতে। পরে মিশরীয়দের দ্বারা পারসিকরা বিতাড়িত হলে সাইরেনিকা একটি স্বাধীন অঞ্চল হিসেবে শাসিত হতে থাকে। খৃস্টপূর্ব ৩৩২ সালে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের হাতে মিসরের পতন ঘটলে সাইরেনিকা পুনরায় গ্রীকদের দখলে চলে যায়। আলেকান্ডারের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে টলেমীদের হাতে মিসরের শাসনভার চলে যায়। খৃস্টপূর্ব ৯৬ সালে টলেমীরা আবার রোমানদের হাতে সাইরেনিকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই প্রথমবারের মত ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরেনিকা প্রদেশদ্বয় একই শাসকের অধীনে শাসিত হতে থাকে। এর পরই ফেজ্জান এলাকা যুক্ত করে পুরো দেশকে লিবিয়া বলে চিহ্নিত করা হতে থাকে। ১৪৬ সালে সেপটিমাস সেভারাস নামক একজন লিবীয় রোমান শাসক হিসেবে শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও লুটেরাদের যুগ

রোমান সম্রাট বাইজেন্টাইনের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর রোমান সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম এ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ৪১০ সালে রোম সাম্রাজ্য একদল দুর্ধর্ষ গ্রীক দানবের হাতে পর্যুদস্ত হয়। রোম সাম্রাজ্য এদের করতলগত হয়। এরা ধ্বংস ও বিভীষিকার অভিশাপ নিয়ে উত্তর আফ্রিকার দিকে ধাবিত হয়। ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরেনিকা --- দু'টি এলাকাই এ সময় এ দস্যুদের দ্বারা পদাবনত হয়। ৪৫৫ সালে ত্রিপলী এদের দ্বারা আক্রান্তহয়। ৫৩৩ সালে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান দস্যুদের কবল থেকে উত্তর আফ্রিকা মুক্ত করেন।

আরবদের অভিযান

লিবিয়ায় আরবদের আগমনই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। শত শত বছর ধরে লিবিয়ার উপর 'আরবদের প্রভাব এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সব ক্ষেত্রেই লিবিয়ার উপর আরবদের প্রভাব অনস্বীকার্য ও অপ্রতিরোধ্য ছিলো। শত শত বছর ধরে তাই লিবিয়া 'আরবী ভাষা, সংস্কৃতি ও ইসলামের সুমহান ও শাশ্বত শান্তিধারায় সিক্ত হয়েছে। গ্রীক ও রোমানদের দর্শ কিংবা সংস্কৃতি লিবিয়ার জনজীবনে কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারেনি। ঐ সম্পর্ক ছিলো নিছক বিজিত ও বিজেতার সম্পর্ক। কিন্ত সে ক্ষেত্রে আরবরা শুদুমাত্র বিজয়ের নেশা নিয়েই লিবিয়া জয় করেনি। তারা জীবনমূখী ধর্ম ও সংস্কৃতির আবেহায়াতও সাথে নিয়ে এসেছিলো। 'আরব শাসকরা শাসক ও শাসিতের মিথ্যা দূরত্ব বিলুপ্ত করে স্থানীয় জনগণের সাথে একাকার হয়ে যান। এটা হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর অব্যাহত আরব অভিযানেরই ফলশ্রুতি। লিবিয়া আজ তাই গর্বিত ' আরব ও ইসলামী জাতির মর্যাদামন্ডিত একটি জনগোষ্ঠী।[১৭৩]

(১৭৩) পূর্বোক্ত, পৃ.৯১৬-১৬০

Dhaka University Institutional Repository

৬৪২ সালে 'আরব বিজেতা' আমর ইবন আল আস সাইরেনিকা দখল করেন। ৬৪৪-৬৪৫ সালে দ্বিতীয় বারের আক্রমণের মুখে ত্রিপলিতানিয়া ফেজ্জানে আরব শক্তির দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী এক দশকের মধ্যেই আরবরা পুরো লিবিয়ায় তাদের শক্তি সংহত ও সম্প্রসারিত করে। বাইজেন্টাইনরা স্বল্প সময়ের জন্য সাইরেনিকায় প্রত্যাবর্তন করলে শীঘ্রই তারা আবার বিতাড়িত হয়। ৭৪০ সালে উত্তর আফ্রিকায় বার্বাররা আরব শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। একাদশ শতকে লিবিয়ায় ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ৬৬১ সালে দামেশক ভিত্তিক উমাইয়া শাসকদের হাতে খুলাফা-ই-রাশেদীন যুগের অবসান ঘটে। ৭৫০ সালে পর্যন্ত আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়াদের পতন হওয়া পর্যন্ততাদের শাসনই অব্যাহত থাকে। আব্বাসীয়রা আরব বিশ্বের অন্যান্য অংশে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত তাদের শাসন অব্যাহত রাখে। আব্বসীয় শাসনের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ থেকে লিবিয়ার বিপুল দূরত্ব থাকায় তাঁরা সরাসির এ অঞ্চল শাসন করার অসুবিধা অনুভব করে ইবরাহীম ইবনুল আগলাবকে তিউনিসিয়া, ত্রিপলিতানিয়া ও তার সন্নিহিত এলাকার ভাইসরয় নিযুক্ত করেন। মিসরের ফাতিমীদের হাতে এ অঞ্চলের শাসনভার চলে যাবার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯১০ সাল পর্যন্ত ইবরাহীম ইবনুল আগলাব প্রতিষ্ঠিত বংশ ঐ এলাকায় রাজত্ব করে। ৯১০ সাল পর্যন্ত ইবরাহীম ইবনুল আগলাব প্রতিষ্ঠিত বংশ ঐ এলাকায় রাজত্ব করে। ৯১০ সাল থেকে ১১৬০ সালে পর্যন্ত এ অঞ্চলে ফাতিমী ও জায়ারিতাদের শাসন চলে। ১১৫৮ সালে থেকে ১২৩০ সাল পর্যন্ত আল মুয়াহিদুন ও ১২৩০ সাল থেকে ১৫১০ সাল পর্যন্ত হাফসিয়ুন বংশ এ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করে। ১৫১০ সাল থেকে ১৫৫১ সাল পর্যন্ত স্পেনীয়রা এ অঞ্চলে শাসন চালায়। ১৫৫১ সালে স্পেনীয় সম্রাট পঞ্চম চার্লস এর নিযুক্ত ভাইসরয়কে পরাস্ত করে তুর্কীরা ত্রিপলী দখল করে।

প্রথম তুর্কী শাসনের যুগ ১৫৫১ সাল থেকে ১৭১১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ১৭১১ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত লিবিয়ায় তুর্কী বংশোদ্ভুত কারমানালী শাসন চলে। দ্বিতীয় তুর্কী শাসন কাল ১৮৩৫ সাল থেকে পুনরায় শুরু হয়। ১৯১১ সাল পর্যন্ত এ শাসনকাল পরিব্যাপ্ত ছিল। এ সময় তুরস্কের সাথে লিবিয়ার সরাসরি স্থলপথে যোগাযোগ ঘটে।

ইতিমধ্যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৩৭ সালে সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবন আলী আল সানুসী আল ইদরিসী আল হাসানী মক্কায় সুফীবাদের শক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন লিবিয়ার রাজা ইদরিসের পিতামহ। ১৮৪৩ সালে সুফীবাদ প্রচারের কেন্দ্রভূমি হিসেবে সাইরেনিকাকে বেছে নেয়া হয়। ক্রমশ লিবিয়ার অপর অংশে সানুসীদের ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রভাব বাড়তে থাকে।

১৯১১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত লিবিয়ায় ইতালীর ঐপনিবেশিক শাসন চলে। উল্লেখ্য , ইতালীয়রাই ছিলো লিবিয়ায় সর্বশেষ বিদেশী শক্তি। ইতালীর ঐপনিবশিক শাসন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য লিবীয়দের দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্কের হাত থেকে ইতালী লিবিয়া ছিনিয়ে নেয়। ১৯১২ সালের ১৮ অকটোবরের চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক লিবিয়াকে ইতালীর কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে ত্রিপলীর জন্য একজন গ্র্যান্ড কাযী নিযুক্ত করার তুর্কী অধিকার সংরক্ষিত থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লিবীয়রা ইতালীর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার একটি সুযোগ পায়। ১৯৪০ সালের ১০ জুনের যুদ্ধে ইতালীয়দের ভূমিকা স্পষ্ট হবার পর সুযোগ পায়। ১৯৪০ সালের ১০ জুনের যুদ্ধে ইতালীয়দের ভূমিকা স্পষ্ট হবার পর প্রবাসী লিবীয়রা মিসরে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। তাঁরা একটি প্রাদেশিক সানুসী সরকার গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু বাদশাহ ইদরিস বৃটিশের তত্ত্বাবধানে প্রথম একটি লিবীয় আরব বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন। এ বাহিনী জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে বৃটিশের পাশে থেকে যুদ্ধ করে। কিন্তু বৃটিশের পক্ষে সহযোগিতা করা হলেও বৃটিশ লিবিয়াকে স্বাধীনতা না দিয়ে আবার কুক্ষিগত করে নেয়। এভাবেই ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত লিবিয়ার উপর বৃটিশ ও ফরাসীদের খবরদারী চলে। তবে লিবিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে বৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে বেশ ঠান্ডা লড়াই চলে। বাদশাহ ইদরিস সবসময়ই বৃটিশের অনুগ্রহ পাবার জন্য উন্মুখ ছিলেন। বৃটিশ যুদ্ধ কমিশনার অফিসের অনুমোদন নিয়ে বাদশাহ ইদরিস পুনরায় ক্ষমতায় জেঁকে বসেন। তবে তিনি নামমাত্র শাসক ছিলেন এবং লিবিয়ার উপর প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে।

১৯৩৪ সালে নাম হয় লিবিয়া। ১৯৪৫ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ লিবিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ প্রশ্নে লন্ডনে এক বৈঠকে বসে, কিন্তু তারা কোন সম্মত পন্থা উদ্ভাবনে ব্যর্থ হয়। ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর গোটা বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে লিবিয়ার ইস্যুটি আলোচিত হয়নি। অবশেষে লিবিয়ার উপর ইতালী, বৃটেন ও ফ্রান্সের যৌথ ট্রাস্টিশীপের সুপারিশ করা হয়। এ পরিকল্পনা গৃহীত হবার দশ বছর পর লিবিয়ার স্বাধীনতা দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। লিবিয়ার জনগণ এ সিদ্ধান্তড়কে আর একটি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে।

১৯৬৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে রাজা ইদ্রিস সিংহাসনচ্যুত হন, কর্ণেল গাদ্দাফির একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ নভেম্বর জাতিসংঘের ১৮৯ নম্বর প্রস্তাব মতে এক বছরের মধ্যে লিবিয়ার স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়। ১৯৫১ সালের ২৪ ডিসেম্বর লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। রাজধানী ত্রিপোলি লিবিয়ার প্রধান বন্দর। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত এই শহরের লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। অন্যান্য শহর বেনগাজি, মিসুরাতা তব্রুক, সবকটিই বন্দর।

অর্থনৈতিক পরিচয়:–মোট জাতীয় উৎপাদনের ৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। গম, বার্লি, অলিভ, খেজুর, বাদামের চাষ হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৭৫ শতাংশ আমদানি করতে হয়। রপ্তানি করে পেট্রোলিয়াম, বাদাম, চামড়া। মোট জাতীয় আয় (জি ডি পি) ২,৮৯০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৬,৮০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:-জামাহিরিয়া শব্দটির অর্থ পিপলস রিপাবলিক, জনগণের সরকার। কিন্তু প্রকৃত বিচারে লিবিয়ায় সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম আছে ১৯৬৯ সাল থেকে। বিপ-বের নায়ক

Dhaka University Institutional Repository

গাদ্দাফি, জেনারেল পিপলস কমিটির চেয়ারম্যান (প্রধামন্ত্রী) ও জেনারেল পিপলস কমিটি (মন্ত্রিসভা) নিয়ে প্রশাসন। এককক্ষ জাতীয় সংসদ জেনারেল ন্যাশনাল কংগ্রেস। ন্যাটোর নেতৃত্বে সামরিক অভিযানে ২০১১ সালে গাদ্দাফির মৃত্যু হয়। এরপর ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (NTC) এর নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ৭ জুলাই ২০১২ তারিখর নির্বাচনের পর (NTC) নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। নব নির্বাচিত সরকার নতুতভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংবিধান প্রণয়েনর কাজ করছে। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।[১৭৪]

৪.১.৪৮. লেবানন

লেবাননের সাংবিধানিক নাম Al Jumhuriyah Al Lubnaniyah এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Republic of Lebanon দেশটির আয়তন ১০,৪৫২ বর্গ কি মি (৪,০৩৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৪২ লক্ষ ২৬,০১৮, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৭ শতাংশ। অধিবাসীরা লেবানিজ নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৮৩ শতাংশ আরব, ৯ শতাংশ প্যালেষ্টাইন, ৫ শতাংশ আর্মেনিয়ান, ১ শতাংশ অন্যান্য। ৬২ শতাংশ মুসলিম, ৩৭ শতাংশ খৃষ্টান, অল্প সংখ্যক ইহুদি। গড় আয়ু ৭৩.৫ বছর। সরকারি ভাষা আরবি ও ফারসি আর্মেনিয়ান ও ইংরেজি ভাষা প্রচলিত। রাজধানী বৈরুত, প্রচলিত মুদ্রা- লেবানিজ পাউন্ড।[১৭৫]

ভৌগোলিক পরিচয়:- পশ্চিম এশিয়ার শেষ সীমানয় ভূমধ্যসারের-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত দেশ। তটরেখা ২২৫ কি:মি:। নহর আল লিজানি বড় নদী, এর জন্য খাওয়ার পানির অভাব নেই। দেশের ২১ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য। দেশটি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত। এর উত্তর পূর্বে সিরিয়া এবং দক্ষিণে ইসরাইল। ত্রিপলি, বৈরুত ও সাঈদা শহরে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা ছাড়াও ত্রিপলির উত্তরে সমগ্র লেবাননে, সাঈদার দক্ষিণে সমগ্র দক্ষিণ লেবানন এবং পূর্ব লেবাননে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মধ্য লেবাননের পর্বতমালা থেকে পশ্চিমে ত্রিপলি ও বৈরুতের মধ্যবর্তী উপকূল অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃস্টান এলাকা। বৈরুত থেকে দক্ষিণ পূর্বে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হচ্ছে 'সাফা'। এর উভয় পাশের ক্ষুদ্র এলাকা খৃস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ। তীব্র জাতি স্বাতন্ত্রবোধের কারণেই এ ধরনের জাতিভিত্তিক শ্রেনী বিন্যাস সূচিত হয়েছে। লেবাননে খৃস্টানরা কোন কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আর্মেনিয়া থেকে ব্যাপক হারে খৃস্টানদের আমদানী করে লেবাননে নিয়ে আসে।

---

(১৭৪) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পুর্বোক্ত, পৃ.১৭৯

(১৭৫) *Europa (2004)*, ibid, V-2,PP.2595 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.২৫৯৫-২৬২০) ও www.wik.pedia.org.

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- প্রাচীন সভ্যতার দেশ। ১৯২০-৪১ সালে ফ্রান্সের রক্ষণাধীন ছিল, ১৯২৫ সালে ফরাসী সরকার এক ম্যান্ডেট বলে লেবাননকে লেবানন প্রজাতন্ত্র' হিসেবে একটি রাষ্ট্রের রূপ দেয়। মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করার অপকৌশল হিসেবেই সিরিয়া থেকে লেবাননকে পৃথক করা হয়। মুসলমানরা এ বিভক্তিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই ১৯৪৩ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা রাষ্ট্রের কোন কাজে অংশ গ্রহণ করেনি। ১৯৪৪ সালে স্বাধীনতার লাভের পর খৃস্টান নেতা বিশারা আল-খুরী ও মুসলিম নেতা রিয়াদ আল-সুলেহ এক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছেন। চুক্তির শর্ত ছিলো--- ''বিশারা খৃস্টানদের পক্ষ থেকে লেবাননকে একটি 'আরব রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন এবং সহযোগী 'আরব দেশসমূহের স্বার্থের পরিপন্থী কোন ইউরোপীয় শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবেন না। অপর দিকে রিয়াদ সুলেহ মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্বীকার করে নেন যে, তারা লেবাননকে অপর কোন 'আরব রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন করে দেবেন না।[১৭৬] দেশটি ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

উভয় জাতির এ স্বীকৃতি ছিলো লেবাননের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভিত্তি। কিন্তু যখনই এ ভিত্তির ওপর আঘাত এসেছে, তখনই দেখা দিয়েছে গৃহযুদ্ধ। লেবাননে পক্ষ মোট চারটি। সুন্নী মুসলমান, শিয়া মুসলমান, খৃস্টান এবং দ্রুজ। দ্রুজরা শিয়াদেরই একটা পৃথক সম্প্রদায়। ১৯৪৩ সনের শাসনতন্ত্র মুতাবিক লেবাননের প্রেসিডেন্ট হবেন একজন ম্যারনিট খৃস্টান, প্রধানমন্ত্রী হবেন সুন্নী মুসলমান, দেশরক্ষামন্ত্রী হবেন দ্রুজ এবং জাতীয় পরিষদের স্পীকার হবেন শিয়া। লেবাননের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন বিশারা এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন রিয়াদ সুলেহ। ১৯৪৯ সালে খৃস্টান নেতা হজব আল-কাসি অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করলে রিয়াদ সুলেহ তাকে মৃত্যুদন্ড দেন। খৃস্টানরা এর প্রতিশোধ স্বরূপ ১৯৫১ সালে রিয়াদ সুলেহকে হত্যা করে। এখান থেকেই রাষ্ট্রীয় ঐক্যে ফাটল ধরে। ১৯৫২ সালের অভ্যুত্থানে বিশারা পদচ্যুত হন এবং কামিল শামউন প্রেসিডন্ট হয়। কামিল ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। ফলে মুসলমানদের অসন্তেড়াষ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৫৮ সালে কামিল শামউন পুনর্বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে মুসলমানদের অসন্তেড়াষ বিক্ষোভের রূপ নেয়। ফলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্রোহ দমন করার জন্য কামিল আমেরিকান ৬ষ্ঠ নৌবহর ডেকে আনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কামিল আর ক্ষমতায় থাকতে পারে নি। এ সময় ফিলিস্তিনীরা লেবাননে একটি নতুন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। তারা এখানে এসে জমা হয়েছিল মাতৃভূমি উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে সংহত করার জন্য। খৃস্টানরা তাদেরকে কখনো সহ্য করতে পারেনি। ১৯৭৩ সালে তারা ফিলিস্তিনীদের ওপর সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র হামলা চালায়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত লেবাননে গৃহযুদ্ধ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের সাথে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কামিল শামউন একদিন মার্কিন শক্তিকে লেবাননে ডেকে আনে।

---

(১৭৬) মুহাম্মদ মুসা, সিরিয়া-লেবানন-জর্দান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩৫.

Dhaka University Institutional Repository

আজ তারাই আবার ইহুদীদের ডেকে এনেছে একই সাথে ফিলিস্তিনী এবং লেবাননী মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য। ইসরাইলী বোমা ও গোলাবার্ষণ আজ এখানকার নিত্য দিনের ব্যাপার। জার্মানীর নাৎসীরা কেবল স্বল্প দিনের জন্য ইহুদীদের ওপর অত্যাচার করেছিল। কিন্তু গোটা দুনিয়ার ইহুদীরা মধ্যপ্রাচ্যের নব্য হিটলার ইসলাইলের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য আজ যুগ যুগ ধরে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচেছ। মুসলমানদের অনৈক্য, আত্মঘাতি ষড়যন্ত্র ইসরাইলী দানবীয় হাতকে আরো শক্ত করে দিয়েছে। ১৯৭৫ সালে খৃষ্টান ও মুসলিম আরবদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ লেবাননকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।[১৭৭]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- একদা লেবানন ছিল আরব দুনিয়া সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। তার রাজধানী বৈরুত ছিল বড় অর্থনৈতিক কেন্দ্র, সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত মানের ব্যাংক সেন্টার। আর পর্যটকদের প্রিয় শহর। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধে লেবানদের অর্থনীতি বিধ্বস্তী হয়েছে। ১৯৯২ থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। কৃষিপণ্য, রাসায়নিক বস্ত্র, দামি পাথর, ধাতব পদার্থ, লেবানন থেকে রপ্তানি হয়। দেশজ উৎপাদন ১৭২০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৪৩২৬ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- প্রথা অনুযায়ী লেবাননের প্রেসিডেন্ট ম্যারনিট খৃষ্টান, প্রধানমন্ত্রী সুন্নি মুসলিম ও জাতীয় সংসদের স্পিকার শিয়া মুসলিম বহু বছর ধরে হয়ে আসছে। প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা। নেবানন ছয়টি মুহাফাজায় {governorates} বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে-- বৈরুত জাবাল, লুবনান, আল, শামাল, আল জানুব, আল বিকা ও আল নাবাতিয়া। এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমবি- সদস্য সংখ্যা ১২৮, খ্রিষ্টান ও মুসলামান সদস্য সমান। সব রাজনৈতিক দল ধর্মভিত্তিক। ভোটাধিকার পুরুষদের ২১ বছর বয়সে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত মেয়েদেরও ২১ বছর বয়সে ভোটাধিকার রয়েছে।

৪.১.৪৯. সংযুক্ত আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাংবিধানিক নাম Al Imarat Al Arabiyah Al Muttahidah এবং ইংরেজি নাম United Arab Emirates দেশটির আয়তন-৮৩,৬০০ বর্গকিমি (৩২,২৯২ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা- ৩২ লক্ষ ৪৭ হাজার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশ। অধিবাসীরা এমিরিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ২৫ শতাংশ এমিরিয়ান, অন্য আরব গোষ্ঠী ২৩ শতাংশ।[১৭৮] অবশিষ্ট ৫২ শতাংশ পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত। রাষ্ট্রের মোট অধিবাসীর মাত্র ২০ শতাংশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাগরিক। অধিবাসীদের ৯৬ শতাংশ মুসলিম, তার মধ্যে ১৬ শতাংশ শিয়া।[১৭৯]

---

(১৭৭) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩৬
(১৭৮) জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ অনারব প্রবাসী, তাদের অধিকাংশই ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইরান থেকে এসেছে।
(১৭৯) অধিবাসীদের ৯৬ শতাংশ সুন্নী মুসলিম, অনাবাদের মধ্য রোমান ক্যাথলিক খ্রষ্টান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি ভাষা আরবি, তবে ইংরেজি ও ফার্সিভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হিন্দি, উর্দু সে দেশে প্রচলন রয়েছে। রাজধানী আবুধাবি, প্রধান বন্দর দুবাই । দেশটিতে শিক্ষার হার ৭৬% ভাগ। প্রচলিত মুদ্রা দিরহাম। দেশটির সংক্ষিপ্ত নাম নেই, সংক্ষেপে বলা হয় UAE ।

ভৌগোলিক পরিচয়:- পারস্য উপসাগরের পশ্চিম- দক্ষিণ উপকূলে সাতটি ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত গঠিত। দেশটির পশ্চিম এবং দক্ষিণে সউদি আরব, পূর্বে ওমান, উত্তরে কাতার এবং পারস্য উপসাগরের দক্ষিণের ৬৫০ কিমি সমুদ্র সৈকত রয়েছে। রাজ্যগুলির নাম আবুধাবি, আজমান, অল ফুজাইরা, শারজাহ, দুবাই, রা'স-আল খায়মা, উম্ আল-কাওয়াইন। আবুধাবি রাজধানী হিসাবে বিখ্যাত, দুবাই প্রধান বন্দর এবং শারজা সম্প্রতি ক্রিকেট খেলার জন্য খ্যাতি লাভ করেছে।[১৮০]

ঐতিহাসিক পরিচয়:-উল্লেখিত সাতটি রাজ্য ১৮২০ সালে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বৃটেনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এগুলো স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ক্ষুদ্র রাজ্য ট্রুসিয়াল স্টেটস নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালে বৃটেনের তত্বাবধানে সাতটি রাজ্য নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত গঠিত হয়। দেশটি ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।[১৮১]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- সমগ্র দেশ সমতল ও বালুকাময়। পূর্ব সীমান্তকিছুটা পর্বতময়। জমি অনুর্ব্বর, কিছু এলাকায় খেজুর, গম, সবজি ও তামাক চাষ হয়। শুধু তেল ও গ্যাসের জন্য ইউএই পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। কৃষি অনুল্লেখ্য, এদেশের ৮৫ শতাংশ লোক তেলের খনিতে কাজ করে। অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয় বলেই এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মানুষ এখানে আসে। যাদের মিলিত সংখ্যা এখন আমিরাতের নাগরিকদের চেয়ে বেশি। মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৮,০৬০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- সাতটি রাজ্য মিলে একটি যুক্তরাষ্ট্র হ'ল সংযুক্ত আরব আমিরাত। শুরু থেকে দেশটির প্রধান আবুধাবির আমীর। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব, আর সকল বিষয়ে রাজ্যগুলি স্বাধীন। সে কারণে তেলসমৃদ্ধ রাজ্যগুলি তেলবিহীন রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ। প্রতিটি রাজ্যের আমির সেখানকার শেখদের মধ্য হতেই নিযুক্ত হয়ে থাকেন । এককক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৪০ জন, সকলেই মনোনীত সদস্য। দেশটিতে কোন রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি নেই, কোন নির্বাচন হয়না।[১৮২]

---

(১৮০) *Europa (2004)*, ibid, P.4321 (বিস্তারিত জানতে পৃ.৪৩২১-৪৩৩৭ দেখুন)
(১৮১) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩
(১৮২) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যে*, বাংলা একাডেমী,ঢাকা-২০০০, পৃ.১৭১-১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫০. সৌদি আরব

সৌদি আরবের সাংবিধানিক নাম Al Mamlakah Al Arabia As-Saudiya এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Kingdom of Saudi Arabia দেশটির আয়তন ২২,৪০,০০০ বর্গকিমি (৮,৬৪,৮৬১ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৭,৫৫৮ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা সৌদি নামে পরিচিত। জনসংখ্যার মধ্যে আরব ৯০ শতাংশ, আফ্রো-এশিয়ান ১০ শতাংশ। সকলেই মুসলিম তবে ৮৫ শতাংশ সুন্নি মুসলিম এবং ১৫ শতাংশ শিয়া মুসলিম। প্রত্যাশিত গড় আয়ু-৭২.৩ বছর। হিজরী ক্যালেন্ডার প্রচলিত। রাষ্ট্র ভাষা আরবি। তবে প্রায় ২৭ শতাংশ প্রবাসী ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। রাজধানী রিয়াদ, প্রচলিত মুদ্রা- সৌদি রিয়াল।[১৮৩]

ভৌগোলিক পরিচয়:- সৌদি আবর এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের ৭০ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে সৌদি আরব। দেশটির পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, উত্তরে জর্দান, ইরাক ও কুয়েত এবং দক্ষিণে ইয়েমেন ও ওমান। দেশটির ভূ-প্রকৃতি এর গুরুত্ব পূর্ণ দিক বিবেচিত হয়ে আসছে সারা দেশই মরুভূমি। পশ্চিমদিকে পাহাড় যার উচ্চতা ৯,০০০ ফুট। সেই পাহাড়ের ওপর থেকে বালির ঢল নেমে ক্রমে সমতল হয়ে পূর্বে পারস্য উপসাগরে মিশেছে। পশ্চিমে রেড সি। উপকূল রেখা, ২,৫১০ কি মি দীর্ঘ। প্রায় সমগ্র দেশ রুক্ষ, শুষ্ক, তপ্ত ও জনবসতিহীন। কর্ষণযোগ্য জমি দেশের মাত্র ১ শতাংশ, বনভূমিও ১ শতাংশ। কোন নদী বা মিষ্টি পানির উৎস নেই।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- সৌদি আরবের জনবসতি ও সভ্যতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। একে আরব ভৌগালিকরা যথার্থই উম্মুল বিলাদ বা দেশসমূহের জননী বলে অভিহিত করতেন তা মানবজাতির সুতিকাগার- সব ধর্ম ও জাতির মূল আবাসভুমি বলে অনুমতি হয়ে থকে। তুলনামূলক জাতিতত্ত্ব মানবজাতির শৈশব আবস্থার উপর যে ক্ষীন,আবছায়া আলোক সম্পাত করেছে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, বিভিন্ন বংশোদ্ভূত দল মানবজাতির এই আদিম আবাসভূমিতে সমবেত হয়ে ক্রমশ পরিবার ও গোত্রে সম্মিলিত হয়েছিল। অতঃপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপনের জন্য তারা বাধ্য হয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। হোমটিক শাখার লোকেরা আপতত দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম তাদের প্রাচীন আবাসভূমি ত্যাগ করেছিল।[১৮৫] হাজার হাজার বছর পূর্বে অ্যাসিরিয়া, ব্যাবলিনিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং ফিলিস্তানে যারা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল মূলত সৌদি আরবের সেমিটিকদের বংশধর। পরবর্তীতে তাদের উত্তরসুরীরা বিভিন্ন সাম্রাজ্য গড়ে তুলে যার ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান।

---

(১৮৩) *Europa (2004)*, Ibid, V-1, PP.3648 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩৬৪৮-৩৬৬৭)

(১৮৪) স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, (অনুবাদ-৬, রশীদুল আলম) মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা- ১৯৯৫, পৃ.১১

(১৮৫) Osman Nur,Topbas, *Islam Spirit and Form*, Erkan Publication, Istanbul, 2003, PP.3-4

Dhaka University Institutional Repository

সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম, নবুয়তপ্রাপ্তি এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার। নবী (সা.) এর প্রচারিত আদর্শ ইসলামে রয়েছে মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ, শান্তিঅগ্রগতি উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তি।[১৮৫] ইসলামের প্রথম যুগে খলিফাগণের শাসন এবং মুসলিম দিগ্বিজয়, মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রসার এবং এ সময়ে ইসলামের প্রচার সৌদি আরব এক নতুন বিশ্বের সূতিকাগার এবং পবিত্র ভুমি হিসেবে বর্হিবিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। মক্কা মুয়াজ্জামায় পবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফ ও মদিনা মোনাওয়ারায় নবী করিম (সা.) এর রওযা শরীফ মুসলিম মানসে সৌদি আরবের অবস্থানকে করেছে সমুন্নত। দেশটি শাসন কার্য পরিচালনার জন্য কখনো মিশরীয় মামলুকরা আবার তুর্কীর ওসমানিয় শাসকগণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। পরবর্তীতে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র সৌদি আরব একটি সুগঠিত ও সুসংহত রাজ্যের রূপ নেয় ১৯২৬ সালে, বর্তমান সৌদি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইবনে সউদ। প্রশাসনিকভাবে চরম রাজতন্ত্র তবে ১৯৯২ সালে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়, যা গণতন্ত্রের পথে প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী রিয়াদ মরুদ্যানে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। শহরকে পরিবৃত করে আছে খেজুর গাছ, যাতে গভীর নলকূপ থেকে পানি সিঞ্চিত করা হয়। লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ। অন্যান্য শহর মক্কা, মদীনা, তায়েফ। বন্দর শহর জেদ্দা, দামাম।[১৮৬]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশটির প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থের মধ্যে রয়েছে লোহা, ফসফেট, বক্সাইট, ইউরেনিয়াম, তামা ইত্যাদি। তেল প্রধান সম্পদ, রাজস্বের ৭০ শতাংশ, মোট জাতীয় উৎপাদনের (জি ডি পি) ৩৭ শতাংশ আসে তেল থেকে। রপ্তানির সবটুকুই অপরিশোধিত তেল বা তেল-জাত পণ্য। বিভিন্ন তেলের খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ বহিরাগত। তেল শোধনাগার, পেট্রোকেমিক্যালস, সিমেন্ট, ক্ষুদ্র স্টিল, রোলিং মিল, নিমার্ণ সরঞ্জাম, সার, প্লাস্টিক প্রভৃতির কারখানা গড়ে উঠেছে। কৃষিতে দেশের ১৬ শতাংশ লোক নিযুক্ত ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ১০ শতাংশ আসে এখাত থেকে। গম, বার্লি, টমেটো, তরমুজ, খেজুর প্রভৃতির চাষ হয় এবং খাদ্যে দেশটির স্বনির্ভরতার পথে। সৌদি আরব যে মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে তার ৮৫ শতাংশ তেল বা তেলজাত পণ্য। মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ১২৮৯০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১০১৫৮ ডলার।[১৮৭]

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- কোন সংবিধান নেই, শীরয়ত অনুসারে দেশ শাসন হয়। ডিক্রী অনুযায়ী শরয়ী আইনে দেশ পরিচালিত হয়। ১৯৯২ সালের রাজকীয় ডিক্রীই রাষ্ট্রের আইন হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। রাজা ১২০ সদস্যের[১৮৮] ৪ বছরের জন্য মজলিশই শুরা গঠন করেন এবং একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে দেশ শাসন করেন। রাজা, প্রধানমন্ত্রী, ক্রাউন প্রিন্স, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী সংসদ নিয়ে প্রশাসন, সকলেই রাজা মনোনীত বা রাজবংশজাত। কোন আইনসভা নেই, আছে রাজা মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদ। রাজনৈতিক দলগঠন নিষিদ্ধ।

---

(১৮৬) আবুল আসাদ, জাজিরাতুল আরব, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮১৭-৮২২

(১৮৭) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৩

(১৮৮) ১৯৯৩ সালে রাজা একটি মজলিস-ই শুরা গঠন করেন, ১৯৯৭ সালে ৬০ সদস্য মজলিস ই-শুয়া বৃদ্ধি করে ৯০ সদস্যের করা হয়। ২০০১ সালে দ্বিতীয় বারের মতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪ বছরের জন্য ১২০ সদস্যের শুয়া গঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫১. সিয়েরা লিওন

সিয়েরা লিওনের সাংবিধানিক নাম The Republic of Sierra Leone দেশটির আয়তন ৭১,৭৪০ বর্গ কি মি (২৭,৬৯৯ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ৫৯ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা সিয়েরা লিওনিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৯৯ শতাংশ আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতি, তন্মধ্যে ক্রিয়ো (Krio), মেন্ডস (Mendes), লিম্বা (Limba), টেমনেস (Temne), উপজাতির প্রধান্য রয়েছে। বাকিরা শ্বেতাঙ্গ, লেবানিজ ও এশিয়ান। অধিবাসীদের ৩০ শতাংশ মুসলিম, ১০ শতাংশ খৃষ্টান, অন্যরা প্রকৃতি ধর্মে বিশ্বাসী। সাক্ষর ৩৬ শতাংশ। গড় আয়ু ৩৪.২ বছর। সরকারি ভাষা ইংরেজি, তবে উত্তরে তেমনে ও দক্ষিণে মেন্দে-দুটি উপজাতীয় ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে পুনর্বাসিন পাওয়া মুক্ত ক্রীতদাসদের বংশধররা ক্রিয়ো নামে ভাঙ্গা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। তাদের বসবাসকারী মুখ্যত রাজধানীতে সীমিত। রাজধানী ফ্রি টাউন,প্রচলিত মুদ্রা- লিওন।[১৮৯]

ভৌগোলিক পরিচয়:- সিয়েরা লিওন আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে আটলান্টিক মহাসাগর তীরে অবস্থিত। দেশটির উত্তর-পশ্চিমে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে রয়েছে গিনি প্রজাতন্ত্র। দক্ষিণ-পূর্বে লাইব্রেরিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর ভূ-প্রকৃতি অনুসারে আটলান্টিক উপকূলে প্রতিষ্ঠিত দেশ। আটলান্টিক উপকূল ৪০২ কি মি। পূর্ব সীমান্তেপর্বতমালা, ঘন জঙ্গলে ভরা দেশ। দেশের ৩০ শতাংশ বনভূমি, ২৫ শতাংশ কর্ষণযোগ্য।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৭৮৮ সালে দেশটির উপকূল অঞ্চল বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। বৃটিশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের ও লন্ডনে আশ্রয় নেওয়া পলাতক ক্রীতদাসদের জন্য বৃটেন প্রথমে সিয়েরা লিওনের উপকূল অঞ্চলে দখল নেয় ও ফ্রি টাউন শহরটির পত্তন করে। ১৮৯৬ সালে সমগ্র সিয়েরা লিওন বৃটিশ উপনিবেশ হয়। ১৯৬১ সালে সিয়েরা লিওন স্বাধীনতা পায় ও জাতিসংঘের সদস্য লাভ করে। রাজধানী ফ্রি টাউন ১৭৯০ সালে মুক্ত ক্রীতদাসদের পুনর্বাসিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হীরা, সোনা, বক্সাইট, লোহা, প্রভৃতি খনিজ সম্পদে দেশ সমৃদ্ধ।[১৯০] দেশের শিল্পসমৃদ্ধ প্রধান বন্দর, লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ। অন্যান্য শহর কইদু বো, কেনিমা, মেকানি।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশটিতে হীরক, বক্সাইট ইত্যাদি খনিজ সম্পদ রয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির ৬৫ শতাংশ কৃষিজীবি। রাজনৈতিক অশান্তিও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে সিয়েরা লিওনের সুসংহত উন্নতি হয়নি।

---

(১৮৯) *Europa (2004)*, ibid, PP.3732 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩৭৩২-৩৭৪৮)
(১৯০) পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৪৬.

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নত স্থিতিশীল হওয়ার আর এক অন্তরায়, প্রতি নারীর গড়ে সম্ভাব্য সন্তান সংখ্যা ৬.১। দেশের দুই তৃতীয়াংশ শ্রমজীবি কৃষিজীবি ও জাতীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ কৃষিপণ্য। অর্থকরী ফসল, কফি, কোকো, পাম কার্নেল। যা চাল হয় তাতে দেশের ৮০ শতাংশ প্রয়োজন পূরণ হয়। মোট জাতীয় আয় (জিডিপি) ১৪০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১৫০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৭৮ সালে গণভোটের মাধ্যমে একটি সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর ১৯৯১ সালে তা পুনরায় গৃহীত হয়। কিন্ত ১৯৯২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। ১৯৯৬ সালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯১ সালের সংবিধান পুর্নবহাল করা হয়। এতে বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চার পথ সুগম হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র প্রধান। তিনি পাঁচ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি সর্বোচ্চ ২ বার অর্থাৎ ১০ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন এবং মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দেশের আইন পরিষদ এককক্ষ বিশিষ্ট ৮০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৯২ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ও সংবিধান বাতিলের পর নতুন নির্বাচন হয়নি। ন্যাশনাল প্রভিসনাল রুলিং কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন। সামরিক ব্যক্তিরাই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় সংসদ 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস' বাতিল হয়ে গেছে। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।[১৯১]

৪.১.৫২. সিরিয়া

সিরিয়ার সাংবিধানিক নাম Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah As-Suriyah এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Syrian Arab Republic দেশটির আয়তন ১,৮৫,৪০৫ বর্গ কি মি (৭১,৪৯৮ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৮,৭৫২ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা সিরিয়ান নামে পরিচিত। জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ আরব, বাকী ১০ শতাংশ কুর্দি, আর্মেনিয়ান ও অন্যান্য। ৭৪ শতাংশ সুন্নি মুসলিম, ১৬ শতাংশ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলিম, বাকী ১০ শতাংশ খৃষ্টান ও ইহুদি। সাক্ষর ৭৫.৩ শতাংশ, গড় আয়ু-৭১.৯ বছর। রাষ্ট্রভাষা আরবি, সরকারি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে ফরাসি ভাষা ব্যবহৃত হয়। রাজধানী দামাস্কাস, প্রচলিত মুদ্রা-সিরিয়ান পাউন্ড।[১৯২]

ভৌগোলিক পরিচয়:- সিরিয়া এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। দেশটির পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও লেবানন, দক্ষিণে ইসরাইল ও জর্ডান, পূর্বে ইরাক এবং উত্তরে তুরস্ক। বর্তমানে গোলান মালভূমি নামে পরিচিত এলাকা (১২৯৫ বর্গ কি মি) ইজরাইলের দখলে আছে। তটরেখা ১৯৩ কি মি। অধিকাংশ সমতল ও মরুভূমি, পশ্চিম দিকে পাহাড় আছে। ২৮ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য, বনভূমি সামান্য তবে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ইউফ্রেটিস নদীর পানিতে কিছু এলাকা সিঞ্চিত।

---

(১৯১) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯১.
(১৯২) *Europa (2004)*, ibid, PP.4055 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৪০৫৫-৪০৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়ঃ- সিরিয়া {শাম}, লেবানন {লুবনান}, জর্দান {উর্দুন}, ইসরাইল {ফিলিস্তীন} প্রভৃতি এলাকা মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পূর্বে বাইজেন্টাইন {খৃস্টান} সম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। এ রাজ্যের তৎকালীন নাম ছিলো রোম। রাষ্ট্রনায়কের উপাধি ছিল কাইজার। হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলাফত কালে তাঁর নির্দেশে খালিদ ইবন অলীদ, আমর ইবনুল আস, শোরহাবিল ইবন হাসান, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং য়াযীদ ইবন আবু সুফিয়ানের (রাঃ) যৌথ নেতৃত্বে ৬৩৩ সালে সিরিয়া অভিযান শুরু হয়। ৬৩৪ সালে আবু বকর (রাঃ) ইন্তিকাল করেন এবং উমর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। ৬৩৫ সালে মুসলমানরা দামেশক অধিকার করে। ৬৩৬ সালে জর্দানের পূর্ব সীমায় অবস্থিত ইয়ারমুক নদীর তীরে বাইজেন্টাইন বাহিনী মুসলিম মুজাহিদদের হাতে চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়। মুজাহিদরা হযরত খালিদ ও আবু 'উবায়দার (রা.) নেতৃত্বে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে কিন্নাসরিন, আন্তাকিয়া, আলেপ্পো, টায়ার সিডন ও বৈরুত প্রভৃতি এলাকা দখল করেন। ৬৩৮ সালে জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে। ৬৩৩-৬৩৮ সালের মধ্যে সিরিয়া, লেবানন, জর্দান এবং জেরুজালেম ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভূক্ত হয়।[১৯৩]

১৯১৮ সালে তুরস্কের উসমানী শাসনের পতনের পূর্ব পর্যন্তএ সব এলাকা মুসলিম রাজ্যের শাসনাধীন থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে সিরিয়া ফরাসীদের দখলে চলে যায়। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্তসিরিয়া ফরাসীদের দখলে থাকে। ১১৯২ সালে ক্রুসেডের যুদ্ধে ইউরোপের সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনী ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড, ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টিন এবং জার্মানির ফ্রেডারিক বারবারোসার যৌথ নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে চরমভাবে পর্যুদস্ত হয় এবং মুসলিম বীর গাযী সালাহ উদ্দীনের সাথে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। এ সময় খৃস্টানরা উপলব্ধি করে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তারা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র আটতে থাকে। অবশেষে তারা মুসলমানদের মধ্যে ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়।

মুসলমানরা তাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র আঁচ করতে ব্যর্থ হয়। তারা আদর্শ ভিত্তিক ইসলামী জাতীয়তাবোধকে ভুলে গিয়ে আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার শিকার হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিত্রশক্তি তাদের এ অনৈক্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা সিরিয়াসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকে লোভ দেখায় যে, তারা যদি তুর্কী সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে যুদ্ধশেষে তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। রাষ্ট্রগুলো সহজেই খৃস্টানদের এ ষড়যন্ত্রজালে আটকা পড়ে যায়। তারা উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের সর্বশেষ চিহ্নটুকু ছিন্নভিন্ন করে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধে উসমানী কর্তৃত্বের পতন ঘটলে মিত্রশক্তি সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে খন্ড বিখন্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়। আরবদের স্বাধীনতার স্বপ্ন পরাধীনতার অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

---

(১৯৩) মুহাম্মদ মুসা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*,পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩০-৮৩৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের কবল মুক্ত হতে শুরু করে। কিন্ত এ সময়ের মধ্যে তারা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন বিষবৃক্ষ রোপন করে, যার করাল গ্রাস থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এতদিনেও তারা মুক্ত হতে পারেনি। মুসলিম রাষ্ট্র গুলোর মধ্যে চলছে মারামারি, হানাহানি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত। যে ইসলাম গণমুখী জীবন ব্যবস্থার জন্ম দিলো মুসলিম দেশগুলোতে আজ তার বড়ই অভাব। এখানে হয় চলছে রাজতন্ত্র, নয় সামরিক একনায়কত্ব। সিরিয়ার মাটির সাথে জড়িয়ে আছে তার প্রাচীন ঐতিহ্য। পবিত্র কুরআনে যে ২৫ জন নবীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) তাঁদের অন্যতম। লুত (আঃ) সিরিয়া, জর্দান ও লেবানন এলাকায়, ইসহাক (আঃ) ফিলিস্তীন এলকায় এবং ইসমাঈল (আঃ) হেজায এলাকায় আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আর ইবরাহীম (আঃ) এসব এলাকা ঘুরে ঘুরে তাদের দাওয়াতী কাজ সরেযমীনে তদারক করেছেন। "কিয়ামতের অন্যতম নির্দশন, হযরত ঈসা (আঃ) সিরিয়ার রাজধানী দামেশকেই আবির্ভূত হবেন। তিনি এখান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করে লানতপ্রাপ্ত ইহুদী জাতিকে চিরতরে খতম করে দেবেন।[১৯৪] সুয়াইদা ও লাবাকিয়া প্রদেশ ব্যতীত সিরিয়ার সমগ্র অঞ্চলে সুন্নী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। লাতাকিয়ায় উলুব্বী{নুসাইরী} শিয়া এবং সুয়াইদায় দ্রুজ শিয়ারা সংখ্যা গরিষ্ঠ। এছাড়া ইসমাঈলিয়া ও ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত মী'আদেরও এখানে বসবাস আছে। বর্তমানে নুসাইরী শিয়ারা দেশের সার্বিক ক্ষমতা কব্জা করে রেখেছে। সিরিয়া যখনই বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, নুসাইরীরা সব সময়ই তাদের স্বাগত জানিয়েছে। দুর্ধর্ষ তাতার, খৃস্টান ক্রুসেডার এবং ফরাসীরা যখন সিরিয়া আক্রমণ করে, চরমপন্থী নুসাইরীরা তাদের সাথে হাত মিলিয়ে সুন্নী মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা কর। ১৯৮২ সালের হামা নগরীর ধ্বংসাবশেষ তাদের নির্বচার হত্যাকান্ডের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। ১৯৬৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নুসাইরীরা সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। অথচ এরা মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। ১৯৭০ সাল নাগাদ দেশের সামরিক বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ তারা করায়ত্ত করে ফেলে। বর্তমান সিরিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক ধারার রাষ্ট্র, সংবিধানে জনগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। কিন্ত সরকার জনগণের এ অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। তাদের বাক স্বাধীনতা নেই। সংবাদপত্রের ওপর রয়েছে কড়া সেন্সরশীপ। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য তথ্য বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপকবাবে সংগঠিত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদের সহোদর রাফাত আসাদ এ বিভাগের দেখাশুনা করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, ট্রেড ইউনিয়ন তথা সমাজের প্রতিটি স্তরে গোয়েন্দা বাহিনী নিজেদের জাল বিস্তার করে আছে। ভয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কেউই মুখ খোলে না। ১৯৮২ সালর মার্চে দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, আইনবিদ, প্রকৌশলী এবং ডাক্তারগণ সিরিয়ায় মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে একটি স্মারকলিপি তৈরী করেন। কিন্তু স্বারক লিপির কালি শুকাতে না শুকাতেই তাঁরা গ্রেফতার হয়ে যায়।

(১৯৪) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আন্দোলন

১৯২৮ সালে মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমুল অস্তিত্ব লাভ করলেও সিরিয়ায় যে কখন এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নয়। তবে ত্রিশের দশকেই এ সংগঠন সিরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করে। মিশরীয় ইখওয়ানের অনুপ্রেরণায়ই সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় দামেশকের 'শাবাবু মুহাম্মদিন'ও ' শাব্বানুল মুসলিমীন,' হলবের 'দারুল আরকাম' এবং হামার ' জমীআতুল ইসলামিয়া' প্রভৃতি সংগঠন ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করে। ১৯৪৫ সালে এ সংগঠনগুলো ' ইখওয়ানুল মুসলিমুন' নাম গ্রহণ করে একটি মাত্র সংগঠনের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। এ সময়ই বহির্বিশ্ব সিরিয়ায় ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারে। ইখওয়ান ১৯৪৫ সনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ১৯৪৮ সনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

সর্বশেষ অবস্থা

সারা বিশ্বে বিশেষত মুসলিম বিশ্বে নৈতিক অবক্ষয়ের যে ধ্বস নেমেছে- সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের মুসলমানরাও এ মহামারী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। নৈতিক অবক্ষয়ের বাস্তব নির্দশন হচ্ছে হামা শহর। মহানবী (সাঃ) এর ওফাতের পর হযরত বিলাল (রাঃ) মদীনা ত্যাগ করে এ শহরে বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে এখানে পানশালার ছদ্মাবরণে গড়ে উঠেছে মদের দোকান। নৈতিক অবক্ষয় গোটা সমাজকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে ! ঘুষ, দুর্নীতি সরকারী অফিস আদালতের প্রতিটি বিভাগে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও সুবিধাজনক নয়। এক অর্থনৈতিক জরিপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এর আমদানীর তুলনায় রফতানীর পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ কম। আরব রাষ্ট্রগুলোর অনুদান থেকেই এ ঘাটতি পুরণ করা হয়। ১৯৪৬ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে ও জাতিসংঘের সদস্য হয়। ১৯৫৮ সালে মিশর ও সিরিয়া যুক্ত হয়ে 'ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকস গঠন করে, ১৯৬১ সালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে আরব-ইজরাইল যুদ্ধে গোলান মালভূমি হাত ছাড়া হয়। ১৯৭১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাফেজ-আল আসাদ প্রেসিডেন্ট হন। ১০ জুন ২০১৩ সালে তার মৃত্যুর পর পুত্র বাসার আল আসাদ প্রেসিডেন্ট হন। তিনি অদ্যবধি প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল রয়েছেন।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- দেশের শ্রমশক্তি এক তৃতীয়াংশ কৃষিকাজে লিপ্ত ও জাতীয় উৎপাদনের ২৭ শতাংশ কৃষিপণ্য। খাদ্যে ও পশুমাংসে স্বয়ং সম্পূর্ণ। শিল্প থেকে আসে জাতীয় উৎপাদনের ১৭ শতাংশ। ফসফেট রক ও পেট্রোলিয়াম প্রধান খনিজ সম্পদ। রপ্তানির ৪০ শতাংশ তেল, ১৩ শতাংশ কৃষিপণ্য, তাছাড়া ফসফেট ও কাপড়। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য। মোট জাতীয় আয় ৩,০০০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২৮৯২ ডলার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৭৩ সালের প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হচ্ছে ২০০৩ সালে সংবিধান সংশোধিত হয়। পুরা দেশটি ১৪টি মুহাফাজায় {প্রদেশ} বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে, আল হাসাকা, লাতাকিয়া, কুনাইতিরা, আল রাককাহ, সুয়াইদা, দারআ, দিয়ারুল যাওয়ার, দামেশক, হলব, হামা, হিমস, ইদলিব এবং তারসূস প্রেসিডেন্ট ৭ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট তিনজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, তিনজন সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিয়ে প্রশাসন। এক-কক্ষ জাতীয় সংসদ, পিপলস এসেমব্লি। সদস্য ২৫০ জন। শাসক দল বার্থ আরব সোশ্যালিষ্ট পার্টি নামে পরিচিত। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।[১৯৫]

৪.১.৫৩. সুদান

সুদানের সাংবিধানিক নাম Jumhuriyat Assudan এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Republic of Sudan দেশটির আয়তন ২৫,০৫,৮১৩ বর্গ কিমি (৯,৬৭,৫০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৪৮৬ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ। অধিবাসীরা সুদানিজ নামে পরিচিত। কৃষ্ণাঙ্গ ৫২ শতাংশ, আরব ৩৯ শতাংশ, রেজা ৬ শতাংশ, আদিধর্মে বিশ্বাসী কৃষ্ণাঙ্গ (দক্ষিণে) ২০ শতাংশ, খৃষ্টান (দক্ষিণে ও খার্তুম শহরে) ৫ শতাংশ। সাক্ষর ৬৮.৮ শতাংশ। গড় আয়ু ৫৫.১ বছর। জন্মহার অত্যাধিক, প্রতি নারীর সন্তজ্ন সম্ভাবনা গড়ে ৬.৩। ভাষা আরবি (সরকারি), বহু স্থানীয় ভাষা প্রচলিত। বাণিজ্য ও কূটনীতির প্রয়োজনে ইংরেজি ব্যবহৃত হয়। রাজধানী খার্তুম, প্রচলিত মুদ্রা- সুদানিজ দিনার।[১৯৬]

ভৌগোলিক পরিচয়:- সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে অর্ধশুস্ক, ঝোপঝাড় ও তৃণ-আচ্ছাদিত এ দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ। ৯,৬৭,৫০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ২২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৩৯ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্তবিস্তৃত সুদানের উত্তরে মিশর, পূর্বে লোহিত সাগর ও ইথিওপিয়া, দক্ষিণে কেনিয়া, উগান্ডা ও কঙ্গো এবং পশ্চিমে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, শাদ ও লিবিয়ার কিয়দাংশ অবস্থিত।

নীলনদ ও এর উপনদীগুলোর অববাহিকা, উত্তর ও পশ্চিমের মরুঅঞ্চল, মধ্য সুদানের সমভূমি এবং দক্ষিণের স্তেপ অঞ্চল সুদানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে সুদানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ দক্ষিণের উচ্চভূমি, দকিণাঞ্চলের জলাভূমি, পশ্চিমের নিম্ন মালভূমি ও মারা পর্বত, পূর্ব সীমান্তে ইথিওপিয়া উচ্চভূমির পাদদেশ ও লেহিত সাগর পর্বত এবং নীল অববাহিকা।

---

(১৯৫) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯২.

(১৯৬) *Europa (2004)*, ibid, V-2, ibid, PP.3960 (বিস্তারিত দেখুন প.৩৯৬০-৩৯৮১)

Dhaka University Institutional Repository

উগান্ডা, জায়ারে ও মধ্য আফ্রিকা সীমান্তের কাছে দক্ষিণের উচ্চভূমি অবস্থিত। এ অঞ্চলের গড় উচ্চতা ২,৫০০ ফুট। হোয়াইট নীলের উৎস এ অঞ্চলেই অবস্থিত। সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে এবং মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার উচ্চভূমির উত্তর প্রান্তেদক্ষিণাঞ্চলের জলাভূমি অবস্থিত। এ অঞ্চলের উচ্চতা ৫০০ ফুট থেকে ১০০০ ফুট। ইথিওপীয় উচ্চভূমির কিয়দংশ সুদানের পূর্ব অংশে প্রবেশ করেছে। এ অঞ্চলের উচ্চতা ১৫০০ ফুট থেকে ৩০০০ ফুট। সোবাত, ব-ু নীল ও আটবারা এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নীলনদের সাথে মিলিত হয়েছে। অত্যন্তশুষ্ক ও রুক্ষ এ পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতা ৩০০০ ফুট থেকে ৬০০০ ফুট। নীল অববাহিকা একটি সংকীর্ণ সমভূমি। এ অঞ্চল পলি এবং এর উভয় প্রান্তউচ্চভূমি দিয়ে আবদ্ধ।

উষ্ণমন্ডলে অবস্থিত বলে সুদানে সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করে। এর দক্ষিণাঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তাই সেখানে সারা বছর সর্বোচ্চ ৪০ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। তবে দেশের উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। গড়ে মাত্র ৪ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় বলে এ অঞ্চলে শুষ্ক ঋতুর কাল দীর্ঘ। উত্তরাঞ্চলের জুবা নামক স্থানে বছরের ৩ মাস এবং মালাকাল নামক স্থানে ৫ মাস শুস্ক থাকে। দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য এবং ভূপ্রকৃতির দিক থেকে উচ্চতার কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কম, কিন্ত উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অতি অল্প বিধায় তাপমাত্রা গ্রীস্মকালে অত্যধিক হয়ে থাকে। বিশেষত উত্তরাঞ্চলের মরুভূমিতে এবং লোহিত সাগর উপকূলে গ্রীস্মকালে তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রী ছাড়িয়ে যায়। রাজধানীর খার্তুমে বর্ষাকাল ৩ মাস দীর্ঘ হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫ ইঞ্চি। গ্রীস্মকালীন ও শীতকালীন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬১ ডিগ্রী ফারেনহাইট ও ৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। শীত ও গ্রীস্মকালে তাপের তারতম্য ২১ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- প্রাচীন কালে কেবলমাত্র সুদানের উত্তরাংশই বহির্বিশ্বের কাছে পরিচিত ছিলো। বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত সুদানের দক্ষিণাংশ ছিলো বাইরের দুনিয়ার কাছে অপরিচিত। তখন যে অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে উপজাতীয় শাসন প্রবর্তিত ছিলো। কেবল মাঝে মধ্যে দু একজন পরিব্রাজক বা অভিযাত্রী এবং দাস ব্যবসায়ী দক্ষিণাঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতেন। তবুও সুদানের সভ্যতা মিসরের মতোই প্রাচীন। দীর্ঘদিন ধরে সুদান বহিশক্তির অধীনে ছিলো। বিভিন্ন সময়ে মিশর, রোম, বাইজেন্টাইন, আরব, তুর্কী, ইংরেজ এবং ফরাসীরা সুদানের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। সবশেষে বৃটিশ, ইতালীয় ও ফরাসীদের মধ্যে এদেশের কর্তৃত্ব নিয়ে চরম বিরোধ সংঘটিত হয়। এক সময় মিশরও সুদানের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

মিসরের অতি প্রাচীন শিলালিপি ও দেয়ালের লিখনে এবং বাইবেলে সুদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুদানের প্রথম স্বাধীন রাজত্বকাল ছিলো ৭৫০ খৃষ্টপূর্ব থেকে ৩০০ খৃস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়। এ সময় মেরবীয় রাজত্ব কায়েম ছিলো। এ রাজত্ব এক সময় মিসরের উপরও কর্তৃত্ব বিস্তার করে। ৬৩৯ সালে মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে আরবদের মিশর অধিকারের সময় এ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ফুঞ্জ বংশের সুলতানগণ বিভিন্ন উপজাতিকে সংঘবদ্ধ করে ১৫০০ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত উত্তর ও মধ্য সুদানে রাজত্ব করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উসমানীয় সাম্রাজ্যের মিশরীয় ভাইসরয় মুহাম্মদ আলী ১৮২০ সালে সুদানকে তুর্কী মিশরীয় শাসনের অধীনে আনয়ন করেন। এ শাসন ১৮০১ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এ শাসনামলের শেষ দিকের একজন শাসক, খেদিভ ইসমাঈল সুদানকে ইউরোপীয় কায়দায় আদুনিকীকরণ করার জন রাজকোষ নিঃশেষ করে দেন এবং দেশকে দেউলিয়ায় পরিণত করেন। এ সুযোগে বৃটেনের লর্ড ক্রোমার সুদান দখল করে নেন। খেদিভ ইসমাঈলের অযোগ্য পুত্র তউফীক বৃটেনের তাবেদার হিসেবে শাসন ক্ষমতায় বসেন। বিশৃংখলা, দুর্নীত ও স্বজনপ্রীতি দিয়ে দেশটাকে তিনি রসাতলের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। সুদানের এ দুর্যোগকালে মুহাম্মদ আহমদ ইবন আবদুল্লাহ আল মাহদীর আবির্ভাব সুদানের ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৮৮১ সালে ৩৭ বছর বয়সে তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে দাবী করেন এবং বহু লোককে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তার অনুসারী করে নেন। তাঁর নেতৃত্বে সুদানের বিভিন্ন উপজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তুর্কী মিশরীয় শাসকদের দুর্নীতি ও ক্রুরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মিসরের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের হাত থেকে সুদানকে মুক্ত করার শপথ নেয়।[১৯৭]

তারা প্রথমে মক্কা ও পরে জেরুজালেম দখলেরও পরিকল্পনা ঘোষণা করে। বৃটিশরা সুয়েজ দখল করলে ১৮৮২ সালে আল মাহদী মিসরের গভর্নরের কাছে পত্র প্ররণ করেন এবং এক লাখ আধিবাসী অধ্যুষিত আল ওবায়েদ দখল করেন। মাহদী আল ওবায়েদের গভর্নর হাউস থেকে কতকগুলো ফরমানও জারী করেন। তাতে তিনি জনগণকে পুরোপুরি ইসলামী আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেন। বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল গর্ডন আল মাহদীর হাতে ক্রমান্তয়ে পরাজিত হতে থাকেন এবং সুদানের শহরগুলো একে একে মাহদীর দখলে চলে আসে। এক পর্যায়ে জেনারেল গর্ডন লর্ড ক্রোমারের সাহার্য্যপুষ্ঠ হয়ে সুদানে ব্যাপকভাবে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে মাহদী খার্তুন আক্রমণ করেন এবং গর্ডন সহ তার সেনাবাহিনীকে নির্মূল করে দেন। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে সুদানে সত্যিকার অর্থে একটি ইসলামী সমাজ গঠনের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে আল মাহদীর ইন্তিড়কালের পর তার অন্যতম খলীফা আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ সুদানের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আল মাহদীর ইসলামীকরণ নীতিকে অব্যাহত রাখেন এবং এক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্তঅগ্রসরও হন। খলীফা আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ শাসন ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনও সাধিত হয়। কিন্ত ইঙ্গ-মিশরীয় বাহিনীর সুদান পুনর্দখলের প্রয়াস অব্যাহত থাকায় ১৮৯৮ সালে বৃটিশ জেনারেল কিচেনারের অধীনে একটি ইঙ্গ-মিশরীয় বাহিনীর হাতে আল মাহদীর এ উত্তরাধিকারী খলীফা, আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদের বিপর্যয় ঘটে।

---

(১৯৭) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ১৮৯৮ সালে সুদানে ঈঙ্গ মিশরীয় যুগ্ম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসন ১৯৫৫ সালে পর্যন্ত বরবৎ থাকে। ১৮৯৮ সালে ফরাসীরা সুদানের অংশ বিশেষ দখলের চেষ্টা করলে জেনালেল কিচেনার ফ্যাসাদা যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। সুদানে ইঙ্গ-মিশরীয় যুগ্ম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সেখানকার সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে।[১৯৮]

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সুদানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সুদান থেকে ইংরেজদের অপসারিত করে মিশরীয় একক শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে মিশরীয় শাসনকর্তা বাদশাহ ফারুক প্রচেষ্টা চালান। এমনকি ১৯৫১ খৃস্টাব্দে ফারুক নিজেকে মিশর ও সুদানের বাদশাহ বলে ঘোষণাও করেন, কিন্তু ১৯৫২ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।

১৯৫৬ সালে ১ জানুয়ারী সুদান স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর সুদানে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৪ সালের অকটোবর মাসে এক গণবিপ্লবের মাধ্যমে সামরিক সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। সুদানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সাদিক আল মাহদীর নেতৃত্বাধীন উম্মাহ পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ কর। কিন্তু নতুন সরকার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ও দক্ষিণাঞ্চলের গৃহযুদ্ধ অবসানে ব্যর্থ হয়েছে। এ অজুহাতে ১৯৬৯ সালের মে মাসে কর্ণেল জাফর মুহাম্মদ নিমেরীর নেতৃত্বে আবার সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৭০ সালের ৯ নভেম্বর জাফর নিমেরী মিশর, লিবিয়া ও সিরিয়ার সাথে একটি রাজনৈতিক ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন, কিন্তু জনগণের চাপে এ পরিকল্পনা বাতিল ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্টদের এক অভ্যুত্থানের ফলে নিমেরী তিন দিন ক্ষমতাচ্যুত ছিলেন। তিনদিন পর পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিনি ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালে এক গণভোটে নিমেরী প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্বহাল হন এবং একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯৭২ সালে দক্ষিণাঞ্চলের খৃস্টান বিদ্রোহীদের সাথে নিমেরী সরকারের এক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। ফলে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে সুদানের স্থায়ী শাসনতন্ত্র জারী করা সম্ভব হয় এবং গণ পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ সুদানের আঞ্চলিক গণ-পরিষদের এবং ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় গণ-পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২৪ মে তৃতীয় বারের জন্য সুদানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনারেল নিমেরী শপথ গ্রহণের পর প্রদত্ত তার ভাষণে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণা মুসলিম বিশ্বের কাছে একদিকে যেমনি আনন্দের কারণ হয়েছে, অপরদিকে তেমনি নানা জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, সংশয়েরও সৃষ্টি করেছে।

---

(১৯৮) মুকুল চৌধুরী, সুদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সুদানে ইসলাম

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমরের (রাঃ) শাসনামলে মুসলিম সেনাপতি আমার ইবনুল আসের নেতৃত্বে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে সরাসরি সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে ৬৩৯ সালের আরবদের মিশর অধিকারের সময় সুদানে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে, যে সকল নও মুসলিম বারবার সম্প্রদায়ের লোক বাণিজ্যেপলক্ষে পশ্চিম সুদানে আসা যাওয়া করতেন, তারাই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে সেখানে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এই বারবার গোত্রসমূহের মধ্যে লামতোনা ও জাদ্দানা নামক গোত্রদ্বয় ইউসুফ ইবন আশফিনের আমলে প্রায় সমগ্র পশ্চিম সুদানকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করার গৌরব অর্জন করেন। হিজরী পঞ্চম শতকে এই বারবার বণিকরাই সুদানের প্রাচীনতম রাজ্য সাংঘাই-এ ও ইসলাম প্রচার করেন। হিজরী ষষ্ঠ শতকে তাঁদের প্রভাব সারা সুদান তথা আফ্রিকার দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌছে যায়।

পূর্ব সুদানে ইসলাম প্রচার করেন মিশরীয় বণিকরা। মিসরে যখন ফাতিমী খিলাফতের পতন ঘটে, তখন মিসরে বসবাসরত বহু আরব পালিয়ে সুদানে আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। তিউনিস ও তানজানিয়ার বনিকদেরও সুদানে ইসলাম প্রচারের মহান কর্তব্য সম্পাদনে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মূলত চারটি পর্যায়ে সুদানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে । প্রথমত: খৃস্টীয় সপ্তম শতকে আরবদের মিশর অধিকারের সময়। দ্বিতীয়ত হিজরী পঞ্চম শতকে নও মুসলিম বারবার জাতীয় লোকদের মাধ্যমে, তৃতীয়ত: ফাতিমী খিলাফতের পতনের পর মিসরে বসবাসরত ' আরবদের সুদানে আশ্রয় গ্রহণের ফলশ্রুতিতে এবং চতুর্থত: হিজরী দ্বাদশ শতক বা খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকে বর্তমান শতকের প্রারম্ভ পর্যন্তপ্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মিশনারীদের সাথে মুসলিম সূফী সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতামূলক দাওয়াতী কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে। বিগত কয়েক শ'বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সুদানের উপর ইসলামী প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী ও বেসরকারী দু'ভাবেই সেখানে ইসলামের বিকাশ সাধিত হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সরকারী পর্যায়ে সুদান দু'বার ইসলামী শাসনের অধীন ছিলো। বেসরকারী পর্যায়ে ১৮৯৯ সালের আগে অর্থাৎ ইঙ্গ-মিশরীয় যৌথ শাসন প্রবর্তনের পূর্বে সুদানের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুসরণের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। যেমন, ১৮২০ সাল থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত রাজত্বকারী তুর্কী মিশরীয় যৌথ শাসন সুদান সুন্নী ও তত্ত্বীয় ধর্মমতানুযায়ী সব ধরনের গোঁড়ামি মুক্ত ছিলো। এ সময় আদালতসমূহের জন্য মিশর থেকে বহুসংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা হতো। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে,পরবর্তীতে কায়রোর আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ডিগ্রীধারী সুদানের বিচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। সুদানের অধিকাংশ অধিবাসী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এ সকল বিচারক হানাফী মতানুযায়ী বিচারকার্য সমাধা করতেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উসমানীয় শাসনের শেষ দিকে অবশ্য স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহ ও তরীকার মিশ্র ভিত্তিতে উদ্ভুত সূফী চেতনা ভিত্তিক ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধকে জনগণের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তারকারী দীনী নেতৃবৃন্দের অনেকে নিরুৎসাহিত করেন।

১৮৯৮ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ইঙ্গ-মিশরীয় যৌথ শাসনামলে প্রশাসন এবং আদালতসমূহের আল আজহারের ডিগ্রীধারীরা বহাল থাকলেও বৃটিশরা বিচারকার্যে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পশ্চিমা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের প্রবর্তন করে, যদিও পাশাপাশি ইসলামের পারিবারিক আইন কখনো বহাল ছিলো। পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়টি মূলত আল মাহদীর উত্তরাধিকারীদের সাথে ইঙ্গ-মিশরীয় সরকারের সংঘর্ষের সময় হিসেবেই চিহ্নিত। ১৮৯৮ সালে আল মাহদীর উত্তরাধিকারী খলীফা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদেরই বিপর্যয় ঘটলেও তাঁর অনুসারীরা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সরকারের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এ দলের বিপ- বী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯১৮ সালের পর থেকে এরা 'আনসার' নাম ধারণ করে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচারকারী হিসেবে চিহ্নিত হন । ফলে সরকারও এঁদের উৎসাহিত করতে থাকেন।

সরকারী পর্যায়ে সুদানে ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে প্রথমত ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত এ সংক্ষিপ্ত অথচ গৌরবোজ্জ্বল সময়টিকেই ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেন। ১৮৪৪ সালে সুদানের দঙ্গোলা প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী 'মুহাম্মদ আহমদ' ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল্-মাহ্দীই হচ্ছেন এই স্বর্ণযুগের উদ্গাতা। তাঁর আবির্ভাবের পেছনে যে সকল কার্যকারণ জড়িত ছিলো, তা হচ্ছে স্থানীয় ফকীহ্ ও তরীকার মিশ্র ভিত্তিতে উদ্ভুত সূফী মতবাদের অতিরিক্ত প্রসার, তুর্কী মিশরীয় শাসকদের নৈতিক অধঃপতন এবং শাসকদের মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। আল মাহ্দী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সুদানের শাসন-কর্তৃত্ব করায়ত্ত করেন এবং সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চালান। প্রথমেই তিনি সুদানে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আইন প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। বিচারকার্যের সুবিধার্থে তিনি চারটি মাযহাবের যে কোন একটি অনুসরণের ক্ষত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং জনসাধারণকে হজ্জ পালনে উৎসাহিত করেন। তিনি তাঁর তিনজন খলীফাকে শাসনকার্য তদারকীর জন্য প্রিন্সিপাল লেফটেন্যান্ট হিসেবে নিয়োগ করেন এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের 'আমীর' ও 'মুকাদ্দাম' নামে অভিহিত করে শাসনকার্যকে একটি সিস্টেমের অধীনে নিয়ে আসেন। বিশেষ ধরনের পোশাক পরিহিত তাঁর অনুসারীর শাসন কার্যে তাকে সহযোগিতা করতেন।[১৯৯]

জেনারেল জাফর মুহাম্মদ নিমেরী কর্তৃক সুদানে জারীকৃত ইসলামী শাসনকে সুদানের সরকারী পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯৬৯ সালের মে মাসে এক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে সুদানের ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে জাফর নিমেরীর শাসন-যুগের সূচনা। ১৯৭৭ সালে পূর্ব পর্যন্তনিমেরী মূলত সোভিয়েত ঘেঁষা ছিলেন।

(১৯৯) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭০

Dhaka University Institutional Repository

ইথিওপিয়ায় সোভিয়েত শক্তি বৃদ্ধি এবং কয়েকবার কমিউনিস্ট শক্তি কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রই মূলত তাঁকে ক্রমান্বয়ে সোভিয়েত বিরোধী করে তোলে। দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মন-মানসিকতায় প্রবল ইসলামী অনুরাগ লক্ষ্য করে তিনি ১৯৮৩ সালের ২৪ মে তৃতীয়বারের মতো সুদানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলে দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। অবশ্য ১৯৭৭ খৃস্টাব্দ থেকেই তিনি এ প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি সুদানের অন্যতম বিরোধী দলীয় নেতা সাদিক আল-মাহদী ও ডঃ হাসান আল্-তোরাবীর সাথে কয়েকটি শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী নিমেরী প্রথমে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন এবং পরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনী ভূমিকা ও ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির প্রেক্ষাপটে মিসরের সাথে সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে বিরোধী দলসমূহের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছেন এবং ক্রমান্বয়ে বিরোধী দলীয় নেতাদেরও ক্ষমতায় ভাগীদার করেন। অবশ্য পরে মিসরের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের প্রশ্নে সাদিক আল্-মাহ্দী নিমেরীর প্রতি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং '৮০ র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন বয়কট করেন। ১৮৮৩ সালের ২৪ মে'র ভাষণে জেনারেল নিমেরী ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত করার সকল মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার এবং মহানবীর (সাঃ) আদর্শ বাস্তবায়নের শপথ ব্যক্ত করেন। ঘোষণানুযায়ী ৮৩'র আগষ্ট মাস থেকে তিনি উপনিবেশ আমলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-বিধির পরিবর্তে ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক আইন বলবতের নির্দেশ জারী করেন। নির্দেশে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিচারকদের কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ইজতিহাদ, গণস্বার্থ ও ফিক্হ্ ইত্যাদির ভিত্তিতে রায় প্রদানেরও উল্লেখ করা হয়। নির্দেশে আরো উল্লেখ করা হয় যে, আদালতগুলো সুদ সংশ্লিষ্ট কোন রায় ঘোষণা করতে পারবে না। কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক দেশ থেকে সুদী কারবার সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকেও সুদ-বিহীন লেন-দেন চালু করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ সকল নির্দেশ বাস্তবায়নের নযীর হিসেবে নিমেরী দু'টি প্রতীকী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথম দেশ থেকে মদ উৎখাতের লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর '৮৩ তিনি এক আড়ম্বরপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সকল মদ ব্লু নীলে ফেলে দেয়া হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল নিমেরী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত বা নিরাপত্তা বন্দী ছাড়া সকল কারাবন্দীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।[২০০]

জেনারেল নিমেরী কর্তৃক এ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সুদানের ভেতর এবং বাইরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। পরবর্তীতে দক্ষিন সুদান এবং দারফুরকে নিয়ে দ্বন্দ্ব সুদানকে বাস্তব অর্থে পিছিয়ে দেয়।

---

(২০০) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিচয়:- গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও পরিকল্পনাহীন কার্যকলাপের জন্য সুদানের অর্থনীতি কোন রূপ নিতে পারেনি। দেশের শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশ কৃষিকাজে নিযুক্ত আর শিল্প বাণিজ্যে মাত্র ১০ শতাংশ। বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণের বোঝা অর্থনীতিকে আরও পঙ্গু করেছে। সুদানের শতকরা নব্বই জন লোক কৃষিকাজ ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বৃষ্টিবহুল দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি ও পশুপালন প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে কৃষিই সুদানের প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। শতকরা আশি জন লোকই কৃষিজীবী। জাতীয় আয়ের শতকরা চল্লিশ ভাগ এবং রফতানী আয়ের শতকরা নব্বই ভাগ কৃষি থেকেই আসে। সুদানের প্রধান কৃষি উৎপন্ন ও অর্থকরী ফসল তূলা। তূলা ছাড়াও সেখানে এরাবিক গম, সিসাম, চীনাবাদাম, ইক্ষু, খেজুর, কফি ও তামাক উৎপাদিত হয়ে থাকে। সুদানের প্রধান খাদ্যশস্য হলো সরগম, জোয়ার, বাজরা, গম ভুট্টা, বার্লি ও ডাল। মোট চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ২ লাখ বর্গমাইল। প্রধান খাদ্যশস্য জোয়ার ও বাজরা মরুভূমির প্রান্তভাগে এবং অন্যান্য শুস্ক অঞ্চলে, বিশেষ করে বেলে মাটিতে অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। মধ্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চলের জলাভূমির প্রান্তভাগে সরগম উৎপাদিত হয়। বৃষ্টিবহুল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ভুট্টা জন্মায় এবং হালকা বেলে মাটি অঞ্চলে চীনাবাদাম ও তরমুজের চাষ করা হয়। নুরা পর্বত অঞ্চলে এবং পশ্চিম ইকুয়েটর প্রদেশে সরকারী উদ্যোগে তূলা চাষ করা হয়। ব্লু-নীল অববাহিকায় সিসামের এবং যে সকল অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা বিদ্যমান, সে সকল অঞ্চলে তামাক ও অন্যান্য শাক সব্জির চাষ হয়ে থাকে।

কৃষির মতো পশুপালনও সুদানের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। গবাদি পশুর মধ্যে গরু, মেষ, ছাগল ও উটই প্রধান। দক্ষিণের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের নাইলোট, সিলুক ও ডিস্কা যাযাবররাই প্রধানত পশুচারণ করে থাকে। সুদানের খনিজ সম্পদ খুবই অল্প। লোহিত সাগর উপকূলের হালাইবে অল্প পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। পোর্ট সুদানের কাছে অবশ্য কিছু কিছু আভ্র খনি রয়েছে এবং লোহিত সাগর পর্বত থেকে অভ্র ও খনিজ লবণ উত্তোলিত হচ্ছে । সুদানে এখনো কোন খনিজ জ্বালানীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শিল্প ক্ষেত্রেও সুদান অনুন্নত। শিল্পে অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে কাঁচামাল ও জ্বালানীর অভাব এবং হালকা লোকবসতিই দায়ী। সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালের পর থেকে অবশ্য শিল্পায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে রাজধানী খার্তুমের উত্তর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র শিল্প এলাকাও গড়ে উঠেছে। এ শিল্প এলাকায় রয়েছে দু'টি সুতা ও কাপড়ের কল, বিস্কুট কারখানা, জুতার কারখানা, সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য, প্লাস্টিক ও ঔষধের কারখানা। এছাড়াও পোর্ট সুদান, আটবারা, ওয়াদ মেদানি প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। সুদানের প্রধান রফতানী দ্রব্য তূলা। তূলা রফতানী থেকেই শতকরা ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। অন্যান্য রফতানী দ্রব্যের মধ্যে এরাবিক গাম থেকে শতকরা ১০ ভাগ, বাদাম থেকে শতকরা ৯ ভাগ এবং সিসাম, তুলাবীজ, গবাদিপশু ও চামড়া থেকে বাকী শতকরা ১১ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সুদানের রপ্তানী পণ্যের ভোক্ত দেশসমূহ হচ্ছে যুক্তরাজ্য শতকরা ২০ ভাগ, পশ্চিম জার্মানী শতকরা ১১ ভাগ, ভারত শতকরা ১১ ভাগ, ইতালী শতকরা ১০ ভাগ এবং বাকী শতকরা ৪৮ ভাগ মিশর, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে।

Dhaka University Institutional Repository

সুদানের প্রধান প্র্যধান আমদানী দ্রব্য হলো মোট আমদানীর শতকরা ২৩ ভাগ বস্ত্র, শতকরা ১৮ ভাগ খাদ্যশস্য ও তামাক, শতকরা ১৬ ভাগ শিল্পের যন্ত্রপাতি, শতকরা ৯ ভাগ যানবাহন এবং বাকী গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম ও জ্বালানী। যন্ত্রপাতি ও যন্ত্র আমদানী করা হয় প্রধানত মিশর থেকে, খাদ্যশস্য এবং জ্বালানী আমদানী করা হয় যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রে ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে।[২০১] দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) ১,২১০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১৩৯৪ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- বারবার সংবিধান রচনা ও বাতিল হয়েছে। ১৯৮৯ সালের ৩০ জুনের অভ্যুত্থানের পর নতুন সংবিধান বলবৎ হয়নি। রেভল্যুশনারি কমান্ড কাউন্সিলের ১২ জনের হাতে দেশের প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব। কোন রাজনৈতিক দল নেই, ভোট নেই, ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ও নেই।

৪.১.৫৪. সুরিনাম

সুরিনামের সাংবিধানিক নাম Republiek Suriname এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Republic of Suriname দেশটির আয়তন ১,৬৩,২৬৫ বর্গ কি মি (৬৩,০৩৭ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ১.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা সুরিনামার নামে পরিচিত। অধিবাসীদের মধ্যে ভারতীয় ভংশোদ্ভুত ৩৭ শতাংশ, ক্রিয়োল (শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ মিশ্রণ) ৩১ শতাংশ, জাভানিজ ১৫.৩ শতাংশ, বুশ ব্যাক ১০.৩০ শতাংশ, রেড ইন্ডিয়ান ২.৬ শতাংশ, চীনা ১.৭ শতাংশ, ইউরোপিয়ান ১ শতাংশ, অন্যান্য ১.১ শতাংশ। হিন্দু ২৭.৪ শতাংশ, মুসলিম ১৯.৬ শতাংশ, রোমান ক্যাথলিক ২২.৮ শতাংশ, প্রোটেস্টান্ট ২৫.২ শতাংশ, অন্যান্য ৫ শতাংশ। সাক্ষর ৯৪ শতাংশ। গড় আয়ু ৭১.১ বছর। সরকারি ভাষা ডাচ, তবে ইংরেজি ব্যাপকভাবে প্রচলিত, এছাড়া হিন্দি ও জাভানিজ, ভাষা দুটি অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাজধানী পারামারিবো, প্রচলিত মুদ্রা- সুরিনাম গিল্ডার।

ভৌগোলিক পরিচয়:- দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তেড়, আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত দেশ। সুরিনামের উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পূর্বে ম্যারোউইজিন নদী (Marowijne) বেষ্টিত। এ নদীর জন্য দেশটি ফরাসি গায়েনা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। পশ্চিমে কোরানতিজিন (Carantijin) নদী থাকায় গায়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। দক্ষিণে বনাঞ্চল ব্রাজিল থেকে আলাদা করেছে। পর্বতময় ও ঘন বনাচ্ছন্ন, উপকূল ভাগ সংকীর্ণ সমতল। উপকূল রেখা ৩৮৬ কি মি। কাঠ, জলবিদ্যুৎ, মাছ, চিংড়ি, বক্সাইট, লোহা, ও কিছু পরিমাণে নিকেল, তামা, প্লাটিনাম, সোনা পাওয়া যায়। দেশের ৯৭ শতাংশ বনভূমি।

---

(২০১) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭২

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ব্রিটেন ও ইউনাইটেড নেদারল্যান্ডের মধ্যকার ১৯৬৭ সালের ব্রেডা শান্তিচুক্তির প্রেক্ষিতে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ নিউ নেদারল্যান্ডের বিনিময়ে নেদারল্যান্ডের কাছে সুরিনাম হস্তগত হয়। ১৬৭৫ সালের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তড়র নিশ্চিত হয়। এরপর দুবার দেশটি বৃটিশ কর্তৃত্বে আসে। দীর্ঘ রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে ১৬৬৭ সালে হল্যান্ডের উপনিবেশ হয়। ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করলে দেশের ৪০ শতাংশ লোক হল্যান্ডে চলে যায়। প্রথম সামরিক অভ্যূত্থান হয় ১৯৮০ সালে। এরপর অভ্যূত্থানের পর ১৯৮৭ সালে নতুন সংবিধান চালু হয়, রামসেবক শঙ্কর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে সামরিক অভ্যূত্থান শঙ্কর উৎখাত হন। ১৯৯২ সালে শান্তিও গণতন্ত্র ফিরে আসে। রাজধানী পারামারিবো ১৫৪০ খৃ প্রতিষ্ঠিত শহর ও বন্দর। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ২৪ কি মি দক্ষিণে সুরিনাম নদীর তীরে অবস্থিত। কফি, ফল, কাঠ ও বক্সাইটের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। লোকসংখ্যা ২ লক্ষ। অন্যান্য শহর নিউ নিকেরি, ব্রোকোপোন্ডো, নিউ আমস্টার্ডাম।[২০২]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- প্রধান সম্পদ বক্সাইট, রপ্তানি থেকে আয়ের ৭০ শতাংশ ও রাজস্বের ৪০ শতাংশ আসে বক্সাইট থেকে। অন্যান্য মধ্যে রপ্তানি সামগ্রিক হয় চাল, কাঠ, বনজ সম্পদ, চিংড়ি, মাছ, কলা। আমদানি করতে হয় যন্ত্রপাতি, তেল, খাদ্য, তুলা, ভোগ্যপণ্য। মোট জাতীয় আয় (জি ডি পি) ১৪০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১৬৬০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৮৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আইন পরিষদ 'ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী' ৫১ সদস্য বিশিষ্ট, তারা ৫ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এ্যাসেম্বলী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। রাষ্ট্রে মুখ্য প্রশাসক হলেন প্রেসিডেন্ট, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্টকে প্রধান মন্ত্রী করে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। প্রেসিডেন্ট, ভাইস- প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। এক -কক্ষ জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

৪.১.৫৫. সেনেগাল

সেনেগালের সাংবিধানিক নাম Republique Du Senegal এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Republic of Senegal দেশটির আয়তন ১,৯৬,৭২২ বর্গ কি মি (৭৫,৯৫৫ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ। অধিবাসীরা সেনেগলিজ নামে পরিচিত। বিভিন্ন আফ্রিকান উপজাতি নিয়ে জনসংখ্যা, যার মধ্যে প্রধান উয়োলোফ (Wolof) ৪৯ শতাংশ ফুলানি, (Peulani) ২২.২ শতাংশ, সেরের (Serer) ১২.৮ শতাংশ, ডিয়োলো (Diolo) ৫.১ শতাংশ,। ইউরোপিয়ান ও লেবানিজ ১ শতাংশ বাকীরা অন্যান্য উপজাতি। ৯৪ শতাংশ মুসলিম, ৪ শতাংশ খৃস্টান, অন্যরা আদিধর্মে বিশ্বাসী। সাক্ষর ৩৮.৩ শতাংশ, গড় আয়ু ৫২.৯ বছর। সরকারি ভাষা ফরাসি। রাজধানী ডাকার, প্রচলিত মুদ্রা- সিএফওফ্রাঁ।[২০৩]

---

(২০২) *Europa (2004)*, ibid, V-2, PP.3982 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩৯৮২-৩৯৩১)

(২০৩) *Europa (2004)*, Ibid, PP.3668 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩৬৬৮-৩৬৯২)

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক পরিচয়:- পশ্চিম আফ্রিকায় আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী দেশ। দেশটির উত্তরে মৌরতানিয়া, পূর্বে মালি, দক্ষিণে গিনি ও গিনিনিসাউ এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। তটরেখা ৫৩১ কি মি। উপকূল সমতল, ক্রমে উঁচু হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাহাড়ে মিশেছে। মানচিত্রে সেনেগালকে একটি সিংহর মুখের মতো দেখায়, আর তার মুখের মধ্যে আঙ্গুলের মতো অবস্থান করছে, গাম্বিয়া নদীর উভয় তীরবর্তী সংকীর্ণ দেশ। সেনেগাল নদী প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে শেষ হয়েছে। দেশের ২৭ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য বনভূমি ৩১ শতাংশ।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৬৫৯ সালে ফ্রান্সের উপনিবেশ হয়, ফরাসিরা প্রথমে ১৬৫৮ সালে সেন্টলুইস বন্দরে ঘাটি স্থাপন করে, ১৯০২ সালে পুরো অঞ্চলটি নিজেদের দখলে নেয়। ১৯৫৮ সালে ফ্রান্স সরকারের অধীনে সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এপ্রিল ১৯৫৯ তে মালির সাথে একীভূত হয়। ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয় ও জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। স্বাধীনতার পর পর গাম্বিয়ার সাথে সেনেগাম্বিয়া নামে একটি কনফেডারেশন গঠন করে কিন্তু ১৯৮২ সালে এটি ভেঙ্গে পড়ে। সেনেগলিজ প্রগ্রেসিভ ইউনিয়নের (ইউ পি এস) নেতা লিওপোল্ড সেদার সেংহোর প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৬ সালে ইউ পি এস কে একমাত্র রাজনৈতিক দল ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬ সালে ইউ পি এস- কে পুনর্গঠিত ক'রে সেনেগলিজ সোশ্যালিস্ট পার্টি নাম দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে। রাজধানী ডাকার প্রধান শহর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। লোকসংখ্যা দশ লক্ষ। অন্যান্য শহর থিয়েস, কাওলাক।[২০৪]

অর্থনৈতিক পরিচয়:- আকরিক লোহা, সোনা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। শ্রমশক্তির ৭৫ শতাংশ কৃষিজীবী ও দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ২০ শতাংশ কৃষিপণ্য। বাদাম প্রধান অর্থকরী ফসল। মাছ থেকে বছরে প্রায় ২০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ফসফেট প্রধান খনিজ পদার্থ। পর্যটন উন্নত শিল্প হয়ে উঠছে। খাদ্যে দুই-তৃতীয়াংশ স্বনির্ভর। মোট জাতীয় আয় (জি ডি পি) ৫০০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১৩০৭ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯১ সালের পরে ২০০১ সালের সংশোধিত সংবিধান অনুসারে দেশ শাসিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনাক্রমে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। দেশে ১১টি প্রদেশিক গভর্নর রয়েছে। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। ইসলাম দেশটির রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এক-কক্ষ জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমবি- , আসন ১২০। প্রধান রাজনৈতিক দল-সোশ্যালিস্ট পার্টি, সেনেগলিজ ডেমোক্রেটিক পার্টি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।[২০৫]

(২০৪) হারুনার রশিদ ভূইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৭
(২০৫) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৫৬. সোমালিয়া

সোমালিয়ার সাংবিধানিক নাম Al-Jumhouriya As-Somalya Al Dimocratia এবং ইংরেজিতে বলা হয় The Somali Democratic Republic দেশটির আয়তন ৬,৩৭,৬৫৭ বর্গ কি মি (২,৪৬,২০১ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৮৬ লক্ষ ৬৮ হাজার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ। অধিবাসীরা সোমালি নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৮৫ শতাংশ সোমালি, অন্যরা আফ্রিকান উপজাতীয় বান্টু। তার বাইরে ৩০ হাজার আরব, ৩ হাজার ইউরোপীয় অন্যরা এশিয়ান। দেশে ৯৯ শতাংশ মুসলমাদের প্রায় সকলেই সুন্নি মুসলিম। কিছু সংখ্যাক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকের বাস আছে। গড় আয়ু ৪৭.৯ বছর। সরকারি ভাষা সোমালি, প্রচলিত ভাষা ইংরেজি, ইতালিয়ান ও আরবি। রাজধানী মোগাদিসু, প্রচলিত মুদ্রা- সোমালি শিলিং।[২০৬]

ভৌগোলিক পরিচয়:- আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব স্কন্ধে শিং-এর মতো অংশটুকুর উপকূলভাগ জুড়ে বিদ্যমান দেশ সোমালিয়া- বর্তমানে সোমালী প্রজাতন্ত্র। সহারা মরুর প্রাণফাটা পিয়াসা নিয়ে উত্তর আফ্রিকার বিশাল ভূ-ভাগের এ অংশটুকু সেই সুদুর অতীতেই যেন ছুটে নেমেছিলো মহাসাগরের বুকে, আর তখন থেকেই ফেনিলোত্তাল তরংগ-মালায় নিয়ত বিধৌত হচ্ছে এর দুই তীর। বছরে দুই মওসুমে বৃষ্টির ধারায় বর্ষিত হয়ে আসছে এর শিরোপরে মহাসমুদ্রের অপত্য-স্নেহ, কিন্তু তবুও সোমালিয়ার অনন্ত পিয়াসা মেটেনি। বৃষ্টির ধারায় গোসল করে দক্ষিণে বামে সাগর-তরঙ্গের সাথে খেলা করছে সোমালিয়া, কিন্তু বুকে তার প্রজ্জলন্তসেই মরুর আদিম পিয়াসা। তার নদীমালা মরুপথেই হারিয়ে ফেলে আপন ধারা।

সোমালী প্রজাতন্ত্রের পূর্বে ও দক্ষিনে ভারত মহাসাগর, উত্তরে এডেন উপসাগর এবং পশ্চিমে ইথিওপিয়া ও কেনিয়া। মোট আয়তন বাংলাদেশের ঠিক নয় গুণ, ২,৭০,০০০ বর্গমাইল। দেশের তিন দিকে বিস্তৃত উপকূল রেখার দৈঘ্য ১৫ শত মাইল।

সোমালীয়া প্রজাতন্ত্রের ভূমি দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে। দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তেকেনিয়ার সীমান্তথেকে জুবা নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্তবিস্তৃত নিম্নভূমি রয়েছে। এখানে প্রচুর তৃণ জন্মে বিধায় সমগ্র অঞ্চলটিই একটি চারণভূমি স্বরূপ। জুবা নদীর উত্তর পার থেকে ওয়েভী শেবেলী নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্তঅঞ্চল সমতলভূমি। সারা দেশের মধ্যে এ অঞ্চলটিই জনবসতিপূর্ণ এবং দেশের যা খেত-খামার, সব এখানেই গড়ে উঠেছে। দেশের উত্তর-পূর্ব প্রাপ্ত সুউচ্চ মালভূমি নিয়ে গঠিত, ভূমি উচ্চতা কোথাও কোথাও ৮ হাজার ফুটেরও বেশী। সমগ্র এলাকার প্রকৃতি ও আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ ও শুস্ক।

---

(২০৬) *Europa (2004)*, Ibid, PP-3822 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.৩৮২২-৩৮৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

মালভূমিটি প্রথমে অনেকটা তরঙ্গের মতো ধাপে ধাপে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নীচু হয়ে গেছে, অনেকখানি অগ্রসর হবার পর এর গড় উচ্চতা ২,২৫০ ফুটে দাঁড়িয়েছে এবং সেখান থেকে ওয়েভী শেবেলী নদীর উত্তর তীর পর্যন্তমোটামুটি সে উচ্চতাই বজায় রয়েছে। দেশের প্রধান দুটি নদী জুবা ও ওয়েভী শেবেলী ইথিওপিয়ার পাহাড় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে ভারত মহাসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। তবে ওয়েভী শেবেলীর স্রোতধারা মহাসাগরে পতিত হবার আগেই তীর-ভূমির বিশুষ্ক প্রান্তড়ের হারিয়ে গেছে। সোমালিয়া উষ্ণমন্ডলীয় দেশ। তাপমাত্রার গড় ৭৬ ডিগ্রী থেকে ৮৮ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মধ্যে উঠানামা করে। বছরে দুবার বর্ষাকাল। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্তমাঝারি এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্তমৃদু বৃষ্টিপাত হয়। দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ ইঞ্চি।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- সোমালিয়া নামের উৎপত্তি আরবী 'জুমাল' শব্দের আঞ্চলিক বিকৃতি থেকে। 'জুমাল' অর্থ সম্পদশালী। সোমালিয়া কয়েকশত গোত্র ও উপ-গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত সোমালী সম্প্রদায়ের বাসভূমি। সোমালীদের পূর্ব পুরুষরা 'আরবের কুরায়েশ' গোত্রভুক্ত ছিল। রসূলুল্লাহর (সা.) চাচাতো ভাই আকিল ইবন আবু তালিব এক দল অনুসারী নিয়ে এ অঞ্চলে হিজরত করেন। পরে বহু ' আরব এখানে আগমন করে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং কালে তাঁদের নেতৃত্বে 'জীলা' ও 'মোগাদিসু' তে দুটি মুসলিম সুলতানাত কায়েম হয়।

জীলা সুলতানাতটি সপ্তম শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ বংশীয় সুলতানরা পাঁচশ' বছর ধরে ধীরে ধীরে রাজ্যের পরিধি বিস্তার করে বারো শতকে এডেন উপসাগরের তীর থেকে বর্তমান ইথিওপিয়ার হারার শহর পর্যন্ত এলাকা নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ষোল শতকে জীলা সাম্রাজ্যের রাজধানী হারারে স্থানান্তর্ড়রিত হয়। জীলা বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ইমাম আহমদ ইবন ইবরাহীম আল্-গামী ১৫৩৫ সালে ইতিওপিয়ার এক বিরাট অঞ্চল জয় করে কাসালা পর্যন্তঅধিকার করে নেন। ইথিওপিয়ার খৃস্টান সম্রাট বার বার তাঁর কাছে পরাভূত হয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেন এবং পূর্তগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইথিওপীয় ও পর্তুগীজ বাহিনীর মিলিত আক্রমণের মুখে ইমাম আহমদ ১৫৪১ সালে পরাভূত হন। তাঁর মুত্যুর পর এ সাম্রাজ্য ক্রমে দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে পড়ে।

মোগাদিসু সুলতানাতটি পনেরো ও ষোল শতকে প্রভূত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু সতেরো শতকে এটি দুর্বল হয়ে পড়ে ও মস্কট-এর সুলতানের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। মস্কট সাম্রাজ্য পরে ওমান ও জাঞ্জিবার রাজ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হলে মোগাদিসু জাঞ্জিবারের ভাগে পড়ে।

আদাল সাম্রাজ্যের পতনের পর জীলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামন্তপ্রধানরা ইয়েমেনের আশ্রয় মেনে নিলে নাম মাত্র ভাবে হলেও এলাকাটি ' উসমানী খিলাফতের অংশীভুত হয়। এভাবে সোমালিয়ার উপকূলভাগের উত্তর অংশ ' উসমানী সাম্রাজ্য ও দক্ষিণাংশ জাঞ্জিবারের আওতায় চলে যায়। কিন্তু অভ্যন্তরভাগ তখনো স্বাধীন সামন্ত-প্রধানদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৯ সালে বৃটেন এডেনে আশ্রিত এলাকা গঠন করে এবং পরের বছরেই তাজুরার সুলতান জীলার গবর্নরের সাথে বৃটেনের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খননের পর এলাকাটির কূটনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্দি পায়। মিসরের তদানিন্তন্ড শাসক খেদিভ ইসমাঈল তখন সুদান ও ইথিওপিয়ার পথে পূর্ব আফ্রিকার কিসমাউ পর্যন্তসৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। এডেনের পরপারে অবস্থিত সোমালী এলকায় তুর্কী সার্বভৌমত্বের তরফে মিসরের আধিপত্য বৃটিশরা অনিচ্ছা সত্বে মেনে নিলেও ভারত মহাসাগরীয় উপকূলের উপর খেদিভের দাবী তারা মানতে রাজী হলো না। তারা জাঞ্জিবারের সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করলো। ফলে এডেন উপসাগর ও হারার শহরের মধ্যবর্তী এলাকার উপরই মিশরীয় আধিপত্য সীমিত হয়ে রইলো। ১৮৮৫ সাল পর্যন্তএ অবস্থা অব্যাহত ছিলো। অতঃপর সুদানে মাহদীর উত্থানের পর মিশর সরকার সোমালিয়ার উপর থেকে তাঁদের অধিকার প্রত্যাহার করলেন। ইত্যবসরে ১৮৮৬ সালে বৃটিশরা সোমালী গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে উত্তর সোমালিয়ায় তাদের 'আশ্রিত' এলাকা গঠন করে নেয়।[২০৭]

ততোদিনে ইন্দোচীনে ফরাসীরা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। ইন্দোচীনের সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে মধ্যপথে অবস্থিত এ এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়লো। তাই ১৮৮৪ ও ৮৫ সালে তারা তাজুরা ও গাবাদের সুলতান এবং ঈসা গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি সম্পাদন করলো। আর তার ফলেই গড়ে উঠলো ভবিষ্যতের ফরাসী সোমালিল্যান্ড ভবিষ্যতের ইতালীয়রাও এ সময়ে সোমালিয়ায় আধিকার কায়েমের জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। জাঞ্জিবারের সুলতানের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করে তারা মোগাদিসু এবং পাশ্ববর্তী উপকুলভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে। পরে মিজারিন সোমালিদের সুলতান ও অন্যান্য গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে তারা দক্ষিণ সোমালিয়া এলাকায় ইতলিয় সোমালিল্যান্ড গঠন করে।

কিছুদিন পরই সোমালীয় ইতহাসের সিংহ পুরুষ মওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ হাসানের আবির্ভাব ঘটে। সিপাহী বিপ-বের গণনায়ক অগ্নিপুরুষ আহমদ উল্লাহ শাহকে যেরূপ বৃটিশরা 'পাগল মোল্লা' বলে অভিহিত করে, মাওলানা মুহাম্মদ ইবন হাসানকেও তেমনি 'পাগলা মোল্লা' বলে অভিহিত করা হয়। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে এ অমিত-বিক্রম গণনেতা ২১ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯০০ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে স্বগঠিত গণবাহিনীর সাহায্যে বৃটিশ, ইতালীয় ও ফরাসী বাহিনীকে তিনি বারবার পরাভূত করেন। পরিশেষে ইউরোপীয় শক্তিগুলো ইতিওপিয়ার খৃস্টান সম্রাটের সাহায্য নিয়ে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেন মাওলানা মুহাম্মদ ইবন হাসানকে পরাজিত করে। কিন্ত সোমালীয়দের অন্তরে মওলানা যে দেশপ্রেমের শিখা প্রজ্ঞলিত করেন, আযাদী সংগ্রামের রূপ নিয়ে তা অনির্বাণ ভাবে জলতে থাকে।

---

(২০৭) ফারুক মাহমুদ, সোমালিয়া-ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮৩-৮৯১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ সালের অকটোবর মাসে ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমন করে এবং মাত্র সাত মাসের মধ্যে সমগ্র দেশ অধিকার করে নেয়। অতৎপর ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ইতালী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দু'সপ্তাহের যুদ্ধে তারা বৃটিশ সোমালিল্যান্ড দখল করে ফেলে। পাঁচ মাস পরে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ সেনরাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এক মাসের মধ্যে তারা মোগাদিসু অধিকার করে সমগ্র ইতালীয় সোমালিল্যান্ড দখল করে এবং মার্চ মাসে বৃটিশ সোমালিল্যান্ডের উপর বৃটেনের অধিকার পুন-প্রতিষ্ঠিত হয়। এপ্রিল মাসে বৃটিশ বাহিনী ইথিওপিয়া দখল করে এবং মে মাসে তারা সম্রাট হাইলে সোলাসীকে তার রাজধানী আদ্দিস আবাবাতে ফিরিয়ে আনে।[২০৮] বিজিত এলাকার সাবেক বৃটিশ সোমালিল্যান্ড, সাবেক ইতালীয় সোমালিল্যান্ড ও ওগাদেন অঞ্চল নিয়ে একটি শাসন ইউনিট গঠন করে এটাকে সামরিক শাসনাধীনে আনয়ন করা হয়।

১৯৪২ সালে বৃটিশ সরকার ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসীকে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা পুনঃ প্রদান করে। কিন্তু ওগাদেন, হাউস ও রিজাভ, এলাকায় বৃটিশ সামরিক শাসন অব্যাহত থাকে।

১৯৫০ সালে ওগাদেন ব্যতীত সাবেক ইতালীয় সোমালিল্যান্ডের অন্যান্য অংশ জাতিসংঘের অছি পরিষদের পক্ষ থেকে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ইতালীয়দেরকে অর্পন করা হয়। সাবেক বৃটিশ সোমালিল্যান্ড বৃটিশের 'আশ্রিত এলাকা' হিসেবেই শাসিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে বৃটিশরা হাউদ ও রিজার্ভ এলাকা ইথিওপিয়াকে অর্পণ করে। তাদের কাজের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য তারা ১৮৯৭ সালে ইথিওপিয়ার সম্রাটের সাথে গোপনে সম্পাদিত একটি চুক্তির বরাত দেয়। সুদানে মাহদীর সাথে যুদ্ধরত থাকাকাল বৃটিশ সরকার ইথিওপিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সোমালী মুসলমানদের অজ্ঞাতে সম্পাদিত উক্ত গোপন চুক্তিতে সোমালিয়ার এ অঞ্চলটি ইথিওপিয়াকে প্রদানের ওয়াদা আদায় করে। উক্ত চুক্তি ছিলো ১৮৮৪-৮৫ সালে সোমালী প্রধানদের সাথে বৃটিশ কর্তপক্ষের সম্পাদিত চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু ফিলিস্তীনে মুসলমানদের সাথে তারা যেরূপ চুক্তি ভংগ করে ইহুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, এক্ষেত্রেও সেরূপ মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভংগ করে মুসলিম এলাকার শাসনভার খৃস্টান ইথিওপিয়ার হাতে তুলে দেয়।

১৯৬০ সালের ২৬ জুন বৃটিশ সরকার বৃটিশ সোমালিল্যান্ডের আযাদী স্বীকার করে নেয়। অতঃপর তা জাতিসংঘের অছি এলাকা সোমালিয়ার সাথে মিলিত হয় এবং ১৯৬০ সালের ১ জুলাই তারিখে সম্মিলিত এলাকা নিয়ে সোমালী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। সোমলিয়া ও সোমালিল্যান্ডের আইন পরিষদ সদস্য মিলিত ভোটে ছয় বছরের জন্য আদেন ' আবদুল্লাহকে নয়া রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন।

---

(২০৮) পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯-এর ২১ অক্টোবর সোমালিয়ার গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে উৎখাত করে সেনা বাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং রাষ্ট্রের নয়া নামকরণ করা হয় সোমালী গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র। এ সময়ে সামরিক সরকার শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে এবং নির্বাচিত পার্লামেন্টও ভেঙ্গে দেয়া হয়। অতঃপর ২১ সদস্যবিশিষ্ট সর্বোচ্চ বিপ-বী পরিষদ ও ১৮ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদের যৌথ নিয়ন্ত্রণে সরকার পরিচালিত হতে থাকে। মেজর জেনারেল সাঈদ বাররাহ এ উভয় পরিষদের প্রেসিডন্ট হিসেবে বহাল হন।

মার্কিন সাহায্যে বলীয়ান প্রেসিডেন্ট সাঈদ বাররাহ অকটোবর মাসে পুনরায় দেশব্যাপী জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্তযে সতেরো সদস্য বিশিষ্ট বিপ-বী পরিষদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো, দুর্নীতিবাজ ও গোত্রীয় বিভেদ সৃষ্টিকারীদের শায়েস্তা করার, যুক্তিতে গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকেই পুনরায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে দেয়া হয়। ফলে ১৯৬৯ সালের সামরিক বিপ-বের পরবর্তী এক দশকের শেষে ১৯৭৯ সালে যে একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল, এক বছর অতিক্রান্তনা হতেই তাও আবার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- সোমালী প্রজাতন্ত্রের অধিকাংশ অধিবাসীর জীবিকার প্রধান অবলম্বন পশুপালন। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা কিছু কিছু কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন করে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের কোন কোন এলাকায় পশুপালনই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। দেশে অভ্যন্তড়ীণ চাহিদা মেটাবার পর প্রতি বছর যথেষ্ট পরিমাণ গোশত, ঘি, চামড়া এবং বহুসংখ্যক জীবিত পশু বিদেশে রফতানী করা হয়। তৃণাঞ্চলে কুপ খননের মাধ্যমে সমৃদ্ধ চারণভূমি সৃষ্টি করে এবং পশুপালক পরিবারগুলোকে আধুনিক পশু পালন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে পশুজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

সোমালিয়ার অধিবাসীদের জীবিকার দ্বিতীয় প্রধান উৎস কৃষিকার্য। খাদ্য-শস্য হিসাবে সোমালিয়ায় ভুট্টা, সরগম, ও সিসেমের চাষ হয়। কলা, আখ এবং তূলা যা উৎপন্ন হয়, তাতে দেশের অভ্যন্তড়ীণ চাহিদা মেটার পর বিদেশে রফতানী করাও সম্ভব হয়। দেশের যে অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, সে সব জায়গা ছাড়াও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন ধরনের সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়। চাষাবাদের পদ্ধতি এখনো প্রাচীন ধরনের। তবে আযাদ সোমালী সরকার যৌথ খামার ও সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রবর্তনের ব্যাপারে জনসাধারণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করায় আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

সোমালিয়ায় উপকুলবর্তী সমুদ্রে প্রচুর টুনা, হাংগর ইত্যাদি জাতীয় সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। কিন্ত সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকার অধিবাসীরা মাছ খেতে অভ্যস্ত নয়। ধৃত মাছ বিদেশে রফতানী করা হয়ে থাকে। উপকূল অঞ্চলে সহজলভ্য এ বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য সরকার জনসাধনকে সমুদ্রে মাছ ধরার আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মোগাদিসুতে একটি 'মৎস্য শিকার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সোমালিয়ায় কোন গভীর অরণ্য নেই। অপক্ষোকৃত বৃষ্টিবহুল পাহাড় অঞ্চলে ঝোপ ঝাড় ধরণের কিছু জংগল রয়েছে। এসব জংগলে প্রাপ্ত গাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে দুপ এবং কিছু কিছু আরবী গঁদ উৎপন্ন হয়।

সোমালিয়ার বৃষ্টিহীন ও বালুকাময় উপকূলভাগ সামুদ্রিক লবণ উৎপাদনের জন্য অত্যন্তউপযোগী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই এ অঞ্চলে বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষাধিক মন লবণ উৎপন্ন হতো। এ ছাড়া, দেশের নানাস্থানে চুনাপাথর, সোপস্টোন, মার্কেল পাথর ও আলাবেস্টার পাওয়া যায়। দেশের অবস্থিত ও ভূ-প্রকৃতি থেকে অনুমতি হয় যে তেল খনি আবিস্কারেরও বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে কতিপয় তেল-কোম্পানী ব্যাপক অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লোহা ও উত্তরাঞ্চলে বেরাইল ও কলম্বাইটোর খনি পাওয়া গেছে।

টিন টিটানিয়াম ও ইউরোনিয়াম খনিগুলোতেও এখন উত্তোলনের কাজ চলছে। চিনির কল, কিছুসংখ্যক কাপড়ের মিল, টুনা মাছা ও অন্যান্য মাছ, গোশত ও ফলফলাদী টিনজাতকরণের কারখানাই উল্লেখযোগ্য। সাবান ইত্যাদি প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কতকগুলো কারখানাও পড়ে উঠেছে। এ ছাড়া নানা ধরণের কুটির শিল্পও আছে। তার মধ্যে এখানকার 'ফুর্তা বানাদির, নামক এক জাতীয় রঙ্গিন কাপড়ের বিশেষ খ্যাতি ও চাহিদা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে রয়েছে।[২০৯] দেশটির মোট জাতীয় আয় (জি ডি পি) ১৭০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৫০০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৭৯ সালে সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ এবং ১৯৮৪ সালে তা সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে পুনরায় সংশোধিত চার্টার গৃহীত হয়। ট্রানজিশনাল ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি ২৪৫ সদস্য বিশিষ্ট আইন পরিষদ এবং দেশের খ্যাতনামা ২০ জন ব্যক্তি অক্টোবর ২০০৩ সালে একজন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য নিয়োগ প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট, দুজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। এক কক্ষ জাতীয় সংসদ পিপলস অ্যাসেমবি- র সদস্য সংখ্যা ১৭৭। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

৪.১.৫৭. শাদ

শাদের সাংবিধানিক নাম Republique Du Tchad এবং ইংরেজি নাম Republic of Chad দেশটির আয়তন- ১২,৫৯,২০০ বর্গকিমি (৪,৯৫,৮০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৯৭ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ৩.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা শাদিয়ান নামে পরিচিত। আরব ও আফ্রিকান প্রায় ২০০ উপজাতি নিয়ে গঠিত দেশ। মুসলিম ৫০ শতাংশ, খৃষ্টান ৩০ শতাংশ অবশিষ্ট সনাতন ধর্মাচারী। গড় আয়ু ৪৪.৭ বছর। রাষ্ট্রভাষা ফ্রেঞ্চ ও আরবি। অনেক আফ্রিকান ভাষা প্রচলিত। ব্যাপকভাবে শিক্ষার হার ৪৪.২ শতাংশ। রাজধানী এ জামেনা (Jamena),প্রচলিত মুদ্রা- ফ্রাঁ (সি এফ এ)।

---

(২০৯) ফারুক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯০

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক পরিচয়:- শাদ উত্তর আফ্রিকার মধ্যভাগে অবস্থিত ভুমিবদ্ধ দেশ। পশ্চিমে ক্যামেরুন নাইজেরিয়া ও নাইজার, উত্তরে লিবিয়া, পূর্বে সুদান এবং দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র অবস্থিত। উত্তর দিক পার্বত্য অঞ্চল ও মরুময়। মধ্যাঞ্চল সমতল, দক্ষিণে নিম্নভূমি। উত্তরে প্রায় এক লক্ষ্য বর্গমাইল জমি লিবিয়া তার এলাকা বলে দাবি করে। শাদ হ্রদ নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বিবাদ আছে। [২১০]

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ফ্রান্স ১৯০০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শাদকে একটি অশ্রিত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে ১৯০৮ সালে এটি ফ্রান্স ইকুটোরিয়াল আফ্রিকার সাথে মিলিত হয়। ১৯২০ সালে ফ্রান্সের উপনিবেশ হয় এবং ১৯৫৮ সালে গণভোটের সিদ্ধান্তঅনুসারে শাদ ফ্রেঞ্চ ইউনিয়নের অভ্যন্তড়রে স্বয়ংশাসিত সাধারণতন্ত্র হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬০ সালে। স্বাধীনতার পর থেকে একটানা অশান্তির মধ্যে শাদ দিন কাটায়। সামারিক অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান, লিবিয়ার জবর দখল ইত্যাদি ঘটনার শেষে ১৯৯০ সালে নতুন সংবিধান বলবৎ হয় যাতে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। রাজধানী জামেনা (Jamena), চারি ও লোগোনে নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত শহর, লোকসংখ্যা ছয় লক্ষ। ১৯৭৩ পর্যন্তনাম ছিল, ফোর্ট লেমি। অন্য শহর সার, মউনদউ, আবেচে।

অর্থনৈতিক পরিচয়:- অতি দরিদ্র দেশ তবে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে বক্সাইট,ইউরোনিয়াম প্রভৃতি। প্রতিকূল আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উন্নয়নের পরিকাঠামোর অভাব চাদকে অতি অনুন্নত দেশ করে রেখেছে। তুলা প্রধান অর্থকরী ফসল, রপ্তানি ৪৮ শতাংশই তুলা, অন্য ফসল আখ। শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষি ও মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত। ধান, চিনাবাদাম, আলু প্রভৃতির চাষ হয়। গবাদিপশু পালন করে একদল যাযাবর শ্রেণীর মানুষ। কটন, টেক্সটাইল, মদ, সাবান, সিগারেট প্রভৃতির প্রভৃতির কারখানা গড়ে উঠেছে। মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান ৪৫ শতাংশ, শিল্প ১৫ শতাংশ। মোট জাতীয় উৎপাদন ১৬ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১০৭০ ডলার।

প্রশাসনিক ও সংবিধানিক পরিচয়:- ১৯৯৬ সালে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সংবিধান গৃহীত হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী ১৫৫ জন সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। তিনি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁকে সহযোগতিা করে মন্ত্রিপরিষদ। জাতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল কনসালটেটিভ কাউন্সিল উচ্চ কক্ষ সিনেটের ৫১ সদস্য। সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ প্রতি দু'বছর অন্তড়র অন্তড়র নির্বাচিত হন। প্রধান রাজনৈতিক দল পেট্রিয়টিক স্যালভেশন মুভমেন্ট (এম পি এস)। এছাড়াও অনেকগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে।

---

(২১০) *Europa (2004)*,V-I, Ibid, PP.1061 (বিস্তারিত দেখুন পৃ.১০৬১-১০৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

৪.২. ও আই সি-র পর্যবেক্ষক সদস্য সমূহের পরিচিতি

৪.২.১. ওআইসি'র পর্যবেক্ষক সদস্য

চার্টারের ধারা-৪ এর (১) এ পর্যবেক্ষক সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে বলা হয়েছে যে.'জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্রকে সংস্থার পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে' [১] চার্টারের ধারা-৪ এর (২)-এ পর্যবেক্ষক সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, 'আন্তর্জাতিক কোন সংস্থাকে পর্যবেক্ষণ মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রীপরিষদের সভায় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগৃহীত হবে' [২] উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে ওআইসি পর্যবেক্ষক সদস্য হিসাবে রাষ্ট্র ও সংস্থাকে সদস্য নির্বাচন করে থাকে ।

উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী ওআইসির পর্যাবেক্ষক সদস্যসমূহ- দুই ধরনের, (ক) দেশ (খ) সংস্থা। নিম্নের সারণির মাধ্যমে পর্যাবেক্ষক সদস্যসমূহের নাম এবং সদস্যপদ লাভের বছরওয়ারী তালিকা প্রদান করা হলো।

সারণি-৫
পর্যাবেক্ষক সদস্যসমূহের নাম এবং সদস্যপদ লাভের বছরওয়ারী তালিকা

ক্রম	দেশের/ সংস্থার নাম	সদস্য লাভের বছর
০১	আরবলীগ	১৯৭৫
০২	ইকো	১৯৭৫
০৩	জাতিসংঘ	১৯৭৬
০৪	মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট	১৯৭৭
০৫	ন্যাম	১৯৭৭
০৬	আফ্রিকান ইউনিয়ন সংস্থা	১৯৭৭
০৭	তুর্কী সাইপ্রাস	১৯৭৯
০৮	বসনিয়া হার্জিগোভিনা	১৯৯৪
০৯	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১৯৯৭
১০	থাইল্যান্ড	১৯৯৮
১১	ওআইসি পালামেন্টোরী ইউনিয়ন	২০০০
১২	ইসলামিক কনফারেন্স ইয়ুথ ফোরাম ফর ডায়ালগ এ্যান্ড কো-অপারেশন	২০০৫
১৩	রাশিয়া	২০০৫

উৎস:গবেষক কর্তৃক তৈরীকৃত

(১) Article 4(1), Ibid, Charter of the Organisation of the Islamic Cooperation (সংশোধিত ১৪ মার্চ ২০০৮)

(২) Article 4(2), Ibid,

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.২. পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্র

পর্যবেক্ষক ৫টি দেশ উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে তুর্কী সাইপ্রাস একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ নয় বা দেশ হিসেবে জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত নয়। পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি ওআইসি'র চটিারের ধারা (৪)ব্যতীত ধারা (২৬) এবং ধারা (২৭) এর আলোকেও এখতিয়ারভুক্ত। কারণ ঐসব দেশে হয় শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে নতুবা কোন বিরোধ থাকবে যা আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলের জন্য হুমকীসরূপ অথবা কোন মুসলিমদেশের শান্তি বিনষ্ঠকারী। নিম্নে পর্যবেক্ষক ৫টি দেশ-এর পরিচিতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হ'ল।

সারণি-৬

পর্যাবেক্ষক সদস্যদেশসমূহের নাম এবং সদস্যপদ লাভের বছরওয়ারী তালিকা

ক্রম	দেশের নাম	সদস্য পদ লাভের বছর
০১	তুকী সাইপ্রাস	১৯৭৯
০২	বসনিয়া হার্জিগোভিনা	১৯৯৪
০৩	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১৯৯৭
০৪	থাইল্যান্ড	১৯৯৮
০৫	রাশিয়া	২০০৫

উৎস: গবেষক কর্তৃক তৈরীকৃত

সাইপ্রাস

সাইপ্রাস এর সাংবিধানিক নাম Republic of Cyprus আয়তন- ৯,২৫১ বর্গ কিমি (৩,৫৭২ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা- ৭ লক্ষ ৮০,৯৩৩ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা সিপ্রিয়ট নামে পরিচিতি। অধিবাসীদের ৭৮ শতাংশ গ্রিক, ১৮ শতাংশ তুর্কি, অন্যান্য ৪ শতাংশ। গ্রিকরা অর্থোডেক্স চার্চের অনুগত, তুর্কিরা মুসলিম। সাক্ষর ৯৭.২ শতাংশ। গড় আয়ু- ৭৮.৩ বছর। ভাষা ইংরেজি, গ্রিক ও তুর্কি। দ্বীপটি এখন দ্বিখন্ডিত, তুর্কিরা উত্তরভাগ দখলে রেখেছে ও অবশিষ্ট অংশ গ্রিকদের অধিকারে। গ্রিক-অধিকৃত সাইপ্রাস আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। তুর্কি অংশের শহর কিইরেনিয়া, ফামাগুন্ডা। রাজধানী নিকোশিয়া। প্রচলিত মুদ্রা- সাইপ্রাস পাউন্ড।

ভৌগোলিক পরিচয়:- ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে অবস্থিত দ্বীপ, সমগ্র তটরেখা ৬৪৮ কিমি। ১৯৭৪ সাল থেকে দ্বীপটির দক্ষিণ দিকের ৬০ শতাংশ গ্রিকদের ও উত্তরের ৩৫ শতাংশ তুর্কিদের দখলে, মধ্যে সংকীর্ণ জাতিসংঘের বাফার জোন। দ্বীপটির মধ্যাঞ্চল সমতল, উত্তর ও দক্ষিণ দিক পর্বতময়। ৪০ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য। খাবার পানির অভাব আছে, বৃষ্টি ছাড়া পানি দুর্লভ।[৩]

(৩) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ (সম্পাদিত), *রাষ্ট্র অভিধান*, ঢাকা-২০০৭, পৃ.১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে হতে তুরস্ক ইউরোপের পূর্বভাগের দেশগুলোর উপর আধিপত্য স্থাপন করে। গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় দেশগুলি এই শতক থেকে বহু শতক বছরের জন্য তুর্কী সুলতানাতের অধীনে চলে যায়।[৪] কিন্তু অনেক ঘটনার পর ১৯১৯ সালে ইতালির বাহিনী আন্তালিয়ায় অবতরণ করে।[৫] দীর্ঘদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পর ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র জন্ম হয়।[৬] পরবর্তীতে রাজনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশটির অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পূর্বতম আধিপত্য বিলোপ ঘটে। ১৯৭৪ সালে ২০ জুলাই তুরস্ক সাইপ্রাস অভিযানে চালিয়ে দেশটির উত্তরাঞ্চল দখল করে।[৭]

১৮৭৮ সালে বৃটিশ উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ সালে সাইপ্রাস স্বাধীন হয়, আর্চবিশপ মাকারিওস প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৩ সালে তুর্কিরা উত্তরাংশে স্বাধীন সরকার গঠন করে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হলে জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী হস্তক্ষেপ করে, দ্বীপরাষ্ট্র দ্বিখন্ডীত হয়। ১৯৮৩ সালে তুর্কি এলাকায় টার্কিশ রিপাবলিক অফ নর্দার্ন সাইপ্রাস নামে স্বতন্ত্ররাষ্ট্র গঠিত হয়। যা শুধু তুরস্কের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।[৮] ২০০৪ সালে জাতিসংঘের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তুর্কি সাইপ্রাস সংযুক্তির পক্ষে এবং গ্রিক সাইপ্রাস সংযুক্তির বিপক্ষে ভোট দিলে অখন্ড সাইপ্রাস গঠনের প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। রাজধানী নিকোশিয়া চামড়া বস্ত্র ও পটারি শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ভেনিশিয়ানদের দখলে থাকাকালে নিকোশিয়া শহরটিকে ১৪৮৯ খৃ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়, সে প্রাচীর এখনও আছে। শহরের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। নিকোশিয়ার অর্ধেক তুর্কি দখলে। গ্রিক অঞ্চলে বন্দর শহর লিমাসোল, লারনাকা, পাফোস। তুর্কি অংশের শহর কিইরেনিয়া, ফামাগুস্তা।

অর্থনীতি পরিচয়:- গ্রিক সাইপ্রাস সমৃদ্ধ দেশ। শ্রমশক্তির ১৪ শতাংশ কৃষিকাজে নিযুক্ত ও মোট রপ্তানির ২৫ শতাংশ কৃষিপণ্য। আলু ও সবজি সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়, আঙ্গুর অলিভ প্রভৃতির চাষ হয়। খাদ্য প্রস্তুতি, বস্ত্র, রাসায়নিক, ধাতু ও কাঠের সরঞ্জামের কলকারখানা আছে। জাতীয় উৎপাদনের ২৪ শতাংশ শিল্পজাত পন্য। পর্যটন খুব উন্নত ও সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সূত্র। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১১,৫০০ ডলার।

---

(৪) শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি, *ইউরোপের ইতিহাসের রুপরেখা*, , ২০০৭, পৃ.৩৬৫
(৫) Bernard, Leasis, *The Emergerce of Modern Turkey,* Oxford nuiversity press, Oxford, 1968, P.240
(৬) ভবেশ রায়, রাষ্ট্রকোষ, ঢাকা.২০০৭, পৃ.৯৮
(৭) Geoffrey Lewis, *Nation of the Modern Woold*: Turkey, E Benn, London,1965, p.52
(৮) হারুনার রশিদ ভূইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন ও সংবিধান পরিচয়:- দুই অংশে দুই ধরনের প্রশাসন। গ্রিক সাইপ্রাসে প্রেসিডেন্ট মুখ্য প্রশাসক, সচিবমন্ডলীর সহায়তায় রাষ্ট্রশাসন করেন। তুর্কি সাইপ্রাসে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র প্রধান ও প্রধান প্রশাসক। দুই সাইপ্রাসেই এককক্ষ জাতীয় সংসদ। গ্রিক সাইপ্রাসে জাতীয় সংসদ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস, সদস্য সংখ্যা ৫৬। তুর্কি সাইপ্রাসে জাতীয় সংসদ অ্যাসেমব্লি অফ দি রিপাবলিক, সদস্য সংখ্যা ৫০। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

বসনিয়া-হার্জিগোভিনা

বসনিয়া-হার্জিগোভিনা এর সাংবিধানিক নাম Republic of Bosnia-Herzegovina আয়তন- ৫১,১২৯ বর্গকিমি (১৯,৭৪১ বর্গমাইল) লোকসংখ্যা-৪১ লক্ষ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৪ শতাংশ। অধিবাসীরা ধর্ম অথবা জাতিগোষ্ঠি অনুসারে পরিচিতি। মুসলিম ৪৪ শতাংশ, সার্ব ৩৩ শতাংশ, ক্রোট ১৭ শতাংশ। সার্ব ও ক্রোটদের ৩৯ শতাংশ অর্থোডেক্স, ক্যাথলিক ১৫ শতাংশ, প্রোটেষ্টাটি ৪ শতাংশ। ৯৩.০ শতাংশ সাক্ষর। গড় আয়ু ৭৪.০ বছর। ৯৯ শতাংশের ভাষা সার্বো-ক্রোসিয়ান ও সেটাই সরকারী ভাষা। রাজধানী সারায়েভো শিল্পসমৃদ্ধ শহর, লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ। অন্যান্য শহর বানজা লুকা, মোস্তার, প্রিজেদোর, তুজলা, জেনিকা। প্রচলিত মুদ্রা- কনভাটিবলনা মার্কা।[৯]

ভৌগোলিক পরিচয়:- দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, বলকান অঞ্চলের দেশ। উত্তর ও পশ্চিম দিকে ক্রোশিয়া, পূর্বে যুগোস্লাভিয়া, দক্ষিণে আড্রিয়াটিক সাগর। পর্বতময় দেশ, উপত্যকাগুলির মাটি উর্বর। বসনিয়া-হার্জিগোনিয়া হচ্ছে প্রাক্তন ফেডারেল যুগ্লোস্লভিয়ার একটি প্রজাতন্ত্র। যুগোস্লাভিয়া ৬টি প্রজাতন্ত্র যথা সার্বিয়া, ভজভোদিনা, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হার্জিগোভিনা, মন্টিনিগ্রো এবং ২টি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল যথা মেসিডোনিয়া ও কসভো নিয়ে গঠিত ছিল। শাসনতান্ত্রিকভাবে প্রজাতন্ত্রগুলো ছিল স্বাধীন। বর্তমানে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো একত্রে রয়েছে এবং অপরগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বসনিয়া-হার্জিগোভিনা মূলতঃ দুটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। একটি বসনিয়া এবং অপরটি হার্জিগোভিনা। বসনিয়ার রাজধানী হচ্ছে সারাজেভো এবং হার্জিগোভিনার রাজধানী মোস্তাব। সম্মিলিত বসনিয়া হার্জিগোভিনার রাজধানী সারায়েভো।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতকে বসনিয়া-হার্জিগোভিনার গোরাপত্তন হয়। বসনিয়া নামটি বোসনা (Bosna) নামক নদীর নাম থেকে এবং হার্জিগোভিনা শব্দটি র্জামান ভাষা হার্জগ থেকে নেয়া হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শাসকদেরকে হার্জগ (Hergog) বলে অভিহিত করা হতো। গ্রীক, রোমান, অটোমান এবং অন্যান্য জাতীয় শাসক দ্বারা বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলটি শাসিত হয়েছে বিধায় এখানে একটি মিশ্র ধরনের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। ৭ম শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত বসনিয়া হার্জিগোভিনা আশয়েরি গোত্রের শাসনাধীনে ছিলো।

(৯) পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১৪৬৩ সালে তুর্কী সুলতান মোহাম্মদ আল ফতেহ-এর সেনাপতি দ্বিতীয় মোহাম্মদ বসনিয়া হার্জিগোভিনায় সামরিক অভিযান চালিয়ে তা দখল করে নেয়। এ সময়ে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার বসনিয়া হার্জিগোভিনার খ্রিষ্টান মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকে বসনিয়া হার্জিগোভিনা একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। ১৪৬৩ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এটি উসমানী তুর্কী সালতানাতের একটি প্রদেশ ছিল।

প্লেভনা রণাংগনে রাশিয়ার নিকট তুর্কীর পরাজয়

ইতোমধ্যে পূর্ব ইউরোপীয় তুকী প্রদেশগুলোর খ্রিষ্টান নাগরিকদের মধ্যে তুর্কী মুসলিম বিরোধী মনোভাব উসকিয়ে দেয়া হয়। বসনিয়া হার্জিগোভিনার খ্রিষ্টানগণ মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয়। বুলগেরিয়ার খ্রিষ্টানগণও একই পথ অনুসরণ করে। এই খ্রিষ্টান বিদ্রোহের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় রাশিয়া। খ্রিষ্টীয় ১৮৭৭ সালে রাশিয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুর্কীর সেনাপতি উসমান পাশা প্লেভনা রণাংগণে রাশিয়ার সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলা করেন। কিন্তু যুদ্ধে তুকী বাহিনী পরাজিত হয়। খ্রিষ্টীয় ১৮৭৮ সালে তুর্কী রাশিয়ার সঙ্গে স্যান ষ্টেফানো চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়।

স্যান ষ্টেফানো চুক্তির শর্তানুযায়ী তুর্কীর সুলতান সার্বিয়া মন্টোনেগ্রো এবং রুমানিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হন। বুলগেরিয়া তুর্কীর কাছ থেকে স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। বসনিয়া-হার্জিগোভিনার ওপর তুর্কীর কর্তৃত্ব বহাল থাকলেও সেখানকার খ্রিষ্টানদেরকে বহুবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়। দানিউব নদীর তীরবর্তী তুর্কী মুসলিমদের দূর্গগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হয়। আর্মিনিয়ার একটি অংশ রাশিয়ার হাতে তুলে দেয়া হয়। বসফরাস ও দার্দানের্লিস প্রণালীর ওপর তুর্কীর একচ্ছত্র অধিকার খর্ব করে তা সকল দেশের বাণিজ্য পথের অবাধ যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত করা হয়।

অষ্ট্রীয়া ও হাংগেরীর অধীনে বসনিয়া-হার্জিগোভিনা

স্যান ষ্টেফানো চুক্তি অনুযারী রাশিয়া তুর্কীর কাছ থেকে যে সব সুবিধা আদায় করে নেয় তাতে গ্রেটব্রিটেন ও অষ্ট্রীয়া-হাংগেরী নাখোশ হয়। উভয় শক্তি রাশিয়াকে বলে যে স্যান ষ্ট্রেফানো চুক্তি অনুমোদনের জন্য ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলোর একটি সম্মেলনে উপস্থাপন করতে হবে। রাশিয়া এ চাপ উপেক্ষা করতে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টীয় ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত ৩৯টি রাষ্ট্রের শিথিল জার্মান কনফেডারেশন মূলত অষ্ট্রীয়-হাংগেরীর নির্দেশই পালন করতো। ওই বছর জার্মেনী অষ্ট্রীয়-হাংগেরীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। কালক্রমে তা ইউরোপের অন্যতম শক্তিধর দেশে পরিণত হয়। ১৮৭৮ সালে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে অষ্ট্রীয়-হাংগেরী, জার্মেনী, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালী এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে এ্যান্ডেসী অষ্ট্রিয়-হাংগেরীর, বিসমার্ক জার্মেনীর, গর্টশেকফ রাশিয়ার, ওয়েডিংটন ফ্রান্সের, কর্তি-

Dhaka University Institutional Repository

ইতালীর এবং ডিজরেইলী ও স্যালিসবেরী গ্রেটব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জার্মেনীর চ্যান্সেলার বিসমার্ক। সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তি বার্লিন চুক্তি নামে আখ্যায়িত হয়।

বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী বুলগেরিয়াকে বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমেনিয়া নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং পূর্ব রুমানিয়াকে পূর্ববৎ তুর্কীর অধীনে রাখা হয়। বুলগেরিয়াকে নয় মাসের জন্য রাশিয়ার শাসনাধীনে দেয়া হয় এবং এরপর তা তুর্কীর অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হিসেবে থাকবে বলে স্থির হয়। তুর্কীকে বাধ্য করা হয় রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টিনেগ্রোকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীকে বসনিয়া-হার্জিগোভিনা দখলে রাখা এবং এর প্রশাসন পরিচালনার অধিকার দেয়া হয়।

বসনিয়া-হার্জিগোভিনার প্রতি সার্বিয়ার লোলুপ দৃষ্টি

তুর্কী সালতানাতের শাসনমুক্ত হওয়ার পর খ্রিষ্টীয় ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ওব্রেনোভিস রাজবংশ সার্বিয়া শাসন করে। এই রাজবংশের রাজাগণ স্বাধীন হওয়া সত্বেও অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর বশবর্তী ছিলেন। খ্রিষ্টীয় ১৯০৫ সালে সার্বিয়ার রাজা আলেকজান্ডার তার স্ত্রীসহ নিহত হন। কারাজর্জেভিক রাজবংশ ক্ষমতাসীন হয়। এই রাজবংশ অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতো। স্বাধীন সার্বিয়ার শ্যেনদৃষ্টি ছিল বসনিয়া-হার্জিগোভিনার ওপর। সে আশা করতো যে একদিন সে তা পেয়ে যাবে। সে তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকে যে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এড্রিয়াটিক সাগর অথবা ঈজিয়ান সাগরে পৌছা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য তার চাই বসনিয়া-হার্জিগোভিনা।

বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়া-হাংগেরী, বসনিয়া-হার্জিগোভিনার প্রশাসন পরিচালনা করছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালে অষ্ট্রিয়া-হাংগেরী সরকার বসনিয়া-হার্জিগোভিনাকে স্বীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে নেয়। এতে সার্বিয়া দারুনভাবে নিরাশ হয়। সে অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর সাথে যুদ্ধ করে বসনিয়া-হার্জিগোভিনা কেড়ে নেয়ার সংকল্প গ্রহণ করে।

মিত্রদেশ রাশিয়া সার্বিয়াকে যুদ্ধে না যেতে বলে। আবার জার্মেনী অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর পক্ষ নেয়। ফলে সার্বিয়া এই কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে, বসনিয়া-হার্জিগোভিনার ওপর তার কোন দাবি নেই এবং অষ্ট্রিয়া-হাংগেরী সাথে বসনিয়া-হার্জিগোভিনার সংযুক্তি সে মেনে নিয়েছে। প্রকাশ্যে এসব ঘোষণা দিতে থাকলেও ভেতরে ভেতরে সার্বিয়া বিরোধীতা করতে থাকে।

উল্লেখ্য, বসনিয়া-হার্জিগোভিনার জনগণও অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। তারা স্বাধীনতার দাবিতে স্বোচ্ছার হয়ে ওঠে। ফলে অষ্ট্রিয়া-হাংগেরী বসনিয়া-হার্জিগোভিনাতে দমন নীতি চালাতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিয়ার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ

বসনিয়া-হার্জিগোভিনার ওপর সার্বিয়ার লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। সার্বিয়া বসনিয়া-হার্জিগোভিনার সার্ব জাতিগোষ্ঠীভুক্ত নাগরিকদেরকে নিয়ে অনেকগুলো গোপন সংস্থা গড়ে তোলে। বসনিয়া-হার্জিগোভিনাকে অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত করে সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করার অভিপ্রায় নিয়ে এই তৎপরতা শুরু হয়। দ্যা ব্ল্যাক হ্যান্ড সোসাইটি যার অপর নাম ছিল ইউনিয়ন অব ডেথ এ লক্ষ্যে বসনিয়া-হার্জিগোভিনায় নিযুক্ত অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর গভর্নর অসকার পটিওয়েককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়। এই সোসাইটির প্রতীক ছিল একটি মাথার খুলি আড়া আড়িভাবে রাখা হাড়, একটি ছোরা, একটি বোমা এবং এক বোতল বিষ। এই প্রতীকই প্রমাণকরে যে এটি ছিল একটি সন্ত্রাসী সংস্থা।

এদিকে ১৯১৪ সালে অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর যুবরাজ ও তার পত্নী বসনিয়া-হার্জিগোভিনায় সফরে আসছেন এ সংবাদ পেয়ে সার্বিয়া সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। যুবরাজও তার পত্নীকে হত্যার লক্ষ্যে বসনিয়া-হার্জিগোভিনার সার্ব সন্ত্রাসীরা সফররত যুবরাজ ও তার পত্নীকে হত্যার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা সফল হয়। বসনিয়া-হার্জিগোভিনায় অষ্ট্রিয়া-হাংগেরীর যুবরাজও তার পত্নী সার্ব সন্ত্রাসীদে হাতে নিহত হন। এ হত্যাকান্ডেই ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা করে।

সার্বিয়ার অধীনে বসনিয়া-হার্জিগোভিনা

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি ১৯১৯ সালের ২৮ জুন প্যারিসে জার্মেনীকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করে। এই চুক্তিটিকেই ভার্সাই চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তিতে অনেকগুলো অপমানকর শর্ত জার্মেনীর ওপর চাপানো হয়। জার্মেনীর কাছ থেকে বিজিত এলাকাগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয়। তার কাছ থেকে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। আরো অনেক রকম শর্তই পরাজিত জার্মানীকে বহন করতে হয়। ভার্সাই চুক্তি ছিল জার্মেনীর জন্য অত্যন্ত অপমানকর চুক্তি। এ চুক্তি মানা জার্মেনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যার প্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয় আর একটি ভয়াবহ যুদ্ধ। যাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৪১ সালের ২৫মার্চ সার্বিয়া জার্মেনীর পক্ষে থাকবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্ত ২৭ মার্চের নয়া সামরিক সরকার এ চুক্তি বাতিল করে দেয়। সার্বিয়ার এ আচরণ জার্মান অধিনায়ক হিটলার ক্ষেপে যান। ১৯৪১ সালে ৬ এপ্রিল জার্মান বাহিনী সার্বিয়া আক্রমণ করে। সার্বিয়ার সেনাবাহিনী জার্মেনীর সেনাবাহিনীর আক্রমণের মূখে ৬ দিনের বেশি টিকতে পারেনি। ১২ এপ্রিল সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড জার্মান সেনাদের পদানত হয়। ১৭ এপ্রিল সার্বিয়ার সেনাবাহিনী জার্মান বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এ মাসেই জার্মেনী হার্জিগোভিনাকে ক্রোয়েশিয়ার হাতে ন্যস্ত করে। তখন পরাজিত সার্বিয়া শাসিত হতে থাকে একজন জার্মান সামরিক গভর্নর দ্বারা।

Dhaka University Institutional Repository

বসনিয়া-হার্জিগোভিনায় রাজনৈতকিক অস্থিরতা

বসনিয়া-হার্জিগোভিনার জনগন ক্রোয়েশিয়ার হাতে অত্যাচারিত হয়। ফলে সেখানে দেখা দেয় অস্থিরতা। এ প্রেক্ষাপটে একজন সার্ব কর্নেল ড্যাগলজুব মিহাইলেভিক, যাকে ড্র্যাজা বলা হতো একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করেন। তিনি সার্বিয়ার ক্ষমতাচ্যুত কারাজজেভিক রাজবংশের পুনর্বাসন সহ সার্বিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে থাকেন।

এদিকে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা শেষ হতে লাগলো। ১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানী এবং আগষ্ট মাসে তার মিত্র জাপান আত্মসমর্পণ করলে এ যুদ্ধের ভয়াবহতা শেষ হয়।

সার্বিয়া থেকে যুগোশ্লাভিয়ার উত্তরণ

জার্মানীর আক্রমণে সার্বিয়ার সৈন্যবাহিনী ছত্রভংগ হয়ে গেলে তরুন রাজা পিটার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। রাজার অনুগত সৈনিকরা সার্বিয়ার পাহাড় জংগলে অবস্থান করে জার্মান সৈন্যদের ওপর চোরাগুপ্ত হামলা চালাতে থাকে। সার্বিয়ার এ সব সৈন্যদের অন্যতম অফিসার ছিলেন মিহাইলোভিক। তিনি ছিলেন কট্টর সার্ব জাতীয়তাবাদী এবং রাজতন্ত্র পন্থী।

এদিকে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতা যোশেফ ব্রজ টিটো তার গেরিলা বাহিনীর জন্য রাশিয়ার নিকট অস্ত্র চাইলেন। মিহাইলোভিক অস্ত্র চাইলেন গ্রেট ব্রিটেনের কাছে। গ্রেটব্রিটেন সার্বিয়ার প্রবাসী রাজাকে সাহার্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। মিহাইলোভিক প্রবাসী সরকারের পক্ষে কাজ করছিলেন বিধায় গ্রেটব্রিটেন তাকে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে। কিন্ত কিছুকাল পর গ্রেটব্রিটেন তার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তি যোশেফ ব্রজ টিটো এবং তার বাহিনীকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে তারা সার্বিয়ার প্রবাসী সরকারের সাথে সমঝোতা দাবি করে। টিটো ভিস দ্বীপে গিয়ে সার্বিয়ার প্রবাসী সরকারের সাথে সমঝোতায় পৌছেন। ১৯৪৪ সালের ১২ আগষ্ট ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্ষ্টের একটি বিমানে করে নেপলসে গিয়ে টিটো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ২১ সেপ্টেম্বর তিনি রুশ বিমানে চড়ে মস্কো গিয়ে রুশ নেতা স্ট্যালিনের সাথে মিলিত হন। উভয় নেতার কাছ থেকে তিনি সাহায্যের আশ্বাস পান। টিটোর বাহিনীতে ৮০ হাজার যোদ্ধা ছিল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে টিটোর অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের দিকে অগ্রসর হয়। রাশিয়ার রেড আর্মির সৈন্যরা অপর দুটো পথ ধরে বেলগ্রেডের দিকে এগিয়ে আসে। ২০ অক্টোবর জার্মান সৈন্যদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করে যোশেফ ব্রজ টিটো। সার্বিয়ার মুক্তিদাতা হিসেবে বেলগ্রেড প্রবেশ করেন তিনি। রাশিয়ার চাপে রাজা পিটার টিটোকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে টিটো একে একে শ্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টোনিগ্রো এবং মেসিডোনিয়াতে নিজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে সার্বিয়া মন্টেনিগ্রো, মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া শ্লোভেনিয়া এবং বসনিয়া-হার্জিগোভিনাকে স্বতন্ত্র রিপাবলিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে টিটো ফেডারেল পিপলস রিপাবলিক অব যুগোশ্লাভিয়া

Dhaka University Institutional Repository

গঠন করেন যা ছিল প্রকৃত পক্ষে সার্বিয়ার গ্রেটার সার্বিয়া স্বপ্নের বাস্তবায়ন। টিটো হন যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট। আর দ্যা লীগ অব কমিউনিস্টস অব যুগোশ্লাভিয়া হয় দেশের একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল।

যুগোশ্লাভিয়ার অধীনে বসনিয়া-হার্জিগোভিনা

দ্যা লীগ কমিউনিষ্টস অব যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান নেতা ছিলেন যোশেফ টিটো। তিনি জাতিগতভাবে ছিলেন একজন ক্রোট। কিন্তু পার্টির প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন সার্ব জাতি গোষ্ঠির লোক। গোটা যুগোশ্লাভিয়ার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক ছিল তারা। এমন কি সেনাবাহিনী অফিসারদের শতকরা ষাট জন ছিল সার্ব। দেশের প্রশাসন, প্রচার মাধ্যম ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে নাস্তিকতার প্রসার ঘটানো হয়। এর ফলে দেশের জনগণের বিরাট অংশের চিন্তা চেতনায় বিকৃতি ঢুকে পড়ে। সার্বগণের মধ্যেই কমিউনিষ্ট আন্দোলন বেশি প্রসার লাভ করে। নাস্তিকতাবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য কঠিন, আবার তা মেনে না নিলে বেচে থাকা ছিল আরো কঠিন। রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আপন কৃষ্টি সংরক্ষনের ক্ষেত্রে বসনিয়া-হার্জিগোভিনার মুসলিমগণ বৈষম্যের স্বীকার হয়। নানাভাবে তারা নির্যাতিত হতে থাকে।

চল্লিশ বছরের কমিউনিষ্ট শাসনও যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। সার্বিয়া এবং মন্টেনিগ্রোর অধিকাংশ লোক সার্ব জাতিগোষ্ঠিয় হওয়ার কারণে এই দুই রিপাবলিকের মাঝে মিল খুব বেশি। কিন্তু শ্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া রিপাবলিকের জনগণ সার্বদের ঘৃনার চোখেই দেখতো। আর অতীতে সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার অধীনে থাকা অবস্থাতেই বসনিয়া-হার্জিগোভিনার মুসলমিগণ নিপীড়িত হয়েছে। সে কারণে সার্ব এবং ক্রোটদের সাথে মুসলিমদের কোন সুসম্পর্ক ছিল না।

যুগোশ্লাভিয়ার অবহেলিত রিপাবলিকগুলোতে বিভিন্ন সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট সরকার তা কঠোরভাবে দমন করতে থাকে।

১৯৮০ সালে যোশেফ ব্রজ টিটো মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এভাবে ফেডারেল সরকার এবং রিপাবলিক সরকারগুলোর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

বসনিয়া-হার্জিগোভিনার সমস্যার স্বরূপ

১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী বসনিয়া-হার্জিগোভিনায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠি স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। সে মোতাবেক বসনিয়া-হার্জিগোভিনা ১৯৯২ সালের ১ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৯২ সালের ২২ মে সে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এর পূর্বে ৭ এপ্রিল ইউরোপীয় সম্প্রদায় বসনিয়া-হার্জিগোভিনাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে সার্ব ও ক্রোট সম্প্রদায় এর বিরোধীতা করতে থাকে। ১৮.৫% সম্বলিত ক্রোটরা প্রধানত দুই ধরনের নীতি গ্রহণ করে। প্রথমত চরমপন্থী খ্রিষ্টান সংখ্যালঘু ক্রোটরা বসনিয়া হার্জিগোভিনায় সার্ব ও ক্রোট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। দ্বিতীয়ত তারা এ নীতিও গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করে যে বসনিয়া হার্জিগোভিনা হবে সার্বভৌম জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক ফেডারেশন এবং এখানে মুসলিম সার্ব ও ক্রোটরা নিজ নিজ অঞ্চলে বাস করবে। ৩১% সম্মিলিত সার্ব গোষ্ঠি বসনিয়া হার্জিগোভিনাকে সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছে। তাদের ইন্দন যোগায় পার্শ্ববর্তী মূল ভূখন্ড সম্মলিত রাষ্ট্র সার্বিয়া। সার্বিয়ার এ ইন্দনের কারণসমূহ নিম্নরুপঃ

১. বলকান অঞ্চলে মুসলমানদের পুনর্জাগরণ রোধ করা।

২. বসনিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব (Geo-Political Inportance)।

৩. বৃহত্তর সার্বিয়া গঠন করা এবং পূর্ববর্তী যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের পূর্বতন ঐতিহ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ব্রিটেনও রাশিয়ার জাতিগত সম্প্রদায়মূলক যোগসূত্রের কারণে তাদের কর্তৃক সার্বদেরকে মদদ দান।

বসনিয়ার মুসলিম সরকার বসনিয়া হার্জিগোভিনার স্বাধীনতা ও সংসতি বজায় রাখার জন্য সার্ব ও ক্রোটদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ক্রোটরা প্রথম দিকেই বেশ কিছু ভূমি দখল করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধবিরতি সম্পাদন করে। কিন্ত সার্বরা মুসলমানদেরকে নিধন এর জন্য ব্যাপকহারে আক্রমণ চালায়। এ হামলায় লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিহত হয় এবং হাজার হাজার মুসলিম নারীদের ওপর মানবতাবিরোধী জঘন্য নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৯২ সালের এপ্রিল থেকে সার্ব বাহিনী ৭৫% ভূমি দখল করে নেয়। ক্রোটদের দখলে চলে যায় ২০% ভূমি। রাজধানী সারাজেভোসহ ৫% ভূমি মুসলমানদের দখলে থাকে।[১০]

১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ বসনিয়ার ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই আরোপের পেছনে কাজ করেছে রাশিয়া ও ব্রিটেনের সার্বদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা। জাতিসংঘ কর্তৃক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে বসনিয়ার মুসলিম সরকার বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে পারেনি। অপরদিকে যুদ্ধরত সার্ব বাহিনী পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাষ্ট্র সার্বিয়া থেকে অবাধে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পায় এবং সেই অস্ত্র দিয়েই মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রতিহত করে। অন্যদিকে ক্রোটরা অস্ত্র পায় পার্শ্ববর্তী ক্রোশিয়া থেকে।

বসনিয়া-হারজিগোভিনা সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের প্রধান প্রবক্তা রাষ্ট্রগুলি তেমন কোন গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি। এক্ষেত্রে তারা দ্বৈত নীতি গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ধীরে চলো নীতি গ্রহন করে এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রস্তাব নিতেও আবেদন জানাতে থাকে। যখন সার্ব কর্তৃক গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও সম্পদ বিনষ্ট পরিস্থিতি ভয়াবহরুপ ধারণ করে ঠিক তখন নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়ার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রেরণ করা হয়। কিন্ত বাস্তবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সেখানে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছুই করনীয় নেই।

---

(১০) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৩-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য ১৯৯২ সালের ১৩ আগষ্ট জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়া-হার্জিগোভিনায় এাণ কার্যে বাধা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং একই সাথে এক প্রস্তাবের মাধ্যমে বসনিয়া-হার্জিগোভিনায় সার্ব বাহিনী কর্তৃক জাতিগোষ্ঠি নিধন এবং মানবাধিকার লংঘনের নিন্দা করে।

১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে সাইরাস ভ্যান্স এবং লর্ড ডেভিড ওয়েনের মধ্যস্থতায় লন্ডনে মুসলিম, ক্রোট এবং সার্বদের এক বৈঠক বসে। মধ্যস্থকারীগণ বসনিয়া-হার্জিগোভিনাকে গোষ্ঠিগত ভিত্তিতে ১০টি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক গোষ্ঠিকে তিন তিনটি ভাগ নেয়ার এবং রাজধানী সারাজেভোতে একটি যৌথ শাসন কায়েমের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব মূলত বসনিয়া-হার্জিগোভিনাকে ছিন্নভিন্ন করারই প্রস্তাব। তদুপরি সার্বিয়া দাবি করে যে সার্বিয়ার বাইরে অন্যান্য রিপাবলিকে অবস্থানকারী সার্বদের এই অধিকার থাকতে হবে যে তারা এক রিপাবলিকের পরিবর্তে অন্য রিপাবলিকের সাথে যুক্ত হয়ে বসবাস করতে পারবে। এই দাবি মেনে নেয়ার অর্থ হবে ক্রোয়েশিয়া এবং বসনিয়া-হার্জিগোভিনার সার্ব অধ্যুষিত এলাকাগুলো শেষাবধি সার্বিয়ার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া। মুসলমানগণ এ দাবি মেনে নিতে পারেনি।

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) বারবার জাতিসংঘের কাছে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কতিপয় ইউরোপীয় শক্তির বিরোধীতার কারণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি।[১১]

বসনিয়া-হার্জিগোভিনা প্রশ্নে বিভিন্ন শান্তি মিশন গঠিত হয়েছে এবং তারা শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে তৎপরতাও চালিয়েছে। কিন্তু সার্বিয়াকে আক্রমণকারী হিসেবে দায়ি করা এবং সার্ব ও ক্রোটদের জবরদস্তিকে নিন্দা করার পরিবর্তে আক্রমণকারীদেরকে পুরস্কৃত করার মনোভাবই পরিলক্ষিত হয়েছে এসব উদযোগে।

অর্থনীতি পরিচয়:- দেশের ৩৬ শতাংশ বনভুমি। খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ দেশ, প্রায়ই বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়। রাজধানী সারায়েভো শিল্পসমৃদ্ধ শহর। অন্যান্য শহর বানজা লুকা, মোস্তার, প্রিজেদোর, তুজলা, জেনিকা। কয়লা, লোহা, সীসা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইটের খনিতে সবচেয়ে বেশি লোক কাজ করে। কাপড়, তামাক, কাঠের আসবারপত্রের কারখানা আছে। দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যর অর্ধেকও উৎপন্ন হয়না। মাথাপিছু আয় ১৫৪০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান পরিচয়:- রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য কোন সংবিধান প্রবর্তিত হতে পারেনি। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রী প্রশাসন প্রধান। কোনো জাতীয় সংসদে গঠিত হতে পারেনি। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল পার্টি অফ ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি, মুসলিম বসনিয়ান অর্গাইজেশন। সার্বজনীন ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে, কর্মরত হলে ১৬ বছর বয়সে।

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক এর সাংবিধানিক নাম Central African Republic আয়তন- ৬,২২,৯৮০ বর্গকিমি (২,৪০,২৬০ বর্গমাইল) লোকসংখ্যা- ৪০ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশ। অধিবাসীরা সেন্ট্রাল আফ্রিকান নামে পরিচিত। অধিবাসীরা আশিটি আফ্রিকান উপজাতিতে বিভক্ত যার মধ্যে বায়া, বান্দা, সারা, মজিয়া প্রধান। ২৫ শতাংশ প্রোটেস্টান্ট, ২৫ শতাংশ ক্যাথলিক, ১৫ শতাংশ মুসলিম, অন্যরা আদিধর্মে বিশ্বাসী। সাক্ষর ৪৮.২ শতাংশ। গড় আয়ু ৩৯.৫ বছর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যাধিক, প্রতি নারীর ৫.৫ সন্তান সম্ভাবনা। সরকারী ভাষা ফরাসি, জাতীয় ভাষা সানঘো। আরবি, হুনসা, সোয়াহিলি ভাষাও প্রচলিত। রাজধানী বাঙ্গুই, প্রচলিত মুদ্রা- সিএফএফ্রাঁ।[১২]

ভৌগোলিক পরিচয়:- মধ্য আফ্রিকার প্রজাতন্ত্রের উত্তরে শাদ, পূর্বে সুদান, দক্ষিণে জায়ার ও কঙ্গো এবং পশ্চিমে ক্যামেরুন অবস্থিত। দেশটি[১৩] মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ দেশ। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিন-পশ্চিম দিক পবর্তময় মধ্যস্থল সমতল উপত্যকা। উত্তর থেকে দক্ষিণে নদী প্রবাহিত। উবাঙ্গি ও সারী নদী ছাড়াও কোট্রো ও এসবালি আছে। তবু দেশের ৮৭ শতাংশ লোক বিশুদ্ধ খাবার পানি পায় না। উত্তরদিক মরুভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিমে বনভূমি। কর্ষণযোগ্য জমি ৩ শতাংশ, বনভূমি ৬৪ শতাংশ।

ঐতিহাসিক পরিচয়:- ১৯০৫ সালে ফ্রান্সের উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনা প্রধান জা-বেদেল বোকাসা ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭২ সালে বোকাসা নিজেকে আমৃত্যু প্রেসিডেন্ট ও ১৯৭৭ সালে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন, দেশের নাম হয় সেন্ট্রাল আফ্রিকান এম্পায়ার। কিন্ত ১৯৭৯ সালে গদিচ্যুত হয়ে দেশত্যাগ করেন। ১৯৯১ সালে সংবিধান বাতিল করে সামরিক কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়।

অর্থনীতি পরিচয়:- দেশের ৫৪ শতাংশ লোক গ্রামবাসী ও কৃষিজীবি। মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ কৃষিপণ্য। রপ্তানির ৬০ শতাংশ কৃষিপণ্য ও ৩০ শতাংশ হীরা। রপ্তানী করে হীরা, তুলা, কফি, কাঠ, তামাক। আমদানি করে খাদ্যশস্য, বস্ত্র, পেট্রোলিয়াম, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। মোট জাতীয় আয় (জি ডি পি) ১৩০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২৬০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান পরিচয়:- সাধারণতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সাম্রাজ্য থেকে গণতন্ত্র পরিশেষে সামরিক শাসন কায়েম হয়। ১৯৮৬ সালের সংবিধান বাতিল হয়ে যায় । প্রেসিডেন্ট মুখ্য প্রশাসক, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা তার সহায়ক। সেন্ট্রাল আফ্রিকান ডেমোক্রেটিক র‍্যালি পার্টি (আরডিসি) একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। জাতীয় সংসদের ৫২ আসন, সবই আর ডি সি'র দখলে। ভোটাধিকার ২১ বছর বয়সে।

---

(১১) Europa (2004), V-I, Ibid, p.315
(১২) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২০০
(১৩) ভবেশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৮

Dhaka University Institutional Repository

থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ড এর সাংবিধানিক নাম Kingdom of Thailand দেশটির আয়তন -৫,১৩,১১৫ বর্গ কিমি (১,৯৮,১০৮ বর্গমাইল) লোকসংখ্যা-৬ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৫৫০২।[১৪] জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৮ শতাংশ। অধিবাসীরা থাই (তাই) নামে পরিচিতি। থাই ৭৫ শতাংশ, চীনা ১৪ শতাংশ, অন্যান্য ১১ শতাংশ। ৯৫ শতাংশ বৌদ্ধ, মুসলিম ৩.৮ শতাংশ, খৃষ্টধর্মী ০.৫ শতাংশ, হিন্দু ০.১ শতাংশ, অন্যান্য ০.৬ শতাংশ। সাক্ষর ৯৫.৭ শতাংশ। আয়ু ৬৯.৩ বছর। সরকারী ভাষা থাই, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি। প্রচিলত মুদ্র- বাথ।[১৫]

ভৌগালিক পরিচয়- থাইল্যান্ডের পশ্চিমে মায়ানমার। উত্তর-পূর্বে লাউস এবং দক্ষিণ-পুর্বে কম্বোডিয়া, দেশটির দক্ষিমাংশের পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে মালয়েশিয়া এবং পূর্বে থাই উপসাগর।[১৬] দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পর্বতময় দেশ। উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় শুস্ক উপত্যকা, মধ্যাঞ্চল উর্বর। প্রধান নদীর মধ্যে আছে চাওপ্রায়, মেকং, সালাউইন। প্রাকৃতিক সম্পর্দে সমৃদ্ধ দেশ, কর্ষণযোগ্য জমি দেশের ৩৪ শতাংশ। ৩০ শতাংশ বন। রাজধানী ব্যাংক চাওপ্রায় নদীর তীরে অবস্থিত শিল্পসমৃদ্ধ শহর ও বন্দর। অন্যান্য শহর চিয়াইংমাই, নদী তীরবর্তী বন্দর শহর নাখোন সায়ন।

ঐতিহাসিক পরিচয়- প্রাচীন সুসভ্য দেশ। ১৮৯৬ সালে বৃটেন-ফ্রান্স মতৈক্য অনুসারে বর্তমান থাইল্যান্ডের সীমানা সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪১ সালে থাইল্যান্ডে জাপানের দখল কায়েম হয় ও ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এক সময় থাইল্যান্ডের নাম ছিল শ্যামদেশ, ১৯৩৯ সালে বদল করে রাখা হয় থাইল্যান্ড। বর্তমান রাজা ভুমিবল অতুল্যতেজ ১৯৪৬ সাল থেকে রাজত্ব করছেন। শাসনব্যবস্থায় বহু উত্থানপতন হলেও রাজতন্ত্র অটুট আছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।

অর্থনীতি পরিচয় - দ্রুত উন্নয়শীল দেশ। বছরে ১১ শতাংশ উন্নয়ন ঘটেছে ১৯৮৭-৯০ সালে। পরে তা হ্রাস পেলেও থাইল্যান্ডের সমৃদ্ধির অভিযান অব্যাহত আছে। একদা কৃষিই ছিল জাতীয় উৎপাদনের বড় অঙ্ক, এখন তা হ্রাস পেয়ে মাত্র ২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যদিও দেশের ৬০ শতাংশ শ্রমজীবি কৃষিকাজে লিপ্ত। রপ্তানির মধ্যে প্রধান কৃষিপণ্য চাল ট্যাপিওকা। অন্যান্য ফসল রবার, ভূট্টা, আখ, নারকেল, সয়াবিন। একমাত্র গম ছাড়া অন্য সব খাদ্যশস্য থাইল্যান্ডে যথেষ্ট জন্মায়। পর্যটন খুব উন্নত এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান সূত্র। এছাড়া বস্ত্র, পোষাক, সিমেন্ট, ছোট যন্ত্রপাতি, বিদ্যুত সরঞ্জার প্রভৃতি রপ্তানি হয়। থাইল্যান্ড টাংষ্টেন উৎপাদনে বিশ্ব দ্বিতীয়, টিন উৎপাদনে তৃতীয়। কলকারখানা ও খনিজ কাজে দেশের ১৩ শতাংশ লোক নিযুক্ত।

(১৪) ৬ কোটি ৮২ লক্ষ জনসংখ্যা বলে কেহ কেহ উল্লেখ করেন ভবেশ রায়, রাষ্ট্রকোষ)
(১৫) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১১১
(১৬) ভবেশ রায়, পূর্বেক্ত, পৃ.৯৬

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় উৎপাদনের ২৫ শতাংশ আসে শিল্প ও খনিজ পদার্থ থেকে। মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ৯,২৬০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২১৯০ ডলার।[১৭]

প্রশাসন ও সংবিধান পরিচয়-বর্তমানে ১৯৭৮ সালের গৃহীত সংবিধান বলবৎ রয়েছে।[১৮] নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, তবে বারবার সামরিক হস্তক্ষেপে বহুদলীয় গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারেনি। নতুন সংবিধানে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। রাজা, প্রধানমন্ত্রী, তিনজন সহকারী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ-রথসথ (Rathasatha) নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর সদস্য সংখ্যা ৩৬০। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আছে জাষ্টিস ইউনিটি পার্টি (সমক্কি তাম), টাট থাই পার্টি, সলিজারিটি পার্টি, থাই সিটিজেন্স পার্টি। ভোটাধিকার ২১ বছর বয়সে।

রাশিয়া

রাশিয়া এর সাংবিধানিক নাম Russian Kays এবং ইংরেজিতে Russian Federation আয়তন- ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গ কিমি (৬৫,৯১,১০০ বর্গমাইল) লোকসংখ্যা- প্রায় ১৪ কোটি ৩৭ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৭ শতাংশ। অধিবাসীরা রাশিয়ান নামে পরিচিতি। তারা মুখ্যত রাশিয়ান তবে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রিপাবলিকের লোকও স্থায়ীভাবে রাশিয়ায় বসবাস করে। যারা ধর্মবিশ্বাসী তারা সকলেই অর্থোডক্স চার্চের অনুগত। গড় আয়ু ৬৬.৮ বছর। সাক্ষরতা ৯৯.৬ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা রাশিয়ান। রাজধানী মস্কো শিল্পসমৃদ্ধ শহর, Moskva নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৯২ লক্ষ। রাশিয়ার পশ্চিমভাগে অবস্থিত মস্কো শহর থেকে রাশিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর সেন্ট পিটার্সবুর্গ ৬৪০ কিমি/৪০০ মাইল উত্তরে প্রায় রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত অবস্থিত। সেন্ট পিটার্সবুর্গের পুর্ব নাম লেনিনগ্রাদ, ১৯৯১ সালের জুন মাসে শহরের অধিবাসীরা ৫৫-৪৩ শতাংশ ভোটে লেনিনগ্রাদ নাম বাতিল করে পূর্বনাম সেন্ট পিটার্সবুর্গ গ্রহণ করে। লোকসংখ্যা ৬১ লক্ষ ২৩ হাজার। প্রচলিত মুদ্রা- রুবল।[১৯]

ভৌগোলিক পরিচয়:- বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্র রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত বেরিং প্রণালী ও পশ্চিম সীমান্ত বাল্টিক সাগর স্পর্শ করেছে। উর্বর কালো মাটি, ব্যাপক বনভূমি ও উরাল পার্বত্য অঞ্চলে নানা খনিজ পদার্থ রাশিয়ার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রাশিয়া এগারোটি টাইম জোনে বিভক্ত। বিস্তীর্ণ সাইবেরিয়া অঞ্চল অত্যাধিক তুষারপাতের জন্য অনুন্নত। আয়তনে বৃহত্তম দেশ হলেও লোকসংখ্যায় ষষ্ঠ স্থানে। চীন, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিলের পরে অবস্থান।

---

(১৭) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১১১
(১৮) ভবেশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৬
(১৯) হারুনার রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭০

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পরিচয়:- রাশিয়ান রাজ্যটি প্রথমে নবম শতাব্দীতে কিয়েভে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩শ শতাব্দীতে মোঙ্গলীয় রাশিয়া দখল করে নেয়। ১৪৮০ সাল মোঙ্গলদেরকে রাশিয়ান অঞ্চল থেকে বিতারিত করা হয়। ১৫৪৭ সালে দুর্ধর্ষ ইভান নিজেকে রাশিয়ার প্রথম জার হিসেবে ঘোষণা করে। ১৬৮২ সালে পিটার দি গ্রেট' রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে রাশিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে জার সাম্রাজ্যের শাসনামল। ১৮৬০ সালে জার আলেকজান্ডার প্রথম জার সাম্রাজ্যে বিচার বিভাগ, শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকারগুলোর স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্ব্ পূর্ণ সংস্কারমুলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা জার সাম্রাজ্যের ভীতকে অনেকাংশে নাড়া দিয়েছিল। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় দেখা দেয় বিপ্লব এবং এর ফলে রাশিয়ান শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে রাশিয়ার কলকারখানাগুলোতে দীর্ঘ মেয়াদী ধর্মঘট শুরু হয়। ৭ নভেম্বর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ান কমিউনিষ্টদের অভ্যুত্থান ঘটে এবং দ্বিতীয় জার নিকলাস ইউনিয়ন গঠন করেন আটটি প্রজাতন্ত্র নিয়ে, অতপর ১৯২৪ সালে লেলিনের মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় আসেন ষ্ট্যালিন এবং তিনি আরও তিনটি প্রজাতন্ত্রকে সংযুক্ত করে ইউনিয়নকে বিস্তৃত করেন।

১৯৫৩ সালে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে নিকতা ক্রুশেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতায় আসার পরে ষ্ট্যালিন আমলের কঠোরনীতি অনেকাংশে রহিত করেন এবং বিশ্ব রাজনীতিতে শন্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Cooxtistence) নীতির প্রবর্তন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক স্বাভাবিক করনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে ক্ষমতায় আসেন মিখাইল গর্বাচেভ। গর্বাভেচ ক্ষমতায় আসার পরে সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমুল সংস্কার সাধিত হয়। তিনি গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রয়েকা নামক খোলানীতি ও সংস্কারমুলক নীতি গ্রহণ করেন যা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভীষণভাবে আঘাত হানে। সমাজতন্ত্র বিরোধী নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পরিত্যাগ করে গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়।[২০] এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন ঠেকাতে গর্বাচেভ ১৯৯১ সালের প্রথম দিকে একটি বিশেষ উদযোগ গ্রহণ করেন। তিনি সহজ ও নমনীয় পদ্ধতির একটি ইউনিয়ন গঠনের পদক্ষেপ নেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে একটি নতুন ইউনিয়ন চুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।

লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ছাড়া অন্যাণ্য প্রজাতন্ত্রগুলো এই চুক্তিকে স্বাক্ষর করতে ও তা মেনে নিতে সম্মত হয়।

---

(২০) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৮-৩৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ক্রাভচুক এবং বাইলোরাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ষ্টানিস্লাভ শুস্কেভিচ পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী বাইলোরাশিয়ার ডাশা শহরে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কমনওয়েলথ গঠনের জন্য ইস্তেহারে স্বাক্ষর করেন।[২১] প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের নেতৃত্বে ১৯৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমা-আতায় মিলিত হয়ে ১১টি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসমুহের কমনওয়েলথ CIS গঠন অনুমোদন করেন। রাশিয়া হচ্ছে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তিত মুল রাষ্ট্র। প্রাক্তন সোভিয়েতের সম্পত্তি ও সেনাবাহিনীর ওপর রাশিয়ার একক কর্তৃত্ব রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে জনগণের ভোটে পুনর্নির্বাচিত হয়ে ইলেলৎসিন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাশিয়াকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। ১৯৯১ সালের ২৪ আগষ্ট রাশিয়ার স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষিত হয়।

অর্থনীতি পরিচয়:- সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি বাতিল হওয়ার পর ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিপনন অর্থনীতি কায়েম হয়েছে। তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, সোনা, প্লাটিনাম প্রভৃতি খনিজ পদার্থর বিশাল ভান্ডার আছে রাশিয়ায়। তবে প্রচন্ড শীত ও দূরত্বের জন্য সব খনিজ পদার্থের যথাযথ ব্যবহার হয় না।কয়লা ও লোহা যথেষ্ট পাওয়া যায় তাই ইস্পাত উৎপাদনে জাপানের পরেই রাশিয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় দেশ। রাসায়নিক, নির্মাণের সরঞ্জাম, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও খাদ্য প্রস্তুতিতেও রাশিয়া অগ্রনী দেশ। তবে সোভিয়েত আমলে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন উপেক্ষিত ছিল, তার অভাব এখনও আছে।[২২] রাশিয়া রপ্তানি করে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, শস্য, মাংস প্রভৃতি। মাথা পিছু আয় ২,৬১০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান পরিচয়:- প্রেসিডেন্ট, সিকিউরিটি কাউন্সিল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট প্রধান শাসক, যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিলের বিশেষ ক্ষমতা তার আছে। প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদ ডুমা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট কংগ্রেস অফ পিপলস ডেপুটিজ, সুপ্রিম সোভিয়েত। রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক রাশিয়া, ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ রাশিয়া, পিপলস পার্টি অফ ফ্রি রাশিয়া। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির একাধিপত্য চলে যাওয়ার পর কোন সুসংহত রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

(২১) পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬০
(২২) হারুনার রশিদ ভূইয়া ও আব্দুল হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : ওআইসি'র সম্মেলনসমূহ ও কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : ওআইসি'র সম্মেলনসমূহ ও কার্যক্রম

কোন সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ণের জন্য সে সংস্থার নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্তাবলীর উপস্থাপনা এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন। ওআইসির কার্যক্রম মূল্যায়ণের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের ব্যত্তয় করা হয়নি। তবে কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উদাহরণ হিসেবে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ কয়েকটি সংক্ষিপ্তভাবে এবং শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা সমূহের মধ্যে থেকে কয়েকটির উল্লেখ করা হল। সামগ্রীক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে পুরো অভিসন্দর্ভ বিবেচিত হবে। কারণ যেখানে যেটুকু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন তা ইতোপূর্বে এবং পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের কয়েকটি ঘোষনা এবং রাষ্ট্র প্রধানদের বক্তব্য হতে একজন প্রধানমন্ত্রীর দোহা সম্মেলনের বক্তব্য উল্লেখ পূর্বক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস চালানু হয়েছে।

৫.১. ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের[১] সিদ্ধান্ত সমূহ

প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ২২-২৬ মার্চ, ১৯৭০। স্থান ঃ জেদ্দা, সৌদী আরব। সিদ্ধান্তঃ পাকিস্তানের প্রস্তাবক্রমে সম্মেলন ইসলামী দেশগুলোর যোগাযোগ সহজতর করার পক্ষে একটি স্থায়ী সচিবালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তনেয়, যার অস্থায়ী অফিস হবে জেদ্দায়। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমানকে দু'বছরের জন্য সেক্রেটারী জেনারেল মনোনয়ন প্রদান করা হয়। মুসলিম রাজধানী শহরগুলোতে পি.এল.ও. অফিস খোলার সুবিধাসহ রাজনৈতিক, আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দানের জন্য সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়।

দ্বিতীয় পরারাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ২৬-২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০। স্থান ঃ করাচী, পাকিস্তান। সিদ্ধান্তঃ সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে টুংকু আবদুর রহমানের স্থায়ী নিযুক্তি। সচিবালয়ের ব্যয় বহনের জন্য ৪,৫০,০০০ ডলারের ফান্ড নির্ধারণ। ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী সংবাদ সংস্থা স্থাপন। কায়রো এবং আম্মান চুক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য পি.এল,ও এবং জর্দানের প্রতি আহবান। গিনিতে পুর্তুগীজ আগ্রাসনের নিন্দা জানানো হয়।

তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী-৪ মার্চ, ১৯৭২ স্থান ঃ জেদ্দা, সৌদী আরব। সিদ্ধান্তঃ মূল আলোচনা ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির উপরই কেন্দ্রীভূত থাকে। সম্মেলনে জেদ্দায় ইসলামিক 'নিউজ এজেন্সী' স্থাপনের ব্যাপারে আরো অগ্রসর হয়।

---

(১) সাজ্জাদ হোসাইন খান, ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ সত্তর থেকে চুরাশি, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, তেইশ বর্ষঃ চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন-১৯৮৪, ঢাকা, পৃ-৫৪৪-৫৪৯. এবং www.oic-oci.org.com.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ২৪-২৭ মার্চ, ১৯৭৩। স্থান ঃ বেনগাজী, লিবিয়া। সিদ্ধান্তঃ সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়নের প্রেক্ষিতে ইসলামী দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের জন্য সদস্য দেশ-গুলোকে আহবান জানানো হয়। ফিলিপাইনের মুসলমানদের অবস্থা সরে-যমীনে তদন্তের জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাতের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব হাসান তোহামিকে সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে টুংকু আবদুর রহমানের স্থলবর্তীকরণ করা হয়।

পঞ্চম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ২১-২৫ জুন ১৯৭৪। স্থান ঃ কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া। সিদ্ধান্ত ঃ সম্মেলনে চূড়ান্তইশতেহার ছাড়াও অতিরিক্ত ১৮টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। লেবাননে ইসরাইলী আক্রমণের নিন্দা করা হয়। ইসরাইলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপসহ পবিত্র শহর জেরুজালেমকে আরবীয় সার্বভৌমত্ব হস্তান্তড়রের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানানো হয়। জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিকীকরণের অভিসন্ধি প্রত্যাখ্যান করা হয়। পি.এল.ও.কে ফিলিস্তিনী জনগণের বৈধ প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ফিলিফাইনের মুসলমানদের উপর সবরকম অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে সমস্যার সমাধানকল্পে 'মরো মুক্তি ফ্রন্টের' সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য ফিলিপাইন সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। ইসলামিক সলিডারিটী ফান্ড-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ষষ্ঠ পরারাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ১২-১৬ জুলাই, ১৯৭৫। স্থান ঃ জেদ্দা, স্ৌদী আরব। সিদ্ধান্তঃ সম্মেলনের চূড়ান্তইশতেহারে ইসলাইলের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করে। সিরিয়া এবং পি.এল.ও'র প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ, ইসলাইলের সাথে সকল ইসলামী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কচ্ছেদ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফিলিস্তিনী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন পুণঘোষণা করা হয়। অধিকৃত এলাকায় ইসরাইলের মানবাধিকার লংঘনের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। জেরুজালেম সম্পর্কিত পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইসরাইলের প্রতি মার্কিনীদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার নিন্দা করা হয়। প্রথমবারের মত সাইপ্রাস সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন ও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সপ্তম পরারাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ১২-১৫ মে, ১৯৭৬। স্থান ঃ ইস্তাম্বুল, তুরস্ক। সিদ্ধান্তঃ জাতিসংঘ থেকে ইসরাইলকে বহিস্কারের ব্যাপারে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্তেঅটল থাকা এবং ফিলিস্তিনী জনগণ ও আরব দেশগুলোর প্রতি সমর্থন পুনঘোষণা করা হয়। জেরুজালেম সংক্রান্ততহবিল গঠিত হয়। সাইপ্রিয়ট মুসলিম কমিউনিটিকে আগামী কোন ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণের আহবান জানানো হয় (কিন্ত পর্যবেক্ষকের পদমর্যাদা না দেয়া) দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া এবং ইসরাইলের মত বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতার নিন্দা করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ইসলামী দেশগুলের নৈতিক এবং বৈষয়িক সমর্থন বৃদ্ধির আহবান জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ১৬-২২ মে, ১৯৭৭। স্থান ঃ ত্রিপোলী, লিবিয়া। সিদ্ধান্তঃ জাতিসংঘ থেকে ইসরাইলকে বহিষ্কারের ব্যাপারে মন্ত্রিগণ তাঁদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তেঅটল থাকে। দক্ষিণ ফিলিপাইনের সংগ্রামী মুসলমানদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি 'মরো মুক্তি ফ্রন্ট' যা ফিলিপাইন সরকারের সাথে আলোচনায় বসার অধিকার রাখে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। য়াহুদী রাষ্ট্রের সাথে প্রতিটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহবান জানানো হয়। ফিলিস্তীনের উপর ডাক-টিকিট প্রকাশের ব্যাপারে ইসলামী দেশগুলোর প্রতি প্রস্তাব করা হয়। জাতিসংঘ থেকে পাঁচটি স্থায়ী ভেটো শক্তি বিলোপের ব্যাপারে লিবিয়ার প্রস্তাবেব প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে আহমদ করিম গাইয়েকে পুনর্নির্বাচন করা হয়।

নবম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ২৪-২৮ এপ্রিল, ১৯৭৮। স্থান ঃ ডাকার, সেনেগাল। সিদ্ধান্তঃ মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তেদৃঢ় অবস্থানসহ পি.এলওর অধিকারের প্রতি পুনঃ সমর্থন জানানো হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে মোজাম্বিক, জাম্বিয়া ও বতসোয়ানা সরকার ও জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থণ দান করা হয়। একটি ইসলামী নগর সংস্থা স্থাপনের ব্যাপারে মতৈক্য উপনীত হয়।

দশম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ৮-১২ মে, ১৯৭৯। স্থান ঃ ফেজ, মরক্কো। সিদ্ধান্তঃ মিশর-ইসরাইল শান্তিড়-বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে কেন্দ্রীভূত থাকে। মিসরের সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্তগৃহীত হয়। এ বিষয়ে বত্রিশটি দেশের সিদ্ধান্তেড়র পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পঁচাত্তরটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ফিলিপাইনের মুসলমানদের জিহাদের সাহায্যার্থে বিশেষ তহবিল গঠনের ব্যাপারে মতৈক্য উপনীত হয়।

একাদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ১৭-২০ মে, ১৯৮০। স্থান ঃ ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। সিদ্ধান্তঃ আফগানিস্তানে রুশীয় আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে মস্কোর সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে সেক্রেটারী জেনারেল হাবিব শান্তিএবং পাকিস্তান ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। জেরুজালেমে য়াহূদীবাদের অনুপ্রবেশ এবং তাকে তাদের রাজধানী ঘোষণায় উদ্ভূত সমস্যার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ বৈঠক ডাকার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানানো হয়। ইসলামী দেশগুলোর সাথে কোন প্রকার মতপার্থক্য দেখা দিলে তার ত্বরিত নিরসনের লক্ষ্যে বার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বাদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ১-৫ জুন, ১৯৮১। স্থান ঃ বাগদাদ, ইরাক। সিদ্ধান্তঃ ফিলিস্তিনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ জন্মভূমির মাটিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নতুন প্রস্তাব পাশ করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানানো হয়। ফিলিস্তিনী জনগণের সম্মানে ২১ আগষ্টকে ইসলামী সংহতি দিবস ঘোষণা করা হয়। ফিলিস্তিনী সংগ্রামকে জিহাদ বলে ঘোষণা করা হয়। ইসরাইলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজধানীগুলোতে পি.এলও.কে কূটনৈতিক মর্যাদা প্রদানের জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আবেদন জানানো হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ও নামিবিয়ার নির্যাতিত

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের বৈধ সংগ্রামের প্রতি আন্তড়রিক সমর্থনসহ দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠী এবং ইসরাইলী সহযোগিদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

চতুর্দশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ঃ ৬-১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ । স্থান ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। সিদ্ধান্তঃ আরব ভূমি থেকে ইসরাইলকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য করার জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহবানসহ আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী পেশ করা হয়। বেনিনকে ইসলামী সংস্থার পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করা হয়। [এর আগে বেনিনের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ছিল]। ঢাকার কারিগরি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের জন্য পঞ্চাশ লাখ ডলারের বাজেট অনুমোদন দেয়া হয়। 'সাহেল' সমস্যার উপর প্রস্তাব গৃহীত এবং সেসব দেশের সাহায্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রশাসক ও অর্থবিষয়ক এবং সংস্কৃতি ও ইসলাম বিষয়ক কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। আন্তর্র্জাতিক ইসলামী আদালতের সংবিধান পরীক্ষা করে দেখা হয়। ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পঞ্চাদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ১২-২২ ডিসেম্বর ১৯৮৪। স্থান- যানা, ইয়েমেন। সিদ্ধান্তঃ সম্মেলনে তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের ১১/৩- ORG(IS) নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়। ওআইসি এবং এর অঙ্গ সংগঠন ও বিশেযায়িত সংস্থা সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদন করা হয়।

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তঃ সম্মেলনে সিদ্ধান্তগৃহীত হয় যে, মুসলিম বিশ্ব ও আরব ইসরাইল সংঘর্ষের মূল কারণ হল ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এতদ্ অঞ্চলের শান্তিস্থাপনের লক্ষে ফিলিস্তিন এবং আবর বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের যে সকল স্থান ইসরাইল দখল করেছে ইসরাইলকে তা পরিত্যাগ করতে হবে। ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বাধীন ফিলিস্তান রাষ্ট্র এবং আল কুদ্দসকে রাজধানী বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। পি.এ.ল ও হল ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ও জনগণের বৈধ প্রতিনিধি। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২/১৯৬৭ নং সিদ্ধান্তফিলিস্তিনী এবং আরব বিশ্বের অধিকার বাস্তবায়নে যথেষ্ট নয়। ফিলিস্তিনী জনগণকে তাদের দেশের শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার বাস্তব এবং নৈতিক সমর্থন প্রদানের বিষয়ে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে Fez Peace Plan বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়। ইরাক ও ইরানের যুদ্ধের শান্তিড়পূর্ণ দ্রুত সমাধানের বিষয়ে সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যমত হয়। Islamic Peace committe গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্তহয়। লেবাননের আন্তর্জাতিক বাউন্ডারী এবং দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পুনরায় স্বীকৃতি অটুট রাখার বিষয়ে সকলে একমত হয়। লেবাননের ভূখন্ডে ইসরাইলের দখলদারিত্বের অবসানের বিষয়ে সম্মেলনে গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতিসংঘের মাধ্যমে একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহবানের মাধ্যমে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়াকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত এলাকা ঘোষণার আহবান জানানো হয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নিন্দা এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান পরিস্কার করা হয়। সম্মেলনে ময়টো দ্বীপের উপর কমোরূস ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বহার থাকার বিষয়ে সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার জনগণের বৈধ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইউনেস্কোর কার্যালয়কে সমর্থন দান করা হয়। আফ্রিকান অনাবৃষ্টি অধ্যুষিত ১০টি দেশে জরুরী খাদ্য সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।

আর্থিক এবং সামাজিক সিদ্ধান্তঃ ১৯৮০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সম্মেলনে স্বল্প উন্নত দেশগুলোর (Least Development Countries) উন্নয়নের বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্তগৃহীত হয় OIC-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে সকল সদস্য স্বল্প উন্নত, তাদের সমস্যাবলীর বিষয়ে মনোযোগ প্রদানের জন্য OIC মহাসচিবের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।

সম্মেলনে সমুদ্র বন্দরহীন সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমস্যার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে UNCTAD-এর সিদ্ধান্তবাস্তবায়নে জোর সুপারিশ করে। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ইয়ামেনের পুর্নগঠনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশেষায়িত সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে জোর সুপারিশ করা হয়।

অনাবৃষ্টি ও মরুঅঞ্চলের উন্নয়নের জন্য OIC-এর বিষেশায়ির সংস্থা সমূহকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। এ বিষয়ে জাতিসংঘের ৩৯ তম সাধারণ পরিষদের ৩/১২/৮৪ নং রেজুলেশন কার্যকরীপূর্বক আফ্রিকার আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। Islamic Cresent Association (ICA)-এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। তুরস্কে ICA এর সদর দপ্তর স্থাপনের বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয়। Islamic States Tele Communication Union এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। পাকিস্তানে এর সদর দপ্তর স্থাপনের বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করা হয়।

ইসলামিক সংহতি তহবিল এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক সিদ্ধান্তঃ সম্মেলনে সকল বিশেষায়িত সংস্থার প্রতি ইসলামী সংহতি তহবিলের বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। International Islamic University In Malaysia, Islamic University In Bangladesh, Regional Institute of Complementary Studies In Pakistan, Regional Institute of Islamic Studies and Researed In Timbuctu, Islamic Translation Institute in Khartoum এবং Zitouna Faculty of Sharia and Usul-Al-Din in Tunis এর বিষয়ে বাস্তব এবং নৈতিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল সদস্য ও বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের প্রতি আহবান জানানো হয়।

Islamci Education Scientific and Cultural Organisation (ISESCO) এর কার্যক্রমের প্রশাংসা করা হয়। এর প্রতি সমর্থন পূর্ণব্যক্ত করে এখনো যেসকল রাষ্ট্র ISESCO-তে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

ষষ্টদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ ৬-১০ জানুয়ারী ১৯৮৬। স্থান ফৈজ, মরক্কো। উপস্থিতি ঃ ৪৩টি দেশ, পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করে তুর্কি সাইপ্রাস, মরো লিবারেশন ফ্রন্ট, জাতিসংঘ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, আরবলীগ, জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

(FAO), জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR), আরব শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (ALESCO), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF), ফিলিস্তিনি জনগণের অলঙ্ঘনীয় অধিকার প্রয়োগ বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটি, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি (UNDP), জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO), জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ণ সম্মেলন (UNCTAD) এছাড়া OIC এর বিশেষায়িত সংস্থা ও অধিভুক্ত সংস্থা সমূহ। সম্মেলন শেষে লিবিয়ার জনগনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয় এবং একটি বিবৃতি প্রদান করা হয়। লিবিয়ার অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং ইহুদীবাদের আক্রমন থেকে লিবিয়ার জনগণকে মুক্ত রাখার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়, নতুবা আন্তর্জাতিক শান্তিএবং নিরাপত্তা বিনষ্ট হতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সপ্তদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ- ২১-২৫ মার্চ, ১৯৮৮। স্থান-আম্মান, জর্ডান। উপস্থিত- ৪৫টি দেশ। ইরান অনুপস্থিত ছিল। পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করে তুর্কি সাইপ্রাস, মরু ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। আন্তর্জাতিক সংস্থা- জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, আরব লীগ, জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNISCO), জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCA), আরব শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (ALESCO), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF), ফিলিস্তিনি জনগণের অলঙ্ঘনীয় অধিকার প্রয়োগ বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটি, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি (UNDP) জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO), জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ণ সম্মেলন (UNCTAD) এছাড়া ওআইসি-এর বিশেষায়িত এবং অধিভূক্ত সংস্থাসমূহ, অতিথি হিসেবে আফগান মুজাহিদ্দীন।

সিদ্ধান্ত- ওআইসি এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলো যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের দেশের আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো এবং বিভিন্ন গ্রুফের সমন্বয়ে ডায়ালগ এর ব্যবস্থা করবে। ইরানকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮ নং সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সম্মেলন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে মর্মে অভিসন্দর্ভ জানানো হয়।

অষ্টদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ-১৩-১৬ মার্চ ১৯৮৯। স্থান-রিয়াদ, স্ৌদি আরব। উপস্থিতি- ৪৬টি দেশ। আফগান মুজাহিদ্দীন আফগানিদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে। পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিল তুর্কি কিবরিস কমিউনিটি, মরু ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, রাবেতা আলম আল ইসলামী, জমিয়তে দাওয়া আল ইসলামিয়া, আন্তর্জাতিক ইসলামিক ব্যাংক এসোসিয়েশন, ইসলামিক কাউন্সিল অফ ইউরোপ, ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেস, ওয়াল্ড ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল আরব ইসলামিক স্কুল, ওয়াল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইউথ (ওয়ামী) রিয়াদ, লীগ অব ইসলামিক ইউনিভারসিটি, জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, আরবলীগ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, আরব রাষ্ট্রসমূহের উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ, UNHCR UNCEIRP, UNDP,

Dhaka University Institutional Repository

সাহেল আন্তঃরাষ্ট্রীয় অনাবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ কমিটি (CILSS) ALECSO, আরব ব্যাংক ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইন আফ্রিকা (BADEA)

সিদ্ধান্ত- পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন এবং সুন্নাহ ইসলামিক সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মূলভিত্তি। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং এর বিশেষায়িত অধিভূক্ত সংস্থাসমূহের কাঠামোর মধ্যে যৌথ ইসলামিক কার্যক্রমের মূলভিত্তিও পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ।

উনবিংশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ-৩১ জুলাই হতে ৫ আগষ্ট ১৯৯০। স্থান- কায়রো, মিশর। উপস্থিতি- ৪৫টি দেশ উপস্থিত ছিল। পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিল মোজাম্বিক (মোজাম্বিক তখনো ওআইসি'র সদস্য হয়নি)

সিদ্ধান্ত- সম্মেলনে ফিলিস্তিন ইস্যু, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগানিস্তানের সমস্যা, লেবানন, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন আনাসে কানাসে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থা এবং জম্মু কাশ্মির দ্বন্ধ নিয়ে আলোকপাত করা হয়। সম্মেলনে ওআইসি এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলোকে ইসলামিক সহযোগিতা ও সংহতি জোড়দার করনের লক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই লক্ষে মক্কা ঘোষনার বাস্তবায়ন এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক সহযোগিতা জোরদারকরণ বিষয়ক তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের জন্য ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

আটত্রিশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ঃ তারিখ-২৮-৩০ জুন, ২০১১। স্থান- এসটানা-কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্র। এসটানা ঘোষনা ঃ আমরা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্য দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিনিধিদল প্রধানরা মুসলিম তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের ধারক এক গতিশীল পরিবর্তনের অধ্যায়ে এসটানায় অনুষ্টিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের আটত্রিশতম অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করছি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের এই বৈঠকের বাড়তি তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঘোষণা করছিঃ

১। আমরা মুসলিম উম্মাহ তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য শান্তি, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার মতো মূল্যবোধগুলির ধারক আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সুমহান নীতিমালার প্রতি আমাদের নিবেদিত প্রাণ ভূমিকা পুর্নব্যক্ত করছি এবং বিশ্বজুড়ে শান্তি, সহযোগিতা ও উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করছি।

২। আমরা ওআইসিতে (OIC) নতুন গতি সঞ্চারিত করতে এবং আমাদের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ও মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন দৃষ্টিকল্প লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে এই সংস্থাকে জোরদার করতে বদ্ধপরিকর। মুসলিম বিশ্বের আজ সংস্কার, সুশাসন ও মানবাধিকার এমনভাবে প্রয়োজন যাতে একবিংশ শতাব্দীর আশা আকাঙ্খা পূরণ হয়। এই প্রেক্ষাপটের মধ্যে আমরা এই সংস্থাকে একটি নতুন প্রতীকসহ 'ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা' এই নতুন নামে অধিকতর সুসংহত ও কার্যকর সংস্থায় রূপান্তরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

৩। আমরা উম্মাহর কল্যাণ সাধন এবং এ যুগের উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখা এই উভয় ক্ষেত্রে ওআইসির দশ বছরের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছি। আমরা ২০১০ সনের ৪-৬ ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওআইসির দশ বছর মেয়াদী কার্যক্রম এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ওআইসির ১৪৪১ হিজরীর কল্পদৃষ্টি বাস্তবায়নের উপর মধ্য মেয়াদী পর্যালোচনা বৈঠকের সুপারিশমালা স্বরণ করছি এবং সেই কারণে এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমের অধিকতর উন্নয়নের প্রয়োজনীতার উপর গুরুত্ব আরোপ করছি।

৪। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ উম্মোচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের মুসলিম উম্মাহর সামনে যেসব চ্যালেঞ্জের আবির্ভাব ঘটছে আমরা তা স্বীকার করি। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে গঠনমূলক সংলাপ ও কাজে নিয়োজিত হওয়ার আহবান জানাই। ওআইসি সনদের চেতনায় আমরা অন্যান্য সংস্থার মধ্যে ওআইসির মাধ্যমে করবো যাতে করে শান্তি, সহযোগিতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা, সুশাসন, গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এইসব চ্যালেঞ্জকে আমাদের জনগনের জীবনমান উন্নয়নের সুযোগে রূপান্তরিত করা যায়।

৫। আমরা ফিলিস্তিনী সমস্যার আসু সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা পুনরুল্লেখ করছি এবং আরব ইসরাইলী সংঘাতের স্থায়ী, সর্বাঙ্গীন ও ন্যায়সংগত সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আরব শান্তি উদ্যোগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা ফিলিস্তিন জাতীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গঠনের তাৎপর্যপুর্ণ উদ্যোগের প্রশংসা করি এবং এক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিকে মেনে নিতে এবং ১৯৬৭ সালের ৪ জুনের সীমান্তের ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে বিশ্ব সমাজের প্রতি আহবান জানাই।

৬। আমরা ফিলিস্তিন ভূখন্ডে ইসরাইলের বসতি নির্মান ও সম্প্রসারণের তীব্র নিন্দা জানাই। কারণ এটা আন্তর্জাতিক আইনের নগ্ন লঙ্ঘন এবং ১৯৬৭ সালে থেকে ইসরাইলী অধিকৃত ফিলিস্তিনী ভুখন্ডে ইসরাইলী দখলকারী অবসানের আলোচনা পুনরায় শুরু করার পথে অন্তরায়। আমরা আরব ইসরাইলী সংঘাত সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রাসঙ্গিক সব প্রস্তাব, বিশেষ করে ২৪২, ৩৩৮, ৪২৫, ১৫১৫ ও ১৮৬০ নম্বর প্রস্তাব বাস্তবায়নের আহবান জানাই। আমরা অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের আরব ও ইসলামী চরিত্র পরিবর্তন, জনসংখ্যা গঠন বদলে ফেলা এবং চারপাশের ফিলিস্তিনী এলাকা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার লক্ষ্যে বেআইনি ইসরাইলী নীতি ও কার্যকলাপের নিন্দা জানাই। আমরা এ ব্যাপারে আল কুদস কমিটির চেয়ারম্যান মহামান্য বাদশাহ ষষ্ঠ মোহামেদের উদ্যোগ এবং সেই সাথে জর্দানের মহামান্য বাদশাহ দ্বিতীয় বিন আল হোমাইনের উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন পুনব্যক্ত করছি।

Dhaka University Institutional Repository

৭। আমরা সিরীয়ার গোলান ও লেবাননের ভূখন্ডে ইসরাইলের অব্যাহত দখলকারীদের নিন্দা করছি এবং ইসরাইল অধিকৃত এসব ভূখন্ড পুনরুদ্ধারে এই দুটি দেশের প্রতি আমাদের সমর্থনের উপর গুরুত্বারোপ করছি।

৮। আমরা ওআইসির সদস্য সকল দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, ভৌগলিক অখন্ডতা ও আইনগত অধিকার এবং জাতিসংঘ সনদ, ওআইসি সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা অনুযায়ী বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। আমরা শান্তিপূর্ণ নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবনের ব্যাপারে ইরাক, আফগানিস্তান, আযারবাইবান, সোমালিয়া, সুদান, আইভরীকোষ্ট, কামারোইউনিয়ন, বসনিয়া ও হারজিগোভিনার সঙ্গে এবং তুর্কী সিপ্রিষ্ট, কসোভো এবং জন্মু ও কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। আমরা সংঘাত রোধ ও তার নিরসনে ওআইসির ভূমিকা জোরদার ও ত্বরান্বিত করার উদ্যোগকে সমর্থন জানাই।

৯। আমরা লিবিয়ার পরিস্থিতি ও এর মানবিক পরিনতিতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং লিবিয়ার জনগণের মানবিক সাহায্য প্রদানের চলমান প্রচেষ্টায় অংশ নিতে ওআইসির সদস্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আহবান জানাই। আমরা এই ভ্রাতৃপ্রতীম দেশের পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি রাখা এবং সকল বিষয়ে সদস্য দেশগুলিকে নিয়মিত ও যথাসময়ে খবর দেওয়ার জন্য ওআইসির মহাসচিবের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা এই সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত সকল প্রচেষ্টাকেও স্বাগত জানাই।

১০। আমরা আফগানিস্তানে শান্তি স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং সেখানে উদ্ভূত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সেই দেশটিতে দীর্ঘ মেয়াদী সময়ে সংশ্লিষ্ট থাকার যৌথ অঙ্গীকার পুনব্যক্ত করছি। এ প্রসঙ্গে আমরা আফগানিস্তানের সাথে সহযোগিতা জোরদার করার ব্যাপারে অবদান রাখার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষা কর্মসূচী, কারিগরী সাহায্য ও অবকাঠামো প্রকল্পগুলির প্রশংসা করি। আমরা মাদক ব্যবসা ও অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আমাদের উদ্যোগ জোরদার করার অঙ্গীকার করছি। আমরা এ অঞ্চলে বেআইনী মাদক ব্যবসার কারণে সৃষ্ট হুমকি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সংগঠিত ও সমন্বিত করার কাজে জাতিসংঘের প্রদত্ত সমর্থনকেও স্বাগত জানাই। এ ব্যাপারে আমরা পাকিস্তানের আলমাটিতে অবস্থিত মাদক দ্রব্য, নেশাকর উপাদনের বেআইনী পাচার দমনে কেন্দ্রীয় এশীয় আঞ্চলিক তথ্য ও সমন্বয় কেন্দ্রের (CARICC) কর্মকান্ডের প্রশংসা করি।

১১। আমরা সব ধরনের ও রূপের সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং দৃঢ়ভাবে পুর্নব্যক্ত করছি যে, সন্ত্রাস বাদকে কখনই কোন ধর্ম, জাতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি বা সমাজের সঙ্গে যুক্ত করা চলবেনা। যারা এ ধরনের ঘৃণ্য হামলার শিকার হয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমাদের গভীরতম সমবেদনা ও সমর্থন ব্যক্ত করছি। আমরা বলি যে শুধুমাত্র নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট থেকে ঐ সামরিক পন্থায় সন্ত্রাসবাদক কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়না। সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজটা অবশ্যই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে, দুঃস্থ অভাবী জনগনের সামাজিক অবস্থা উন্নত করে তুলে এবং তরুন জনগোষ্টির কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমেই করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এইভাবে সন্ত্রাসের মূল কারণগুলি দুর করে অনেক বেশি ভালো ফল পাওয়া যাবে। আমরা সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা ও তা নির্মুল করার কাজে সহযোগিতা জোরদার করতে আমাদের অঙ্গীকারের পুনরুল্লেখ করছি এবং জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দুই পবিত্র মসজিদের জিম্মাদার বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজীজের প্রস্তাবটি পুনরায় জোর দিয়ে ব্যক্ত করছি। আমরা ২০১১ সালের জুন মাসে তেহরানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াই সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে ইরানের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

১২। অস্ত্রবিস্তার রোধ ও নিরস্ত্রীকরণকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বৃহত্তর উদ্যোগের প্রয়োজন। আমরা এটাও জোর দিয়ে বলছি যে সর্বক্ষেত্রে পরমানু অস্ত্রবিরোধ ও নিরস্ত্রীকরণে অগ্রগতি অর্জন করতে হলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করা অপরিহার্য। আমরা পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ ও অন্যান্য ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূল করার ব্যাপারে ওআইসির সমর্থনের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরছি এবং আন্তর্জাতিক আইন, প্রাসঙ্গিক বহুপক্ষীয় কনভেনশন ও জাতিসংঘ সনদের কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পন্থায় অস্ত্রবিস্তার বোধের জন্য আমাদের আহবান পূনর্ব্যক্ত করছি। মধ্যপ্রাচ্যে পরমানু অস্ত্রসহ ব্যাপক বিধ্বংসী অন্য সকল অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ২০১২ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ২০১০ সনের পরমানু অস্ত্রবিস্তার বোধ চুক্তির পর্যালোচনা সম্মেলনে যে আহবান জানানো হয়েছে আমরা সেটাকে অভিনন্দন জানাই। আমরা মধ্য এশিয়ায় পরমানু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল সংক্রান্ত চুক্তির চলমান বাস্তবায়নের প্রশংসা করি।

১৩। আমরা কাজাকিস্তানের সাবেক সেমিপালাটিনিস্ক পারমানবিক পরীক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য এই প্রজাতন্ত্রটিকে অভিনন্দন জানাই এবং এই ঐতিহাসিক ঘটনার ২০ তম বার্ষিকী উদযাপন করি। আমরা ২৯ আগষ্টকে পারমানবিক পরীক্ষা বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা করার জন্য কাজাকিস্তানের উদ্যোগে আনীত জাতি সংঘ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই।

১৪। ওআইসি বর্হিভূত সদস্য দেশগুলির মুসলিম সম্প্রদায় সমূহের সংগ্রামকে সমর্থন যোগানের ব্যাপারে ওআইসির সদস্যগুলি ও মহাসচিব যেসব প্রচেষ্ট চালিয়েছেন আমরা তার প্রশংসা করি এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী এই সমগ্র দায়গুলি যেসব রাষ্ট্রের অন্তর্গত সেগুলির সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রতিষ্ঠিত নীতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ওআইসি শীর্ষ বৈঠক ও সিএফএম (CFM) প্রস্তাব সমূহের বাস্তবায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন এসব উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানাই।

১৫। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা, সংঘাত রোধ করা, সামাজিক সম্প্রীতি লালন করা, পরিচিতি বা সত্ত্বা সংরক্ষণ করা ও বৈচিত্র অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে আন্তধর্মীয়, আন্ত-জাতিগত ও আন্ত-সাংস্কৃতিক সংলাপ এগিয়ে নেয়ার জোরালো উদ্যোগের

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব পূনর্ব্যক্ত করছি। আমরা নিয়মিত ভিত্তিতে বিশ্বনেতৃবৃন্দ ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় নেতাদের কংগ্রেস আহবানের জন্য কাজাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহামান্য (Nursultan Nayarbayev) এবং উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং তুরস্কের যুগ্ম উদ্যোগে গঠিত বাদশাহ আব্দুল্লাহ সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সভ্যতা জোট সংলাপ কেন্দ্রসহ ইসলামী দেশগুলির অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ন উদ্যোগ ও ফোরামের প্রতি সমর্থন জানাই যেগুলি আন্ত-ধর্মবিশ্বাস, শান্তি ও সম্প্রীতির উন্নয়নে সংলাপের কার্যকর ফোরাম যোগায়। মুসলিম বিশ্ব নামে পরিচিত বিশ্বের এ অংশের দেশগুলি ও পাশ্চাত্যের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সংলাপ জোরদার করার ক্ষেত্রে কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্র যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমরা তা কৃতজ্ঞ চিত্রে স্বীকার করি।

১৬। আমরা সহনশীলতার আহবান জানাই এবং ইসলাম সম্পর্কে একটা আতঙ্কভাব সৃষ্টি ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের নিন্দা জ্ঞাপন করি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসলামভীতি কার্যকরভাবে মোকাবিলায় ওআইসি মহাসচিব যে নিরলস উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা তার প্রশংসা করি। আমরা ধর্মের অবমাননা এবং ধর্ম বিশ্বাস বা জাতপাতের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠির গায়ে ছাপ মেরে দেওয়ার প্রবনতা মোকাবিলার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশ্বসমাজের কাছে আহবান জানাই।

১৭। আমরা মুসলিম উম্মার জন্য মধ্য এশিয়া অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব স্বীকার করি যা এই বাস্তবতার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের পর কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্র হচ্ছে ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সভাপতিত্বকারী মধ্য এশিয়ার দ্বিতীয় রাষ্ট্র। আমরা মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসারের উদ্যোগকে সমর্থন করি এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করাসহ চলমান আর্থ-সামাজিক কর্মস্রোতে আঞ্চলিক গোষ্ঠিগুলিকে সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীকে অভিনন্দিত করি।

১৮। আমাদের সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা তা স্বীকার করি। সে কারনেই আমরা ২০১১ সনের ৭-৯ জুন এসটানায় অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব ইসলামী অর্থনৈতিক ফোরামের ফলাফলকে স্বাগত জানাই। আমরা উন্নয়ন জোরদার করার বিপন্ন অবস্থা লাঘব করতে এবং আমাদের জনগন ও অর্থনীতির সম্ভাবনাময় ক্ষমতা উন্মোচন করার অঙ্গীকার ঘোষনা করছি। আমরা মুসলিম দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও সাহায্য বৃদ্ধি, আমাদের সম্পদের আধুনিকায়নের জন্যে শিক্ষা ও উদ্ভাবনা ক্ষমতার প্রসার, জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া এবং বিশেষত যুব সমাজ ও নারী সমাজের জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে আমাদের সংকল্প সুনিশ্চিত করছি। মুসলিম বিশ্বের বিপুল মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের বদৌলতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আমরা তা স্বীকার করি। এ ব্যাপারে আমরা বানিজ্য, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে ওআইসির অভ্যন্তরে বহুপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করার এবং সেই সঙ্গে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (IDB) উদ্যোগে একটি এসএমই (SME) তহবিল গঠনের আহবান জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। আমরা আমাদের সমাজের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধি আনার জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যা পরিচর্যা সুবিধার উপর গুরত্ব আরোপ করি। এ বছরের শেষ দিকে কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় তৃতীয় ওআইসি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্মেলন ২০১২ সালে পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে ওআইসির জন্য কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগের আমরা প্রশংসা করি।

২০। আমরা এই বাস্তবতায় উদ্বিগ্ন যে, খাদ্য ও পানির অপ্রতুলতার কারণে আমাদের জনগণের কল্যাণ ব্যাহত ও আমাদের রাষ্ট্রগুলির স্থিতিশীলতা ক্ষুন্ন হতে পারে। আমরা খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ওআইসি দেশেগুলির মধ্যে এবং ওআইসি ও অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আহবান জানাই। সে কারণেই আমরা একটা প্রাসঙ্গিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাই। পানিকে আমরা আল্লাহর রহমত বলে গণ্য করি বা জীবন এনে দেয় এবং জীবনকে ধারণ করে। তাই আমরা 'ওআইসি ওয়াটার ভিশন' বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সহ এই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৃহত্তর সহযোগিতার আহবান জানাই।

২১। আমরা ওআইসি সদস্য দেশগুলির সক্ষমতা গড়ে তোলা, বিনিয়োগ সৃষ্টি করা ও অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ভুমিকাকে স্বীকার করি এই লক্ষ্যে আমরা বানিজ্য প্রসার ও যৌথ উদ্যোগ কর্মকান্ডে বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করাসহ ওআইসির সদস্য দেশগুলিতে বেসরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপের সহায়তা বৃদ্ধির আহবানা জানাই।

২২। আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং ইসলামী দেশগুলির ভাষা, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সেরা কীর্তিগুলি আদান প্রদানের গুরুত্ব, পুনরুল্লেখ করছি। আমরা ইসলামী শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক ২০১৫ সালে আলমাটিতে ইসলামী সাংস্কৃতি রাজধানী হিসাবে মনোনয়নকে স্বাগত জানাই।

২৩। আমরা বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ সমর্থন করি এবং ওআইসির সদস্য দেশগুলিকে তাদের নিজ নিজ চাঁদার পরিমাণ বাড়ানোর আহবান জানাই। এ প্রসঙ্গে আমরা দক্ষিন-দক্ষিণ সহযোগিতা প্রসারের চেষ্টায় ওআইসির সাথে সহযোগিতা করার জন্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারের প্রতি আহবান জ্ঞাপন করছি।

২৪। আমরা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা, জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরব রাষ্ট্র লীগ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এশিয়ান মিথস্ক্রিয়া ও আস্থা নির্মানের ব্যবস্থা বিষয়ক সম্মেলন, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা, ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ, তুর্কী ভাষী রাষ্ট্র সমূহের সহযোগিতা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার মধ্যে বৃহত্তর আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার আহবান জানাই।

২৫। আমরা মুসলিম বিশ্বের স্বার্থকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নেওয়া, আমাদের মুল্যবোধগুলিকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্ব পূর্ণ কুশলিব হিসাবে ওআইসির মানমর্যাদা বাড়িয়ে তোলার জন্য মহাসচিব মহামান্য অধ্যাপক Ekmeleddin Ihsanoglu র প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করছি। আমরা ওআইসির কার্যপরিচালনা ক্ষমতা জোরদার এবং সংস্থার লিয়াজো অফিসগুলির নেটওয়ার্কের বিস্তারের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে সহযোগিতা প্রসারের উদ্যোগকে সমর্থন জানাই।

২৬। কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মহামান্য Nursulten Nagarbayev এবং কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের জনগণ ও সরকারের বদান্যতা আথিথেয়তা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের আটত্রিশতম বৈঠক সাফল্যমন্ডিত হওয়ার জন্য আমরা তাদের সুগভীর মোবাররক জানাই।

পর্যালোচনা

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শুরু থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের ৩৮টি সম্মেলন ৫৭টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ২৪টি দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩টি দেশে[২] ৪ বার করে। ১টি দেশে[৩] ৩ বার ৩টি দেশে[৪] ২ বার করে এবং ১৭টি দেশে[৫] ১ বার করে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৯৮০ সালে ৪টি বিশেষ সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সদস্য দেশ পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্র ও সংস্থা ছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী সর্বদাই বলিষ্ট ও জোড়ালো না হলেও একেবারে নিস্প্রভ নয়। সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে ফিলিস্তিন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা (PLO) কে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সমর্থন দান একটি রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে। ইহুদী রাষ্ট্র কর্তক দখলীকৃত ফিলিস্তিন ভূমিতে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারকে বরাবরই দখলমুক্ত করার জন্য বিশ্ববাসীর নিকট বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুরোধ করা হয়। অর্থ্যাৎ এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সম্মেলনে ফিলিস্তিন ইস্যু আলোচিত হয়েছে। আরব-ইসরাইল সংঘর্ষের বিষয় আলোচনাপূর্বক আরব রাষ্ট্রসমূহের ইসরাইলী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল সমূহ ছেড়ে দেবার বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে কয়েকটি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। সংস্থার সংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করা, স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, চার্টার প্রনয়ণ ও অনুমোদন করা, চাটার সংশোধন করা, মহাসচিব নির্বাচন, শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ইত্যাদি দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদ সম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া বিশেষায়িত সংস্থা গঠন, অধিভুক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক কার্যক্রম গ্রহণের ও বাস্তবায়নের জন্যও এ পরিষদ অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে নুর আহমদ বাবা উল্লেখ করেন The conference also passed resolutions on economic, social , cultural and administrative issues.

---

(২) ৩টি দেশ ৪ বার করে ঃ সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক.

(৩) ১টি দেশ ১ বার ঃ মরক্কো.

(৪) ৩টি দেশ ২ বার করেঃ লিবিয়া, মালয়েশিয়া, ইয়েমেন.

(৫) ১৭টি দেশ ১ বার করে ঃ সেনেগাল, ইরাক, নাইজার, বাংলাদেশ, জর্ডান, গায়ানা, ইন্দোনেশিয়া, কাতার, বার্কিনা কাসো, মালি, সুদান, ইরান, আজার বাইজান, উগান্ডা, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, খাজাঘিস্তান।

Dhaka University Institutional Repository

On the cultural front the conference inter alia asked the Islamic Solidarity Fund to support within its means the American Islamic College in Chicago and called on the member-states to offer material and moral assistance to it.

The confereecnce urged the member-states to pay their share towards the budget of the General Secretariat and its subsidiary institutions as quickly as possible. In response to this appeal some states announced donations to variuos OIC bodies. Such on the spot donations amounted to a totol of $ 11.302 million US dollars.[৬]

সম্মেলনসমূহে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র কিংবা অসদস্যরাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে বিভিণ্ন সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। ইরান ইরাক যুদ্ধ, ইরাক কুয়েত সমস্যা, আফগানিস্তান সমস্যা, বসনিয়া হারজিগোভিনা সমস্য, কসোবো সমস্যা, সুদান সমস্যা, লিবিয়ার সমস্যা, কাশ্মীর ইস্যু, মরু লিবারেশন ফ্রন্ট ফিলিপাইনের কার্যাবলীকে সমর্থন দান ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৫.২. ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ

ইতোমধ্যে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ওআইসির কার্যক্রমের মূল শক্তি মুলতঃ এর শীর্ষ সম্মেলন বা রাষ্ট্র প্রধানগণের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কিংবা ঘোষনা। এই সম্মেলনে যে বিষয়াবলীর অবতারণা করা হয় তা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ সম্মেলন, মন্ত্রী পরিষদ সম্মেলন, মহাসচিব কিংবা ওআইসি সচিবালয় বাস্তবায়ন করে থাকে। নিম্নে কলেবর সিমাবদ্ধ রাখার স্বার্থে শীর্ষ সম্মেলনের[৭] কয়েকটি উল্লেখ করে এর সার্বিক বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হলো।

রাবাত ঘোষণা, ১৯৬৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, শাদ, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, মরক্কো, স্ৌদি আরব, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, নাইজার, পাকিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মিশর, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, সেনেগাল এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে পি.এল,ও. যোগদান করে। সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

মুসলামনদের সাধারণ বিশ্বাস তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সমঝোতা সৃষ্টির শক্তিশালী ভিত্তি।

---

(৬) Noor Ahmad Baba, *Organisation of Islamic Corference Theory and Practice of Pan-Islamic Cooperation*, University Press Limited, Dhaka-1994, P-172.

(৭) রাবাত ঘোষণা, লাহোর ঘোষণা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পুর্বোক্ত, পৃ.৫৩৯-৫৪৩, এবং www.oic-oci.org.com.

Dhaka University Institutional Repository

এটা স্বীকার করে এবং ইসলাম নির্দেশিত আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধ, যা মানব জাতির সমৃদ্ধি বিধানের অপরিহার্য চাবিকাঠি, তা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং জাতিসংঘ সনদ, মৌলিক অধিকার, মানুষে মানুষে সু-সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত নীতি ও লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করে এবং মুসলিম জনগণের ভ্রাতৃসুলভ ও আধ্যাত্মিক বন্ধন শক্তিশালী করা এবং সুবিচার, সহনশীলতা, বৈষম্যহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে এবং গোটা জগত জুড়ে স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও উন্নতির বিস্তার ঘটানোর ব্যাকুলতা নিয়ে এবং বিশ্বের শান্তিও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে সংহত করার দৃঢ় মত ব্যক্ত করে এই সম্মেলন ঘোষণা করছে ঃ

১. ইসলামের শাশ্বত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের সরকারগুলো পরস্পর আলোচনা করবে।

২. তাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে জাতিসংঘ সনদের নীতি ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক শান্তিনিরাপত্তা শক্তিশালী হয় এমন পথে তারা তাদের ঐ বিরোধ শান্তিড়পূর্ণভাবে মীমাংসা করবে।

৩. মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি এবং মসজিদুল 'আকসার উপর সংঘটিত জঘন্য অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরীক্ষা করে দেখার পর এই সম্মেলন ঘোষণা করছে ঃ

১৯৬৯ সালের ২১শে' আগষ্টের নিদারুণ ঘটনার মাধ্যমে পবিত্র মসজিদুল 'আক্সার যে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তা বিশ্বের ছয়শ' মিলিয়ন মুসলমানকে গভীর শোকে অভিভূত করেছে। ইসলাম, খৃষ্টবাদ ও য়াহুদীবাদ-এর অনুসারীদের পবিত্র নগরী জেরুজালেম-এর আল কুদস দখল করে ইসরাইলী সৈন্যরা পবিত্র স্থানগুলোর ধ্বংস সাধন করে মানব সমাজের একটি অতি পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে, তা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং বিশ্বের মুসলিম জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তেড়াষ সৃষ্টি করেছে।

৪. সম্মেলনের উপস্থিত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং প্রতিনিধিরা ঘোষণা করছেন যে, ইসরাইলী সৈন্যের দখলই জেরুজালেমের মুসলিম পবিত্র স্থানগুলোর উপর হুমকি সৃষ্টি হবার কারণ। পবিত্র স্থানসমূহের স্বকীয় বৈশিষ্ট রক্ষা এবং এখানে অবৈধ প্রবেশ বন্ধ করার জন্য পবিত্র নগরীর ১৯৬৭ সাল পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে যা গত ১৩ শ, বছর ধরে চলে আসছিল।

৫. সুতরাং তারা ঘোষণা করছে যে, তাদের সরকার ও জনগণ জেরুজালেম নগরীর ১৯৬৭ সাল পূর্ব অবস্থার বিপরীত যে কোন সমাধান প্রত্যাখান করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

তারা বিশ্বের সকল সরকার বিশেষ করে ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জেরুজালেম নগরীর সাথে ইসলামের অনুসারীদের গভীর সম্পর্কের এই নগরীর মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালাতে আহবান জানাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ১৯৬৭ সাল থেকে অধিকৃত আরব এলাকা দখল করে রাখা এবং জেরুজালেমকে কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আহ্বানের প্রতি ইসরাইল কর্ণপাত না করায় তাদের জনগণ ও সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

৮. পরিস্থিতির ভয়াবহতার দিক বিবেচনা করে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিরা জরুরীভিত্তিতে ও আন্তড় রিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সব সদস্যের প্রতি, বিশেষ করে বিশ্বশান্তিরক্ষার ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্বশীল বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতি সামরিক শক্তি বলে জবর দখলের অবৈধতার নীতিকে সামনে রেখে অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে ইসরাইলকে বাধ্য করার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাকে জোরদার করতে আহবান জানাচ্ছে।

৯. ফিলিস্তীনের বিয়োগান্ত ঘটনায় ব্যথিত তারা ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছে এবং সমর্থন জানাচ্ছে তাদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার ও তাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি।

লাহোর ঘোষণা, ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের লাহোর নগরীতে দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পি.এল ও সহ ও.আই.সির তৎকালীন ৩৪টি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রদান ও প্রতিনিধিগণ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এছাড়া পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করে আরব লীগ, রাবেতা আল আলম আল ইসলামী, মু'তামার আল আলম আল্ ইসলামী এবং এ্যান্টিওকের পেরার্ক। এ সম্মেলনে যে ঘোষণা প্রকাশ করে, তা'লাহোর ডিক্লারেশন' নামে পরিচিত। 'লাহোর ঘোষণা" নিম্নরূপ ইসলামী দেশ ও সংস্থাসমূহের বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ নিম্নলিখিত গোষণা দান করছেন ঃ

১. আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলিম জনগণ তাদের সাধারণ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইসলামী জনতার সংহতি প্রকৃতই মানুষের মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, বিভেদ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি এবং জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিবাচক ও চিরন্তড়্ন নীতির উপর ভিত্তিশীল।

২. এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের সমৃদ্ধি অর্জনের সংগ্রামের সাথে তারা একাত্ম।

৩. স্বাধীনতা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে বিশ্বশান্তিনিশ্চিতকরণে তাদের চেষ্টা, ইসলামের নীতি অনুসারে অন্য ধর্ম বিশ্বাসীদের সাথে সহযোগিতা ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে সফল করে তোলাই তাদের আকাঙ্খা।

৪. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার সংহতি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ, অন্যের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, একে অন্যের অভ্যন্তড়ীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, ভাইসুলভ মনোভাব নিয়ে শান্তিড়পূর্ণ উপায়ে নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলা এবং যেখানে যতটা সম্ভব মুসলিম দেশগুলোর বিরোধে শুভেচ্ছা ও মধ্যস্থকাকারী শক্তির ব্যবহার তাদের দৃঢ় সংকল্প।

৫. অক্টোবর যুদ্ধে ইসরাইল সীমান্তড়বর্তী আরব দেশসমূহ ও ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন তথা আরব প্রচেষ্টার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সেই সময় সন্ধিক্ষণে মুসলিম সংহতির প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতী।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ ও ভাইসুলভ সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ইসলামিক কনফারেন্সের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের প্রতি স্বীকৃতি।

মধ্যপ্রচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁরা ঘোষণা করছেন ঃ

১. আরব স্বার্থ যা আগ্রাসন বিরোধী এবং যা চায় না যে শক্তির অন্যায় ব্যবহারে ভূ-খন্ড বা অন্য লাভ দ্বারা পুরস্কৃত হোক- সব দেশেরই সাধারণ স্বার্থ।

২.আরবদেরকে তাদের হৃত ভূমি উদ্ধারের জন্য সর্ব উপায়ে পূর্ণ ও ফলপ্রসু সাহায্য করা উচিত।

৩. ফিলিস্তিনী জনগণের স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্বার্থ, যারা মনে করে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার তাদের নিজেদেরই।

৪. ফিলিস্তিনী জনগণকে তাদের পূর্ণ জাতীয় অধিকার ফিরিয়ে দেয়াই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান এবং সুবিচারভিত্তিক স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার মূল শর্ত।

৫.আন্তর্জাতিক সমাজ বিশেষ করে যারা ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তীন বিভাগের প্রশ্নে অভিভাবকত্ব করেছিল, ফিলিস্তিনী জনগণের উপর চেপে বসা অবিচার দূর করার দায়িত্ব তাদেরই।

৬. আল্লাহর দেয়া পবিত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলামের একটি প্রতীক আল-কুদ্স। গত ১৩০০ বছর ধরে মুসলমানরা পবিত্রতাসহ এ নগরীর সংরক্ষণ করছে। মুসলমানরাই একমাত্র এ পবিত্র স্থান সংরক্ষণের অধিকারী। কারণ একমাত্র তারাই জেরুজালেমের ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। জেরুজালেমে য়াহুদী অধিকার সংরক্ষণের কোন চুক্তিই এবং এ নগরীকে অ-আরব কাউকে নিয়ন্ত্রণে দেয়ার কোন ব্যবস্থাই ইসলামী দেশসমূহের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় পূর্বশর্তই হল জেরুজালেম থেকে ইসরাইলী সৈন্যের প্রত্যাহার।

৭. আরব দুনিয়া এবং গোটা বিশ্বের ঃ যেমন- লেবানন, মিশর, জর্দান এবং সিরিয়ায় খৃস্টান গীর্জা কর্তৃক আন্তর্জাতিক জনমতের কাছে এবং বিশ্বের ধর্মীয় সম্মেলনগুলোতে ফিলিস্তীন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবং জেরুজালেম ও ফিলিস্তীনের অন্যান্য পবিত্র স্থানের উপর আরব সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্থন প্রশংসাযোগ্য।

৮. অধিকৃত আরব এলাকা-বিশেষ করে পবিত্র নগরী জেরুজালেমের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিনাশের চেষ্টা আন্তর্জাতিক বিধির সুস্পষ্ট লংঘন এবং ইসলামী সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং সাধারণভাবে ইসলামী বিশ্বের আবেগ অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৯. আরবদের সমর্থনে আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের সম্মানজনক ও দৃঢ় ভূমিকা অত্যন্তপ্রশংসাযোগ্য।

১০. সত্যিকার শান্তিপ্রতিষ্ঠার ধারাকে মূল প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করাতে হবে এবং যুদ্ধ বিরতিকে অন্য কিছু নয়, অধিকৃত এলাকা থেকে ইসরাইল সৈন্যের প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তিনী জনগণের জাতীয় অধিকার প্রত্যর্পণের পদক্ষেপ হিসেবে ধরতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহ গ্রহণ করা হয় ঃ

১. ইসলামী দেশসমূহ থেকে দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞানতা দূর করা।

২. শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক অনুন্নত দেশের উপর ঘোষণ চালানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করা।

৩. কাঁচামালের রফতানী এবং শিল্পপণ্য ও কলাকৌশল আমদানীর ক্ষেত্রে সুষম বাণিজ্য বিনিময় নীতির প্রবর্তন করা।

৪. উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৫. উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে বর্তমান মূল্য বৃদ্ধিজনিত অসুবিধা দূর করা।

৬. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধি করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আলজিরিয়া, মিশর, কুয়েত, লিবিয়া, পাকিস্তান, সৌদী আরব, সেনেগাল ও আরব আমিরাতকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি সুপারিশ করবে এবং তা পরবর্তী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে পেশ করবে। শীর্ষ সম্মেলন শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই সেক্রেটারী জেনারেলের আমন্ত্রণে এ কমিটির অধিবেশন জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হতে হবে।

সম্মেলনে উপস্থিত বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ জেরুজালেম, মধ্যপ্রাচ্য, ফিলিস্তিনী, মুসলিম সলিডারিটি ফান্ড, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্তবিভিন্ন প্রস্তাবও পাশ করেন এবং ঐগুলোকে এ ঘোষণার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন।

এগুলো ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে কাজ করে যাবার জন্য তাঁদের নিজ নিজ প্রতিনিধিকে নির্দেশ দান করেন।

মক্কা ঘোষণা, বিগত ১৪০১ হিজরী সনের ১৯ থেকে ২২ রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৯৮১ খ্রি. সালের ২৫ থেকে ২ জানুয়ারী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স বা সংক্ষেপে ও.আই.সি) উদ্যোগে পবিত্র মক্কা নগরীতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে প্রকাশিত ঐতিহাসিক যুক্ত বিবৃতি 'মক্কা ঘোষনা' নামে পরিচিত।

আমরা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ, আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ পবিত্র মক্কা নগরীতে ১৪০১ হিজরী সনের ১৯-২২ রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ১৯৮১ সালের ২৫-২৮ জানুয়ারী তারিখে তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে জমায়েত হয়েছি।

মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ'তালার কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা মাথা নত করছি, যিনি তার অসীম রহমতে মুসলিম জাহানের কিবলা ও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার গৌরবে ধণ্য মহাসম্মানিত মক্কা নগরীতে নতুন হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে এভাবে সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। মুসলিম জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় মূহুর্ত বলে আমরা বিবেচনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এ শুভ উপলক্ষ গোটা মুসলিম জাতিকে উদ্ধুদ্ধ করবে অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতা গুলোকে স্মরণ করতে, অনুপ্রাণিত করবে বর্তমান পরিস্থিতিগুলোর যথাযথ মূল্যায়ণ এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, ঐক্যবোধ ও সাম্যের মহান ইসলামী আদর্শে আস্থাবান হতে, শ্রেনী ও অবস্থানগত বৈষম্যগুলোর কথা ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মানব সভ্যতার একটি গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি তথা মুসলিম জাতির একটি উন্নত সমৃদ্ধিশালী ও সুখী ভবিষ্যত গড়ে তোলার একক লক্ষ্য অর্জনে উদ্যোগী হতে।

ইসলামের মহান শিক্ষা ও আদর্শে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন ও সেভাবে আচার-আচরণ ও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন গঠন করার মধ্যেই যে সব বিপদ মুসলিম জাতিকে ঘিরে রয়েছে, সে সব থেকে উত্তরণের প্রকৃত নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। স্থায়িত্ব উন্নতি ও সম্মানজনক সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ কেবল মাত্র ইসলামের সুদৃঢ় অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। বস্তুতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে উদ্ধত ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা শুধু মাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অন্যান্য জাতির সাথে কাধ মিলিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতি অর্জনের মহতী প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে বিশ্ব সমাজে তাদের ন্যায্য আসন অধিকার ও হস্তচ্যুত পবিত্র স্থানগুলো পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে একমাত্র দীন ইসলামের সুদৃঢ় অবলম্বনই মুসলিম জাতিকে যোগাতে পারে চিরস্থায়ী অনুপ্রেরণা।

চিরস্থায়ী সংগ্রাম

স্বাধীনতা, ন্যায়-বিচারবোধ, মানুষের প্রতি মর্যাদা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, দরদ ও সহনশীলতা ইত্যাদি যে সকল শাশ্বত নীতি মুসলমানগণ বিশ্বস করে থাকেন, সে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ, জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে এবং অন্যায় অবিচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে মুসলিম জাতিও অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্যমান সর্ম্পকের উন্নয়ন বল প্রয়োগের মাধ্যম নয়, বরং মানবিক মুল্যবোধের দ্বারাই পৃথিবীর বুক থেকে অত্যাচার, অবিচার, শোষন ও অধিপত্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও জাতিগত, ধর্মগত, গোত্রগত বা স্ত্রী-পুরুষগত যাবতীয় বৈষম্যমূলক আচরণ দরীভূত করে পৃথিবীর বুকে একটি নতুন যুগের সূচনা সম্ভব হতে পারে।

আমরা ঘোষনা করছি অতীতের অনৈক্য ও অবমাননার শিকার হওয়ার পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতির কারণে মুসলমানদের বহু আবাসভূমি বিশেষ করে প্রথম কিবলা ও তৃতীয় পবিত্রতম স্থান আল কুদস শরীফ বিদেশী আক্রমনকারীদের কুক্ষিগত হয়েছে, সেরূপ পরিস্থিতির শিকারে পরিণত না হওয়ার শক্তি আমরা কেবলমাত্র দীনের রশি সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেই অর্জন করতে পারি। মুসলিম জাতি অন্যায় ও আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে, তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবদান লোপ করে দেয়া হয়েছে, জাতীয় সম্পদের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন এরূপ ভূরি ভূরি নযীর ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। বর্তমান শতাব্দির সূচনা মুহূর্তে মুসলিম জাহানের স্বাধীনতা, স্থায়িত্ব, সম্মান ও ইজ্জত সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভাবিত পুর্ব অগ্রগতি সাধন করা সত্ত্বেও মানব জাতি অভাব, দারিদ্র, নৈতিক অধঃপতন, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও ধন-বৈষম্য এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অশুভ শক্তিগুলোর পায়তারা বিরোধের বীজ বপন কর ক্রমাগতভাবে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে মানব জাতির শান্তি ও সভ্যতার অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে চলেছে।

মুসলিম জাতির অন্তর্নিহিত গুনাবলী বৃহত্তর ঐক্য, একত্মতাবোধ, উন্নতি ও অগ্রগতি শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রসূলের পবিত্র জীবনে অনুসৃত আদর্শ। এগুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান যা আমাদেরকে সততা, ন্যায়বিচারবোধ ও মুক্তি-পথের সন্ধান দেয়। আর এটাই হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এ থেকেই আমরা মানবতার অবমাননা এবং অশুভ শক্তিগুলোর কাছে পর্যন্ত না হওয়ার শক্তি ও সাহস খুজে পাব। এর মাধ্যমেই আমাদের মধ্যকার সুপ্ত শক্তিগুলোর পূর্ন বিকাশ সাধন সম্ভব হবে। এ হচ্ছে সৎ জীবন যাপনের অন্তনির্হিত চালিকা শক্তি।

আমরা বিশ্বা করি

উৎকৃষ্ট মানব ও অন্যান্য সম্পদের অধিকারী আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে নানা বর্ণ-গোত্র ও সম্প্রদায়রূপে অবস্থানরত একশো কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট মুসলিম জাতি সমগ্র মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণে অনন্যসাধারণ অবদান রাখতে পারে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মুসলিম ইতিহাসের ক্রান্তিমুহূর্তে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত এ মহতী সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের রেনেসা আন্দোলনের সূচনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমরা আমাদের পরস্পরের মধ্যে একাত্মতা প্রকাশ পূর্বক নিম্ন বর্ণিতরূপে প্রতিজ্ঞা করছিঃ

১. ভাষা, বর্ণ, আবাসগত এবং অন্যান্য ব্যাপারে পার্থক্য সত্ত্বেও পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান একই ধর্মীয় বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ, একই বৃহত্তম ঐতিহ্যের অনুসারী, একই মহান জাতির অংশ বিশেষ। স্বার্থদ্বন্ধের সংঘাতে শতধা-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রকার মতাদর্শের প্রতি মুসলিম জাতি সমর্থন করে না, কারণ তারা মধ্যপথ অবলম্বনে বিশ্বাসী। কাজেই যত সহনশীলতা, স্ৰৈভ্রাতৃত্ব, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এবং রসূল (সা) এর পবিত্র জীবনের আদর্শকে সামনে রেখে ন্যায়বিচারের আদর্শ অনুযায়ী আমরা সেগুলো মীমাংশা করে নিতে সুদৃঢ় আকাংখা ব্যক্ত করছি।

আমাদের জনগণের আশা আকাংখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর জগত সমাজে সম্মান জনক অবস্থান অর্জনের উদ্দেশ্যে, আন্তর্জাতিক প্রশ্নসমূহে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও একাত্মতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ধারা বৃদ্ধি করতে ঐকান্তিক আগ্রহ পোষন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

পরাধিকৃত অঞ্চলগুলো মুক্ত করতে, আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে ধর্মযুদ্ধ (জিহাদে) অবতীর্ণ হতে দৃঢ় ইচ্ছা পোষন করছি।

২. মুসলিম জাতি আজ আন্তর্জাতিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব উদ্ভূত নানাবিধ অন্যায় ও বিপদের শিকারে পরিণত হচ্ছে, এ বিষয়ে আমরা সচেতন রয়েছি। আমরা এও জানি যে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম সকলের প্রতি ন্যায়বিচার ও সমতাপূর্ণ আচরণের জন্য ইসলাম নির্দেশ দেয়। যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয়, যারা আমাদেরকে আমাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়নের কাজে লিপ্ত নয়, কিংবা যারা অন্যায় অত্যাচার ও আক্রমন কারীদের পক্ষ অবলম্বন বা সমর্থন করছে না, তাদের প্রতিও ইসলাম সহনশীলতা ও উদার ব্যবহারের শিক্ষা দেয়।

আমরা আরব ভূখন্ড ও ফিলিস্তিনী মুসলমানের আবাসভূমি সমূহ অস্ত্রের জোরে অন্যায় ও অবৈধভাবে কুক্ষিগতকারী ইহুদীবাদের প্রতিরোধ করতে সুদৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। রাজনৈতকি, অর্থনৈতিক, জনবল ও সমরাস্ত্র সরবরাহ করে যারা পররাজ্যগ্রাসী ইহুদীবাদের সামগ্রিক সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে, আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাদের ধিক্কার দিচ্ছি। ফিলিস্তিনী সমস্যা সমাধানে সহায়ক নয়, ফিলিস্তিনী জনগণের জাতিসত্বা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সমেত তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনসহ তাদের বৈধ এবং একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার (পি এল ও) নেতৃত্বে সার্বভৌম ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ন্যায্য স্বীকার করে না এরূপ যে কোন প্রস্তাব বা প্রচেষ্টা আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছি।

আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে যেটুকু সম্বল ও সামর্থ রয়েছে, তারই উপর নির্ভর করে ও অন্যায় আগ্রাসণ ও চাপ প্রতিরোধকল্পে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন ও জাতিসংঘে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী অধিকৃত আরব ও ফিলিস্তিনী ভূখন্ডসমূহ মুক্ত করার লক্ষ্যে জিহাদের জন্য আমাদের প্রস্তুতির কথা আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি।

কোন বিকল্প নেই

ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি সংঘটিত আগ্রাসন, তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় অধিকার সমূহ অস্বীকার, পবিত্র আল-কুদস শরীফের অমর্যাদা ও এর এলাকাসমূহ কুক্ষিগত করার মাধ্যমে আগ্রাসনকর্ম দীর্ঘস্থায়ী করণের প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হতে এবং এর সমর্থনকারীদের কঠোর ভাষায় ধিক্কার জ্ঞাপন করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের নিজেদের আয়ত্বে যতটুকু শক্তি ও সামর্থ রয়েছে, তারই উপর নির্ভর করে আল-কুদস শরীফ এবং অধিকৃত আরব এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারকল্পে মুক্তিসংগ্রামে দৃঢ়ভাবে নিয়োজিত হওয়ার আকাংখা আমরা পুন ব্যক্ত করছি। অধিকৃত আরব এলাকা সমূহ এবং আল-কুদস শরীফ এলাকা মুক্তকরণের এ কর্মসুচী বর্তমান বংশধরদের জন্য আল্লাহ চাহে ত একটি স্থায়ী সংগ্রামের কর্মসূচী রূপে পরিগণিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপর পরিচালিত খোলাখুলি আক্রমণ, তাদের স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মুসলিম জাতিসত্তার প্রতি প্রকাশ্য লাঞ্ছনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি এবং আমরা আফগান জনগণের মুক্তি সংগ্রামে সামগ্রিক ভাবে সমর্থন জানাচ্ছি।

আফগানিস্তান থেকে অবিলম্বে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের শর্তে, সে দেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখন্ডতা, গোষ্ঠি নিরপেক্ষতার নীতি ও জনগণের মৌলিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি স্বীকৃতিসহ বাইরের যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান লাভের যে কোন প্রচেষ্টা আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। নিজেদের স্বাধীনতা ও আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার পুররুদ্ধারের লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত আফগান জনগণের সাথে আমরা আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করছি।

পরাশক্তি সমূহের মধ্যে বিদ্যমান বৈরিতা, তাদের নিজ নিজ প্রভাব বলয় বিস্তারের লক্ষ্যে ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের সন্নিকটবর্তী এলাকাসমূহে ক্রমবর্দ্ধমান উপস্থিতি ও সাময়িক শক্তিবৃদ্ধি আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। উপসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং এ অঞ্চলের সমুদ্রপথ সমূহের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব কোনরূপ বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়াই উপসগারীয় রাষ্ট্রগুলোর উপর ন্যস্ত বলে আমরা মনে করি।

পৃথিবীর বহু দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে-মানবিক মর্যাদা ও অধিকার নগ্নভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে। আমরা এ সব রাষ্ট্রের সরকার সমূহের প্রতি মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে আইনানুগ সমান নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় জীবন যাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য আহবান জানাচ্ছি।

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে অন্যায় লালসা, ন্যায়বোধের অভাব, ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবৈষম্য ও ভন্ডামীর নীতিতে পরিচালিত অস্ত্র প্রতিযোগিতা, দুর্বল জাতিগুলোকে পদাবত করে রাখার যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে বিশ্ব সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়ে মানব সভ্যতার ভিত্তিমূলকেই বিপদগ্রস্থ করে তুলেছে। পৃথিবীর সকল স্থানে মানবিক মর্যাদা, মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল দেশের সাথে মানুষের প্রতি আন্তরিক ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য কাজ করে যেতে আমরা আহবান জানাচ্ছি।

মৃত্যু ও ধ্বংসের উপাদান মারণাস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় সম্পদের অপচয়ের পরিবর্তে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিরোধ আপোষে সমাধানের লক্ষ্যে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী তৎপর হওয়ার জন্য আমরা সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বিবাদ বিসম্ববাদ আপোষ নিস্পত্তি করার সহায়ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে কার্যরত যাবতীয় আন্ত:রাষ্ট্রীয় সংস্থা সমূহ এবং জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি আমাদের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। জাতিসংঘের কর্ম তৎপরতা ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার কাজ ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল শক্তিকে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করছি। জাতিসংঘের কর্মতৎপরতার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের কারণে আমরা ইসরাইল ও তার সহযোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছি। গোষ্ঠি নিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শের প্রতি আমরা আমাদের আনুগত্য ও সমর্থন ঘোষণা করছি। আরব লীগ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষনা করছি।

শুরা বা পরামর্শ সভা ধর্মবিশ্বাস, ন্যায় বিচার এবং নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য আমাদের জনগণের স্বীয় ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আস্থাশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবং বৃহত্তম মানব সমাজের সাথে সম্পর্ক উন্নততর করার পূর্ব শর্ত স্বরূপ পবিত্র কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের অনুসৃত আদর্শ অনুযায়ী আমাদের নিজেদের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারণ একমাত্র এ ভাবেই সত্য ও ন্যায়নীতি জয়যুক্ত হতে পারে। মুসলিম জাতির জন্য অগ্রগতি ও সম্মান, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা লাভেরও এটাই একমাত্র পথ।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৎ ও মহত কাজে উদ্যোগী এবং অসৎ ও অপকর্ম থেকে বিরত হওয়ার প্রেরণা লাভের লক্ষ্যে মুসলিম জাতির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ অনুষ্ঠানের রীতি পুনরায় প্রবর্তন করার জন্য আমরা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করছি। কারণ সকল প্রকার মতানৈক্য দূরীভূত করাত এবং মুসলিম জাতির প্রতি স্নেহভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বন্ধন অধিকতর দৃঢ় করাত ব্যবস্থা সুফলপ্রসূ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। পবিত্র কুরআন ও রসুল (সাঃ) এর পবিত্র জীবনে অনুসৃত আদর্শ প্রতিটি মুসলমান যাতে নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন এবং ব্যক্তিগতভাবেও যেন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা লাভ করা সম্ভব হয়, সে জন্য আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা দান করে যাব।

মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদাবোধ সংরক্ষণের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনুরূপভাবে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও স্বাধিকার সংরক্ষনের জন্য আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা পুন ব্যক্ত করছি। সত্য ও ন্যায় নীতির আদর্শ পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে রত তারা হোক ফিলিস্তীনে কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় সকল মানুষের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

আমাদের বহু জনগণ দারিদ্রের সুকঠোর নিস্পেষণে জর্জরিত। আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদ একত্র করে স্নেহভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবোধের মাধ্যমে আমাদের দারিদ্র পীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে আমরা দৃঢ় আকাংখা ব্যক্ত করছি। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা আমাদের কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যাব।

ন্যায়, পারস্পরিক সমঝোতা ও পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার সহায়ক নীতির ভিত্তিতে আমরা পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই, যাতে করে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয়। নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের কথা আমরা পুন ব্যক্ত করছি।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানান্বেষন ও জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্য কর্তব্যরুপে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সে কারণেই অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষা-সূচী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছি। যেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গবেষণা ও ইজতিহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে পারে। নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ পুন জাগরিত করে মুসলিম তরুণ সমাজে বিদ্যমান অজ্ঞতা দূর করে তাদের পার্থিব চাহিদা পুরণের বিনিময়ে ধর্মীয় শিক্ষা পরিত্যাগ করানোর সকল প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে মুসলিম জাতির মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ও একাত্মবোধ দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে আমাদের কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে আমরা সুদৃঢ় আকাংখা ব্যক্ত করছি।

পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও যুক্ত কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন গণসংযোগ মাধ্যম ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নের জন্য আমরা সমবেতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আমাদের জাতির প্রতি সুপরিকল্পিতরূপে আচরিত বিদ্বেষপূর্ণ, অমর্যাদাজনক, বিচ্ছিন্নতাবাদের উস্কানীদাতা গণসংযোগ মাধ্যমগুলোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে নৈতিক আদর্শ ও ন্যায়বোধের দ্বারা পরিচালিত আমাদের গণসংযোগ মাধ্যমগুলো কাজ করে যাবে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং এর ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থারূপে এর গুরুত্ব, লাভ, মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠাকারী এবং স্ৗেভ্রাতৃত্বের প্রতীক স্বরুপ ও সংস্থার অঙ্গ-সংগঠনরূপে আরো কতিপয় সংস্থার আত্ম-প্রকাশ ও কর্মতৎপরতা আমাদের নিকট একটি গৌরবের বিষয়। আমরা ইসলামিক সলিডারিটী তহবিল ও আল কুদ্‌স তহবিল ইত্যাদি অঙ্গ সংগঠনসহ এ সংস্থার কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যেতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ সংস্থার উদ্দেশ্য, নীতি ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল অন্যান্য আন্ত:রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা বৃহত্তম মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্যবন্ধন ও স্ৗেভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, সদস্য রাষ্ট্র সমূহের রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের প্রতিকূল না হলে তাদের প্রতিও সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করে যেতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ধর্মীয় নীতি আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে সম্মুখে বিদ্যমান বিপদ ও চ্যালেঞ্জ সমূহের মুকাবিলা এবং পারস্পরিক অবস্থা, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আমাদের জনগণের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। অন্যান্য রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতিও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ন মনোভাবের প্রতি অনুরূপ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহবান জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অন্যায় অবিচার পরিত্যাগপূর্বক সুন্দরতর মানব সমাজ গড়তে ও পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নততর করে গড়ে তুলতে আমরা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহান দয়াময় আল্লাহ তাআ'লার কাছে আমাদের দোয়া: আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনপূর্বক সৎ ও ন্যায়ানুগ জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় তিনি যেন আমাদেরকে সাহায্যদান করেন।

নিশ্চয় মহান আল্লাহ বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সাফল্যের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহর অনুমোদিত দীনকে যারা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলো পরিপূর্নভাবে পালন করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে সাফল্যের সুনিশ্চিত আশ্বাস। অবিশ্বাসীগণই হচ্ছে প্রকৃত দুস্কৃতিকারী।

ডাকর ঘোষণা- একাদশ ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের, তারিখ-১৩-১৪ মার্চ, ২০০৮, স্থান- ডাকার-সেনেগাল প্রজাতন্ত্র, সম্মেলন ইশতেহার ঃ

১। সেনেগাল প্রজাতন্ত্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট (Scceq) এর আমন্ত্রণে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন, একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম উম্মার অধিবেশন ১৪২৯ হি রবিউল আউয়াল মাসের ৬-৭ তারিখ (১৩-১৪ মার্চ, ২০০৮ সনে) সেনেগাল প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত হয়।

২। এ অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে ৮-৯ মার্চ, ২০০৮ এ জেষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ১১-১২ মার্চ, ২০০৮ এ অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতিমূলক সরকার পক্ষীয় সভা।

৩। মালয়েশিয়ার সিনেটের প্রেসিডেন্ট মালয়েশিয়ার মহামান্য প্রধানমন্ত্রী এবং দশম ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi বাণী প্রদান করেন। তার বাণীতে এ মর্মে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মালয়েশিয়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থা পদ্ধতিকে সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে অগ্রাধিকার-আরোপ করবে। এ সংস্থাকে আরোও কার্যকর এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের ব্যাপারে আরোও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে হবে। মালয়েশিয়া ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতির ভূমিকা পালনকালে যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছিল বর্তমান অধিবেশনে সেগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়। উদ্যোগগুলোর মধ্যে যে গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেগুলো হলো। ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভূক্ত দেশ সমূহের জন্য সক্ষমতা গড়ে তোলার কর্মসূচী (Capacity Building Programme) চালু করা, বিশ্ব ইসলামী অর্থনৈতিক ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা, মুসলিম বিশ্ব এবং পাশ্চত্য দেশগুলোর সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্থাপন করা-ভুল বুঝাবুঝি এবং অবিশ্বাসের মাত্রা কমিয়ে আনা, একইসাথে আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ভুমিকাকে আরোও শক্তিশালী করে তোলা এবং উগ্রবাদ ও ইসলাম ভীতির মোকাবেলা করা।

৪। এ সম্মেলন সেনেগাল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মহামান্য (Maitre Abdoulaye Wade) কে একাদশে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত করে। এ সংস্থার অন্যান্য সদস্যদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ক্রমে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ অলকৃত করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়। এ সম্মেলন সিদ্ধান্ত নেয় যে, নির্বাচিত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র মিশরীয় প্রজাতন্ত্র ও তুর্কী প্রজাতন্ত্র যথাক্রমে ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করবেন এবং মালয়েশিয়া সম্মেলন র‍্যাপেটিয়ারের (Rappoteur) পদ অলকৃত করবেন।

৫। সেনেগাল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং একাদশে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান তার বক্তৃতার শুরুতে মহামান্য অতিথিবৃন্দ, রাজন্যবর্গ এবং রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদেরকে স্বাগত জানান এবং তাকে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে তার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, এ শীর্ষ সম্মেলন শুধুমাত্র সেনেগালের শীর্ষ সম্মেলন নয় এটা হলো আফ্রিকার শীর্ষ সম্মেলন। তিনি এটা জোর দিয়ে বলেন যে, একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহকে একটি নবোদ্যমে সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রজ্জলিত করতে হবে, যে প্রতিষ্ঠানটি আমাদের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং মানবিক ও আর্থিক সংস্থান দ্বারা আর্শীবাদপুষ্ট। তিনি জোড় দিয়ে বলেন যে, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার চার্টার নিরীক্ষনের এ পদ্ধতি সন্তোষজনক এবং শুধুমাত্র এ অত্যবশীয় সংস্কারের মাধ্যমেই এ সংস্থা মুসলিম উম্মাহর আকাঙ্খা পুরন করতে পারবে।

৬। প্যালেস্টেনীয়ান ন্যাশনাল অথরিটির (PNA) মহামান্য প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস তার বিবৃতিতে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত ভূখন্ডে তাদের বিরামহীন আক্রমনের কারণে পরিস্থিতি যে অধিকতর মন্দাবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে তার প্রতি গুরত্বারোপ করেন। তিনি আল কুদ্‌সের প্রতি প্রদত্ত বর্তমান হুমকির ব্যাপারে গভীর উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেন। কারণ ঐ শহরটিকে ইহুদীকরণ করা এবং আল আকসা মসজিদের তলদেশে চলমান খনন কাজ। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আল কুদস এবং শরনার্থী ইস্যুগুলোর সমাধান ব্যতীত কোনভাবেই চূড়ান্ত শান্তি অর্জন করা সম্ভব হবে না এবং একতরফা সমাধান ও অস্থায়ী সীমানাসহ একটি রাষ্ট্রের ধারণাকে তিনি দৃঢ়তার সাথে বাতিল করেন।

৭। অত:পর ক্রমানুসারে বক্তৃতা করেন আরব গোষ্ঠির পক্ষে জিবুতির মহামান্য প্রেসিডেন্ট, এশিয়া গোষ্ঠির পক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকা গোষ্ঠির পক্ষে বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট। তারা সেনেগালের প্রেসিডেন্ট Maitre Abdoulaye Wade-কে একাদশ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়াতে তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তারা সেনেগালে একাদশ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ব্যবস্থা করার জন্য ঐ দেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট সরকার এবং সেনেগালের জনগনকে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং উদার আতিথেয়তার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এ সম্মেলনের অধিবেশনগুলো যাতে কৃতকার্যভাবে চলতে পারে সেজন্য সেনেগালের কর্তৃপক্ষ যে চমৎকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর জন্য ও তারা প্রশংসা করেছিলেন। তারা মালয়েশিয়ার মহামান্য প্রধানমন্ত্রী এবং দশম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের অধিবেশনের চেয়ারম্যান Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi- ২০০৩ সন থেকে এ সংস্থার কার্যকর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যও তার ভুয়সী প্রশংসা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮। আরব রাজতন্ত্রের বিদেশ মন্ত্রী এবং সউদী প্রতিনিধদলের প্রধান মহামান্য যুবরাজ সাউদ আল ফায়সাল এ মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, তার দেশে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনকে একটি গুরত্বপূর্ণ উন্নয়ন হিসাবে অভিহিত করে। কারণ ২০০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে মক্কা-আল মুকারামায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মুসলিম উম্মাহর নেতাদের দ্বারা দশ বৎসর মেয়াদী অ্যাকশন কর্মসূচী গৃহীত হয়। তিনি এ কর্মসূচীর সমস্ত দিকের বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। মুসলিম জগতের একাধিক বিরোধ মীমাংসার জন্য সাউদী আরবের ভূমিকার উপর গুরত্ব-আরোপ করেন।

৯। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) মহাসচিব মহামান্য অধ্যাপক Ekmeleddin Ihsanoglu সংস্থার গুরুত্ব পূর্ণ কর্মকান্ডের উপর তার সাধারণ রিপোর্ট প্রদানকালে মহামান্য প্রেসিডেন্ট Maitre Abdoulaye Wade-সেনেগাল প্রজাতন্ত্রের সরকার এবং জনগন শীর্ষ সম্মেলনের অধিবেশন যাতে নির্বিঘ্নে চলে এবং এ থেকে যাতে হ্যা-সূচক ফলাফল পাওয়া যায় সে লক্ষে যে প্রচন্ড চেষ্টা চালিয়েছিলেন তার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দশম শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান মালয়েশিয়ার মহামান্য প্রধানমন্ত্রী Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi-তার সময়কালে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি দু'টি পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ধন্যাবাদ প্রকাশ করেন। মহামান্য রাজা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানানো হয় তার সরকারের বিরতীহীন সমর্থনের জন্য এবং জেদ্দায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রধান কার্যালয় নির্মাণ উপলক্ষে এক খন্ড প্রশস্ত জমিদানের জন্য। তিনি গত কয়েক বছরে নতুন নীতি শাস্ত্র দৃষ্টি ভঙ্গি ও দুরদৃষ্টি এগুলোর উপর ভিত্তি করে যে কাজ অর্জন করা হয়েছে সেগুলোর উপর গুরুত্ব-আরোপ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ক্রমবর্দ্ধমান ইসলাম ভীতির কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং পশ্চিমা সংখ্যালঘু কিছু লোকের পূর্ব বিবেচনা প্রসুত ধারণা ঐতিহাসিকভাবে শত্রুতা এবং ইসলামের সত্যিকার মূল্যবোধ প্রচারে ব্যর্থতা।

১০। জাতিসংঘের মহাসচিব মহামান্য বান কী মুন, লীগ অফ এ্যারাব স্টেটের মহাসচিব ড. আমর মুসা এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের বিদারী চেয়ারম্যান আলফা উমার কোনারে তাদের বক্তৃতায় নিজ নিজ সংস্থার এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মধ্যে বিরাজমান সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের প্রশংসা করেন। তাদের বক্তৃতায় সম্মিলিত কর্মকান্ডের কলাকৌশলের অধিকতর উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব -আরোপ করা হয়।

১১। ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের (WML) মহাসচিব ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মহসিন আল তুর্কী তার বক্তৃতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে লীগের কর্মকান্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যার মধ্যে প্যালেস্টাইনের জনগনের দুঃখ দুর্দশা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন প্রচারের মোকাবিলাও অন্তর্ভূক্ত।

১২। এ সম্মেলনে ২০০৮ সনের ১১-১২ মার্চ তারিখে যে প্রস্তুতিমূলক সরকারপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতিবেদন, আলোচ্য সূচী এবং কর্মসূচী গৃহীত হয়।

১৩। এ সম্মেলনের চলতি অধিবেশনের জন্য একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম উম্মাহ আদর্শ বাণী হিসাবে গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। মালয়েশিয়ার মহামান্য প্রধানমন্ত্রী সেনেগাল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, সাউদী রাজতন্ত্রের বিদেশমন্ত্রী এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব সূচনা বক্তব্যকে এ সম্মেলন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সরকারী নথী হিসাবে গণ্য করে।

১৫। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং দশম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান Seri Abdullah Ahmad Badawi-তার সময়কালে সংস্থার কর্মকান্ডের যে প্রতিবেদন প্রদান করেন সেটা এ সম্মেলন প্রশংসার সাথে লক্ষ্য করে। স্থায়ী কমিটির সভাপতিরা যে প্রতিবেদন প্রদান করেন সেটা এ সম্মেলন সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করে। যে সকল ব্যক্তিবর্গ এ প্রতিবেদন দেন তারা হলেন মহামান্য রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ, মরক্কো রাজ্যের রাজাধিরাজ ও আল কুদস কমিটির চেয়ারম্যান, মহামান্য Maitre Abdoulaye Wade- সেনেগাল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং সংবাদ ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান (COMIAC) মহামান্য আব্দুল্লাহ গুল, তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার জন্য স্থায়ী কমিটির (COMCEC) চেয়ারম্যান এবং মহামান্য পারভেজ মুশাররফ, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত সহযোগিতা স্থায়ী কমিটির (COMSTECH) চেয়ারম্যান।

১৬। ইসলামী সম্মেলনসংস্থার মহাসচিব যে প্রতিবেদন প্রদান করেন সেটা এ সম্মেলনে প্রশংসার সাথে লক্ষ্য করা হয়। এ সংস্থার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত করার নিমিত্ত তিনি যে কর্মকান্ড ও পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ইস্যুর সর্বশেষ অবস্থার বিবরণও এ প্রতিবেদনে বিধৃত আছে।

১৭। ইসলাম এবং মুসলমানদের সেবার জন্য এ সম্মেলন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার চার্টারের উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং নীতির প্রতি এর সৃদৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা পুর্নবার ব্যক্ত করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে এবং প্রস্তুতিমূলক সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয় সে গুলোর বাস্তবায়নের ব্যাপারে এ সম্মেলনের আনুগত্যকে পুনর্বার ব্যক্ত করা হয়।

প্যালেস্টাইন এবং আরব ইসরাইলী বিরোধ

১৮। পুরো মুসলিম উম্মাহর জ্ঞাতার্থে এ সম্মেলন আল কুদস, আল শরীফ সমস্যার কেন্দ্রীয় চরিত্রকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। ইসলামী এবং খৃষ্টান ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলোর পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজনের উপর এ সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে ঘোষনা দেওয়া হয়। আল-কুদ্স আল শরীফের ভিতরে এবং চারদিকে মুসলিম এবং খৃষ্টান পবিত্র ভূমির উপর দখলী শক্তি ইসরাইলের বিরামহীন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এ সম্মেলন তীব্র ঘৃণার পুনরাবৃত্তি করে। ঘৃণা প্রকাশের আরোও কারণ হলো ইসরাইল কর্তৃক আল-হারাম আল-শরীফ এবং আল-আকসা মসজিদের তলদেশে বেআইনি খনন কার্য পরিচালনা এবং পবিত্র শহরের জনসংখ্যা বিষয়ক গঠন ও চারিত্র পরিবর্তন, পবিত্র শহরের আইনী মর্যদা পরিবর্তন করার জন্য সাধারনের বেআইনি ও উত্তেজনাকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বিশেষত ইসরাইলের বেআইনি উপনিবেশ কর্মসূচী, বসতি স্থাপন এবং ইসরাইলী অধিকৃত শহরের ভিতরে এবং চারিদিকে দেওয়াল নির্মান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। প্যালেস্টাইনের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থনের জন্য আল-কুদস কমিটির চেয়ারম্যান মহামান্য রাজা ৬ষ্ট মোহাম্মদ যে উদ্যোগ ও চেষ্টা নিয়েছেন সে জন্য এ সম্মেলন তার প্রশংসা পুনঃব্যক্ত করে। ইসরাইল যাতে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের প্রতি অনুগত হয় সেজন্য ইসরাইলকে অনুরোধ এবং বাধ্য করার জন্য তিনি সার্বক্ষনিকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পভাবশালী শক্তি বিশেষভাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। আল কুদসের অনুপম আধ্যাত্মিক পরিচিতি সংরক্ষণ পবিত্র ইসলামিক স্থানগুলো এবং এর সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য এবং মাঠ পর্যায়ে গৃহায়ণ, সামাজিক, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নর ক্ষেত্রে Bayt Mal Al-Quds যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন সেজন্য এ সম্মেলন তার প্রশংসা করা হয়।

২০। ইসলামিক পবিত্র জায়গা এবং হাশেমীয় স্থাপত্য সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং এগুলোকে পূর্ব জেরুজালেমে স্থিতিবস্থা (Status quo) পরিবর্তন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাত থেকে রক্ষার জন্য জর্দান যে ভূমিকা পালন করেছে তবে প্রশংসা এ সম্মেলনে করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জেরুজালেমের ন্যায্য দাবী তুলে ধরার জন্য মহামান্য রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ ইবনে আল হোসাইনের প্রশংসা করা হয়।

২১। এ সম্মেলনে প্যালেস্টাইনী জনতার বিরুদ্ধে ইসরাইলের সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা করা হয়। ইসরাইল এ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে চরমভাবে মানবাধিকার অবমাননা, যুদ্ধাপরাধ প্যালেস্টাইনের বেসামরিক জনতাকে হত্যা ও আহত করছে। যাদের মধ্যে শিশু, মহিলা এবং বয়স্করাও অন্তর্ভূক্ত। তারা বাছা-বিচার হীনভাবে প্রাণনাশক শক্তি ব্যবহার, বিচার বহির্ভূত হত্যা, প্যালেস্টাইনীদের বাড়ীঘর, সম্পত্তি, অবকাঠামো, কৃষি জমি এবং জীবিকা নির্বাহের অন্যন্য উৎস– দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাবে ধ্বংস করছে এবং বিনা বিচারে হাজার হাজার মহিলা ও শিশু দেরকে আটকে রেখে এ ঘৃণ্য কাজগুলো অবিরামভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। অতিসম্প্রতি ইসরাইল অধিকৃত প্যালেস্টাইনী ভূখন্ডের উপর বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় যে আকস্মিক ও প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয় সে ব্যাপারেও সম্মেলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ আকস্মিক ও প্রচন্ড আক্রমণের শিকার হয় শত শত নিরপরাধ প্যালেস্টাইনী জনতা যা মানবাধিকারের জাজ্বল্যমান অবমাননা এবং যেটা সেখানকার ভয়াবহ মানবিক অবস্থাকে আরোও অবনতির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

২২। গাজা উপত্যকায় বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং মানবিক সংকটের যে ক্রমাবনতি হচ্ছে সে ব্যাপারে এ সম্মেলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এসব সমস্যা উদ্ভবের কারণ হলো প্যালেস্টাইনী জনতার বিরুদ্ধে ইসরাইলের বেআইনি আটক, অবরোধ, বাধা এবং অন্যান্য বেআইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ইসরাইলী কৃতকর্মের প্রতিফলন ঘটে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র, বেকারত্ব, ক্ষুধা, বেসামারিক জনগনের স্বাস্থ্যের নিম্নগামী অবস্থা, ব্যাপক পুষ্টিহীনতা এবং শিশুদের মধ্যে রক্তশুন্যতার মধ্য দিয়ে পুষ্টিহীনতা এবং রক্তশুণ্যতার কারণ হলো প্যালেস্টাইনে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী, মেডিকেল ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরজ্ঞাম এবং জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সরবরাহে ইসরাইলের ইচ্ছাকৃত বাধা প্রদান। এগারোতম শীর্ষ সম্মেলন এ উপসংহারে উপনীত হয়েছে যে,

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাইল কর্তৃক প্যালেস্টাইনের বেসমারিক জনগোষ্ঠিকে এভাবে সমষ্টিগত শাস্তি প্রদান করা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে ভয়ানকভাবে লঙ্ঘনের সমতুল্য এবং দখলী শক্তিকে এ ধরনের যুদ্ধাপরাধের জন্য জবাব দিহিতরি সম্মুখীন হতে হবে। সে জন্য এ সম্মেলন থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এ মর্মে আবেদন করা হয়েছে যে, তার যাতে ইসরাইলের উপর চাপ প্রয়োগ করে-যাতে করে, দখলী শক্তি ইসরাইল অতি শীঘ্র গাজা উপত্যকায় প্যালেস্টাইনী জনগনের উপর অবরোধ অপসারণ করে এবং গাজার সমস্ত সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়ে গাজা উপত্যকার ভিতরে ও বাইরে মানুষ এবং দ্রব্য সামগ্রীর আনা নেওয়ার অনুমতি প্রদান করে যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে মানবিক সাহায্য সামগ্রী ও কর্মচারীবর্গের বাধাহীন প্রবেশাধিকার এবং গাজার বাইরে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের অবাধ গমনাগমন। জর্দানের হাশেমী রাজ্য এবং মিশরের আরব প্রজাতন্ত্র তাদের নিজস্ব কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ধরনের সাহায্য নিশ্চিত করায় সম্মেলনে তাদের এ গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

২৩। বর্তমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক মানবিক সংকট নিরসনের জন্য Quartet-কে তার জরুরী চেস্টার জন্য এ সম্মেলন থেকে আহবান করা হয়। শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানোর জন্য দুই পক্ষের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ১৯৬৭ সনে সে প্যালেস্টাইন অধিকৃত হয়েছিল সে প্যালেস্টাইন ভুখন্ড থেকে জবর দখল তুলে নেওয়ার জন্য রোড ম্যাপের পুরোপুরি বাস্তবায়ন চেয়ে এ সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় রোড ম্যাপ বাস্তবায়িত হলে দুটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে এ সংকটের নিরসন হবে যেটার ভিত হলো জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবাবলী টার্মার্স অফ রেফারেন্স এবং মধ্য প্রাচ্যে শান্তি অর্জনের ফর্মুলার নীতি। এ সম্মেলন শান্তি অর্জনের এ ফর্মুলার পুনঃ প্রবর্তনকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত দুইটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্মেলন দুটি নভেম্বর-২০০৭ এবং ডিসেম্বর-২০০৭ সনে যথাক্রমে আন্নপলিম এবং প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্যালেস্টাইন ইসরাইলী এবং আবর ইসরাইলী বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে একটি সঠিক টেকসই ও সমন্তীত সমাধাণ খুজে বের করার জন্য এ সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি উদাত্ত আহবনা জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে ২০০৭ সনে সৌদি আরবের রীযাদে মে সিদ্ধান্ত গুলো গ্রহণ করা হয়। সেগুলোর গুরুত্ব কে পুনরায় উল্লেখ করা হয় বিশেষত ২০০২ সনের মার্চে বৈরুত লেবাননে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর পুনরায় জোর দিয়ে আলোকপাত করা হয়।

২৪। এ সম্মেলনে প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক দলগুলো যে দ্বিধাবিভক্ত সে ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ২০০৭ সনের জুন মাসের আগে গাজা উপত্যকায় যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং বৈধ কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ভৌগলিক অখন্ডতা এবং প্যালেস্টাইনের জনগনের ঐক্য বজায় রাখার জন্য এ সম্মেলন থেকে জোর দাবী জানানো হয়। জাতীয় পর্যায়ে মিলন এবং প্যালেস্টাইনীদের জাতীয় স্বার্থ অর্জন করার জন্য প্যালেস্টাইনীদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে সংলাপের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন (PLO) যেটা প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনী জনগন ও

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃপক্ষের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি তার প্রতি সম্মেলনের পূর্ন সমর্থন পুনঃব্যক্ত করা হয়। অধিকন্ত প্যালেস্টাইনের সব গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি এ সম্মেলনের সমর্থনকে পুনঃব্যক্ত করা হয়।

২৫। মিশরের আরব প্রজাতন্ত্র প্যালেস্টাইনী জনগনের কষ্ট লাঘব এবং বর্তমান মানবিক সংকট এড়ানোর জন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার প্রশংসা এবং সমর্থন এ সম্মেলন থেকে জানানো হয়। অধিকন্ত মিশরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ হোসনী মুবারক প্যালেস্টাইনী গোষ্ঠির মতানৈক্যের শীঘ্র অবসান ঘটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে সংলাপের প্রস্তাব দিয়েছেন এ সম্মেলন তার সমর্থন জানিয়েছে। এ সংলাপের ভিত হবে প্যালেস্টাইনীদের জাতীয় ঐক্য।

২৬। ইরাকী-সিরীয়, ইরাকী-জর্দানের সীমান্তে আটকে পরা দুই হাজার প্যালেস্টাইনী শরনার্থীকে সেবাদানের জন্য সম্মেলন সুদানের প্রশংসা করে এবং ইসলামী সংহতির উপর গুরুত্ব রোপ করে।

২৭। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২/১৯৬৭ এবং ৩৩৮/১৯৭৩ নম্বর প্রস্তাব, শান্তির জন্য ভূমি ফর্মূলা, মাদ্রিদ শান্তি সম্মেলনের টার্মস অফ রেফারেন্স এবং আরব শান্তি প্রচেষ্টার আলোকে সিরীয় গোলান থেকে ইসরাইলী বাহিনীকে পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ২৮ মার্চ ২০০২ সালে বৈরুতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আরব শান্তি প্রচেষ্টা গৃহীত হয় এবং মার্চ, ২০০৭ সালে রীয়াদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এটা পুনঃনিশ্চিত করা হয়।

২৮। লেবাননের সংকট নিরসনের জন্য সম্মেলন থেকে সমর্থন পুনঃ ব্যক্ত করা হয় এবং লেবাননী রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আবেদন করা হয়, তারা যেন সার্বিক সময়ে যার প্রতি সবার সম্মতি আছে এমন প্রার্থীকে নির্বাচিত করে এবং যত শীঘ্র সম্ভব একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করে। লেবাননে বিভক্তি প্রতিরোধ করতে হলে এবং দেশটাকে আবার ঐক্য, শান্তি এবং স্থিরতার পথে ফিরিয়ে আনতে হলে যত শীঘ্র সম্ভব একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে হবে।

২৯। লেবাননের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের বিচার-বুদ্ধিহীন ইসরাইলী আগ্রাসন এবং এ সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অপরাধকে এ সম্মেলন কঠোরভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করে। এসব অপরাধের বিরুদ্ধে আইনগত অভিযোগ আনা প্রয়োজন। এ আক্রমণের কারণে লেবাননে যে প্রাণহানী এবং ক্ষতি সাধিত হয় সেজন্য ইসরাইলকে পুরোপুরিভাবে দায়ী করা হয়। এ সম্মেলনে লেবাননের অবিচলিত অবস্থানের এবং বীরত্বপূর্ন প্রতিরোধের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আবেদন করা হয়। ইসরাইল যাতে লেবাননের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করে, লেবাননের সার্বভৌমত্বের এবং জাতিসংঘের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাবের অবমাননা না করে সে মর্মে ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টির প্রস্তাব গৃহীত হয়। দক্ষিণ লেবাননে এবং লেবাননের পুরো ভূখন্ড জুড়ে ঐ দেশের সেনাবাহিনী যে ভূমিকা রাখে সেজন্য তাদের প্রশংসা করা হয়।

৩০। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করার জন্য বিশেষতঃ সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ফাতাহ আল ইসলামের মূল উৎপাদনের জন্য লেবানন সরকার এবং সৈন্য বাহিনী যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সম্মেলন তার সমর্থনকে নিশ্চিত করে। নাহার আল

Dhaka University Institutional Repository

বারীদ ক্যাম্প পুনঃ নির্মান এবং এ ক্যাম্পের ছিন্নমূল মানুষের প্রর্ত্যাবর্তনকে নিশ্চিত করার জন্য লেবানন সরকারের চেষ্টাকে সমর্থন জানানোর জন্য এ সম্মেলন আহবান জানিয়েছে।

৩১। প্রেসিডেন্ট রাফিক আল হারিরী এবং তার সঙ্গীদের হত্যার কারণ উদঘাটন করার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার জন্য এ সম্মেলন দাবী করে। সুবিচার নিশ্চিত করা, আগ্রাসন থেকে লেবাননের জনগণকে রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য এ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শীঘ্র শুরু করার জন্য এ সম্মেলনে দাবী উত্থাপন করা হয়।

৩২। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সিরীয়ার উপর যে একতরফা অর্থনৈতিক শাস্তি (Economic Senction) আরোপ করেছে সেটা এ সম্মেলন প্রচন্ডভাবে নিন্দা করে তথাকথিত Syria Accountability Act- প্রত্যাখ্যান করে। এটাকে আইনত অকার্যকর হিসাবে সিরীয়া বিবেচনা করে এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব ও চার্টার ইসলামী সম্মেলণ সংস্প্রস্তাবের একটি জাজ্বল্যমান অবমাননা হিসাবে বিবেচনা করে এবং এটাকে ইসরাইলের পক্ষে একটি নির্লজ্জ পক্ষপাত হিসাবে অভিহিত করে। এ সম্মেলন সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের সাথেও সংহতি প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতানৈক্যের অবসান ঘটানোর জন্য এ দেশের ভুমিকার প্রশংসা করা হয়। অধিকন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে Syria Accountability Act অবিলম্বে পুনঃবিবেচনা করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট আইনে এ পর্যন্ত যত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলো বাতিল করতে সবিনয় অনুরোধ জানানো হয়।

রাজনৈতিক ইস্যু

৩৩। এ সম্মেলন সুদানের জনগণ ও সরকারের সাথে পূর্ণঃ সংহতি জানায়। জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতা, শান্তি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী সুদানের স্থিরতা অর্জনের অব্যাহত চেষ্টার জন্য সমর্থন জ্ঞাপন করে। সার্বভৌমত্ব, একতা এবং ভৌগলিক অখন্ডতা রক্ষা করার চেষ্টার প্রতি এ সম্মেলন পুর্ন সমর্থ জ্ঞাপন করে। দেশের পুণগঠন, উন্নয়ন দারফুর-সহ মানবিক প্রয়োজনের সমাধান দেওয়ার চেষ্টাকে অধিকতর সমর্থন দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এ সম্মেলন আকুল আবেদন করে।

৩৪। দারফুর-সম্পর্কিত উন্নয়নকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষন জানায়, বিশেষ ভাবে AU-UN বাহিনীর সৈন্য মোতায়েন এবং ২০০৭ সনের ২৭ অক্টোবরে লিবীয়ায় শান্তি আলোচনার সূচনাকে এ ধরনের নিষ্পত্তি মূলক এবং চূড়ান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য এ সম্মেলনে সকল বিদ্রোহী গোষ্ঠিকে আহবান করে এবং যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিরা এ সকল আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে অথবা শান্তি অর্জনের পদ্ধতির গোপনে ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদনে করা হয়।

৩৫। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (IDB) সহায়তার দারফুর-এর পুর্ণবাসন এবং পুণগঠনের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার যে চলমান প্রচেষ্টা চলছে সেটাকে এ

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলন সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে। এ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্র এবং দাতা সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশ গ্রহণের আহবান জানানো হয়।

৩৬। ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামীক শীর্ষ সম্মেলনের এগারোতম অধিবেশনের পাশাপাশি সুদান এবং চাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষন জানায় এবং মহামান্য প্রেসিডেন্ট Maitre Abdoulaye Wade-কে দুই ভ্রাতৃপ্রতীম জনগণের মধ্যে শান্তি এবং সৌহাদ্য অর্জনের চেষ্টা করার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

৩৭। জাতিসংঘ চার্টারের সাথে সঙ্গতিপুর্ন সোমালিয়ার সার্বভৌমত্ব, ভৌগলিক অখন্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং একতার প্রতি এ সম্মেলন সোমালিয়ার সম্মানকে পুনর্ঃনিশ্চিত করে। এ সম্মেলন থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে সোমালিয়াতে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে সৈণ্য মোতায়েন এবং অন্যান্য সাহায্য প্রদানের বিষয় বিবেচনা করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এ সম্মেলন থেকে লজিষ্টিক ব্যবস্থা, আর্থিক কারিগরী এবং অন্যান্য ধরনের সমর্থন দেওয়ার জন্য সোমালিয়ায় অবস্থিত আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশনের (AMISOM) বরাবরে অনুরোধ জানানো হয়। অস্থায়ী ফেডারেল সরকার সোমালিয়ার জন্য মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব Ahmadou Onld Abdullah-র মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টাকে সমর্থন জানায় এবং সোমালিয় সরকার বিরোধী দল এমনকি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সোমালিয়ায় যাতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তা ফিরে আসে সে ব্যাপারে চলমান শান্তি স্থাপন পদ্ধতিকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। সোমালিয়ায় আত্মঘাতী আক্রমণ পরিকল্পিত হত্যাসহ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে এ সম্মেলন তীব্রভাবে নিন্দা জানায়।

৩৮। (Burkina Faso) প্রেসিডেন্ট (Blaise Compaore) র পৃষ্টাপোষকতায় (Orngadougou) তে প্রেসিডেন্ট (Laurent Gbagabo) এবং Kikafur Soro-র মধ্যে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সম্মেলন সেটার প্রশংসা করে। আইভরীকোস্টে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সদস্য রাষ্ট্র, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সাধারণ সচিবালয় এবং মুসলমি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক, বস্তুগত এবং লজিস্টিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। আইভরিকোস্টের পুনগঠনে সাহায্য প্রদান করার জন্য ইসলামী দাতা দেশগুলো একটি সম্মেলন আহবান করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে মর্মে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) মহাসচিবকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩৯। এ সম্মেলন গিনী বিসাউয়ের কতৃপক্ষ এবং জনগণের সাতে পুর্নসংহতি পুনঃব্যক্ত করে। জাতীয় সমঝোতা, দীর্ঘ মেয়াদী শান্তি এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের চেষ্টার প্রতি সমর্থন জানানো হয়। গিনী বিসাউয়ের পুনগর্ঠন, উন্নয়ন এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা মিটাতে যাতে সেদেশ আরোও সচেষ্টা হতে পারে এজন্য এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরোও অধিক সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪০। এ সম্মেলন প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্বাধীন মিডিয়া, নিরাপত্তা সেকটর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সেকটরে উন্নতি এবং আফগানিস্তানে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪১। সম্মেলনে আফগানিস্তানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রশংসা করা হয় এবং ঐ দেশের জনগণের জন্য সৃষ্ট সাহায্য তহবিলের মাধ্যমে দেশটির উন্নয়নের জন্য আরোও উদারভাবে দানের জন্য অনুরোধ করা হয়। অধিকন্তু টোকিও ২০০১, বার্লিন ২০০৪ এবং লন্ডন ২০০৬ এর দাতা সম্মেলনে দাতারা সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটার জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

৪২। চৌত্রিশতম ICFM (ইসলামাবাদ ১৫-১৭ মে)-তে আফগান ইসলামী প্রজাতন্ত্র উলামা এবং মুসলমি জ্ঞানীদের জন্য কাবুলে যে আন্তজার্তিক সম্মেলন করতে চায় সে প্রস্তাবকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষণ জানায়। এ সম্মেলনের উদেশ্যে হবে ইসলামের মহান নীতিমালা এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পৃষ্টাপোষকতায় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইসলামের ভূমিকা।

৪৩। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহযোগিতার মাধ্যমে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য তুরস্ক যে Ankar Process শুরু করে ছিল সেটাকে সচল রাখার জন্য এ সম্মেলন জোরালো সমর্থন প্রকাশ করে।

৪৪। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে পাকিস্তান এবং ইরান প্রজাতন্ত্রের গভীর প্রশংসা করা হয়। কারণ তারা বিরাট সংখ্যাক আফগান অধিবাসীদের অন্ন সংস্থান করে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে যে গুরুভার এদেশগুলা গ্রহণ করেছিল সেটাও এ সম্মেলন স্বীকার করে।

৪৫। এ সম্মেলন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট এজেন্সীকে এ মর্মে অনুরোধ করে তারা যেন আফগান শরনার্থীদেরকে আরো বৃহৎ পরিসরে সাহায্য করে যাতে করে আফগানরা তাদের মূল সমাজে ফেরত আসতে পারে এবং আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতায় নিজেদের অবদান রাখতে পারে।

৪৬। তালেবান, আল কায়েদা এবং অন্যান্য চরমপন্থী গোষ্ঠির সন্ত্রাসমূলক এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ড এবং আফগান জনসাধারনের বিরুদ্ধে যে উর্ধ্বমূখী আত্মঘাতীমূলক আক্রমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেগুলোর বিরুদ্ধে এ সম্মেলন গভীবভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করছে।

৪৭। কমোরসের জাতীয় সরকার শাসতন্ত্র অনুযায়ী যাতে জাতীয় ঐক্য পুনঃস্থাপন করতে পারে সেজন্য এ সম্মেলন তার জোরালো সমর্থন পুনঃনিশ্চিত করছে। অধিকন্তু দীর্ঘ মেয়াদী শান্তি, উন্নতি এবং উন্নয়নের ধারা সুগম রাখার জন্য আনযুয়ান দ্বীপের নেতাদেরকে তাদের বিদ্রোহে ইতি টানার অনুরোধ জানানো হয়।

৪৮। এ সম্মেল পুনঃ ব্যক্ত করে যে, ইরাকের সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য এবং ভৌগোলিক অখন্ডতাকে সকলেরই সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এ সম্মেলন জোরের সাথে আরোও ব্যক্ত করে যে, ইরাকী জনগণের তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করার অধিকার থাকতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এ সম্মেলন গোচরীভূত করেছে যে, ইরাকে বর্তমানে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান, যেটা গঠিত হয়েছে শাসনতন্ত্রে বিধৃত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। বাথ পার্টির মূল উৎপাটন করার জন্য যে আইন ছিল সেটাকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে এ সম্মেলন ইরাকী সরকারকে সাধুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

জানাচ্ছে। দায়বদ্ধতা এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা দ্বারা বাথ পার্টি সংক্রান্ত আইনটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যেটাকে উক্ত সম্মেলন একটি বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৭৭০ (২০০৭) নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী ইরাকে জাতিসংঘ মিশনের অবস্থানের সময়ের বর্ধিতকরণকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষণ জানায়। ২০০৭ সালে ৩ মে শার্ম আল শেখ এ সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তির বাস্তবায়নকেও এ সম্মেলন সাধুবাদ জানায়।

৪৯। ইরাকের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে এ সম্মেলন গুরুত্বারোপ করে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা মর্মে ইরাকের ঘোষণাকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষন জানায়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং চলতি প্রথা এবং চুক্তি বিশেষতঃ যে চুক্তিগুলো আন্তর্জাতিক সীমানা সংক্রান্ত সেগুলোকে মেনে চলার ব্যাপারে ইরাকের ঘোষিত প্রতিশ্রুতিকে এ সম্মেলন স্বাগত জানায়।

৫০। ইরাকী নাগরিক, কর্মকর্তা, আরব ও অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক অথবা পবিত্র স্থান অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর অতীতে যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলছিল অথবা এখনও চলছে-এ সম্মেলন থেকে এর বিরুদ্ধে চরম নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এ হিংস্রতার পরিসমাপ্তি ঘটানো এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কারণগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে সবরা সমর্থনের জন্য অনুরোধ করে এ সম্মেলন সব পার্টির প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করে যার মধ্যে বহুজাতিক বাহিনীও অন্তর্ভূক্ত। এ সম্মেলনের আরোও আবেদন হলো ইরাকী জনগনের বেসামরিক এবং ধর্মীয় অধিকারকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং ইরাকের ধর্মীয় জায়গা, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করা।

৫১। এ সম্মেলন থেকে বাগদাদে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সমন্তয় অফিস খোলার জন্য দাবী জানান হয় এবং এ কারণে ইরাকী সরকারের একটি অফিস বিল্ডিং প্রদানকে সাধুবাদ জানানো হয়। অধিকন্ত ইরাকী প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার সূত্রপাত করার জন্য এবং এ ব্যাপারে পাসস্পরিকভাবে স্থিরকৃত তারিখে নিকট ভবিষ্যতে একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সচিবালয় কর্তৃক একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের ইচ্ছাকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষণ জানায়।

৫২। ইরাকে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে তাদের দূতাবাস পুনরায় খোলার জন্য আহবান জানান হয়। এর মাধ্যমে এ সদস্য রাষ্ট্র স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

৫৩। সম্মেলনে ইরাকে গত সরকার কর্তৃক যুদ্ধ বন্দী এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকদের হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। অধিকন্ত এ সরকার কর্তৃক এ অপরাধ গুলোকে দশ বৎসরের বেশি সময়কাল গোপন রাখাকেও এ সম্মেলন নিন্দা করে। কারণ এ কাজটিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লংঘন বলে বিবেচনা করা হয়। সম্মেলন থেকে অপরাধ সংঘটন কারীদের বিচারের দাবী ওঠে। এ সম্মেলন জাতিসংঘের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সমন্তয়কারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিখোঁজ কুয়েতী নাগরিকদের অদৃষ্ট জানার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪। জাতীয় সমঝোতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ভূমিকাকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষণ জানায়। যার মধ্যে ইরাকে সমঝোতার জন্য মুসলিম নেতাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অন্তর্ভূক্ত। এ সম্মেলটি ইন্দোনেশিয়ার উদ্যোগে বোগরো (Bogor) ২০০৭ সালের ৩-৪ এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। যেটা ইরাকী সমাজের বিভিন্ন অংশে পারস্পরিক সমঝোতা, শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

৫৫। সমাজতান্ত্রিক লিবীয় আরব জামহুরিয়ার উপর যে একতরফা শাস্তি বিধান করা হয়েছিল সেটার প্রত্যাহারকে এ সম্মেলন স্বাগত জানায়। এ শাস্তির কারণে যে ক্ষতি হয়েছিল লিবিয়া-এ ক্ষতিপুরন পাওয়ার জন্য হকদার বলে এ সম্মেলন স্বীকার করে। এ সম্মেলন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পূববর্তী অবস্থানকে পুনঃ নিশ্চিত করে। লিবীয় নাগরিক আব্দুল বাসিত আল মেগরাহীর রুলিংয়ের বিরুদ্ধে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। এ সম্মেলন লিবীয় নাগরিকের আশুমুক্তি দাবী করে। কারণ তার উপর রুলিং প্রদানের আইনগত কোন ভিত্তি ছিলনা পর্যবেক্ষক এবং একাধিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইন বিশারদ এটি নিশ্চিত করেছেন। এ ব্যাপারে উক্ত লিবীয় নাগরিকের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মানবিক অধিকার সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয় তারা যেন সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির উপর তার মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

৫৬। জাতিসংঘ গৃহীত প্রস্তাবের আলোকে জন্মু এবং কাশ্মীরের জনগনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আইনসংগত অধিকারের প্রতি এ সম্মেলন তার সমর্থন পুনঃনিশ্চিত করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রতিবেদনের সুপারিশ গুলোকে এ সম্মেলনে পুরো পুরিভাবে বাস্তবায়নের দাবী জানানো হয়। কাশ্মীরী জনগনের মানবিক অধিকারের প্রতি এ সম্মেলন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং ভারতীয় অধিকৃত কাশ্মীর থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর অপসারনের দাবী করে। এ সম্মেলন থেকে ভারতকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তথ্য অনুসন্ধান মিশন এবং অন্যান্য মানবিক অধিকার সংস্থাকে ভারতে অধিকৃত জম্মু এবং কাশ্মীর যেতে দেয় যাতে করে তারা ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে মানবিক অধিকারের অবস্থা পরীক্ষা করতে পারে।

৫৭। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার Contact Group-এর সুপারিশগুলোকে এ সম্মেলন সমর্থন করে। এ সম্মেলন কাশ্মিরীজনতার সত্যিকার প্রতিনিধি (True Representative) কর্তৃক উপস্থাপিত স্মারকলিপি লক্ষ্য করে এবং কাশ্মিরী জনগনের ইচ্ছা ও আশার উপর ভিত্তি করে জন্মু এবং কাশ্মীর বিরোধের সঠিক এবং শান্তিপূর্ন সমাধানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সমর্থনকে পুনঃনিশ্চিত করে।

৫৮। ভারতের সাথে চলমান Composite Dialogue- এ পাকিস্তান প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে এ সম্মেলন প্রশংসা করে। অধিকন্ত যে আন্তরিকতা, নমনীয়তা এবং সাহসের সাথে জন্মু এবং কাশ্মীর বিরোধের প্রস্তাব এগিয়ে নেওয়া হয়েছে এ সম্মেলন থেকে তার প্রশংসা করা হয়। এ সম্মেলন ভারতকে অনুরোধ করে জম্মু এবং কাশ্মীর বিরোধের ব্যাপারে একটি ন্যায্য এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছানোর ব্যাপারে তারা যেন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ভারতের সাথে Composite Dialogue যাতে চালু থাকে সে জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার একটি বিরতিহীন চেষ্টার জন্য সম্মেলন পাকিস্তানের প্রশংসা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯। ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণে জম্মু ও কাশ্মীরে যে বিরাট মানবিক বস্তুগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ক্ষতি সাধিত হয়েছে সেজন্য এ সম্মেলন জম্মু এবং কাশ্মীরের জনগনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলো যে ত্রান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে সে জন্য এ সম্মেলন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অধিকন্তু উক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সাহায্য সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অন্তর্ভূক্ত দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশ্মীরি ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদানের জন্য সদস্য রাষ্ট্র ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়।

৬০। এ সম্মেলন থেকে হিন্দু উগ্রপন্থীদের দ্বারা বাড়ী, মসজিদ এবং চারার-ই-শরীফ ইসলামী কমপ্লেক্স ধ্বংসের নিন্দা জানানো হয়। এ সম্মেলন মুসলিম জনগন এবং তাদের পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং বাড়ি মসজিদের আদি জায়গায় এটা পুনর্নির্মাণের যে প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়েছিল তা বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকাকে এ সম্মেলন অনুরোধ জানায়।

৬১। আযারবাইজান প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে আরমেনীয় প্রজাতন্ত্রের চলমান আক্রমণকে এ সম্মেলন পুনরায় ঘৃনা জানায়। এ আক্রমণ জাতিসংঘ চার্টার এবং আন্তর্জাতিক আইনের আদর্শের একেবারে নির্লজ্জ অবমাননা। অধিকৃত আযারবাইজান ভূখন্ড থেকে আরমেনীয় বাহিনীর সামগ্রিক নিঃশর্ত এবং আশু অপসারনের জন্য এ সম্মেলন থেকে অনুরোধ জানানো হয়। এ সম্মেলন আর্মেনিয়াকে নিন্দা করে এবং আরমেনিয়া যাতে স্মৃতিসোধ ধ্বংসের বিরতীহীন কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে সে মর্মে এ সম্মেলন থেকে দাবী উথাপন করা হয় তার যেন আযারবাইনের সাথে সংহতি আরোও জোরদার করে এবং আজাববাইযানের পুর্ন সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগলিক অখন্ডতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আজাববাইযানকে পূর্ণ সমর্থন করে। "আজারবাইযানে অধিকৃত এলাকার পরিস্থিতি" এ শিরোনামে UNGA-র চলতি অধিবেশনে আযারবাইজান যে ড্রাফট প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে সেটার প্রতি ইসলামী সম্মেলন সংস্থা শক্তিশালী এবং অটুট সমর্থন জানানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, একই ব্যাপারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে যে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়েছিল তার সাথে UNGA-র অধিবেশনে উপস্থাপিত ড্রাফট প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে।

৬২। ২০০৪ সালের ২৮ মে তারিখে জাতিসংঘের তদানীন্তর মহাসচিব তুর্কী সাইপ্রিয় মুসলমানদের ন্যায্য দাবীকে জোর সমর্থন জানিয়ে যে প্রতিবেদন তৈরী করেন, সেটা তদানীন্তন মহাসচিব ২০০৭ সালের ৪ জুনের প্রতিবেদনে S/2007/328 এবং ২০০৭ সনের ৩ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পুর্ববর্তী সম্মেলনে প্রতিবেদনগুলো উপস্থাপিত হয়। তুর্কী সাইপ্রিয়টদের কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অবসান চায়। এ সম্মেলন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আকুল আবেদন জানায়। তারা যেন আর দেরী না করে তুর্কী সাইপ্রিয়টদের এ বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটায়। জাতিসংঘের কমপ্রিহেনসিভ সেটেলমেন্ট প্লানের উদ্দেশ্য হলো দুটি স্থাপক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি দ্বি-অঞ্চল অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা, যেখানে কোন পক্ষই একে অপরের উপর

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্ব চাইবেনা এবং গ্রীক সাইপ্রিয়টরা তুর্কী সাইপ্রিয়টদের প্রতিনিধিত্ব করেনা। জাতিসংঘের পরিকল্পনার ভিত্তিতে সাইপ্রাস ইস্যুর একটি ব্যাপক সমাধানে গ্রীক সাইপ্রিয়টদের অনিচ্ছার কারণে এ সম্মেলন গভীর হতাশা প্রকাশ করে। জাতিসংঘের মহাসচিবের মধ্যস্থতায় এবং জাতিসংঘের কমপ্রিহেনসিভ সেটেলমেন্ট প্লানের ভিত্তিতে সাইপ্রাস সমস্যার ব্যাপক সমাধানে তুর্কী সাইপ্রিয়ট পক্ষের সংশ্লিষ্টতাকে এ সম্মেলন জোর সমর্থন জানায়। এ সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে আবারও সদস্যরাষ্ট্রদের অনুরোধ জানায় তারা যেন তুর্কী সাইপ্রিয়টদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন তাদের সম্পর্কের পরিধি বাড়ায় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে উৎসাহিত করে তারা যেন তুর্কী সাইপ্রিয়টদের সাথে উচ্চ পর্যায়ে সফর বিনিময় ব্যাবসায়ী প্রতিনিধিদল প্রেরণ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ক্রীড়া সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার গৃহীত প্রস্তাবগুলো বিশেষ করে প্রস্তাব নম্বর ২-৩১/পি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলো যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা সচিবালয়কে জানানোর জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অনুরোধ করেছে।

৬৩। ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী কসোভো সংসদ কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতা এ সম্মেলন স্বাগত জানায়। বলকানের মুসলমানদের প্রতি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার চলমান উৎসাহের কথা স্মরণ করে এ সম্মেলন কসোভোর জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করে।

৬৪। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সীমান্তের মধ্যে বসনিয়া ও হার্জিগোভিনার একতা ভৌগলিক অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব সংরক্ষনের যে প্রতিশ্রুতি সদস্য রাষ্ট্রগুলো দিয়েছে সে প্রতিশ্রুতিকে এ সম্মেলনে পুনঃনিশ্চিত করা হয়। বসনিয়া ও হারজিগোভিনা হলো বিভিন্ন জাতি, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠির লোকের আবাসস্থল।

৬৬। পরবর্তীতে কাজাজিস্তানের অরগেনিজেশন অন সিকিউরিটি এন্ড কুপারেশন ইন ইউরোপের চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করার আলোকে এ সম্মেলন অবগেনিজেশন অন সিকিউরিটি এন্ড কুপারেশন ইন ইউরোপের সাথে মিথস্ক্রিয়ার উন্নয়নকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষণ জানায়।

৬৭। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে মুসলিম জাহানকে তৈরী করার জন্য দশ বৎসর মেয়াদী POA-এর কর্মসূচীর প্রতি এ সম্মেলন তার প্রতিশ্রুতিকে পুনঃনিশ্চিত করে।

৬৮। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সচিবালয় POA-এর দশ বৎসর মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে যে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে তার উপর গুরুত্ব-আরোপ করেছে এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সচিবালয়, সহায়ক সংস্থা এবং সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের মাধ্যমে এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এ সম্মেলন তার প্রশংসা করেছে।

৬৯। এ সম্মেলন থেকে নিউইয়াক, জেনেভা ইউনেস্কো (UNESCO), ওয়াশিংটন, ভিয়েনা এবং ব্রাসেলসে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কার্যক্রমের প্রশংসা করা হয় এবং এ মর্মে তাদেরকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং জাতিসংঘের অন্যান্য এজেন্সীর সকল মিটিংয়ের পূর্বে ও পরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থানের সমন্বয় করে এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার যথাযথ প্রস্তাবের আলোকে অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সভায় উল্লিখিত কাজটি করে। এ সম্মেলন থেকে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। তারা যেন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবাবলী উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলোর পক্ষে ভোট দান করে। তাদেরকে আরোও অনুরোধ করা হয় তারা যেন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সম্মেলনে উপস্থপিত সে প্রস্তাবগুলো মেনে চলে যেগুলোতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার একটি সাদৃশ্য অবস্থান আছে। এ সম্মেলন ইসলামী সম্মেলন গোষ্ঠিকে বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রণ করা হয়। কারণ তারা যেন আলাপ চালিয়ে যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠি যাতে এ আলোচনাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে।

৭০। ব্রাসেলসে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অফিস খোলার কাজের অগ্রগতিকে এ সম্মেলন সন্তুষ্টির সাথে সাধুবাদ জানায় এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে সমর্থন দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এ সম্মেলন আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, এ অফিসটি দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সংলাপ এবং আলোচনা উৎসাহিত করবে, উভয় পক্ষের সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্বজনীন স্বার্থ, অধিকতর সমঝোতা এবং স্মৌহার্দের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপিয় উইনিয়ন এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার কর্মসূচীকে জোরদার করবে।

৭১। এ সম্মেলন থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিবকে অনুরোধ জানানো হয়, তিনি যেন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থা ও গোষ্ঠির সাথে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সহযোগিতার অধিকতর উন্নতি কল্পে তার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে বিলি করার জন্য এ বিষয়ে উপর একটি জরীপ চালাতে, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিবের কাছে এ অনুরোধ করার উদ্দেশ্যে হলো এটা জোর দিয়ে বলা যে, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা এবং গোষ্ঠি তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ, জোরদার করতে হবে এবং তাদের পলিসিভিত্তিক এবং কার্যকরী সহযোগিতা থাকতে হবে।

৭২। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নকে উন্নীত করতে এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে এ সংস্থার মহাসচিবকে তার চলমান চেষ্টা এবং প্রশংসনীয় উদ্যগ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ সম্মেলন পুর্ন সমর্থন এবং প্রশংসা জানিয়েছে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের এ চলমান চেষ্টা এবং উদ্যমের উদ্দেশ্যে হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল অংশিদারদের সংস্থায় কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে এ সংস্থার মর্যাদা বৃদ্ধি করা। অংশিদারদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো জাতীয় সরকার সমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বিশেষ করে জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন এজেন্সী সমূহ। আফ্রিকান ইউনিয়ন, লীগ অফ এবার স্টেট আসীয়ানা (ASEAN) EU, OAS, OSCE, কাউন্সিল অফ ইউরোপ, UNESCO, WHO, WTO, এবং ECO।

৭৩। এ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তকে পুনঃনিশ্চিত করে বলা হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের কোন অধিবেশনে মুসলিম উম্মাহর সঠিক প্রতিনিধিত্বকে যদি অবহেলা করা হয় তাহলে সেটা মুসলিম জাহানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেনা। এ সম্মেলন থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কনট্যাক্ট গ্রুপকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলন সংস্থা সদস্য রাষ্ট্রের অবস্থানকে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে। এর উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপক সমন্বয়ের কাজকে উন্নীত করা এবং সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলো যাতে নিরাপত্তা পরিষদে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তা নিশ্চিত করা। সম্মেলন এটা পুনঃনিশ্চিত করে যে, নিরাপত্তা পরিষদের পুনঃগঠনের বিষয়টিকে কোন কৃত্রিম সময় সীমার মধ্যে বেধে রাখা যাবেনা এবং এ ইস্যুতে মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৭৪। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে হস্তক্ষেপের প্রবণতা এবং একতরফা কর্মকান্ড বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে সত্যিকার অর্থে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করাতে এ সম্মেলন এ দুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ সম্মেলন জোর দিয়ে বলেছে যে, নিরাপত্তা পরিষদকে পুরোপুরি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। অধিকন্ত এ সম্মেলন ঐ পলিসিগুলোর ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যেগুলো এ পরিষদকে সুবিচারের মাধ্যমে কাজ করতে বাধাগ্রস্থ করে এবং এভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংস করার চেষ্টা করে। সম্মেলনে জোর দিয়ে বলে যে, নিরাপত্তা পরিষদ তার আইন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহ সংক্রান্ত ইস্যুতে এ পরিষদ বার বার তার ব্যর্থতার জন্য দায়ী থাকবে।

মুসলিম সম্প্রদায় এবং সংখ্যা লঘিস্টদের ইস্যু

৭৫। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বহির্ভূত দেশ সমূহে মুসলিম সম্প্রদায় এবং সংখ্যা লঘিষ্টদের দাবী আদায়ের পক্ষে সুবিচার পাওয়ার জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব যে চেষ্টা উদ্যম এবং প্রভাব প্রয়োগ করেছেন এজন্য এ সম্মেলন তার এ কাজে সমর্থন এবং অনুমোদনের পুনরাবৃত্তি করেছে। এ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাকে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী এবং দশ বৎসর মেয়াদী কর্মসুচী সেটা ২০০৫ সনে মক্কা আল মোকাররমাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটার বাস্তবায়নে সচেষ্ঠা হতে হয়েছে। মহাসচিবের চেষ্টা বিশেষ করে দক্ষিণ ফিলিপাইন, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, মায়ানমার প্রজাতন্ত, গ্রীসের পশ্চিম থ্রেস, বলকান ককেসাস, ভারত এবং অন্যান্য দেশে মুসলমানদের ইস্যু নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এ সম্মেলন প্রশংসা করে। এসব কিছুই করতে হয়েছে মুসলিম সংখ্যা লঘুরা সে সব দেশে বসবাস করছে সে দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের উপর সম্মান দেখিয়ে। এ সম্মেলন জোর দিয়ে আরোও বলা হয়ে যে, বর্তমানের চ্যালেঞ্জগুলো সংলাপ এবং সহযোগিতার নীতি গ্রহণে আগ্রহী।

৭৬। এ সম্মেলন থেকে ভারতের মুসলমানদের ব্যাপারে বিশেষত গুজরাটের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ সম্মেলন ভারতের মুসলমানদের অবস্থা মনিটর করার জন্য এবং রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা যে চ্যালেঞ্জ এবং কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে সে ব্যাপারে আরোও সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৭৭। পশ্চিম থ্রেসের মুসলমান সংখ্যালঘুদের দাবীর প্রতি এ সম্মেলন তার দৃঢ় সমর্থন জানায়। দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে তুর্কী মুসলমান সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং পরিচিতির স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। অধিকন্ত (Xanthi) এবং (Komotini) নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository

মুফতীদের সরকারী মুফতী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে এবং গ্রীসকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন ইসলামী ওয়াকফের প্রশাসনিক কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করে।

৭৮। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে সাউদী আরবের জেদ্দায় এবং ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ফিলিপাইনের প্রজাতন্ত্রী সরকার মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (MNLF) এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মধ্যে যথাক্রমে যে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সভার হ্যা–সূচক ফলাফলকে এ সম্মেলন সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং এ ফলাফলকে সংরক্ষণ করার জন্য গুরুত্ব -আরোপ করা হয়। ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণ ফিলিপাইনকে এবং সাউদী আরবকে যথাক্রমে সভাপতি এবং সহ-সভাপতির আসন অলংকার করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং ত্রিপক্ষীয় সভার সুফল অর্জনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দক্ষিণ ফিলিপাইনের জন্য গঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সকল সদস্যদের প্রশংসা করা হয়, উল্লেখ্য যে, শান্তিচুক্তি যাতে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা যায় সে মর্মে সম্ভাব্য প্রস্তাবাবলী যাতে তৈরী করা যায় সেজন্য মহাসবিকে অনুরোধ জানানো হয়।

৭৯। থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলিয় প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা মনিটর করার জন্য এ সংস্থার মহাসচিবের দীর্ঘ মেয়াদী চেস্টার প্রশংসা করা হয়। ২০০৭ সালের মে মাসে তার থাইল্যান্ড সফরের হ্যা–সূচক ভালো ফলাফলের জন্য এ সম্মেলন থেকে পূর্ণ সন্তষ্টি প্রকাশ করা হয় এবং থাইল্যান্ডে ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মধ্যে যাতে সহযোগিতার পরিধি বৃদ্ধি পায় সে ব্যাপারে সক্রিয় হতে মহাসচিবকে অনুরোধ করা হয়। থাইল্যান্ডে সরকারের সাথে আলোচনা করে দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলমানদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্যও তাকে অনুরোধ করা হয়।

৮০। কাজাকিস্থানের সেমিপালাতিনসকে ২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে সেন্ট্রাল এশিয়ান নিউক্লিয়ার ফ্রি যোন ট্রিটি (CAPWFZ) স্বাক্ষরকে সাদর সম্ভাষণ জানায়।

৮১। এ সম্মেলন দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছে যে, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমানবিক অস্ত্র-বিস্তার রোধ করার জন্য বহুজাতিক আলাপ/আলোচনার পথই শ্রেষ্ঠ, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে জাতিসংঘ যে প্রাথমিক দায়িত্ব এবং কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারটাকে এ সম্মেলন পুনঃনিশ্চিত করেছে।

৮২। কনফারেন্স অন ডিজআরমামেন্ট-এর সদস্যসহ সকল সদস্য রাষ্টকে বিশেষ করে নিউক্লিয়ার উইপনস স্টেটগুলিকে (NWS) সম্মেলন থেকে এ মর্মে অনুরোধ করা হয় তারা যেন বহুপক্ষিক আইনতঃ বাধ্যতামূলক এমন একটা দলিল তৈরী করেন যেটি যে সব দেশ আনবিক শক্তিবিহীন তারা যেন আনবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ থেকে নিঃশর্তভাবে আনবিক অস্ত্রের ব্যবহার অথবা ব্যবহারের হুমকি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকে। কনফারেন্স অন ডিজআরমামেন্ট কে সম্মেলন থেকে এ মর্মে অনুরোধ করা হয় যে তাদের আলোচ্য সুচীতে যা কিছুই থাকুক না কেন তারা যেন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে আনবিক শক্তি নিরস্ত্রাকরনের উপর আলোচনা শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

৮৩। NPT- তে এবং স্ট্যাটিউট অফ দি ইন্টারন্যাশনাল এটমিক এনার্জি এজেন্সীতে (IAEA) বিধৃত আছে যে এটা প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অধিকার যে শান্তিপুর্ন উদ্দেশ্যে আনবিক শক্তির ব্যবহার করতে পারবে। এ সম্মেলন জোরের সাথে সমর্থন করে যে ইরানের পারমানবিক ইস্যু একমাত্র শান্তি পুনৃ উপায়ের মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে এবং পুর্বশর্ত ব্যতীত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে IAEA, NPT-এবং IAEA আইনের কাঠামোর মধ্যেই এটার নিষ্পতি করতে হবে। ইরানের উপর সৃষ্ট চাপের ব্যাপারে এ সম্মেলন থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত চাপের কারণে এ অঞ্চলের ভিতরে এবং বাইরের সম্ভাব্য পরিনামের ইস্যুটাও চিন্তায় আনা হয়। ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং IAEA মধ্যে যে কর্ম পরিকল্পনা করা হয়েছে তাকে এ সম্মেলই সাদর সম্ভাষণ জানায় যেটা দ্বারা অবশিষ্ট ইস্যুগুলোর সমাধান সাধিত হয়েছে।

৮৪। সম্মেলন এটা পুনঃনিশ্চিত করে যে শান্তিপূর্ন উদ্দেশ্যে আনবিক শক্তির ব্যবহার প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ অধিকার। IAEA-র উদ্যোগে আনবিক শক্তির শান্তিপূর্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতাকে এ সম্মেলন উৎসাহিত করে।

৮৫। সশস্ত্র বিরোধের কারনে আফ্রিকাতে যে দুর্ঘটনা প্রকোপ আকার ধারন করেছে, পরিনামে বিশেষত শিশু ও মহিলাদের মৃত্যু হয়েছে এবং সেটা আফ্রিকান অর্থনীতির উপরে নতুন বোঝা সৃষ্টি করেছে সে ব্যাপারে এ সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ সম্মেলন থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ করা হয় তারা যেন সশস্ত্র বিরোধের সাংঘাতিক পরিনামকে দমন করার জন্য কার্যকরীভাবে সাহায্য করে এবং এ কারণগুলোর মূল-উৎপাটন করে। আফ্রিকায় অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য্য এবং বেআইনি চোরাচালানের ব্যাপারে এ সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ সম্মেলনে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আন্তজার্তিক চুক্তি মেনে চলার এবং এক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানায়।

৮৬। আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক স্তরে সামরিক ভারসাম্যহীনতার কারণে যে সামঞ্জস্যহীনতার উদ্ভব হয়েছে তা প্রতিকারের ব্যাপার মনে রেখে অমীমাংসিত বিরোধ মীমাংসা করে এবং সর্বনিম্ন স্তরে রনসজ্জার ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে এ সম্মেলন আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে।

৮৭। জাতিসংঘ চার্টারের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আত্মরক্ষার অধিকারকে এ সম্মেলন স্বীকার করে। এ সম্মেলন জোর দিয়ে বলে যে প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে প্রচেষ্টা প্রস্তাব এবং তৎপরতাকে মোকাবিলা করতে হবে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এজন্য কমাতে হবে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক এবং উত্তেজনা। বিরোধ দমাতে এবং বিরোধের সমাধান করতে হবে। একে অপরের মধ্যে বিশ্বাস তৈরী এবং বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিরস্ত্রীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নীত করতে হবে। এ সম্মেলন গুরুত্ব সহকারে বলে যে প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্রের বানিজ্য বন্ধ করার জন্য যেকোন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা, কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং জনগনের স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার-যাতে খর্ব না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮৮। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে এ সম্মেলন নিরাস্ত্রিকরণ, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ এবং এর সাথে সম্পর্কিত নিরাপত্তার ব্যাপারে একটি নতুন এবং সুষম প্রচলিত মত গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। সেজন্য এ সম্মেলন যত শীঘ্র সম্ভব সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহবানের প্রস্তাব প্রদান করে।

৮৯। এ সম্মেলন থেকে ইসরাইলকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে (NPT) স্বাক্ষর দান করে এবং তাদের সমস্ত পারমানবিক সাজসজ্জা IAEA-র ব্যাপক তত্ত্বাবধানে রাখে। এ অঞ্চলে শান্তি এবং নিরাপত্তা সংরক্ষনের উদ্দেশ্য যত শীঘ্র সম্ভব মধ্যপ্রাচ্যে একটি আনবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার গুরুত্ব পুনঃনিশ্চিত করেছে। এ ব্যাপারে ২০০৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদ প্রদত্ত আরব প্রচেষ্টাকে (Arab Initiative) পুনরায় সমর্থন করেছে।

৯০। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত IAEA-র ৫২ তম সাধারণ সম্মেলনে ইসরাইলী আনবিক শক্তি এবং ভীতি (Israeli Nuclear Capabilites and Threats) আলোচ্য সুচীতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং ঐ সম্মেলনে একই শিরোনামে একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আরব লীগের চেষ্টাকে এ সম্মেলন সমর্থন জানায়।

৯১। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র যারা কেমিক্যাল উইপনস কনভেনশনের ও (CMC) সদস্য, তারা এটা পুনঃনিশ্চিত করেছে যে, কেমিক্যাল উইপনস কনভেনশনকে (CWC) যদি পুরোপুরি বিশ্বজনীন, অবৈষ্যম্য মূলক এবং কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে এটা আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ সম্মেলনে অরগেনিজেশন ফরদি প্রহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপনসকে (OPCW) CWC-র আইন মান্যতা পরীক্ষা করার জন্য একমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে এর ভূমিকার উপর গুরুত্ব রোপ করা হয়। যারা রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তাদের প্রতি CWC শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। অধিকন্ত CWC বিশ্বাস করে যে, রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাকে একটি অত্যবশ্যকীয় মানবিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে। তারা দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছে ইহুদীদের অনমনীয় ব্যবহারের সাথে যারা যুক্ত হয়েছে রাসায়নিক অস্ত্রের গোপন কর্মসূচী হলো এ কনভেনশনের বিশ্বজনীনতার প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বিপদজনক ও হুমকিস্বরুপ।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী পদক্ষেপ

৯২। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কিছু সদস্য রাষ্ট্র ২০০৬ সালের ৩০-৩১ অক্টোবর রাবাতে পারমাণবিক সন্ত্রাববাদ রোধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে চেষ্টা গ্রহীত হয় তার উদ্দেশ্যে হলো সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি গভীর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা যা এ সম্মেলন গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেছে।

৯৩। এ সম্মেলন দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করে যে, সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরিভাবে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বিরোধিতা করে, ইসলাম সুপারিশ করে সহনশীলতা, দয়া এবং অসহিংসতার জন্য। সন্ত্রাসবাদের সাথে কোন গোত্র ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

এবং সংস্কৃতির কোন যোগাযোগকেও এ সম্মেলন নিন্দাজ্ঞাপন করে। এ সম্মেলন থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি সম্মেলন করার জন্য পুনরায় আহবান জানানো হয়। যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করা এবং যারা জাতিসংঘের চার্টার এবং আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করার ন্যায্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ থেকে পৃথক করে দেখা। এ সম্মেলন থেকে সন্ত্রাসবাদের উপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মিটিংয়েরও আহবান জানানো হয়।

৯৪। দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বকে বিঘ্নিত করার জন্য সন্ত্রাসবাদ এখনও হুমকিস্বরূপ কাজ করছে। এর কোন ন্যায্যতা নেই এবং সীমাহীনভাবে এর নিন্দা করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের কোন নির্দিষ্ট-ধর্ম-গোত্র-জাতিগত মৌলিকতা, জাতীয়তা অথবা কোন ভৌগলিক অঞ্চল নেই। এক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকে যদি কোন ধর্মের সাথে বিশেষত ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে এটা সন্ত্রাসবাদের স্বার্থকেই উদ্ধার করবে। আন্তর্জাতিক সংহতি এবং সহযোগীতা ছাড়া সন্ত্রাসবাদকে কার্যকরীভাবে মোকাবিলা যাবেনা। সকল সন্ত্রাসী এবং তাদের সমর্থনকারীদের চিহ্নিত, সংজ্ঞায়িত, নিন্দা, একঘরে করা এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত হবে একটি সার্বজনীন এবং সঙ্গতি পূর্ণ নীতিগ্রহণ করা। সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতীয় প্রকৃতির কারণের এটাকে পৃথিবী ব্যাপী পদক্ষেপের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে প্রধান ফোরাম হলো জাতিসংঘ। সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক রীতির প্রতি পরানুগত্য হলো দেশকে গুরুত্ব পূর্ণ অধিকন্ত ইসলাম অথবা যে কোন মুসলিম দেশকে সন্ত্রাসবাদের সাথে অনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত করার রাজনৈতিক মদদপুষ্ট চেস্টাকে এ সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করে।

৯৫। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস রোধকল্পে জাতিসংঘে যে কৌশল গ্রহণ করেছে সেটা এ সম্মেলন মনযোগের সাথে লক্ষ্য করেছে। এ সম্মেলন সন্ত্রাস দমনের জন্য এমন একটি কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য আবেদন করা হয় যেটা সন্ত্রাসবাদের মূল কারণকে আমলে নেয় এবং যে মানুষেরা বিদেশী দখল দায়িত্বে ঔপনিবেশিক অথবা বৈদেশিক বশ্যতায় থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তাদের এ সংগ্রাম এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এ সংগ্রাম স্বীকার করে যে বিদেশী দখলদারিত্য, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবিচার এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে অস্বীকার করা হলো সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ।

৯৬। একটা চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে রুখে দাড়ানোর জন্য এ সম্মেলন তার দৃঢ়তা পুনঃব্যক্ত করে, যে চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিরূপন এবং ঐ চুক্তির পরিধি নির্ণয় করা যাতে করে ঐ চুক্তি সন্ত্রাস দমনে সক্ষম হয়।

৯৭। দুইটি পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায় নিয়োগের ব্যাপারে যে প্রস্তাব দেওয়া হয় সেটা এ সম্মেলন সমর্থন এবং গ্রহণ করে। উপরন্ত রাজা আব্দুল্লাহ বিন আবুল আযিয সন্ত্রাসবাদ দমন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে প্রস্তাব পেশ

Dhaka University Institutional Repository

করেন (রীয়াদ, ফেব্রুয়ারী-২০০৫) সেটাও এ সম্মেলন সমর্থন করে। এ সম্মেলন অভিমত প্রকাশ করে যে শুধুমাত্র অন্তর্জাতিক সমন্বিত এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের মূল উৎপাটন করা সম্ভব। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তথ্য, বিশেষ জ্ঞান বিনিময়ের সুবিধার জন্য উল্লেখিত কেন্দ্র খোলার জন্য জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, এ কেন্দ্রের সাহায্যে সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠান ও সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনা নিবিড়ভাবে মনিটর করা সম্ভব হবে।

৯৮। তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট যিনে এল আবেদীন বিন আলী তার পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সনের ১৫-১৭ নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, ISESCO-র যৌথ প্রচেষ্টায়, সন্ত্রাসবাদের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন এর বিস্তাব, হুমকি এবং দমন পদক্ষেপ শীর্ষক যে সম্মেলনের আয়োজন করেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং তার সুনাম করা হয়।

৯৯। তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট যিনে এল আবেদীন বিন আলী তার পৃষ্টপোষকতায় ২০০৭ সনের ১৫-১৭ নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং ISESCO-র যৌথ প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসবাদের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন-এর বিস্তার, হুমকি এবং দমন পদক্ষেপ শীর্ষক সে সম্মেলনের আয়োজন করেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং সুনাম করা হয়। উপরন্ত তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট যিনে এল আবেদীন বিন আলী জাতিসংঘের উদ্দোগে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়ে ছিলেন এ সম্মেলন থেকে তার উদ্দ্যোগ নেওয়াকে প্রশংসা করা হয়। এ সম্মেলনটার উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য একটি কৌশল উদ্ভাবন করা সন্ত্রাসবাদের কারণ দূরীভূত করা এবং নৈতিকতা ও বিধি প্রণয়ন করা।

শান্তি, সুবিচার এবং সমতার ভিত্তিতে এটি নতুন পৃথিবী গড়ে তোরার ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সকল্প এ সম্মেলন পুন:ব্যক্ত করে। জাতিসংঘ চার্টারের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আত্মরক্ষার অধিকার, জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখন্ডতা বজায় রাখার উপরও এ সম্মেলন গুরুত্ব রোপ করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং সংহতি বৃদ্ধি করার ব্যাপারেও এ সম্মেলন গুরুত্ব রোপ করে। সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বাস সহযোগিতা এবং সংহতি বৃদ্ধি করার ব্যাপারেও এ সম্মেলন গুরুত্ব রোপ করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধিকল্পে এ সম্মেলন কিছু নীতিমালা এবং পথ-নির্দেশ করে অনুমোদন দান করে। এবং সংস্থার সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে যাতে এ দলিলের বিধিগুলো মেনে চলে সেজন্য সম্মেলন থেকে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এ সম্মেলন থেকে পুনব্যক্ত করা হয় যে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হলো সব মুসলমান রাষ্ট্রের চিন্তার বিষয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং জাতিসংঘ চার্টারের বিধানানুযায়ী তাদের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে এ সম্মেলন তাদের দৃঢ় প্রত্যায় ব্যক্ত করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের ভৌগলিক অখন্ডতা, শক্তির অপব্যবহার অথবা শক্তির ব্যবহারে হুমকি

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান বিতর্কের শান্তিপুর্ন সমাধান এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা এসব বিষয়ে জাতিসংঘের চার্টারের বিধিমালাকে কেউ যাতে কোন চেষ্টা নিতে পারে সে সম্ভাবনা তিরোহিত করেছে। এ সম্মেলন পুনঃ নিশ্চিত করে যে এ নীতিমালাগুলি সকলের নিরাপত্তা বিধানে পূর্বশর্ত।

মানবিক ইস্যু

১০০। মুসলমান দেশগুলিতে UNHCR-এর সহযোগিতায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত মুসলমান দেশগুলিতে শরণার্থীদের অবস্থার উপর সরকারী দায়িত্বের কথা স্মরণ করা হয়।

১০১। সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধে যাতে মানবিক কর্মকান্ড চালানো হয় সে মর্মে সম্মেলন থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ মানবিক কর্মকান্ড চালানোর সময় সবচাইতে বেশী আক্রান্ত জনগোষ্ঠির দিকে যাতে অধিকতর মনযোগ দেওয়া হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়, উপরন্ত এতদিন পর্যন্ত যে মানবিক কর্মকান্ড নেওয়া হয়েছে সেজন্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

১০২। এ সম্মেলনে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু মানাবিক সাহায্য পাঠায় যার মাধ্যমে ইসলামী সংহতির স্পৃহা এবং সম্মিলিত ইসলামী কর্মকান্ড বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটে এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন চলাকালীন সময় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কি মানবিক প্রচেষ্টা চালাতে পারে সেটা নির্ধারনের ব্যাপারে একটি বিশেষ অধিবেশন আয়োজন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০৩। এ সম্মেলন যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য দুর্যোগের সময় মানবিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল সে কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ জানায় তারা যেন সংহতি এবং অংশীদায়িত্বের মাধ্যমে মানবিক সাহায্য প্রদানের কাজ করে তাদের সাহায্য দানের কৌশলটা যাতে টেকসই ও সমষ্টিগত হয় এবং উদ্দেশ্যটা যাতে হয় নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলা, মানব জীবন রক্ষা করা এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

১০৪। ২০০৮ সালের ৭-৯ মার্চ পর্তুগালের স্যালীতে মানবিক ও পরহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য এ সম্মেলন থেকে মহামান্য প্রেসিডেন্ট Abdoulaye Wade- কে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়। এ সম্মেলন থেকে যে চূড়ান্ত ইশতেহার প্রকাশ করা হয় সেখানে মানবিক কর্মকান্ড ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং মানবিক ও পরহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোর প্রশংসা করা হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় মানবিক ও পরহিতকর সংগঠিত করার জন্য এ সম্মেলন থেকে আহবান জানানো হয়। উপরন্ত এ সম্মেলন সংস্থা মহাসচিবকে আদেশ দেন তিনি যেন এ সংস্থার ভূমিকাকে বৃদ্ধি করেন এবং দশ বৎসর মেয়াদী কর্মসূচীতে লক্ষ্য অর্জনে সচেস্ট হন।

Dhaka University Institutional Repository

১০৫। এ সম্মেলন থেকে গুরুত্ব সহকারে বলা হয় যে, ইসলাম ধর্মে মানবিক অধিকারের যে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলিরর উচিত হবে সে কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়া এবং এ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়া। এ সম্মেলন সুনিশ্চিত করে যে এ অধিকারগুলি বিশ্বজনীন। উপরন্ত এ সম্মেলন গুরুত্বারোপ করে বলে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলির উচিত মানবিক অধিকারগুলিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং অবিভাজ্যভাবে দেখা। এ সম্মেলনে 'ইসলামে মানবিক অধিকারের অঙ্গীকার নামা' এবং ইসলামে মহিলা অধিকারের অঙ্গীকার নামার 'ড্রাফট তৈরীর আবেদন করা হয়। উপরন্ত ''সব ধরনের সাম্প্রদায়িক বিভেদের মূল উৎপাটনের জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে যাতে মানবিক অধিকারগুলি বিস্তার লাভ করতে পারে সে উদ্যোগে একটি স্বাধীন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার যে উদ্যোগ চলছে তা যাতে থেমে না যায় এর প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাতে করে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠালাভের সাথে সাথে অঙ্গীকার নামাগুলি ড্রাফটিংয়ের কাজটা তত্ত্বাবধান করা যায়। মানবিক অধিকাররের জন্য এ সম্মেলন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার হাই কমিশনার পদ সৃষ্টির উদ্যোগকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। উপরন্তু সচিবালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন ড্রাফট টার্মস অফ রেফারেন্স এবং এর আর্থিক জটিলতার উপর মুসাবিদা তৈরী করে এবং পরবর্তী ICFM-র সভায় এটা উপস্থাপন করে।

১০৬। এ সম্মেলন মানবাধিকার কাউন্সিল (Human Right Cuncil) যেটা জাতিসংঘের একটি সহায়ক সংস্থা তার প্রতি জোর সমর্থন জানায়। জাতিসংঘের অন্যতম কাজ হলো মানবাধিকারের প্রসার সাধন এবং মৌলিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার ৬০ তম বার্ষিকীতে এ সম্মেলন থেকে সব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়-তারা যেন মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকারের ধারণাকে উপস্থাপন ও দৃষ্টিগোচর করার জন্য এ বার্ষিকীতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। মানবিক অধিকার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণা যেটা ২০০৭ সালে মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়।

১০৭। মানবিক অধিকারের ইস্যুগুলির ব্যাপারে মহাসচিবের ২০০৭ সালের ১২-১৫ মার্চে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা সফর, মানবিক অধিকার কাউন্সিলে তার বক্তৃতা প্রদান এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রতিনিধির সাথে তার ব্যাপক আলোচনার প্রশংসা করা হয়। মুসলিম দেশ সমূহের স্বার্থ রক্ষার্থে জেনেভায় জাতিসংঘ কার্যালয়ে সকলের অংশ গ্রহণ ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপের মূল্যবান চেষ্টাকে এ সম্মেলন প্রশংসা করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি এ সম্মেলন থেকে অনুরোধ জানানো হয় তারা যেন তাদের মধ্যে মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ফোরামে সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখে এবং সামগ্রিক ভাবে মুসলিম সমস্যাগুলির ব্যাপারে জেনেভাতে জাতিসংঘ মানবিক অধিকার কাউন্সিলে তাদের অবস্থানে ঐক্যবদ্ধ থাকে।

১০৮। সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিচার ব্যবস্থায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এ সম্মেলন স্বীকার করে। এ সহযোগিতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের বিরামহীন আলোচনা এর উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অভিন্ন অবস্থানে সমন্বয় সাধন করা এবং অভিন্ন স্বার্থ অর্জন করা বিশেষ করে অগ্রগতিশীল উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবদ্ধ করনের ক্ষেত্রে। ২০০৭ সনের ৪-৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তেহরানে মুসলিম দেশগুলির বিচার বিভাগীয় প্রধানদের প্রথম সম্মেলনকে এ সম্মেলনের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়। মুসলিম দেশগুলির বিচার বিভাগীয় প্রধানরা তাদের প্রথম সম্মেলনে যে সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন সেগুলিকে এগারোতম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে। এ সম্মেলন থেকে সকলের অংশ গ্রহন ভিত্তিক আন্ত:সরকারী আইন বিশারদের একটি দলকে এ সংস্থার আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং চূড়ান্তকরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিচার বিভাগীয় প্রধানদের পরবর্তী সম্মেলনে এ আইনের খসড়াকে বিবেচনা করত: চূড়ান্ত করনের জন্য এ সম্মেলনে উপস্থাপিত হবে এবং এ কার্যক্রমে প্রত্যেক সদস্য রাস্ট্রকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

১০৯। ২০০৬ সনের ১৫-১৭ মে তারিখে ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইসফাহানে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের পুলিশ প্রধানদের যে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এর প্রতিবেদন ও ঘোষণার প্রতি এগারোতম শীর্ষ সম্মেলন সমর্থন জানায়। আইন প্রয়োগকারী এজেন্সীর প্রধানদের নিয়ে পরবর্তী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ২০০৭ সালের ২২-২৩ অক্টোবর মাসে আযারবাইযানের বাকুতে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় ঐ সভাকে এগারোতম শীর্ষ সম্মেলন সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে এবং ২০০৯ সালের প্রথম অর্ধেকের মধ্যে বাকুতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আযারবাইযান প্রজাতন্ত্রের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

১১০। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার চার্টার পরিবর্তনের ব্যাপারে সংস্থার মহাসচিব যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এগারোতম শীর্ষ সম্মেলন এর সুনাম করে। উপরন্ত ২০০৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর মক্কায় যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এর প্রস্তাবাবলীকে কার্যে রুপান্তরিত করার প্রচেস্টাকেও প্রশংসা করা হয়।

১১১। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কাঠামোর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় সেগুলিতে স্বাক্ষর এবং অনুমোদন দেওয়ার জন্য এগারতম শীর্ষ সম্মেলন সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা স্থাপনের ক্ষেত্রে মহাসচিব যে চেষ্টা করেছেন এ সম্মেলন সেটার প্রশংসা করে এবং (ICFM) এর অনুমোদন সাপেক্ষে আরোও সহযোগিতা চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার ব্যাপারে মহাসচিকে উৎসাহিত করা হয়।

১১২। এ সম্মেলন স্বীকার করছে যে, ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেছে এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মানুষের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে রেখেছে। সে কারনে ইসলাম মানবিক অধিকার ভোগের উন্নতি বিধানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব -আরোপ করেছে। উপরন্ত এ সম্মেলন মানবিক অধিকারের ইস্যুকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা ইসলামী শরীয়ার নীতি এবং আইনের সুনাম হানির চেষ্টার ব্যাপারে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ সম্মেলন থেকে জোরালো ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত করা হয় যে, মানবিক অধিকারের বিষয় বস্তুনিষ্ঠ এবং অবিভাজ্য দৃষ্টিকোন থেকে অবলোকন করতে হবে। এর মধ্যে কোন ভেদাভেদের অবকাশ নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্র যাতে তাদের ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে পরের সে মর্মে এ সম্মেলন তাদের মতামত পূর্ণব্যক্ত করে। এ সম্মেলন থেকে আরোও অনুরোধ করা হয় যে, কেউ যাতে অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং সেই রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্বের ক্ষতি করার জন্য মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীনতাকে ছুতা হিসাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। এগারোতম শীর্ষ সম্মেলন এ মর্মে তার সমর্থন জানায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র তার সার্বভৌম অধিকারের বদৌলতে আন্তর্জাতিক দলিলের ব্যাপারে তার নিজস্ব অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকবে। এগারোতম শীর্ষ সম্মেলন থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে এ মর্মে অনুরোধ করা হয়, তারা যেন মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষত প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক ফোরামে তাদের কার্যকরী সংহতি এবং কার্যকারিতা বজায় রাখে যাতে করে যে কোন সদস্য রাষ্ট্রে মানবিক অধিকারকে রাজনৈতিক চাপের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা না হয়।

১১৩। ইসলামকে বারবার মানবিক অধিকার লংঘনের সাথে একত্রিত করার চেষ্টার ব্যাপারে এ সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। উপরন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কোন রাষ্ট্রকে আক্রমনের ব্যাপারে এ সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। একটি সংস্কৃতির কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য যে ক্রমবর্দ্ধমান চেষ্টা চলছোর মুখোমুখি হওয়ার চেস্টাকে এ সম্মেলনে গুরুত্ব রোপ করা হয়েছে। এ চেষ্টার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের মূল্যবোধ মতামত এবং জীবনধারণ পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চায়-পরিনামে উন্নয়নশীল দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় ক্ষতিগ্রস্থ এবং নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিপদের সম্মুখীন হয়। এ কারনেই তেহরানে ন্যাম সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড কালচারাল ডাইভার্সিটি স্থাপনকে এ সম্মেলন সাধুবাদ জানায়।

১১৪। ইসলামে মানবিক অধিকার সম্পর্কিত কায়রো ঘোষণা এবং এর উপ-কমিটির কার্যক্রমকে এ সম্মেলন প্রশংসার চোখে দেখে এবং তাদেরকে এ মর্মে অনুরোধ জানায় তারা যেন ৬০/২৭-পি নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী মানবিক অধিকারের উপর ইসলামিক চার্টার এবং মানবিক অধিকারের উপর ইসলামিক চুক্তি এ দুটি বিষয়ে উন্নয়নের জন্য তাদের কাজ চালিয়ে যান। এ সম্মেলন সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে অনুরোধ জানায় তারা যেন যথাশীঘ্র ইসলামে শিশুর অধিকার চুক্তিটি অনুমোদন করে।

অর্থনৈতিক ইস্যু

১১৫। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে মুসলিম জাহানের অর্থনৈতিক, মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য এ সম্মেলন গুরুত্ব আরোপ করে।

১১৬। সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি পায় সেটার উপর এ সম্মেলন গুরুত্ব রোপ করে। সেজন্য এ সম্মেলন সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সার্ভিসের নেটওয়ার্ক তৈরী, জাহাজী করনের সুবিধা এবং বিমান যোগাযোগের সুবিধা সৃষ্টি এবং যুপপৎভাব এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব ারোপ করে।

১১৭। ডাকার এবং সুদান (Sudan) বিমান বন্দরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র সমূহ এবং আইডিবির সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তকে এ সম্মেলন সাধুবাদ জানায়। এ বিশেষ কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্যেগুলো একটি গুরুত্ব পূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্প শুরু করার নির্বাহী প্রকল্প গ্রহণ ডাকার (Dakar) এবং সুদান বিমান বন্দরের যোগাযোগ স্থাপনের প্রকল্প।

১১৮। জাতীয় অর্থনীতির পরমুখাপেক্ষিতা এবং শক্তি সরবরাহের গুরুত্ব কে বিবেচনায় রেখে শক্তির উৎস এবং পরিবহন রাষ্ট্রকে বহুমুখী করার ব্যাপার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং ভোক্তা ও রপ্তানীকারক দেশগুলির মধ্যে অধিকতর সংলাপের পরামর্শ দেয়।

১১৯। সম্মেলন ওআইসি'র অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রেরণা যোগাতে বেসরকারী খাতের ভূমিকার উপর গুরুত্ব রোপ করে এবং সেই লক্ষ্যে নিজ নিজ বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আগে থেকে সক্রিয় ভূমিকা নেয়ার এবং পারস্পরিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহনে উৎসাহিত করার জন্য সদস্য দেশগুলির প্রতি আহবান জানায়।

১২০। সম্মেলন এই মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে, সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার উচ্চমাত্রা অর্জিত হলে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংহতি এবং তার পরিণতিতে চূড়ান্ত লক্ষ্য ইসলামী অভিন্ন বাজার গঠনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচিত হবে।

১২১। সম্মেলন উন্নয়নশীল ও সর্বাপেক্ষা কম উন্নত দেশগুলির (LDC) পণ্য ও সার্ভিস উন্নত বিশ্বের বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্য আরোও উদারীকরণের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য উন্নত দেশগুলিকে আহবান জানায়। সম্মেলন ওআইসির সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশগুলির জন্য বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য সদস্য দেশগুলিকে উৎসাহিত করে।

১২২। সম্মেলন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার দোহা উন্নয়ন পর্বে অগ্রগতির অভাব লক্ষ্য করে এবং উন্নয়নের বিষয়টিকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সকল প্রক্রিয়ার মুখ্য ও অবিভাজ্য অংশে পরিণত করার ও উন্নয়ন পর্ব যথশীঘ্র সম্পন্ন করার জন্য সংস্থার প্রতি তার আহবান পুনরুল্লেখ করে।

১২৩। সম্মেলন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশেষত সর্বাধিক অনুন্নত দেশগুলিতে বিদ্যমান ব্যাপক দারিদ্র এবং তারই পরিণতিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে এই দেশগুলির অধিকতর প্রান্তিকায়ণে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী দশকে এসব দেশের দারিদ্রতা কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সদস্যদেশগুলো তাদের অঙ্গীকারের কথা পুন:ব্যক্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে আরো ২৫টি সিদ্ধান্ত রয়েছে। এসকল সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে স্বল্প আয়ের দেশ সমূহের (LDC) দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, ক্ষুধা নিবারন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, এসব ক্ষেত্রে দারিদ্র রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতা প্রদান, রাষ্ট্র সমূহের সরকারী নীতির উন্নয়ন, ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। উন্নত রাষ্ট্র সমূহের সাথে উন্নয়নশীল অথবা নিম্ন আয়ের রাষ্ট্র সমূহের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন। Millennium Development Goal অর্জনে মানব সম্পদ উন্নয়নে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পদক্ষেপ গ্রহণ যাতে করে দারিদ্র হ্রাস পায়। ওআইসিভূক্ত দেশে বাণিজ্য অগ্রাধিকার পদ্ধতি TPSOIC এবং PRETAS বিষয়ে ১ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখের গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্কের প্রচেষ্টার প্রশাংসা করা হয় সম্মেলনে। যে সকল দেশ TPSOIC এর ফ্রেম অব এগ্রিমেন্টে এবং PRETAS ও TPSOIC রুল অব অরিজিনাল ২০০৮ এ স্বাক্ষর করেন নি। সে সকল দেশকে স্বাক্ষর প্রদানের আহবান জানানো হয়। সম্মেলনে এগারোতম ট্রেড নেগশিসেটি কমিটি TNC-কর্তৃক ফ্রিপ্রারেনশিয়াল টেরিফ স্কিম (PRETAS) Prolocol-এ স্বাক্ষরকারী সদস্য দেশ বাংলাদেশ, কামেরুন, মিশর, গায়ানা, জর্দান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া, তিউনিসিয়া, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সম্মেলনে COMCEC এবং WIEF এর গৃহীত প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা হয়। ICCI-এর অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের সহযোগিতার প্রশংসা করা হয়। ISFD এ রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুমোদনের বিষয়টি সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। ওআইসি'র POA-এর বাস্তবায়নের জন্য IDB-এর নীতির প্রশংসা করা হয়। SPDA-এর মাধ্যমে আফ্রিকার উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচীর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করা হয় যে, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক বিষয়াবলী রাজনৈতিক দমন পীড়নের জন্য ব্যবহারের মাপকাঠি না হওয়া বাঞ্চনীয়। সম্মেলনে ওআইসি'র দশ বৎসরের কর্মপরিকল্পনা অনুন্নত দেশসমূহে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ সহযোগিতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ওআইসি'র মহাসবিচকে অনুরোধ করা হয়। IDB-কে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান করায় সম্মেলনে ধন্যবাদ থেকে জানানো হয়। টোগোর অর্থনৈতিক দুর্দশার বিষয় সম্মেলনে উল্লেখ করে এর সহযোগিতার জন্য IDB-কে অনুরোধ করা হয়। ওআইসি সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে Trade Preferential System বিবেচনায় ক্রমে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামিক কমন মার্কেট এর বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয়ে সম্মেলনে গুরুত্বারোপ করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি

সম্মেলনে ১৪৯ থেকে ১৬৯ পর্যন্ত মোট ২১ টি সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলন বিশ্ব সম্প্রদায়কে বাস্তব্যবিদ্যা বিষয়ে মনোযোগ প্রদানের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় কারণ মানবজাতিকে বেচেঁ থাকার জন্য এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অবলম্বনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বালি (ইন্দোনেশিয়া) Climate Change Conference-এর প্রশংসা করা হয়। কিয়োটো প্রটোকল বিষয়ে গঠিত এডহক ওয়াকিং কমিটি (AWG) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের কাজ সম্পন্ন করবে বলে সম্মেলনে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। সদস্য দেশগুলোকে সর্বোচ্চ সক্ষমতা দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের SIDS এবং LDC দেশসমূহের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। দশম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ভিশন ১৪৪১ বিবেচনা রেখে কাজ করার জন্য ওআইসি'র মহাসচিকে অনুরোধ জানান হয়। মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা বিশ্বের বিজ্ঞানী, নীতি নির্ধারণকারী এবং বিভিন্ন কম্পনীকে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দিয়ে Atlas এবং Demos-এ প্রকল্প গ্রহণ করায় তাদের প্রশংসা করা হয়। IDB-কে এ প্রকল্পে আর্থিক সার্পোট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। IUT গাজীপুর, ঢাকার কার্যক্রমের জন্য উচ্চ প্রশংসা করা হয় কারণ এ প্রতিষ্ঠানটি সদস্য দেশসমূহের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আবশ্যক মানব সম্পদের জোগান দিয়ে আসছে। নাইজেরিয়ার ইসলামিক ইউনিভার্সিটির (IUN) এর ট্রাস্টি বোর্ডকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। উগান্ডা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করায় ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রযুক্তিগত, আর্থিক এবং সেচ্ছাসেবক হিসেবে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহবান জানান হয়। আন্তর্জাতিক সংহতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তিউনেসিয়া ঘোষণাকে সম্মেলন ধন্যবাদ জানায়। সম্মেলন যৌনবাহিত রোগ বিশেষ করে HIV/AIDS এর মত ভয়াভহব্যাধি নিয়ন্ত্রণে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে ইসলামিক অনুশাসন এবং শিক্ষা বিশেষ করে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা এ রোগ প্রতিরোধে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ বিষয়টি তুলে ধরার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১২-১৫ জুন ২০০৭ সালে ইসলামিক স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধির Vaccin উৎপাদনের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে সম্মেলন দৃঢ়ভাবে উৎসাহ প্রদান সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তথ্য এবং যোগাযোগ

তথ্য এবং যোগাযোগ বিষয়ে সম্মেলনে ১৭০-১৭৩ পর্যন্ত মোট ৪টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তাবলীর মধ্যে রয়েছে Islamic News Agency (IINA) এবং Islamic Broadcasting Organigation (ISBO) সংস্থা দু'টির পূনগর্ঠন করে নতুন নামকরণ করা হয় Islamic Broading Union (ISBU) তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান সেনেগালের প্রেসিডেন্ট মান্যবর আব্দুলায় ওয়াদেকে 'ডাকার'-এ

Dhaka University Institutional Repository

COMIAC এর স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাকে ২০০৫ সালে Digital Solidarity Fund (DSF) গঠন করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। তথ্যসমাজের বিশ্ব সম্মেলন এ WSIS সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কার্যকরী অংশগ্রহণের জন্য এবং পরবর্তীতে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম অনুসরণ করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।

দাওয়া বিষয়ক

সম্মেলনে দাওয়া বিষয়ে ১৭৪-১৭৫ মোট ২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার মধ্যে রয়েছে Committee for the Coordination Joint Islamic Action (CCJIA) সরকারী এবং বেসরকারী মুসলিম সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে সম্মেলন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এই সংস্থার কায়রোতে অনুষ্ঠিত ৩০ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে ১৫ তম সেশনে ওআইসি দশ সালে কর্মপরিকল্পনা (POA) বাস্তবায়নের জন্য এ বিষয়ে একটি Task Force গঠন করে।
সদস্য দেশগুলোর শিক্ষা, ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষা, তথ্য, ইসলামিক দাওয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিতে যৌথ ইসলামিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য জোরালোভাবে গুরুত্বারোপ করে।

সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিষয়

সম্মেলনে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিষয়ে ১৭৬ থেকে ১৯৭ পর্যন্ত মোট ২২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সকল সিদ্ধান্তাবলীর মধ্যে রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক ইসলাম, মুসলিম এবং অন্যান্য ঐশী ধর্মের প্রতি পরিকল্পিতভাবে কুৎসা রটনা ও অমুসলিম দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিন্দাবাদ করা বৈষম্য সৃষ্টি করার হীন প্রবণতায় সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করে যে, ইসলামুফোবিয়া প্রতিরোধ করা হবে। কেননা এটি মানব মর্যাদার বিপক্ষে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের উপাদান বিরোধী। বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নিয়ে আক্রামণাত্নকভাবে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ এবং ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি প্রকাশের বিরুদ্ধে সম্মেলন জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইসলামের মর্যাদাহানীর মত গর্হিত কাজের শাস্তি বিধান করা হবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির গুরুদায়িত্ব। এর প্রেক্ষিতে ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী কাজ হবে 'ডায়ালগ' এর আয়োজন করা যা ওআইসি'র সদস্যদেশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

সম্মেলন মহাসচিবকে দায়িত্ব প্রদান করে যে, একটি গ্রুপ গঠন করে আন্তর্জাতিক আইনসিদ্ধ উপাদান তৈরী করা যার মাধ্যমে সকল ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং যে কোন ধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করা সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলন মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদকে বাক স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যথার্থ মানের একটি চার্টার তৈরীর কাজ করার জন্য সমর্থন ব্যক্ত করে যাতে ধর্মের প্রতি যথাযথ সম্মান এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদা প্রদান করা যাবে।

সম্মেলনে ইসলাম ও এর প্রচারক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বিরুদ্ধে সকল অপপ্রচার মর্যাদা হানীকর ও ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ এবং ভুল-তথ্য সম্বলিত সকল ধরনের প্রকাশনার নীতিমালা এবং মুসলিমদের বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা সম্বলিত ইসলামুফোবিয়ার বিরুদ্ধে সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এসব বিষয়ে মুসলিম উম্মার উদ্বেগের বিষয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে বিশেষ করে জাতিসংঘের মহাসচিবকে অবহিত করা হয়। পাশ্চাত্যের সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য এবং ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রকাশের নিমিত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ওআইসি'র মহাসচিব এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সকল ইতিবাচক কার্যক্রমকে সম্মেলন সাধুবাদ জানায়।

সম্মেলনে মিশরে অনুষ্ঠিত ওআইসি মহিলা বিষয়ক দ্বিতীয় মন্ত্রী পরিষদের সভা নভেম্বর ২০০৮ কে ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করে। সম্মেলন ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ২০-২১ নভেম্বর ২০০৬ সালে Womens Role in the Development of OIC Member States শীর্ষক প্রথম ইসলামিক মন্ত্রীপরিষদ সম্মেলন এ তুরস্কের প্রচেষ্টাকে গুরুত্বারোপ করা হয়।

ওআইসি'র সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আলোচ্যসূচী গ্রহণ করায় সম্মেলন মহাসচিব এবং সচিবালয়ের উচ্চ প্রশংসা করে। সম্মেলন ইরানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামিক মন্ত্রী পরিষদ সম্মেলন Womens Role in Development- এর প্রশাংসা করে।

সম্মেলন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২০১০ সালকে ''আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন বৎসর'' ঘোষণা করায় গভীরভাবে মূল্যায়ণ করে কারণ এর ফলে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মতৈক্যের উন্নতি, সম্প্রীতি এবং সহযোগিতার পথ সুগম হবে এবং পবিত্র স্থানসমূহ সংক্ষরণ আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকরী হবে।

সম্মেমনে আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমী (IIFA) এবং এর কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অন্যান্য বিষয়

সম্মেলনে প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয়ে ১৯৮ থেকে ২০০ মোট ৩টি সিদ্ধান্ত এবং সংস্থা বিষয়ক ২০১ থেকে ২০৬ পর্যন্ত মোট ৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সকল সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে চাদা প্রদান, চাঁদা প্রদান নিয়মিত করণ, সচিবালয়ের বাজেট, স্থায়ী আর্থিক কমিটির সভা প্রসঙ্গ, চার্টার সংশোধন বিষয়, ১২ তম ও ১৩ তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা

শীর্ষ সম্মেলনের উপরোক্ত ঘোষণাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলনসহ এ পর্যন্ত (২০১১) ১১টি সম্মেলন ৯টি দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১টি দেশে[৮] ৩ বার এবং ৮টি দেশে[৯] ১ বার করে এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলটি অনুষ্ঠিত হয়। চার্টার অনুযায়ী [১০] প্রতি ৩ (তিন) বছরে ১ বার এ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও প্রতিষ্ঠাকালীন শীর্ষ সম্মেলন ১৯৬৯ হওয়ার পাচ বছর পর ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় সম্মেলন এর সাত বছর পর ১৯৮১ সালে তৃতীয় এর তিন বছর পর ১৯৮৪ সালে চতুর্থ এর তিন বছর পর ১৯৮৭ সালে পঞ্চম, এর চার বছর পর ১৯৯১ সালে ষষ্ঠ, এর ২ বছর পর অর্থ্যাৎ চার্টার অনুযায়ী তৃতীয় বছরে ১৯৯৮ সালে সপ্তম, এর তৃতীয় বছরে চার্টার অনুযায়ী অষ্টম ১৯৯৭ সালে, এর তিন বছরের মধ্যে চার্টার অনুযায়ী ২০০০ সালে নবম, এর তিন বছরের মদ্যে চার্টার অনুযায়ী ২০০৩ সালে দশম, এর চার বছর পর ২০০৮ সালে একাদশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেখা যায় যে, ৬টি সম্মেলন চার্টার অনুযায়ী সঠিক সময়ে অনুষ্টিত হলেও বাকী ৫টি সম্মেলন চার্টার অনুযায়ী সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। অন্যদিকে ২০১২ পর্যন্ত চারটি বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হলে ২২-২৩ মার্চ ১৯৯৭ ইসলামাবাদ পাকিস্তানে প্রথম, ৪-৫ মার্চ ২০০৩ দোহা কাতারে দ্বিতীয়, ৭-৮ ডিসেম্বর ২০০০ মক্কা আল মোকাররম, সৌদি আরবে তৃতীয়, ১৪-১৫ আগষ্ট ২০১২ মক্কা আল মোকাররম, সৌদি আরবে চতুর্থ বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণের উপস্থিত থাকার কথা। যদি কোন বিশেষ কারণে রাষ্ট্র প্রধান উপস্থিত না থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি তার উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এছাড়া পর্যবেক্ষক সংস্থা ও দেশ এবং আমন্ত্রিত অতিথি সম্মেলনে যোগদান করে থাকেন। রাষ্ট্র প্রধানগণ বা তাদের প্রতিনিধি ব্যতীত পর্যবেক্ষক সদস্যের পক্ষ থেকেও সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৫ম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল 'জাবিয়ার প্যারেজ দ্যা কুয়েলার' (Javier Pereje Cueller) তুর্কী সাইপ্রাসের মুসলিম প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট রাউফ দেনকাস (President Rauf Danktash) আফগান[১১] মুজাহিদীনের প্রতিনিধি অধ্যাপক আব্দুল রসুল সাঈফ (Prof Abdul Rassul Sayyaf) এবং এম এন এল এফ (MNLF) এর নুর মিসৌরী (Nur Misnari) সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।[১২] এ রকম উদাহরণ প্রায় সকল শীর্ষ সম্মেলনে লক্ষ্য করা যায়।

---

(৮) ১টি দেশে ৩ বার দেশটি হলো মরক্কো.

(৯) ৮টি দেশে ১ বার করে ঃ দেশ ৮টি হলো- পাকিস্তান-১, স্ৌদি আরব-১, কুয়েত-১, ইরান-১, কাতার-১, মালয়েশিয়া-১, সেনেগাল-১ ও মিশর-১.

(১০) ওআইসি চার্টারের ৪র্থ অধ্যায়ের ধারা (৬) (৭) (৮) ও (৯) এ শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। বলা ৮ এ ধারা হয়েছে

(১) সদস্য রাষ্ট্র সমূহের কোন একটিতে প্রতি তিন বছরে একবার ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে (দ্রঃ- ওআইসি চার্টার).

(১১) এ বছর আফগানিস্তানের সদস্যপদ স্থগিত থাকায় আফগান মুজাহিদীন পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে সম্মেলনে উপস্থি হয় (Noor Ahmad Baba, Organisation of Islamic Corference Theory and Practice of Pan-Islamic Cooperation, P-175).

(১২) Noor Ahmad Baba, Ibid, P.175.

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষ সম্মেলনে সাংগঠনিক বিষয়াবলী যেমন আলোচিত হয়ে ঘোষনা বা সিদ্ধান্তভূক্ত হয় তেমনি বিশ্বসংস্থা হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এরূপ সংঘাতময় অবস্থা ও দেশের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য কিংবা কোন বিষয়ে উদ্দ্যোগ গ্রহণকল্পে কমিটি গঠন করা হয়। যেমন Noor Ahmad Baba উল্লেখ করেন The summit constituted a 10 member committee to find out how the International Islamic News Agency (IINA) could be salvaged and made effective. Only a few months earlier the financial position of the agency had been so had that the salaries of its employees could not be paid for about 18 months. It was only through Saudi assistance that the salaries were paid later. The confereence, significantly, agreed on the basic draft charter of the International Islamic Court of Justice. The court was to work for resolving disputes between the member-states that might voluntarily seek its arbitration. The summit urged the member countries to endorse the charter.[১৩] সম্মেলনে অনেক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হয় যেমন Noor Ahmad Baba উল্লেখ করেন One of the achievements of the conference was to have worked out an agreement to put end to the factional fighiting around the Palestinian refugee camps in southern Lebanon. The Algerian Foreign Minister, Ahmad Taleb al Ibrahim, said the summit had reached an agreement stipulating a ceasefire, withdrawal of all parties to previous positions and breaking of the siege on the camps. In particular, Lebanon and Syria agreed to work together to end the 11-year-old civil war and increase the member of Palestinian refugee camps in south Lebaonn. The summit accordingly called for the lifting of the siege around the Palestinian camps in Lebanon and return of those who had been driven out of them. In this regard, it expressed support for the efforts of the Arab League.[১৪]

এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্যালেস্টাইনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি, তাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রতিষ্ঠ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে কোন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্ত সকল শান্তি প্রচেষ্টায় এটা পাশ কাটানো হয়। ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের পর আরব দেশগুলোর তেল অবরোধ যুক্তরাষ্ট্রকে আরবদের প্রতি পুর্বতন মনোভাব পাল্টাতে বাধ্য করে। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সোভিয়েতের কাছে হেরে যাবার আতংক থেকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার Shutle Diplomicy এর মাধ্যমে শান্তির লক্ষ্যে উদ্‌যোগ নেন।

---

(১৩) Noor Ahmad Baba, Ibid, P,177.
(১৪) Noor Ahmad Baba, Ibid, P,176.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ২১ ও ২২ ডিসেম্বর জেনেভাতে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা হয়। ওই আলোচনার ফলে সিরিয়া ও মিশর তাদের হারানো কিছু এলাকা ফিরে পায়। ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর মার্কিন মধ্যস্থতায় মিশর-ইসরাইল অন্তবর্তীকালীন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ফলে আরো অধিকৃত এলাকা মিশর ফেরত পায় এবং প্রায় এক দশক পরে সুয়েজ খাল চালু হয়। এ চুক্তিকে সিরিয়া, পিএল ও সহ আরো অনেক আরব রাষ্ট্র প্রত্যাখান করে। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মিশর মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাতের ইসরাইলী জাতীয় সংসদে Knesset বক্তৃতায় তাদের দু'দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান এবং ইসরাইলকে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যাবার অনুরোধ করেন।

১৯৭৮ সালের ক্যাম্পডেভিড চুক্তি কিংবা পরবর্তীতে আরো উদদোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন চুক্তি[১৫] স্বাক্ষরিত হয় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। ওআইসি'র প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনা থাকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন থাকে, কিন্তু সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেছে।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের পূর্ব প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। এগুলো নিম্নরূপ :

১. যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ : যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যে এমন কিছু স্বার্থ রয়েছে যার জন্য তাকে ইসরাইলকে সমর্থন করতে হয়েছে, অন্যদিকে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানে সে বিড়ম্বনা করেছে।

ক. এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্বের কারনেই বহু সময় ধরে একদিকে আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে ইসরাইলকে সামরিক সমর্থন দিয়ে আসছে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসন হাওয়ার এর মতে কোন ভূখন্ডের গুরুত্ব বিচার করলে সামরিক দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল আর নেই। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশসমূহকে সামরিক চুক্তিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। যেমন, বাগদাদ চুক্তিকে সেন্টো (Cento) তে পরিণত করার চেষ্ঠা। শুধু তাই নয়, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না মোটেই।

খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির সাথে খনিজ তেলের স্বার্থ জড়িত। মধ্যপ্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানের মোট প্রয়োজনের ৭৫% তৈল সরবরাহ করে। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা যেমন ঃ একসটন, টেকসামো মোবিল, গালফ, মোকল ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করছে।

গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদী লবির ভূমিকার ফলেও যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সমর্থন করছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬০ লক্ষের মতো ইহুদী বসবাস করে। মার্কিন প্রশাসন, সামরিক ও শিল্প ক্ষেত্রে অনেক প্রভাবশালী ইহুদী রয়েছে যারা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে আভ্যন্তরীণ উপাদান হিসেবে কাজ করছে।

---

(১৫) বিভিন্ন চুক্তিঃ হেবরণ ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তি, ওয়েই রিভার চুক্তি, রোড ম্যাপ ইত্যাদি- উল্লেখযোগ্য (আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন অস্ত্র ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। প্যালেস্টাইন সমস্যা বিলম্বিত হওয়ার অর্থ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ক্রয় করবে।

ঙ. আরব রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক কোন্দলের কারণে প্যালেস্টাইন সমস্যা বিলম্বিত হয়। আরব রাষ্ট্রসমূহ ক্ষুদ্রতম স্বার্থের কারণে একে অন্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারছে না। ১৯৪৮ সালের, ১৯৬৭ সালের, ১৯৭৩ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রসমূহ কিছু কিছু সুবিধা পাবার কারণে প্যালেস্টাইনের মূল সমস্যাকে এড়িয়ে গেছে। মিশরের সাথে ইসরাইলে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আরব বিশ্বে ফাটল সৃষ্টি হয়। এভাবে দেখা যাচ্ছে আরব বিশ্বের ন্যূনতম স্বার্থের কারণে প্যালেস্টাইন সমস্যার কোন আশানুরূপ সমাধান হয়নি।

চ. PLO-এর অন্তর্বিরোধ প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্ব পিএলও-এর অনেক উর্ধ্বতন নেতা মানতে চায়নি। ফলে প্যালেস্টাইন সমস্যা বিলম্বিত হয়েছে। অন্যদিকে আরব বিশ্বের অনেক দেশের সাথে PLO-এর সম্পর্ক ফাটল ধরে। এজন্য অনেক রাষ্ট্রই এ সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখায় নি।

ছ. প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যক্ষভাবে এ সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়েনি বলে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সুদূর পরাহত হয়েছে। প্রথম দিকে মিশরের সাথে রাশিয়ার সুসম্পর্ক থাকলেও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে মিশরকে প্রতিশ্রুত সামরিক সাহায্যদানে সোভিয়েত অঙ্গিকার ভঙ্গের ফলে মিশরের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। সিরিয়ার সাথেও তার শুধুমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো যে, অতীতে যে সমস্ত সংকট ও সমস্যার তগিঘড়ি সমাধান হয়েছে তার মূলে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয় পরাশক্তিই জড়িত ছিল। এভাবে কিউবা সংকট, বার্লিন সমস্যা, সুয়েজ সংকট, আফগানিস্তান সমস্যা, কাম্পুচিয়া সমস্যাও সমাধান হয়েছে। সুতরাং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের পূর্বশর্ত ছিল।[১৬]

প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নিরলস বাস্তবতা অনুধারণ করে ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮০ সালে এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে মরোক্কোর ফেজ নগরীতে এক সম্মেলনে OIC কতিপয় সুপারিশ করে।

১. জেরুজালেমসহ ১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে দখলীকৃত এলাকা থেকে ইহুদী সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে।
২. দখলীকৃত অঞ্চলের ইহুদী বসতি ভেঙ্গে দিতে হবে।
৩. প্যালেস্টাইনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে হবে।
৪. জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন প্যালেস্টাইনী রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে।
৫. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এই অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে ইত্যাদি।[১৭]

---

(১৬) আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সিড়ি বই বিতান, ঢাকা-২০০৯, পৃ,২৪৪-২৪৫.
(১৭) Noor Ahmad Baba, Ibid, P,127-128.

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষ সম্মেলনে যে সকল সমস্যার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তাই মূলত ঐ সমস্যার মুসলিম রাষ্ট্র কিংবা মুসলিম জাতির উল্লেখযোগ্য সমস্যা। যেমন লিবিয়া-চাদ সমস্যা, ইরান-ইরাক সমস্যা, ইরাক-কুয়েত সমস্যা, আফগানিস্তান সমস্যা, বসনিয়া হারজিগোবিনা সমস্যা, কসোভো সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদি। সম্মেলন গুলোর সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করলে এবং ওআইসির বক্তৃতা বিবৃতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এসব বিষয়ে সমস্যা সমাধান কালে যেমন ভাল ফর্মুলা প্রদান করেছে তেমনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এবং মুসলিম নিধন বন্ধের জন্য আহবান জানিয়েছে, কিন্তু কাজ হয়েছে কতটুকু-এক্ষেত্রে সংস্থাটিকে আরো শক্তিশালী করার পরামর্শ তাত্ত্বিকদের।

ওআইসিরকে এক্ষেত্রে জাতিসংঘের কাঠামোকে অনুসরণ করতে হবে। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তিএবং নিরাপত্তা রক্ষার অভিভাবকত্ব নিরাপত্তা পরিষদকে অর্পণ করা হয়েছে। এটিই হল তার প্রাথমিক কর্তব্য। সনদের ২৪ নং ধারা অনুযায়ী সনদে যুক্ত উদ্দেশ্য ও নীতি অনুসারে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদ এই কর্তব্য সম্পাদন করবে। নিরাপত্তা পরিষধ দুটি পদ্ধতিতে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে : প্রথমত, কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবরার আশস্কা দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান রাষ্ট্রসমূহকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির অনুরোধ জানাতে পারে। সনদের ৩৩ নং ধারায় শান্তিপূর্ণ উপায় বিরোধ নিষ্পত্তির সাতটি পদ্ধতিতে উল্লেখ আছে : ক) আলাপ-আলোচনা (Negotiation); খ) অনুসন্ধান (Enquiry); গ) মধ্যস্থতা (Mediation) ঘ) সালিশি (Arbitration); ঙ) বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি (Judicial Settlement); চ) আঞ্চলিক সংস্থা, ব্যবস্থাপনা অথবা ছ) অন্য কোনো শান্তিড়পূর্ণ উপায়ে অবলম্বন (Resort to Regional Agencies or Arrangements, or Other Peaceful Means of their Own Choice);। বিরোধের সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলি এর মধ্যে যে-কোনো একটি উপায় অবলম্বন করতে পারে।

উল্লেখিত উপরোউক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ-মীমাংসা সম্ভব না হলে নিরাপত্তা পরিষদ যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়। এটি হল একটি চরম পদক্ষেপ। বিরোধ-নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক; রেলপথ, সমুদ্রপথ, বিমানপথ, ডাক, সরবরাহ, বেতার-যোগাযোগ এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে নির্দেশ দিতে পারে। এই উপায়সমুহকে বস্তুত প্রতিরোধমূলক বা নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা (Preventive Measures) নামে অভিহিত করা যায়। প্রতিরোধমূলক বা নিবর্তনমুলক উপায়সমূহের মাধ্যমে বিরোধ-মীমাংসা সম্ভব না হলে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা অথবা শান্তিপুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ সৃষ্টি এবং জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর সাহায্যে শক্তি প্রয়োগের জন্যও নিরাপত্তা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা পরিষদ যাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র নিজ নিজ জাতীয় সশস্ত্রবাহিনী প্রস্তুত রাখতে বাধ্য থাকবে।[১৮]

বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংহতির উপর যথাযথ গুরুত্ব -আরোপ করা হচ্ছে। কিন্ত তা বাণী হিসেবে যত মহৎ ওয়াজ হিসেবে যতটুকু গ্রহণযোগ্য কার্যক্ষেত্রে তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। এজন্য আকাংখিত সংহতি আসছে না আসার কথাও নয়। প্রশ্ন হল, সংহতি কার সাথে কার? ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি, গোষ্ঠির সাথে গোষ্ঠির, একশ্রেনী সমাজের সাথে অন্য শ্রেণী সমাজ, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্র এমনি করে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের একটি অখন্ড সংহতি। তা সম্ভব হলে বিশ্ব মানবিক ভ্রাতৃত্বের রূপায়ণও সম্ভব।[১৯]

জাতিসংঘের অনেক ব্যর্থতার মধ্যে-এ আন্তর্জাতিক সংহতি অনেকাংশে অক্ষুণ্ন রেখেছে, ফলে কিছু সফলতাও রয়েছে, কিন্ত ওআইসি'র এ ধরনের কাজ তার সদস্যদের মধ্যে সম্পন্ন করেছে বলে বাস্তবে বুঝা যায় না।

জাতিসংঘের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাজ শান্তিরক্ষা বাহিনী। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষাবাহিনীর প্রধান দায়িত্ব হল শান্তিরক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এই কারণে শান্তিরক্ষকগণ নিরস্ত্র পর্যবেক্ষক অথবা হালকা অস্ত্রে সজ্জিত সেনানী হতে পারেন।

শান্তিরক্ষাবাহিনীর দায়িত্ব হল পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর মহাসচিবের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের তদারকি এবং চুক্তি ও অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা। আবার কখনো বা শান্তিরক্ষাবাহিনীকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নির্বাচন পরিচালনা, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার পথে কোনো দেশের উত্তরণের প্রক্রিয়ার তদারকি, স্বাভাবিক নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে হয়। শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে বাহিনী প্রেরণের কয়েকটি শর্ত আছে : প্রথমত, যে-দেশে শান্তিরক্ষাবাহিনী প্রেরণ করা হবে, তার সম্মতি প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক এই শান্তিরক্ষাবাহিনী প্রেরণ অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়ত, সদস্যরাষ্ট্রগুলি শান্তিরক্ষাবাহিনীতে স্বেচ্ছামুলকভাবে সেনানী পাঠাবে। শান্তিরক্ষাবাহিনী প্রেরণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন। ৫ জন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে কোনো সদস্য নেতিবাচক ভোট দিলে বাহিনীপ্রেরণ বাধাপ্রাপ্ত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী মহাসচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের ১০টি শান্তিরক্ষা মিশনে ২০,০০০ মতো ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। এছাড়াও ১৪,০০০ সেনা, সামরিক পর্যবেক্ষক, বেসামরিক পুলিশ ছিল।[২০]

---

(১৮) তোফাজ্জেল হোসেন, *জাতিসংঘ*, ঢাকা-২০০৭, পৃ,৬৬-৬৭
(১৯) আব্দুল মুকীত চৌধুরী, মুসলিম বিশ্বের সংকট, উত্তরণ প্রত্যাশা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পুর্বোক্ত, পৃ.৬২০
(২০) তোফাজ্জেল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৮-৬৯.

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং পর্যবেক্ষক গোষ্ঠি বেশির ভাগ প্রেরিত হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রে এবং মুসলিম সংখ্যালঘু রাষ্ট্রে অবশ্য অন্যান্য ধর্মাবলী রাষ্ট্রেও রয়েছে। নিম্নের সারণি থেকে বিষয়টি পরিস্কার হবে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত যে-সকল দেশে শান্তিরক্ষাবাহিনী এবং পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী প্রেরিত হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল :

সারণি-৭

যে সকল দেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং পর্যবেক্ষক প্রেরিত হয়েছে তার তালিকা ঃ

মেয়াদকাল	শান্তিরক্ষাবাহিনীর নাম	স্থান	বাহিনীর সংখ্যা
১৯৪৮	ইউ এন ট্রুস সুপারভিশন অর্গানাইজেশন (UNTSO)	ফিলিস্তিন	৫৭২
১৯৪৮	ইউ এন অবজার্ভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান (UNOGIP)	কাশ্মীর	৩৫
১৯৫৬-১৯৬৭	ইউ এন ইমার্জেন্সি ফোর্স-১ (UNEF-1)	মিশর	৬,০৭৩
১৯৬০-১৯৬৪	ইউ এন অপারেশন ইন (UNOC)	কঙ্গো	১৯,৮২৮
১৯৬৩-১৯৬৪	ইউ এন ইয়েমেন অবজার্ভেশন মিশন (UNYOM)	ইয়েমেন	১৫০
১৯৬৪	ইউ এন ফোর্স ইন সাইপ্রাস (UNFICYP)	সাইপ্রাস	৬,৪১১
১৯৭৩-১৯৭৯	ইউ এন ইমার্জেন্সি ফোর্স-২ (UNEF-2)	সুয়েজখাল ও সিনাই	৬,৯৭৩
১৯৭৪	ইউ এন ডিজএনগেজমেন্ট ফোর্স (UNDEF)	সিরিয়া	১,৩১৭
১৯৭৮	ইউ এন ইনটেরিম ফোর্স ইন লেবানন (UNIFIL)	লেবানন	৫,৮২৭
১৯৮৮-১৯৯০	ইউ এন গুড অফিসেস মিশন ইন আফগানিস্তান অ্যান্ড পাকিস্তান (UNGOMAP)	আফগানিস্তান	
১৯৮৮-১৯৯১	ইউ এন অ্যাংগোলা ভেরিফি-কেশন মিশন (UNAVEM)	আংগোলা	৬০
১৯৮৯-১৯৯০	ইউ এন ইরাক-ইরান মিলিটারী অবজার্ভার গ্রুপ (UNIMOG)	ইরান-ইরাক	৪০০
১৯৮৯-১৯৯০	ইউ এন ট্রানজিশন অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ (UNTAG)	নামিবিয়া	৪,৬৫০
১৯৮৯	ইউ এন অবজার্ভার গ্রুপ ইন সেন্ট্রাল আমেরিকা (UNOGCA)	এল সালভাদর, হন্ডুরাস ও নিকারাগুয়া	১,১০০
১৯৯১	ইউ এন মিশন ফর রেফারেন্ডাম ইন ওয়েস্টার্ন সাহারা (UNMRIWS)	পশ্চিম সাহারা	২,০০০
১৯৯১	ইউ এন ইরাক-কুয়েত অবজাবভেশন মিশন(UNIKOM)	ইরাক-কুয়েত	১,৪৪০
১৯৯১	ইউ এন অবজার্ভার মিশন ইন এল সালভাদর (UNUSAL)	এল সালভাদর	১১৩
১৯৯১	ইউ এন অ্যাডভান্সড মিশন ইন কম্বোডিয়া (UNAMIC)	কাম্বোডিয়া	৪৬০
১৯৯২	ইউ এন ট্রানজিশন্যাল অথরিটি ইন কম্বোডিয়া (UNTAC)	ক্রোয়েশিয়া	১৫,০০০+
১৯৯২	ইউ এন প্রোটেকটিভ ফোর্স (UNPROFOR)	যুগোশ-াভিয়া	৯,০০০
১৯৯২	ইউ এন মিলিটারী লিয়াজো অফিসার্স ফোর্স (UNMLO)	সোমালিয়া	১৪,০০০+
১৯৯২	ইউ এন অপারেশন ইন সোমালিয়া (UNOSOM)	রুয়ান্ডা	৪,০০০+ ৫,৫০০
এপ্রিল,১৯৯৪	ইউ এন অ্যাসিস্টেন্স মিশন ইন রুয়ান্ডা (UNAMIR)		২,৫০০

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩. ওআইসির সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণের ভাষণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওআইসি কার্যক্রম আবর্তিত হয় মূলত: ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা কিংবা সিদ্ধান্তকে ঘিরে। কিন্তু একটি কৌতুহলের বিষয় হল রাষ্ট্র প্রধানগণের বক্তব্যে যে ব্যাপক বিষয়ের অবতারণা করা হয় তা অনেক সময় সম্পূর্ন রূপে সিদ্ধান্ত হিসেবে কিংবা ঘোষণায় আসে না। এ ভাবনা থেকে ওআইসিকে শক্তিশালী করণে দক্ষিন এশিয়ার একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দোহা সম্মেলনের বক্তব্য এখানে সন্নিবেশিত হ'ল।

(ক) মাহাথির মোহাম্মদ-এর ভাষণ[২১]- ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরাইলের বোমা, মর্টার ও বুলেট আক্রমণে শিশুসহ বহু সাহসী লোকের হত্যা ও পঙ্গু হওয়ার প্রেক্ষাপটে দোহায় ৫৬টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। তারা তাদের স্বাধীনতার অধিকার ও মর্যাদার জন্য যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা নিশ্চিতভাবে ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে।

বিষয়টি খুবই দুঃখজনক যে, জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্বকারী এক তৃতীয়াংশের অধিক মুসলিম দেশ অসহায়ভাবে ইসরাইল কর্তৃক নিরপরাধ ফিলিস্তিনীদের অব্যাহত হত্যা প্রত্যক্ষ করে চলেছে এবং এজন্য ইসরাইলকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে না। তারা এই হত্যার কাজ করছে উদ্ধতভাবে। মুসলিম দেশগুলোর জন্য এটা এমন এক ভয়াবহ অবস্থা যে, ইসরাইলের এই কাপুরুষোচিত কাজের বিরুদ্ধে আমরা ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছি না। ইসরাইল শুধু ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালনা করছে না, তারা মুসলমানদের সম্মান ও ঐক্যের বিরুদ্ধেও আঘাত হানছে।

ফিলিস্তিনীদের ভাগ্যের সাথে সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের ভাগ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফিলিস্তিনীরা স্পষ্টভাবে অধিকৃত এলাকায় বসবাস করছে এবং তাদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের ওপর আক্রমণের অর্থ আঘাতস্বরূপ। কোন রকম শাস্তি ছাড়াই ইসরাইল অব্যাহতভাবে ফিলিস্তিনীদের হত্যা করে চলেছে। মুসলিম দেশগুলো বিষয়টা শুধু প্রত্যক্ষ করতে পারে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে আমাদের অনেক কিছু করার আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রেক্ষপটে বলা যায়, ওই অগ্রগতি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে। ফিলিস্তিনীদের ওপর যা ঘটছে তা নিশ্চিতভাবে আমাদের ওপরও ঘটবে। যুগোশ্লাভিয়া, চেচনিয়া এবং অন্যান্য স্থানে তা ঘটছে। আমাদের এখনই কাজ করতে হবে। একথা উপলব্ধি করার জন্য আমাদের কি ভূপাতিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?

(২১) মাহাথির মোহাম্মদ, *ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ*, (অনুবাদ-আবু জাফর), হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা,২০০৯, পৃ,১৩-১৮ (মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাতারে দোহায় অনুষ্ঠিত নবম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষন, ১২ নভেম্বর-২০০০).

Dhaka University Institutional Repository

একটি সংগঠন হিসেবে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি), বিশেষ করে বর্তমান এই শীর্ষ সম্মেলন ফিলিস্তিনীদের এবং অন্যান্য এলাকার মুসলমাদের বিষয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে আমাদের সমবেত কণ্ঠস্বর জোরে এবং স্পষ্টভাবে শোনা যেতে পারে এবং আমরা এমন অনেক কাজ করতে পারি যার মাধ্যমে সবাই আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আল-কুদস, আল শরীফকে ফিলিস্তিনী জনগণের রাজনৈতকি ও ঐতিহাসিক নগর এবং রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কোন ছাড় দেবো না এবং এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবো। সিরিয়ার গোলান অঞ্চলসহ অধিকৃত প্যালেষ্টাইন ও আরব ভূখন্ড পুনরুদ্ধারে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করতে হবে। একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আমাদের জাতিসংঘের উদ্যোগসহ সব প্রয়াসকে সমর্থন এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরপাত্তার স্বার্থে শান্তি প্রয়াসকে পুনর্জীবিত করা উচিত। ফিলিস্তিনী নেতৃত্বকেও আমাদের পূর্ণভাবে সমর্থন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করা উচিত।

আমি বিশ্বাস করি যে, গুরুত্ব পূর্ণওই বিষয়ে শীর্ষ সম্মেলনের এই অনুষ্ঠান আমাদেরকে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে। এখন খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের ঝগড়া করা উচিত নয়; বরং ওই বিষয়ে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া উচিত আন্তরিকভাবে। একই চিন্তাধারা ও ধর্মীয়ভাবে উৎসর্গীকৃত মানুষের মতো এই সংগঠনকে এখন সত্যিকারভাবে কাজ করা উচিত। যারা কাল্পনিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে ঘৃণা প্রকাশ করে অথচ তাদের চোখের সামনে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘনের বিরুদ্ধে কিছু করে না তাদেরকে আমরা ধিক্কার জানাই। ফিলিস্তিনীরা যথেষ্ট সংগ্রাম করেছে এবং দুঃখ ভোগ করেছে। আমাদের সমর্থনে তাদের যা পাওয়া উচিত তা এখন দেখার সময় এসেছে।

ফিলিস্তিনীদের প্রতি আমাদের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করে আমি বলতে চাই যে, এই সমস্যার সাথে জড়িত জটিলতা সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। আমরা যতই সাহায্য সহযোগিতা করি না কেন এমন কিছু সমস্যা আছে যার সমাধান আমাদের আয়ত্বের বাইরে। ইসরাইলের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয় সম্পর্কে আমাদের উপেক্ষা করা বা অবমূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। ইসরাইলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সব ঘটনার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা আছে এবং ওইসব ঘটনা ঘটেছে ফিলিস্তিনীদের স্বার্থের প্রতিকূলে। সুতরাং এ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ যে, আমাদের আদর্শ, উদ্যোগ ও উৎসাহ যেন বাস্তবতার নিরিখেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে উদ্দেশ্যের গভীরতা ও সম্মিলিত লক্ষ্যের জন্য উৎসর্গীকৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথ অনুসরণে আমরা সাহায্য করতে পারি।

বিশ্ব নতুন সহস্রাব্দে পদার্পন করেছে এবং অতীতে ইসলামী সভ্যতা ছিলো উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে। কিন্ত অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে তৃতীয় এই সহস্রাব্দে ইসলামী সভ্যতার গতি অত্যন্ত মন্থর। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দবিন্দু ছিলো দামসিক (Damsyik) বাগদাদ, কর্ডোভা ও সমরখন্দ।

Dhaka University Institutional Repository

এটা জানা কথা যে, অতীতের মতো এখনও বিশ্বের অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে মুসলিম দেশগুলো। অথচ এ সব দেশের লোক সাধারণভাবে চরম দারিদ্র ও অভ্যন্তরীণ হিংসাত্মক কাজের আবর্তে ডুবে আছে। অনেক মুসলিম দেশে মুসলমানদের মধ্যেকার অন্তর্কলহ এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে বিবাদ এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে তা মুসলমান ও তাদের মর্যাদা হরনকারী দেশের মধ্যেকার বিবাদের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ।

বিভিন্ন মুসলিম দেশের উপর আপতিত বিপর্যয় এবং বিদ্যমান দুঃখজনক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দোহা সম্মেলনের জন্য গৃহীত প্রতিপাদ্য শান্তি ও উন্নয়ন অত্যন্ত যথার্থ ও সময়োপযোগী। এখানে আমরা আমাদের অর্জিত শিক্ষা ও অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং উম্মার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন চিন্তাধারা ও কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। এ দুটো বিষয়ই আলোচিত হওয়া উচিত আন্তরিকভাবে এবং খোলাখুলিভাবে। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে আমাদের সবার।

মুসলমানদের জীবনধারার সাথে শান্তি কথাটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পবিত্র কুরআনের ৫৩টি আয়াতে এই শান্তির কথা বলা হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা তাদের জীবনের সব কার্য প্রক্রিয়ায় শান্তি কথাটা উচ্চারন করে; কারণ এ কথাটা তাদের সাদর সম্ভাষণের একটা মাধ্যম। অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে তাই মুসলমানদের জীবন ধারায় শান্তির প্রসার ঘটানো বাধ্যতামূলক। নিজেদের মধ্যে বা অন্যের সাথে যুদ্ধ করার কারণ অনুসন্ধান তাই ইসলামসম্মত নয়।

শান্তি ও অগ্রগতি হলো দুটো চ্যালেঞ্জ যা মুসলিম উম্মাহর সামনে এসে দাড়িয়েছে। ওই চ্যালেঞ্জ একে অপরের পরিপূরক। একটা ছাড়া অন্যটা থাকতে পারে না। এ জন্যই ইসলামী ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি)কে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, এ সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে শান্তি ও উন্নয়নের একটা নতুন ধারা বেগবান হয়েছে।

বিশ্বের এখন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ এখন একে অপরের ওপর ক্রমাগতভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিশ্ব এখন বহুমুখী স্বার্থের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে অনেক দেশ নতুন মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ নিজেদেরকে নতুনভাবে মুল্যায়ন করছে; শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে নতুন করে ঐক্য গড়ে উঠছে এবং সবকিছু মূল্যায়িত হচ্ছে নতুনভাবে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের নতুন যন্ত্রপাতিও সংযোজিত হচ্ছে।

নুতন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে যে সমস্যা প্রশ্নাকারে দেখা দিয়েছে তা হলোঃ শান্তি ও উন্নয়নের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স কি এর কাঠামো ও কাজকে পুনর্গঠিত বা পুনর্মূল্যায়ন করে দৃষ্টিভঙ্গি, গঠন ও উন্নয়ন কৌশল পদ্ধতিতে কার্যকর ও উপযোগী করতে পারবে? আজ হোক বা কাল হোক, এই সংস্থা যে সমস্যার সম্মুখীন হবে তা নিরসনে এর কাঠামো ও

Dhaka University Institutional Repository

কার্যসম্পাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনে বাধ্য হবে। সুতরাং এ কাজ পরে না করে এখনই করা উচিত। এ সংস্থা এ কাজ এখনই করুক, মুসলিম উম্মাহ তা প্রত্যাশা করে।

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) অতীতে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই হলো স্বার্থের দ্বন্দ্ব, আদর্শগত সংঘাত এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সমস্যা। এসব কিছুই এখন আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে সংস্থা তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করতে পারবে না আমাদের মধ্যে কেউ এ কাজ করাতে পাবরে না আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির যে ভিন্নতা আছে তা গ্রহণ করে সবার মধ্যে সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া উচিত। এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য মোতাবেক সংস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে এর ভূমিকাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, বিশেষ করে শান্তি ও উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করার লক্ষ্যে।

সংস্থার উপযোগিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবায়ন করার সময় দেখতে হবে যে, এর পুনর্গঠিত ভূমিকা নিয়ে সরকারগুলো নতুন ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে সংস্থার মূল কাজ কোন কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কি কাজ তা সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে, অন্যের সাথে তার কি কাজ করা উচিত এবং অন্যরা কি কাজ করবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ঐক্যমত্যে হতে হবে। এ কাজের জটিলতা সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। এর সফলতার জন্য গঠন ও কাজের ধারার পরিবর্তন আনতে হবে। সংস্থার মধ্যে এমন কাজের ধারা সৃষ্টি করতে হবে যেন বিভিন্ন সরকার ও সচিবালয়ের কার্যাবলী পরস্পরকে উৎসাহিত ও বেগবান করে। আগামী দিনে অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া প্রশ্নাতীতভাবে কার্যকর হতে যাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া হবে বিশ্বায়ন এবং রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে। বিশ্বায়নের এই ধারণা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের অনুমিত ধারাণার চেয়ে অনেক বেশী ইসলামিক। ইসলামী সহযোগিতা জোরদারকরণ এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি দ্রুত করার ক্ষেত্রে এই বিশ্বায়ন ধারনা অধিক শক্তিশালী ও প্রগতিশীল। কিন্তু এর বর্তমান গঠন কাঠামোর মধ্যে অনেক ঝুকি ও চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের কাজ হলো এটা নিশ্চিত করা যে, এর সুফল সবার কাছে পৌঁছানো এবং তা যেন কিছু সংখ্যক সুবিধাভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স-এর এ ব্যাপারে এমন কার্যকর প্রয়াস নেওয়া উচিত যেন তা সব মুসলমান দেশের ও মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে ফলপ্রসূ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসা বানিজ্যের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলা যায় যে, অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এখন ব্যবসা বানিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার উপযুক্ত সময়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্যিক বাধা আছে তা তাদের দূর করা উচিত। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে তা মুসলিম দেশগুলোর জন্যে এক বিরাট বাজারে পরিণত হবে এবং এই প্রসারিত বাজার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকে যথার্থভাবে ব্যবহার করা গেলে তা আমাদের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এই সাথে ওআইসি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একটা সুপরিকল্পিত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার ফরে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের সুফল উন্নত দেশগুলোই লাভ করে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের ধনী বিনিয়োগকারীর। তাদের কারিগরী ও প্রযুক্তি জ্ঞান নিয়ে মুসলিম দেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবেন। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ এবং সরাসরি মুসলিম বিনিয়োগ এই দুই ধরনের উদ্যোক্তারা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী মুসলিম দেশে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এজন্য তাদের পুঁজি বা দক্ষতার প্রয়োজন নেই তাদের প্রয়োজন সবদিক দিয়ে দক্ষ একটা টিম বা দল গঠন করা। বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম দেশের এখন যে সব পণ্য আমদানী করা হয় তার মধ্যে থেকে অনেক পণ্য মুসলিম দেশ থেকেই আমদানী করা যায়। এজন্য পণ্যের মান বা মূল্যের ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

যাহোক, মুসলিম দেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ এবং সরাসরি মুসলিম বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোতে শিল্প প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ওই সব দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ যেন আকর্ষণীয় হয়। বিনিয়োগ করার সময় রাজনীতিসহ অন্যান্য পরিবর্তিত অবস্থার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ অনুকূল অবস্থার পরিবর্তন বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ এবং সরাসরি মুসলিম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

বিভিন্ন প্রজেক্টে অর্থ বিনিয়োগ করে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক ভাল কাজ করছে। কিন্ত যে সব দেশে অর্থ সংকট আছে সে সব দেশে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক তার কার্য পরিধি বাড়াতে পারে। ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এটা নিশ্চিত করা দরকার যে, উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাংক ভুমিকা রাখছে।

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স কি নিজের ভূমিকাকে পুনর্মূল্যায়ন করে আগামী ২০-৩০ বছরে ইসলামী উম্মাহকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও তথ্য প্রযুক্তি যুগের সাথে সমন্বয় করতে পারবে। এ ধরনের অবস্থা নিশ্চিত করা আমাদের একটা বড় দায়িত্ব। ফিলিস্তিন ও অন্যান্য মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের কথা যেমন আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তেমনি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের কথাও আমরা বিস্মৃত হবো না।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই শীর্ষ সাম্মেলনের সুচিন্তিত মতামত ও আলোচনা অত্যন্ত কার্যকর হবে এবং তা নতুনভাবে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্থাকে দিক নির্দেশনা দেবে, একবিংশ শতাব্দীর নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য উম্মাহকে শান্তি ও উন্নয়ন কর্মসুচী বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্য অর্জনে সংস্থাকে অবশ্যই পথ প্রদর্শকের ভুমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা উম্মাহকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারবো এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যেমে এর সমস্যার সমাধান করতে পারবো।

এই সংস্থার সদস্য হিসেবে মালয়েশিয়া। এর কার্যাবলী ও পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেওয়া ও এর প্রভাবকে আরও কার্যকর করার জন্য খুবই আগ্রহী এবং আমাদের এই আগ্রহ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমরা মনে করি, মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে ত্রৈবার্ষিক ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন কার্যকর আলোচনার একটি

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম। এই প্রেক্ষপটে মালয়েশিয়ার সরকার ও জনগনের পক্ষে আমি ২০০৩ সালে কুয়ালামপুর ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের ১০ তম অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব পেশ করছি। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, আমার এই প্রস্তাব সব সদস্যের অনুকূলে সমর্থন পাবে।

পর্যালোচনা ঃ

১২-১৩ নভেম্বর ২০০০ সালে নবম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন দোহা কাতারে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫৩ টি সদস্য রাষ্ট্র, ৪টি পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্রসহ ১৪টি পর্যবেক্ষক সদস্য, ৮টি সহযোগী সংস্থা, ওআইসির ৪টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, ওআইসির ৬টি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান, ৭টি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং সোসাইটি এবং ১৭টি অতিথি রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। সম্মেলন শেষে দোহা ঘোষণা গৃহীত হয়। উক্ত ঘোষণায় প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গে আল-আকসা মসজিদ এবং আরব ইসরাইল সংঘর্ষের মূল কারণ হিসেবে ইসরাইলি আগ্রাসন আরবদের যে সকল স্থান ইসরাইল দখল করেছে তা ছেড়ে দিতে এবং জাতিসংঘের ৪৪৬ নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব রোপ করা হয়। আফগানিস্তান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আফগানিস্তানের সংঘর্ষ বন্ধ করে শান্তি স্থাপনের পথকে উন্মোক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব রোপ করে ওআইসি এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে বিবদমান জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপনে সমন্বয় সাধনের জন্য অনুরোধ করা হয়। বসনিয়া-হারজিগোবিনা এবং কাসোভো সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বসনিয়া-হারজিগোবিনা এবং কসোভোতে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এর জনগনের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জাতিসংঘকে কার্যকারি পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব রোপ করা হয়। একই সাথে কসোভোর বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১২৪৪ নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে অবস্থার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়। সোমালিয়ার সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করে দেশটির সার্বভৌমত্ব ও ঐক্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয় এবং দেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান কামান করা হয়। চেচনিয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য রাশিয়ার প্রতি আহবান জানানো হয়। ভারতের জন্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নিতে ভারতের প্রতি অনুরোধ করা হয়। ওআইসি'র মহাসচিবকে জান্ম কাস্মীরে (Fact Finding) মিশন পরিচালনার জন্যও সম্মেলন থেকে অনুরোধ জানানো হয়। ইরাক-কুয়েতের বিষয়ে সম্মেলনে গুরুত্বের সাথে আলোচনা-পূর্বক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইরাকের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। উভয় দেশকে তাদের একে অপরের সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও অনুরোধ করা হয়। আজারবাইজানের বিরুদ্ধে আর্মেনিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আলোচনা করে আজারবাইজান থেকে আর্মানিয়ার সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়। সাইপ্রাস সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করে তুর্কী মুসলিম সাইপ্রাইসের জনগণের বৈধ অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গ্রীক সাইপ্রাসকে আহবান জানানো হয়। এ বিষয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবের ১২ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালের/ তারিখের বিবৃতিকে সাধুবাদ জানানো হয় সম্মেলন থেকে। সম্মেলনে লিবিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার ১৯৮৬ এর আগ্রাসনের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এর শান্তিপূর্ণ ইতিবাচক সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সালের ২০ নভেম্বর গৃহীত ৩৮/৪১ নং সিদ্ধান্তেরর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইরান এবং লিবিয়ার দামাতুলল বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সবাইকে এটি বিবেচনায় রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ও স্থায়ীত্বের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। Sahel-এর জনগনের প্রতি অবদান রাখার জন্য সম্মেলনে আহবান জানানো হয়। আফ্রিকার অনাবৃষ্টি এলাকার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রতি অনুরোধ করা হয়। সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্র এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মালি সরকার ও জনগণের জরুরী কার্যক্রম মিটানো এবং প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণের জন্য আর্থিক সহযোগিতার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। একইভাবে গাইজার এর গায়ানা সরকার ও জনগণের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য সম্মেলনে অনুরোধ জানানো হয়। সম্মেলনে সিয়েরা লিওনের জন্য পশ্চিম আফ্রিকা উন্নয়ন কমিউনিটি, জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের সহযোগীতার কথা উল্লেখ করে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রের এবং সংস্থার নিকট উক্ত দেশের জন্য মানবিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সুদানের বিদ্যমান অবস্থায় সংহতি ও সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রকে সুদানের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ মঞ্জুরের আবেদন জানানো হয়। সম্মেলনে যে সকল দেশ জাতিসংঘের সদস্য এবং উক্ত সংস্থার চার্টার মেনে চলে এবং ওআইসি'র সদস্য সে সকল দেশে মানবিক আর্থিক মঞ্জুরী প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং সদস্য দেশ সমুহের প্রতি আহবান জানানো হয়। এমন একটি দেশ কমরুস। কমরুসেরময়োটে দ্বীপের উপর সে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অর্থনৈতিক অখন্ডার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়।

নিরস্ত্রীকরণ

সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে গনবিধ্বংসী পারমানবিক অস্ত্ররোধ ইসলামিক দেশসমূহের জন্য অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়। CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty-তে স্বাক্ষরের জন্য সদস্য দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হয়। আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য শান্তিপূণর্ন পারমানবিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি কমিশন এজেন্সির (IAEA) রেজুলেশনের প্রতি একই সাথে ইসরাইলকে পারমাণবিক চুক্তি ব্যবহার না করতে IAEA-এর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। ২০০৫ সালের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে সবাইকে অংশ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইসলামিক রাষ্ট্র সমূহের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং তাদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে মর্মে সকল সদস্য রাষ্ট্র সম্মেলনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাকের সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা এবং সীমান্ত রক্ষায় অবিচল থাকার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়।

ওআইসি সদস্য দেশসমূহের সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা বিধান, মুসলিম জনগনের এবং দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকা, নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে স্বাধীন থাকা, সম্পদের অর্থনৈতিক সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সম্পর্কন্নোয়ন, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্যদের রাষ্ট্র কিংবা জনগণের হস্তক্ষেপ না করা, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বজায় রাখার বিষয়ে একে অপরকে সহায়তা ও সহযোগিতা করা, সর্বোপরি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ে ব্যক্ত করে এ বিষয়ে সমর্থন পূর্ণব্যক্ত করা হয়। একই সাথে মানবিক মুল্যবোধে অবিচল থাকা এবং জাতিসংঘের সনদের এবং নীতিমালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। ওআইসি সদস্যরাষ্ট্রের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদারকরণ এবং এসব ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। সদস্যরাষ্ট্রের সাংস্কৃতি, মুল্যবোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় লক্ষে সিদ্ধান্ত হয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যেন ও হুমকীর সম্মুখিন না করতে পারে যে দিকে সতর্ক থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং যে কার্যক্রম গ্রহণ করে ভবিষ্যতের বিপথজ্জনক অবস্থা থেকে উম্মাকে মুক্ত রাখার জন্য সংস্থার মহাসচিবকে সম্মেলনে অনুরোধ করা হয়।

সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা হয় যে, জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজন এবং জাতিসংঘে ইসলামিক দেশসমূহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সংস্কারের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্দি অন্যতম। এক্ষেত্রে সংস্থাকে কার্যকরী এবং প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ওআইসির সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রসমূহে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র ও সংস্থার পক্ষ থেকে ডেলিগেশন প্রেরণ করা হবে। এসব সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ঐহিত্য, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার ভোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আন্তরিকতার পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সংস্থার উপযুক্ত মহাসচিবকে কর্মসুচী প্রদানের দায়িত্ব প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ওআইসি সম্মেলনে মরু ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (MNLF) এবং ফিলিপাইন সরকারের মধ্যে ১৯৯৬ এ অনুষ্ঠিত চুক্তিকে স্বাগত জানায়। তাদের ন্যায্য আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এবং উক্ত শান্তিচুক্তি পরিপূনণভাবে বাস্তবায়নর মাধ্যমে দক্ষিণ ফিলিপাইনে কার্যকর শান্তি স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। মায়ানমারের মুসলিম জনগনের প্রতি সে দেশের একটি গ্রুফ কর্তৃক শোষন-বঞ্চনা এবং নাগরিক অধিকার হরণ সহ যে ধ্বংষাত্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্চে তা বন্ধের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মুসলমানদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহবান জানানো হয়। সম্মেলনে মানবাধিকার বিষয়ক কায়রো ঘোষনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। ইসলামে মানবাধিকারে যে কথা বলা হয়েছে তার প্রতি সকলের সমর্থন আদায়ের গুরুত্ব॰রোপ করা হয়। সম্মেলনে ইসলামিক স্যাটেলাইট কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকরের সহযোগিতা চাওয়া হয়। (International Communication Union) ২০০৩ সালে সেনেগালের রাজধানী তিউনিসিয়ার অনুষ্টানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদেরকে সহযোগী হতে হবে। অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাবকে কাটিয়ে ইতিবাচক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগী হতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) এর সদস্যপদ সকল

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসি সদস্য দেশকে গ্রহণ করে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকল সদস্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ওআইসি'র স্বাধীনে (Standing Commiltee for Economic and Comercial Cooperation (COM CEC) নীতিমালার আলোকে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে সকলে ঐকমত্য পোষন করে। সদস্য দেশগুলোকে একটি (Islamic Common Market) গঠনের উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে (Islamic Free Trde Zone) গঠনে উদ্দোগী হওয়ার বিষয়ে একমত পোষন করে। বাজার অর্থনীতি, মুদ্রানীতি, মুলধন যোগাননীতি, সর্বোপরি অর্থনৈতিক নীতি শক্তিশালী করা এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনীতি শক্তিশালী ভীতের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কার্যকরি আন্তঃওআইসি রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গ্রুপ তৈরীর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলনে (LDCS) বিষয়ে জাতিসংঘের ১৯৯৪ সালের রেজুলেশন এবং ১৯৯৭ সালের এতদবিষয়ক (Action Plan) বাস্তবায়নের জন্য উন্নত দেশসমূহের প্রতি আহবান জানানো হয়। সদস্য দেশগুলোকে IDB-এর সহযোগিতা গ্রহণ করে আর্থিক উন্নয়নের পরামর্শ প্রদান করা হয়। একই সাথে IDB-এর প্রাপ্য চাঁদা পরিশোধের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়।

পরিশেষে জন্য হুমকী সরূপ, জীববিজ্ঞান এবং সমাজ অর্থনীতি জন্য ক্ষতিকর কর্মসূচী থেকে বিরত থাকার প্রতি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার কথা মেনে নিয়ে এর অগ্রযাত্রাকে উন্নয়নের জন্য সদস্য দেশসমূহের সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন কিছুতেই শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে হুমকির মুখোমুখি করে এমন পরিবেশ থেকে মুক্ত থেকে মানবতার উন্নয়নে তথ্য-প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসুস্থ ব্যবহার রোধ করে মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নে অবাধ প্রযুক্তি ব্যবহারে সকলকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন ভয়াবহ ব্যাধির নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহার নিশ্চিত করে চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জাতিসংঘের অবৈধ মাদক ব্যবহারে গৃহীত কনভেনশনের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। মাদক নিয়ন্ত্রণে সংস্থার মহাসচিবকে কার্যকরি কর্মসূচী প্রনয়নের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়। দক্ষ জনশক্তি গঠনে ঢাকায় অবস্থিত (Institute of Technology) এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক এবং কিয়োটা প্রটোকলের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানানো হয়।

ইসলামী সংস্কৃতি একটি অতীব উন্নত এবং ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি-ইসলামী উম্মার ঐক্য স্থাপনে এই সংস্কৃতির আদান-প্রদান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে একে আরো শক্তিশালী করা যায় বলে মনে করা হয়। (ISESCO) কর্তৃক গৃহীত ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরব এবং ইসলামকে জানতে সাহায্য করায় সম্মেলনে তাদের ভূয়সী প্রশাংসা করা হয়। তবে সদস্য দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিয়োগের জন্য ডায়ালগ-এর ব্যবস্থা করার জন্য সম্মেলনে তাগিদ প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে ওআইসিভুক্ত একটি সদস্যরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী দোহায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যে ভাষন প্রদান করেন এরূপ উপস্থিত ৫৩টি রাষ্ট্র প্রধানগণ তাদের আঙ্গিকে বক্তব্য প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের সকলের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলন শেষে যে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে যার সারাংশ উপরে উল্লেখ করা হল-তা অত্যন্ত তাৎপর্য মন্ডিত,যুগোপযোগী এবং বাস্তবভিত্তিক। কিন্ত সময় যতই যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেক কিছুই প্রাসঙ্গিক বিবেচনার পরও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিংবা তাৎক্ষনিক ভাবে আংশিক গৃহীত হলেও চূড়ান্ত বিচারে অদ্যাবধি তা সম্পূর্ণ রূপে গৃহীত হয়নি। কারণ মুসলিম বিশ্বের ২০০০ সালের অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা আরো অবনতির দিকে তা যেমন আন্তঃদেশীয় সমস্যার বিবেচনার তেমনি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার বিবেচনাও বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়:

বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে ওআইসি'র কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়:

বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে ওআইসি'র কার্যক্রম

সংস্থার চার্টারের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বিভিন্ন কমিটি এবং বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধানকল্পে চার্টারের ধারা (৫),(১০),(১৩),(১৪),(১৫),(২৬)এবং (২৭) এর আলোকে ওআইসি বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধ্যায় ১৫এর ধারা ২৭এ শান্তিভ্রূপূর্ণ পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি'র বিধানে বলা হয়েছে যে, 'ওআইসি সদস্যরাষ্ট্রসমূহ, যারা কোন বিরোধের পক্ষভূক্ত এবং যে বিরোধের ফলে ইসলামী উম্মাহ বা আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে তার সমাধানের জন্য উদ্যোগ, আলোচনা, তদন্ত, মিমাংসা, সালিশি, বিচারিক নিষ্পত্তির অথবা তাদের পছন্দ অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারে।[১] এক্ষেত্রে উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে নির্বাহী কমিটি এবং মহাসচিবের সাথে আলোচনা-পরামর্শ। এবিধানের আলোকে বিরোধগ্রস্থ দেশসমূহ ওআইসি'র এখতিয়ারভূক্ত। তাত্ত্বিকদের অনেকে আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন দেশের সমস্যার মূল কারণ মনে করেন নয়া বিশ্ব ব্যবস্থাকে,যদিও এটি পরিপূর্ণভাবে সত্য নয়। আর বিশ্বের এ ব্যবস্থাকে যেভাবেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন, এটা সত্য এই নয়া বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বর [২] (২০০১) এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পর বুশ[৩] প্রশাসনের একটি আগ্রাসী মনোভাব বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে বিতর্কিত করেছে।

---

(১) ওআইসি সনদ, ধারা, ২৭, (২০০৮ সালের সংশোধনী অনুযায়ী)।

(২) সেপ্টেম্বর ট্রাজেডি ঃ অপরাজেয় শক্তি আমেরিকার জন্য তো বটেই সারা বিশ্বের ইতিহাস ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর একটি হৃদয়-বিদারক অধ্যায়ের সূচনা করে। হাডসন নদীর তীরে অবস্থিত লোয়ার ম্যানহাটানের নিউইয়র্ক শহর হ'ল অন্যতম প্রধান বানিজ্যিক শহর। ৭৫ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত ''ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার'' যা 'টুইন টাওয়ার' নামে পরিচিতি লাভ করেছে সারা বিশ্বে সেটা আত্মঘাতি বিমান হামলার শিকার হয়। এদিন প্রায় একই সময়ে ওয়াশিংটনের পেন্টাগনেও মারাত্মকভাবে সন্ত্রাসী হামলা হয়, যার ফলে বিশ্বের হাজার হাজার নিরীহ কর্মজীবি মানুষ হতাহতের শিকার হয়। ১১০ তলা মজবুত টুইন টাওয়ার এভাবে ভূমিতে গড়াগড়ি যাবে তা ভাবতে পারেনি আমেরিকারসহ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ এটাকে জাতীয় ট্রাজেডি বলে ঘোষনা প্রদান করেন। স্থানীয় সময় ৮ টা ৪৮মিনিট টুইন টাওয়ারের উত্তর দিকের টাওয়ারে আমেরিকান এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট-১১ আঘাত হানে। এই ৭৬৭ বোয়িং বিমানটি বোষ্টন থেকে ৮ টার দিকে ছেড়ে লসঅ্যাঞ্জেলস এর দিকে আসছিল। এটি উত্তর দিকের টাওয়ারে ৯৬ তলা ও ১০৪ তলার মাঝামাঝি সরাসরি ঢুকে পড়ে। তখন চতুর্দিকে শুধু অগ্নিশিখা আর কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। এই ধোয়ার মধ্যেই স্থানীয় সময় সকাল ৯ টা ৩ মিনিটে দ্বিতীয় বিমানটি দক্ষিন টাওয়ারে এসে আঘাত করে। প্রচন্ড বিস্ফোরণে আশে পাশের সমস্ত এলাকা প্রকম্পিত হয়। মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর ৯টা ৪৩ মিনিটে অন্য একটি প্যাসেঞ্জার জেট বিমান আঘাত হানে, ১০টা ৪৮মিনিটে পেনিসিলভেনিয়ায় আরেকটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। এসব বিমানের ২৬৬ জনসহ প্রায় ৬ হাজার মানুষ নিহত হয়। ফলে বিশ্বব্যাপী শোকের ছায়া নামে।

(৩) জর্জ ওয়াকার বুশ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত দেশে ৪৩ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জর্জ ওয়াকার বুশ ২০ জানুয়ারী ২০০১ সালে শপথ বাক্য পাঠ করার মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। জর্জ ডব্লিউ বুশ ১৯৪৬ সালের ৬ জুলাই কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের নিউ হ্যাভেনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জর্জ বুশ মার্কিন প্রজাতন্ত্রের ৪১ তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জর্জ ডব্লিউ বুশ ১৯৬৮ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে হাভার্ড বিজনেস স্কুলে ৭৫ সালে বি বি এ ডিগ্রি অর্জন করেন। মি. বুশ ১৯৯৪ সালে রিপাবলিকান হিসেবে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের গর্ভণর নির্বাচিত হন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত একই পদে অধীষ্ট ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই আগ্রাসী মনোভাব কোন দিকে মোড় নেয়, তা শুধু আগামী দিনগুলোই বলতে পারে। তবে বুশ প্রশাসনের নীতিনির্ধারকদের সাথে যাঁরা জড়িত, তাঁরা আগামী দিনের যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কিছু রূপ তুলে ধরেছেন-এদের একজন অধ্যাপক কন্ডোলিজ্জা রাইস (Condoleezza Rice) ষ্ট্যাম্পফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক এই অধ্যাপিকা তখন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে কিছু মৌল অগ্রাধিকারকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে: (১) যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা; (২) মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে অবাধ বাণিজ্য বিস্তৃত করা ও স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (৩) যারা আমেরিকান মূল্যবোধের অংশীদার, তাদের সঙ্গে শক্তিশালী ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা; (৪) রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার জ্যোতিকেন্দ্র বিস্তৃত করা; (৫) যেসব রাষ্ট্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক ধবংসাত্মক অস্ত্রের উদ্ভোবনে আত্মনিয়োগ করা।[৪]

অধ্যাপক কন্ডোলি রাইসের মতামত যে তার ব্যক্তিগত কোন মতামত নয় নিম্নে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কিন কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের হাউস কমিটিতে রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম উপদেষ্টা পিটার টি আর ব্রুকস (Peter T.R. Brooks) সম্ভাব্য নীতিকে বিশ্লেষন করেছেন এভাবে U.S. must manage their future relationship with a clear priority to protecting and advancing American interest through a policy of strategic realism rather the strategic partnership তিনি দ্রুত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মিসাইল সিস্টেম মোতায়েন, তাইওয়ানে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদি বিক্রয় ও উচ্চ প্রযুক্তি যাতে চীন, উত্তর কোরিয়া ও ইরানসহ অন্যান্য দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের কাছে সরবরাহ করা না হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখার আহবান জানান[৫] আসলে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে মর্মে কেহ মন্তব্য করতে পারেন। অধ্যাপক রাইজ্জ জাতীয় স্বার্থকে যেভাবে দেখেছেন, তাকে অনেকে আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করবেন। তবে অধ্যাপক নাই জাতীয় স্বার্থকে দেখেছেন ভিন্ন চোখে। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট এর ডীন অধ্যাপক জোসেফ নাই (Joseph S. Nye, Jr.) জাতীয় স্বার্থের সাথে মানবাধিকারের প্রশ্নটিকে এক করে দেখেছেন। তার মতে "....The national interest can include values such as human rights and democracy, if the public ...... is willing to promote them..." অধ্যাপক নাই তিন ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরুপ। এ পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্র। যেমন- উত্তর কোরিয়া ও ইরাক, কসোভো বসনিয়া, সোমালিয়া, হাইতি, যারা পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে আঘাত করতে পারে।[৬] তবে কোন কোন তাত্বিক অন্যান্য বিষয় এসব সমস্যার কারণ বলে উল্লেখ করেন।

(৪) দেখুন তার প্রবন্ধ Promoting National Interest, Foreign Affairs, January-February, 2000, তারেক শামসুর রেহমান, *নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, মাওলা বাদার্স, ঢাকা-২০০৮, পৃ.৩২০.

(৫) দেখুন, Strategic Realism: The Future of U.S. Sino Security Relations, Review, Vol. 27, No. 3, Summer, 1999, PP. 53-56,পূর্বোক্ত, পৃ.৩২১.

(৬) Redefining the National Interest Foreign Affairs, Vol. 78, No.4, July-August, 1999, PP. 22-35, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২১

Dhaka University Institutional Repository

তারা মনে করেন যে, বাহ্যিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা আন্তর্জাতিকতা, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌভ্রাত্রের পরিবেশকে ধ্বংস করে যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করবে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রসার, আন্তর্জাতিকতার ব্যাপ্তি, জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা।

দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সামরিক জোটের প্রতিষ্ঠা বিংশ শতাব্দির রাজনৈতিক মানচিত্রে বহুল পরিবর্তন সাধন করছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পরস্পর নির্ভরশীলতা রাষ্ট্রের চরম বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।[৭] বাস্তবে সমস্যার কারণ যাই হোক না কেন বা যে কোন তত্ত্বের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হোক না কেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমস্যা রয়েছে, আর বর্তমানে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সমূহে এ সমস্যা প্রকট। ওআইসি বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে এসংক্রান্ত বিষয়াবলীর কয়েকটি দেশের উপর আলোকপাত করা হলো।

৬.১. বাংলাদেশ
৬.২. ফিলিস্তিন
৬.৩. আফগানিস্তান
৬.৪. ইন্দোনেশিয়া
৬.৫. ইরাক
৬.৬.ইরান -ইরাক
৬.৭.কাশ্মীর
৬.৮.কুয়েত

৬.১. বাংলাদেশ

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে যে কয়'টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সংঘর্ষ ঘনিভূত হতে শুরু করে। যদিও এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এ অঞ্চলের মানুষের বড় অংশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আগ্রহী ছিল। কিন্ত পশ্চিমা শাসকদের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একপেশে মনোভাবের ফলে বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়।[৮] ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বাঙালী জাতির দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের চূড়ান্তপরিণতি। এই সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।[৯] মূলত বিংশ শতাব্দীতে ছিল গণতান্ত্রের তরঙ্গ।"ঐতিহাসিকেরা উনবিংশ শতাব্দীতে যে গণতন্ত্রের তরঙ্গ দেখা পান তার মধ্যে প্রধানত: তিনটি উত্থান-পতন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া থেকে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্তপ্রায় ২৯টি গণতন্ত্রের[১০] দেখা পাওয়া যায়।

(৭) নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, শ্রী ভুমি পাবলিশিং কোম্পানী, ২০০৪, পৃ- সংযোজন-১৬৬.
(৮)আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা,জুন ২০০০ দ্রঃ ভূমিকা।
(৯) সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, ঢাকা- এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ.০৫
(১০) ২৯টি গণতন্ত্র অর্থাৎ ২৯টি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিচারপতি হাবিবুর রহমান এভাবে উল্লেখ করায় হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ সালের দিকেই সে তরঙ্গের ভাটা দেখা দেয়। গণতন্ত্রের সোপানে আরোহন করেই ফ্যাসিজম, নাৎসিজমের জন্ম। ১৯৪২ সালে বিশ্বে গণতন্ত্রের সংখ্যা ৬২তে নেমে আসে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের দ্বিতীয় জোয়ার দেখা যায়। ১৯৬২ সালের মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩৬ এ। আবার ভাটায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা নেমে আসে ৩০ এ। ১৯৭৪ সালের দিকে স্বরণকালের তৃতীয় জোয়ারে আরও ৩০টি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।[১১]

বিশ্ব গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার জোয়ারে যখন তরঙ্গায়িত ঠিক তেমন এক মূহুর্তে ১৯৬৯ সালের ২১ আগষ্ট ইহুদীবাদী দুষ্টচক্র অধিকৃত জেরুজালেম[১২] নগরীতে অবস্থিত মুসলিম জাতির প্রথম কাবা মসজিদুল আকসায়[১৩] অগ্নি সংযোজ করে। এ ঘটনায় মুসলিম বিশ্ব তীব্র প্রতিবাদ জানায়, ক্ষোভে ফেটে পরে। ইহুদীদের এহেন ন্যাক্কারজনক গর্হিত কর্মের জবার প্রদানের জন্য ২৫ আগষ্ট মিশরের রাজধানী কায়রোতে ১৪ টি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের একটি শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগৃহীত হয়। শীর্ষ সম্মেনের জন্য ৭টি দেশ নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।[১৪] এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের ২১-২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ২৪ টি দেশের [১৫] রাষ্ট্র প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবীতে ১৯৭০ সালে প্রথম ওআই সি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ওআই সি'র সচিবালয় জেদ্দায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ও আই সি'র প্রতিষ্টার পর থেকে একদিকে যেমন বারতুল মোকাদ্দাস'কে ইহুদী দখলমুক্ত করার জন্য কাজ করছে তেমনি শোষিত বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বপক্ষে তাদের কল্যাণার্থে কাজ করছে। তবে নিশ্চয়ই তা চাহিদা অনুযায়ী অতি সামান্য। এছাড়াও যে সব প্রক্রিয়ায় শান্তি প্রতিষ্টিত হতে পারে সে সকল কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন যুদ্ধকালীন সময়ে রাজনৈতিক সমাধান, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নে কাজ করা, স্বল্প উন্নত দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো।

১১। সৈয়দ শাহ এমরান, *প্রসঙ্গ নজরুল*, ঝিঙ্গেফুল প্রকাশনা, ঢাকা- অক্টোবর ২০১০, ভুমিকা দ্রষ্টব্য।

১২। জেরুজালেম: মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের পবিত্র স্থান। বিভিন্ন শাসনামলে এ শহরের শাসনভার এ সকল ধর্মের শাসনকর্তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইলের যুদ্ধের পর এ শহরের শাসন ক্ষমতা ইসরাইলদের হস্তগত হয়।

১৩। মসজিদুল আকসা: মুসলামানদের প্রথম কেবলা, দ্বিতীয় পবিত্রতম মসজিদ, জেরুজালেম শহরে অবহিত।

১৪। *Syed Tayyeb-ur-Rahman, Global GeoStratrgy of Bangladesh, OIC and Islamic Ummah*, Islamic Foundation 1985, Dhaka P.59.

১৫। ২৪টি দেশ হলো : ১৯৬৯ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, শাদ, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, মরক্কো, স্ৌদি আরব, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, নাইজার, পাকিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মিশর, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, সেনেগাল এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে পি.এল,ও. যোগদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে ও আই সি' এ দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যেমন- মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ বন্দের পদক্ষেপ গ্রহণ, পরবর্তীতে বিভিন্ন রকম উন্নয়মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে এবং শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে। এখানে "বাংলাদেশে ও আই সি'র কার্যক্রম" এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে পাঠককে ও আই সি'র কার্যক্রম বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে সংস্থাটির সম্পর্ক এবং এর ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে নিম্নোক্তো বিষয় আলোচনা করা হবেঃ

১। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালীন ওআই সি'র কার্যক্রম

২। মুসলিম দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সর্ম্পক স্থাপন এবং ও আই সি'র সদস্যপদ লাভ

৩। বাংলাদেশে ও আই সি'র শিক্ষা কার্যক্রম

৩.১ Islamic University of Technology (IUT)

৩.২ Islamic Development Bank-Bangladesh Islamic Solidarity Education Wakf (IDB-BISEW)

৪। ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এর কার্যক্রম

৫। বাংলাদেশে ও আই সি'র অন্যান্য কার্যক্রম

৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন

৬.১.১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালীন ওআই সি'র কার্যক্রম

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ওআই সি'র প্রতিষ্ঠা আনেকটা সমসাময়িক। এক দীর্ঘ সশস্ত্র মুদ্ধিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোতে ২৪টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন এবং ওআই সি'র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংস্থাটি প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ফলে এ অল্প সময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালীন সময়ে ওআই সি'র অবদান রাখার সুযোগ অনেকটা কম ছিল। অন্যদিকে ওআই সি'র সদস্যভূক্ত একটি দেশের দুটি অঞ্চলে সশস্ত্র যুদ্ধ চলছে এটি বিবেচ্য বিষয় ছিল ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংকট থেকে ক্রমশ এটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে রূপান্তর্ড়রিত হয়। [১৬] মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মুসলিম বিশ্বের সকল দেশই একমত ছিল যে, বাংলাদেশ সংকট পাকিস্তানের আভ্যন্তড়ীন ব্যাপার। যে কারণে মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়। এসব দেশের মধ্যে ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক, জর্ডান, লিবিয়া পাকিস্তানকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে।

১৬। আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যূদয় ও জাতিসংঘ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০০২, পৃ.০১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সম্মেলন সংস্থাও (ও.আই.সি) সহমত পোষন করে এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও জুন মাসের শেষে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন শেষে যুক্ত ইশতেহারে বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের তথাকথিত ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্ঠাকে সমর্থন জানায়। এভাবে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষে নৈতিক এবং কোন কোন দেশ আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা দেয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে মধ্যপন্থী মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির বিষয়ে একমত পোষন করলেও তারা অনেক ক্ষেত্রে ভারত ও সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক, জনমতের প্রভাব ও গণমাধ্যমের চাপে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইরাক, সুদান ও আলজেরিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। [১৭]

সারণি ঃ ০৮

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধে কয়েকটি মুসলিম দেশের পাকিস্তানকে প্রদত্ত অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য।

দেশ	সামরিক সাহায্য	আর্থিক সাহায্য
ইরান	সামরিক বাহিনীর জন্য অস্ত্র, গোলাবারুদ, খুচরা যন্ত্রাংশ, বিমান বাহিনীর ব্যবহৃত অস্ত্র।	
সৌদি আরব	৬টি হেলিকপ্টার, ২টি টর্পেডো, বোট।	২০ মিলিয়ন ডলার (ঋণ)
জর্ডান	১০টি এফ-১০৪ জেট ফাইটার, খুচরা যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদ।	
কুয়েত		২ মিলিয়ন ডলার (সাহায্য)
তুরস্ক	গোলাবারুদ	
আবুধাবী		১০ মিলিয়ন ডলার (ঋণ)

Source: Rocded Khan (Compiled), The American Papers Secret and Confidential India-Pakistan-Bangladesh Documents 1965-1973 (Dhaka : UPL, 1992), p. 943.
(আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ) "বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১" ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ মার্চ ২০০২, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩)।

এভাবে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষে নৈতিক এবং কোনো কোনো দেশ আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা দেয়। 'তবে মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে মধ্যপন্থী মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির বিষয়ে একমত পোষণ করলেও তারা অনেক ক্ষেত্রে ভারত ও সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক, জনমতের প্রভাব ও গণমাধ্যমের চাপে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইরাক, সুদান ও আলজেরিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এসব দেশের মধ্যে সুদান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিরোধীতে পরিণত হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৬ আগষ্ট সৌদি আরবেব স্বীকৃতির পর দেশটি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। [১৮]

১৭। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, *বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক* ১৯৭১-১৯৮১, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৫ মার্চ ২০০২, পৃ.৩৫২-৩৫৩

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫২-৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

তবু সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম অদ্যুষিত একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে ওআই সি'র অবদান লক্ষ্য করা যায়। মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমান [১৯] (Tunku Abdul Rahmen) ওআই সি'র প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন[২০]। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার ২৮ দিনের মাথায়, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে উ থান্ট মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমানকে একটি গোপনীয় পত্র পাঠান। তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য উদ্যোগ নিতে তিনি আবদুর রহমানকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, সে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি। কাজ হলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্ভবত ভিন্ন খাতে বইত[২১]। এর প্রসঙ্গে আশফাক হোসেন উল্লেখ করেন,

"উ থান্ট খুব সাবধানতার সঙ্গেই চিঠিটি লিখেছিলেন। তিনি জানতেন এ চিঠির কথা ফাঁস হয়ে গেলে পাকিস্তান তার প্রতিবাদ করবে। তাছাড়া মহাসচিব হিসেবে তার নিরপেক্ষতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। চিঠি পাওয়ার অব্যবহিত পরেই টুংকু আব্দুর রহমান উথান্টের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে যথাসাধ্য করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন বলে মহাসচিবকে আশ্বাস দেন। 'ঈশ্বর ও মানবতার নামে' এই কাজে তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে টুংকু জানান। উথান্টের কাছ থেকে অনুরোধ পাওয়ার আগে আরো অনেক মুসলিম সংস্থার কাছ থেকে মধ্যস্থতার অনুরোধ পেয়েছিলেন টুংকু । কিন্ত পাকিস্তান ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না সে কথা তার জানা ছিল। উ থান্টকে লেখা এক বার্তায় সে কথা উল্লেখ করে টুংকু জানান, প্রেসিডেন্ট খানের সঙ্গে তার চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে এবং তাকে যে কোনো সময় পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েও রেখেছেন তিনি। [২২]

টুংকু জাতিসংঘের মহাসচিবকে তার এই আশংকার কথা বলেননি, বরং তিনি শুধু কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উ থান্টকে অবহিত করার মাধ্যমে আশ্বস্থ করেন। আশফাক হোসেন উল্লেখ করেন যে,

৩ মে লন্ডন থেকে পাঠানো টুংকুর এই বার্তা পেয়ে উথান্ট স্বাভাবিকভাবে আশান্বিত হয়েছিলেন। তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, টুংকু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হবেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭ জুলাই টুংকু ও ইয়হিয়া খানের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ হয়। উভয়ের আলোচনার ভিত্তিতে টুংকু অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্যে সেখানে যাত্রার আয়োজন করছেন বলে উ থান্টকে জানান। টুংকু ও উ থান্টের এই কূটনৈতিক উদ্যোগ অবশ্য এর বাইরে খুব একটা আগাতে পারেনি, তার কারণ একই প্রস্তাব নিয়ে ভারতের সাথে যাগাযোগ করা মাত্রই তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয়। সম্ভবত নিম্ন পর্যায়ের কূটনৈতিক শলা-পরামর্শে তিনি প্রাথমিকভাবে উভয় সরকারের কাছ থেকেই সমর্থনের আশ্বাস পেয়েছিলেন।

১৯। টুংকু আব্দুর রহমান (Tunku Abdul Rahman): টুংকু আব্দুর রহমান, ৮ ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ ও ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে মৃত্যুবরন করেন। তিনি মালয়েশিয়ার স্বধীনতা আন্দোলনের নেতা, মালয়েশিয়ার জনক ও স্বাধীন মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। Tunku তার রাজকীয় উপাধী |

২০। Noor Ahmad Baba, *Organization of Islamic Conference therory and practice of Pan-Islamic Cooperation*, University press life, Dhaka, 1994 P.37

২১। আশফাক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৪৭

২২। পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

২৩ জুলাই উ থান্টকে লেখা এক বার্তায় টুংকু তার আভাষই দিয়েছিলেন। জেদ্দা থেকে লেখা সে বার্তায় টুংকু তার উদ্যোগের একটি রূপরেখা জাতিসংঘের মহাসচিবকে প্রেরণ করেন। তার এই বিশ্বাস ছিল যে ইয়াহিয়া খান ও ইন্দিরা গান্ধীকে পরস্পরের মুখোমুখি করা সম্ভব হলে একটি সমাধান ফর্মুলা অর্জন অসম্ভব হবে না।'উভয় নেতাই যুক্তি মেনে চলেন, তবে তাদের দেশের চলমান রাজনৈতিক মনোভাব তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে', টুংকু তার বার্তায় মন্তব্য করেছিলেন।[২৩]

এ উদ্দোগ সর্ম্পূনরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ এমন একটি অবস্থানে পৌঁছেছিলেন যে, তাদের দেশের চলমান রাজনীতির বাইরে কিছুই চিন্তা করার সুযোগ তাদের ছিল না। এ অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধ কিংবা যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবার সময় ফুরিয়ে যায়।এ বিষয়টিই তাদের পরবর্তী যোগাযোগে ফুটে ওঠে। আশফাক হোসেনের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে - টুংকুর এই আশাবাদ সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রশ্নের কোন সমাধানে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে তার সামরিক বিজয় অর্জিত হওয়ায় পাকিস্তানের সেনা কর্মাদ্যক্ষরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে মুক্তি বাহিনীর সামরিক প্রতিরোধ দীর্ঘ স্থায়ী হবে না। বাংলাদেশে তার সামরিক অভিযানের অন্যতম পরিকল্পনাকারী জেনারেল রাও ফরমান আলী পরে দাবি করেন, ১০ মের মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে আর্মির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এই পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাথে কোন সমঝোতার স্পষ্ট বিপক্ষে ছিল সামরিক জান্তাগুলো, কারণ সে অবস্থায় ২৫ মার্চের সামরিক হস্তক্ষেপকে নিয়মসিদ্ধ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে'। প্রায় একই সময় পাক জেনারেলরা আওয়ামী সমর্থকদের, বিশেষ করে আনিত সভায় নির্বাচিত সদস্যদের দলে ভিড়াবার লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার অধীনে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা যে নব আইন সভার নির্বাচিত সদস্য সে ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ নেবেন। তাদের আইন সভার প্রতিষ্ঠিত সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু যারা সে সুযোগ নেবেন না অর্থাৎ যারা ভারতে থেকে যাবেন বা মুক্তিবাহিনীর কাজে সমর্থন জোগাবেন তাদের আসন শূন্য ঘোষণা করা হবে। ২১ও ২৪ মে দু-দফায় ইয়াহিয়া তার এই পরিকল্পনা পেশ করেন। এ কাজে মদদ দেওয়ার জন্য এ সময় সামরিক জান্তা সাবেক আওয়ামী নেতা সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মানকে ব্যবহারের সিদ্ধান্তনেয়। বেগম আখতার জুন মাসে ঢাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়ে গেছেন এমন আওয়ামী নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে ১০৯ জন আওয়ামী নির্বাচিত এমপির সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন বলে দাবি করেন। কোনো কোনো আওয়ামী নেতাকে দলে ভেড়াতে পারলেও উদ্বাস্তুদের মধ্যে ফিরে আসে এমন নারী-পুরুষ খুব কমই ছিল।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে শরণার্থী বাঙ্গালিদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। অ্যামনেস্টি ঘোষণার পাশাপশি আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো রকম রাজনৈতিক সমঝোতার যে কোনো সম্ভাবনা বাতিল করে দেন ইয়াহিয়া খান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না বলে ইয়াহিয়া খান ২৮ জুন এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন। অন্য কথায় যে জাতীয় রাজনৈতিক সমঝোতা সম্ভব বলে উ থান্ট আশা করেছিলেন, তার সম্ভাবনা তত দিনে কার্যত নিবে গেছে। টুংকুকে ইয়াহিয়া যত সম্মানই করুক না কেন, অভ্যন্তড়রীণ রাজনৈতিক বিবেচনা অগ্রাহ্য করে কোনো সমঝোতায় যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

ভারতও এত দিনে বাংলাদেশ প্রশ্নে তার অবস্থান পরিস্কার করে এনেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় সমঝোতার বদলে মুক্তিবাহিনীকে সামরিক সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে নয়াদিল্লির রাজনৈতিক প্রশাসন ঐকমত্যে পৌঁছেছে। ২০ জুলাই ভারতীয় পরাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, মুক্তিবাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্যের জন্য যা প্রয়োজন ভারত সরকার তা করে যাবে। এর এক সপ্তাহের ভেতর দেওয়া এক ঘোষণায় ভারত সরকার শেখ মুজিবের ওপর কোনো শারীরিক আঘাত এলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানান। ঠিক কী প্রতিক্রিয়া হবে তা পরিস্কার করে জানানো না হলেও কেউ কেউ এই ঘোষণাকে পাকিস্তানের বিরদ্ধে সামরিক হুমকি বলে তার ব্যাখ্যা করেন। এই ক্রমাবনতিশীল রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিতে টুংকুর পক্ষে কোনো রাজনৈতিক সমাধানে আসার লক্ষ্যে অগ্রগতি অর্জন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামিক কনফারেন্সের সদস্য হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও তিনি ভারতের কাছ থেকে বাঁধার সম্মুখীন হন। ব্যক্তিগত পর্যায় টুংকুকে এ কারণেই নয়াদিল্লি কনফারেন্সের একটি প্রতিনিধি দলকে ভারত আসার অনুমতি দিতে পর্যন্তঅস্বীকার করে। এ অবস্থায় টুংকু বুঝতে পেরেছিলেন, উথান্টের দেওয়া কূটনৈতিক মিশনে কোনো রকম অগ্রগতি অর্জন তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। উ থান্টকে ৭ সেপ্টেম্বর লেখা একটি দীর্ঘ গোপনীয়, প্রতিবেদনে তার এই হতাশার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। ইয়াহিয়া খান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে কোনো রকম মুখোমুখি সাক্ষাৎকার আয়োজন তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, সে প্রতিবেদন থেকে সে কথা স্পষ্ট হয়। এই প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে উ থান্ট মন্তড়ব্য করেন, 'দি এপিসোড অফ এ প্রাইভেট মিশন হ্যাড কাম টু এ ক্লোজ'। অন্য কথায়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ প্রশ্নের রাজনৈতিক সমাধানের যে উদ্যোগ উ থান্ট নিয়েছিলেন, এভাবে প্রবল ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটে"[২৪]।

উপরোক্ত পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে বিবদমান বিষয় নিয়ে তাদের আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বাস্তাবে ও আই সি'র প্রতিষ্ঠায় যে সকল দেশ অগ্রগামী ছিল তার মধ্যে পকিস্তান, মালয়েশিয়া,সৌদি আরব ও মরক্কো অন্যতম। ফলে মালায়েশিয়া পাকিস্তানের বিভক্তির পক্ষে ছিলনা বরং এ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছিল।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু, পাকিস্তানের সমঝোতার অনাগ্রহ এবং ভারতের সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক প্রয়াসের অনীহার কারণে এ উদ্দেগ ব্যহত হয়। তৎকালীন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে আবু দেলোয়ার হোসেন উল্লেখ করেন - ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণের আগে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তনের প্রতিনিধিত্ব করার সময় এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে কট্টর বাংলাদেশ-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির খসড়া প্রতিলিপি টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলেন এবং সাংবাদিকদের জানান, তিনি যুদ্ধবিরতি চুক্তি কিছুতেই মেনে নেবেন না। অবশ্য তাঁর এই প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে পাকিস্তানি জেনারেলরা একই তারিখ রাতে আত্মসমর্পনের দলিল স্বাক্ষরের চূড়ান্তসিদ্ধান্তনিয়ে ফেলেন এবং পরের দিনই অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্তভ্ভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেন। যদিও এ সংবাদ পাওয়ার পরও ভুট্টোর প্রতিক্রিয়া ছিল 'বাংলাদেশ বলে কিছু নেই, আছে পূর্ব পাকিস্তান'। তবে ভুট্টোর মতো একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, পাকিস্তানের এই ঘটনাপ্রবাহই তাঁকে রাস্ট্রের কর্ণধার হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই ১৮ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পরাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি জানান, পাকিস্তানের দুটি অংশের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তিনি সচেষ্ট থাকবেন। ২০ ডিসেম্বর ভুট্টো দেশে ফিরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর প্রথম ভাষণে বাংলাদশকে 'পূর্ব পাকিস্তান' আখ্যা দিয়ে একে পাকিস্তানের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে দাবি করেন। তিনি তাঁর স্বভাবসূলভ আবেগময় বক্তৃতায় বাঙ্গালি জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভুলের মাশুল যাতে দেশ বিভক্তিতে রূপ না নেয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য বাংলাদেশের নেতাদের প্রতি আহবান জানান। ভুট্টো বলেন, আমি মুসলিম বাংলার নেতা ও জনগণের কাছে যেতে চাই এবং বিদেশী কোনো শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে চাই। আমরা বিগত ২৪ বছর যেমন ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করেছি, ভবিষ্যতেও সেরকমভাবে বসবাসের জন্য নতুন একটা মীমাংসায় উপনীত হবো। তবে এই মীমাংসা অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে হতে হবে। একই দিন প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেও তিনি পাকিস্তানের দুই অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুন সরকার গঠনের পক্ষে মত দেন। একাত্তরে মার্চ মাসে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অনীহা, নয় মাস জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে যোগসাজস, সরকারি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে ইরান, চীন সফর, সর্বোপরি উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দান সামরিক জান্তার প্রতি তাঁর সমর্থনেরই প্রমাণ দেয়। যদিও পাকিস্তানের ভাঙনে ভুট্টো তাঁর দায়-দায়িত্ব এড়ানোর জন্য নিজের ভূমিকাকে আড়াল করতেই প্রতিষেধক হিসেবে আগাম ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করেন। নিজের এই লক্ষ্য সাধনে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য, জেনারেলদের অযোগ্যতা ও নারী কেলেঙ্কারী কাহিনী ডিসেম্বর মাসেই পাকিস্তানের টিভিতে তুলে ধরা হয়। ২০ ডিসেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়াসহ ৬ জন জেনালেলকে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং গণতন্ত্র ফিরে না আসা পর্যন্তসামরিক শাসন বলবৎ রাখার ঘোষণার মাধ্যমে ভুট্টো যেমন একদিকে নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অন্যদিকে তেমনি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য তাঁর আন্তর্ভুরিকতা প্রদর্শনের জন্য পাকিস্তানে বন্দি শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করে ঐক্যবদ্ব পাকিস্তানের অনুকূলে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এড়িয়ে এই উদ্যোগের পিছনে ভুট্টোর উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমত, অভ্যন্তড়ীণ ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করার জন্য পাকিস্তানিদের মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল তাকে নিজের অনুকূলে আনা। দ্বিতীয়ত, ভারতকে এড়িয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকায়ন। মুজিবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ২৭ ও ২৯ ডিসেম্বরের দুটি বৈঠকে ভুট্টো মুজিবকে যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার আহবান জানান।[২৫]

এ সব রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের স্বধীনতা লাভের প্রত্যাশায় মুক্তিযুদ্বকে ভাল চোকে দেখেন নি। এ কারণে অনেক মুসলিম দেশ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের অভ্যবহিত পরে স্বীকৃতি প্রধান করেনি। বরং অনেক দিন পর স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৫। পাঠকের সুবিধার্তে পত্রটি এখানে উল্লেখ করা হল।
অত্যন্তগোপনীয়,ব্যক্তিগত ও গোপনীয়
২৩ এপ্রিল ১৯৭১
প্রিয় টুংকু
দীর্ঘ সময় ধরে বিবেচনার পর আপনাকে শেষ পর্যন্তএই চিঠি লিখছি। আশা করি বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপকে আপনি সমীচীন মনে করবেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনি বাকি বিশ্বের সবার মতো পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সমান উদ্বেগের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। যেহেতু সেখানে আমাদের বেশ বিস্তৃত জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউএনডিপি) চালু রয়েছে (যা এখন আপাতত স্থগিদ) আমি তাদের কাছ থেকে পরিস্থির বিশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্য পেয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত অন্যান্য জাতিসংঘ কর্মকর্তার কাছ থেকে আমি যে বক্তব্য পেয়েছি তাতে আমার উদ্বেগ গভীরতর হয়েছে। সেখানে সামরিক বিজয় আপাততভাবে অর্জিত হয়ে থাকতে পারে এবং এক ধরনের শান্তিও্ও হয়তো ফিরে আসবে। কিন্ত আমার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া সেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসবে। আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, সামনের কঠিন দিনগুলোতে দূর্যোগ ও ক্লেশ এড়াতে হলে সেখানকার জনগণের সাহায্যার্থে ব্যাপক আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। এ প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। এই মানবিক উদ্যোগকে মাথায় রেখেই আমি আপনাকে লিখছি এব কথা বলার জন্য যে, আপনি এ ব্যাপারে কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতে পারেন কিনা। একটি মুসলিম দেশের সাবেক সরকার প্রধান হিসেবে ও বিশেষত আপনর বর্তমান দায়িত্বভারের কারণে ভ্রাতৃসূলভ ও মুসলমানদের মধ্যে এই বেদনাদায়ক সংঘর্ষ সমাধানেও আপনার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। আমি মনে করি, আপনার ব্যক্তিগত প্রভাব ব্যবহারের মাধ্যমে অদুর ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান অর্জন সম্ভব হবে।
যথাযথ সম্মান পূর্বক
আপনার বিশ্বস্ত
উ থান্ট
(বিস্তারিত আশফাক হোসেন, পূর্বোক্ত)

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ আল মামুন উল্লেখ করেন যে- The role of the Muslim countries during the liberation war of Bangladesh and subsequent years was shaped by the previous relationship of united Pakistan with them. The state most closely related with Pakistan's ruling Government gave their full support to the ruling military junta and supplied various arms and ammunition (e.g. Iran, Saudi Arabia, Jordan, Libya etc.) But it was surprising that some of the Muslim countries, which had strained relationship with Pakistan did not support the liberation war of Bangladesh and they remained neutral (e.t. Egypt, Syria, Algeria, Iraq etc.), although some of the youth organizations of these countries supported the liberation war of Bangladesh and expressed their support through newspapers. To have a clear idea about the Muslim world's role during the liberation war and subsequent years, it is needed to go through the formative phases of Pakistan's foreign policy. [২৬]

৬.১.২. মুসলিম দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সর্ম্পক স্থাপন এবং ও আই সি'র সদস্যপদ লাভ

ওআই সি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি সংগঠন। জাতিসংঘের পর এ সংগঠনটির অবস্থান। বিভিন্ন রাষ্ট্র সদস্য পদ গ্রহণের মাধ্যমে একটি সংগঠন আন্তর্জাতিক সংগঠনের চরিত্র অর্জন করতে পারে। সে হিসাবে ওআইসি'র সনদের প্রতি অঙ্গিকার এবং এর সদস্যপদ লাভের সকল শর্ত পূরণ করার পর একটি রাষ্ট্র উক্ত সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে থাকে। এটি জাতিসংঘের দুই শ্রেণীর সদস্য পদ- মূল সদস্য (Original Member) এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র (Other Member Country) [২৭] না রেখে বরং সংস্থাটি চার্টার এ সদস্য রাষ্ট্রকে যেভাবে উল্লেখ করেছে তা হলো (ক) ৫৭ সদস্য রাষ্ট্র (57 states Member) (খ) অন্যান্য রাষ্ট্র (Others states) যারা এ Charter এর অধীনে সদস্য হবে। এছাড়া (গ) পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্র ও (ঘ) পর্যবেক্ষক সদস্য- আন্তর্জাতিক সংস্থা এই অতিরিক্ত দু'ধরনের সদস্যপদের বিধান রাখা হয়েছে। সনদের ধারা ৩ এর (১) এ বলা হয়েছে [২৮] The Organization is made up of 57 States member of the Organization of the Islamic Conference and other States which may accede to this Charter in accordance with Article 3 paragraph 2.

২৬। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫২-৩৫৩।

২৭। Abdullah al Mamun, *Bangladesh and Muslim Cuntries, A Political Study (1972-1990)*, Thesis submitted to the University of Dhaka for the Degree of Master of Philosophy in Political science, University of Dhaka, P.14

২৮। আশফাক হোসেন, পৃ.২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৩ এর (২) এ বলা হয়েছে[২৯] Any State, member of the United Nations, having Muslim majority and abiding by the Charter, which submits an application for membership may join the Organization if approved by consensus only by the Council of Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the council of Foreign Ministers.

ধারা ৪ এর (১) এ বলা হয়েছে[৩০] Decision on granting Observer status to a State, member of the United nations, will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Minister এবং ধারা ৪ এর (২) এ বলা হয়েছে[৩১] Decision on granting Observer status to an international organization will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers অন্যদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আন্তর্জাতিক শান্তিনিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়নে সর্বোপরি দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতার জন্য ধারা (২৫) এ বলা হয়েছে[৩২] জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র- (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায়-অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন। সংবিধানের ধারা (৬৩) তে বলা হয়েছে[৩৩] (১) সংসদের সম্মতি ব্যাতিত যুদ্ধ ঘোষনা করা য়াইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবেন না। (২)বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল,জল বা আকাশ পথে প্রকৃত বা আসন্ন আক্রমনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রক্ষা বা প্রতিরক্ষার জন্য তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে তৎক্ষনাৎ সংসদ আহবান করা হইবে। (৩) যুদ্ধ কিংবা আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া অভিব্যক্ত সংসদের বিধিবদ্ধ কোন আইনকে এই সংবিধানের কোন কিছুই অবৈধ করিবে না।

২৯। — Charter of the organization of the Islamic Conference, Article-3
৩০। — Charter of the organization of the Islamic Conference, Article-3
৩১। — Charter of the organization of the Islamic Conference, Article- 4
৩২। — Charter of the organization of the Islamic Conference, Article- 4
৩৩। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সংঘ প্রকাশ, চর্তুথ সংস্করন-জুন ২০১০, ঢাকা, পৃ.১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বংলাদেশের স্বধীনতা লাভের পরে 'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি বা কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেনি '[৩৪], অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রীকরণ এবং প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সাংবিধানিক নীতি হওয়ায় বাংলাদেশ একদিকে যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মতি আদায় করছে। তেমনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক[৩৫] ও আঞ্চলিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করতে সচেষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ আল মামুন উল্লেখ করেন- It could achieve recognition of 95 countries and had become a member of several international bodies including WHO, Commonwealth, World Bank, IMF, ILO, UNESCO etc. within a year of her independence (16.12.1972)[৩৬]. বস্তুত মুসলিম বিশ্বের দেশ সমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে তৎকালীন সরকার মনে করে।

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ আল মামুন উল্লেখ করেন- Past Liberation Bangladesh immediately faced nation building as well as state building task, which was a complex and multidimensional process and at the sametime, the most cherished goal of any nation state. Post-liberation Awami League Government faced many formidable problems such as the restoration of civil administration all over the country, promotion of law and order situation, rehabilitation of war victims, reconstruction of wardevastated economy, infrastructure and consolidation of national independence and securing foreign recognition, which depended mostly on socio-economic and political developments. To achieve these objectives, the Awami League government formulated policies concerning foreign relations with various countries as well as Muslim countries. The Mujib administration launched a massive diplomatic campaign to achieve these goals and early recognition by the world communities including Muslim countries for the greater interest of newly emerged Bangladesh[৩৭].

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য দেশের মত বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিনির্ধি প্রেরণ করেন এবং ঐ সকল দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানগণকে তাদের প্রতিনিধি বাংলাদেশে প্রেরণের জন্য কূটনৈতিক প্রয়াস চালানো হয়। নিম্নোক্ত সারণি-৫৯ ও ১০ এ মুজিব আমলে বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি প্রেরণের তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ-.২০০

৩৫। আব্দুল লতিফ খান, *আর্ন্তজাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সিড়ি বই বিতান, ঢাকা-২০০১, পৃ.৪০৯

৩৬। Abdullah al Mamun, P.51

৩৭। Abdullah al Mamun, P.46

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ০৯

বিভিন্ন মুসলিম দেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি প্রেরণ

ক্রমিক	তারিখ	প্রতিনিধিগণের বিবরণ	ভ্রমণকৃত দেশ	সফরের প্রকৃতি
১	জুলাই ১৯৭২	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	মালয়েশিয়া	রাষ্ট্রীয় সফর
২	জুলাই ১৯৭২	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	ইন্দোনেশিয়া	রাষ্ট্রীয় সফর
৩	আগষ্ট ১৯৭২	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	মিশর	ব্যক্তিগত সফর
৪	জুলাই ১৯৭৩	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	ইন্দোনেশিয়া	রাষ্ট্রীয় সফর
৫	জুলাই ১৯৭৩	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	আলজেরিয়া	রাষ্ট্রীয় সফর
৬	আগষ্ট ১৯৭৩	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	ইন্দোনেশিয়া	রাষ্ট্রীয় সফর
৭	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি	আলজেরিয়া (৪র্থ ন্যাম সম্মেলন)	রাষ্ট্রীয় সফর
৮	সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি	বাহরাইন	রাষ্ট্রীয় সফর
৯	জানুয়ারী ১৯৭৪	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেস দূত	মিশর, সৌদী আরব	রাষ্ট্রীয় সফর
১০	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	আলজেরিয়া,ইরাক,লিবিয়া, লেবানন,জর্ডান	রাষ্ট্রীয় সফর
১১	মার্চ ১৯৭৪	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	কুয়েত,আবুধাবী,বাহরাইন	রাষ্ট্রীয় সফর
১২	জুন ১৯৭৪	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	মালয়েশিয়া (৫ম ওআইসি পররাস্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন)	রাষ্ট্রীয় সফর
১৩	জুন ১৯৭৪	বাংলাদেশের পররাস্ট্রমন্ত্রী	ইরান,কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত,বাহরাইন	রাষ্ট্রীয় সফর
৪	জুলাই ১৯৭৪	বাংলাদেশের বানিজ্যমন্ত্রী	মিশর, ইরাক,স্কৌদী আরব	রাষ্ট্রীয় সফর
১৫	আগষ্ট ১৯৭৪	বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী	ইরাক	রাষ্ট্রীয় সফর
১৬	সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	বাংলাদেশের বানিজ্যমন্ত্রী ও পররাষ্টমন্ত্রী	আফগানিস্তানের ,ইরান	রাষ্ট্রীয় সফর
১৭	অক্টোবর ১৯৭৪	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী	ইরাক	রাষ্ট্রীয় সফর
১৮	অক্টোবর ১৯৭৪	বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী	সৌদী আরব	রাষ্ট্রীয় সফর
১৯	নভেম্বর ১৯৭৪	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী	মিশর,কুয়েত	রাষ্ট্রীয় সফর
২০	ডিসেম্বর ১৯৭৪	বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী	সংযুক্ত আরব আমিরাত	রাষ্ট্রীয় সফর
২১	মে ১৯৭৫	বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী	স্কৌদী আরব	রাষ্ট্রীয় সফর
২২	জুলাই ১৯৭৫	বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী	সৌদী আরব (৬ষ্ট ওআইসি পররাষ্টমন্ত্রী সম্মেলন)	রাষ্ট্রীয় সফর
২৩	জুলাই ১৯৭৫	বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী	সৌদী আরব(অইডিবি সম্মেলন)	রাষ্ট্রীয় সফর
২৪	জুলাই ১৯৭৫	বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী	তুর্কী	রাষ্ট্রীয় সফর
২৫	অক্টোবর ১৯৭৫	বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী	সৌদী আরব(ইসলামিক সম্মেলন)	রাষ্ট্রীয় সফর

তথ্যসূত্র ঃ গবেষক কতৃক বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত।

বাংলাদেশের এ উদ্দেগে সারা দিয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশ বাংলাদেশে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে শুরু করে, ফলে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সর্ম্পক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সারণি ১০- এ বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধি প্রেরণর একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১০

বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ

ক্রমিক	তারিখ	প্রতিনিধিগণের বিবরণ	সফরের প্রকৃতি
১	সেপ্টেম্বর ১৯৭২	ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্টমন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
২	জুলাই ১৯৭৩	মিশরের পররাষ্টমন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
৩	আগস্ট ১৯৭৩	তুর্কীর পররাষ্টমন্ত্রী	যাত্রাবিরতি
৪	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪	মিশরের প্রেসিডেন্ট	রাষ্ট্রীয় সফর
৫	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪	কুয়েতের পররাষ্টমন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
৬	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪	ও আই সি'র সেক্রেটারী জেনারেল	রাষ্ট্রীয় সফর
৭	মার্চ ১৯৭৪	দক্ষিণ ইয়ামেনের পররাষ্টমন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
৮	মার্চ ১৯৭৪	আলজেরিয়ার পররাষ্টমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট	যাত্রাবিরতি
৯	এপ্রিল ১৯৭৪	সেনেগালের শিল্প উন্নয়নমন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
১০	মে ১৯৭৪	সেনেগালের প্রেসিডেন্ট	যাত্রাবিরতি
১১	জুন১৯৭৪	পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
১২	জুন১৯৭৪	আফগানিস্তানের উপ - পররাস্ট্রমন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
১৩	ডিসেম্বর ১৯৭৪	মালয়েশিয়ার রাজা	রাষ্ট্রীয় সফর
১৪	মার্চ ১৯৭৫	আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট	রাষ্ট্রীয় সফর
১৫	জুন ১৯৭৫	সংযুক্ত আরব আমিরাতের তৈল ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী	রাষ্ট্রীয় সফর
১৬	সেপ্টেম্বর ১৯৭৫	সেনেগালের প্রেসিডেন্ট	রাষ্ট্রীয় সফর

তথ্যসূত্র ঃ গবেষক কতৃক বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত।

কিন্তু এ উদ্দ্যোগটি যেন বাস্তবে আলোর মুখ না দেখে এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের আহবানে সারা দিয়ে বিভিন্ন দেশ যেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান না করে সে জন্য ভুট্রো কূট- কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের ভাষায় -

মুজিবের পাকিস্তানে অবস্থানকালেই ১ জানুয়ারি ভয়েজ অব আমেরিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্রো দুই অংশের ঐক্য এবং একটি রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরের দিনই করাচিতে ভুট্রোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দেশটির নীতি নির্ধারকদের এক বৈঠকে মুজিবকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্তনেয়া হয়। ঐদিনই মার্কিন সাময়িকী 'টাইমস' ভুট্রোর বক্তব্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে পাকিস্তানের উভয় অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমঝোতা কাজ করেছে বলে মন্তড়ব্য করে। যদিও রবার্ট পেইন মনে করেন যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে কোনো চুক্তি বা ঐ জাতীয় কোনো সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভুট্টো মুজিবকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্তনেন। মুজিবের মুক্তির পিছনে অভ্যন্তড়ীণ ও বহির্দেশীয় কারণ ছিল সক্রিয়। মুজিবকে মুক্তি না দিলে যুদ্ধবন্দিদের যে ফিরিয়ে আনা যাবে না ভুট্টো সেটা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে নয়মাস পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবকে বন্দি ও তাঁর প্রহসনমূলক বিচারের উদ্যোগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইয়াহিয়া বহির্বিশ্বে নিন্দিত হয়েছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে ভুট্টো মুজিবকে মুক্তি দিয়ে নিজেকে একজন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালান। তবে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ভুট্টো এই স্পর্শকাতর সিদ্ধান্তেড়র ক্ষেত্রে একক দায় না নিয়ে ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি করাচিতে প্রায় এক লাখ লোকের এক সমাবেশে মুজিবের মুক্তির জন্য জনতার রায় চান। উপস্থিত জনতা ইতিবাচক মত দিলে ভুট্টো মুজিবের মুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ঐদিনই রেডিও পাকিস্তান এই মুক্তির কথা ঘোষণা করে। সরকারি দল পিপিপি ছাড়াও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং ন্যাপ একে স্বাগত জানায় কারণ, তাদের বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তছিল পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ সহায়ক। ভুট্টো নিজেও বিভিন্ন বক্তৃতায় অনুরূপ মত দেন। মুজিবের মুক্তির পিছনে ভুট্টোর আরো যে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য কাজ করে, তা হলো- প্রথমত, ভুট্টো এর মাধ্যমে এটাই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যে, নয়মাসের যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল সামরিক শাসকদের মতের বিরুদ্ধে। বন্দিদশা থেকে মুজিবকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে তিনি নিজেকে একজন মার্জিত, মধ্যপন্থী মধ্যস্থতাকারী ও গ্রহণযোগ্য পাকিস্তানি নেতা হিসেবে উপস্থাপিত করার এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং বহির্বিশ্বে একান্তরে পালিত নিজের ভূমিকা আড়াল করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং এব্যাপারে বাংলাদেশের সহানুভূতিও কামনা করেন। তৃতীয়ত, মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানের দখল হয়ে যাওয়া ভূখন্ড উদ্ধার করাসহ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম করা। সবশেষে বলা যায়, ৩ জানুয়ারির জনসভাতেই ভুট্টোটা বিভিন্নদেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে তাঁর ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা উল্লেখ করেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চাপও অব্যাহত ছিল। তবে ভুট্টো মুজিবের মুক্তির ঘোষণা দিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেননি। এর মাধ্যমে ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে সমঝোতার সর্বশেষ চেষ্টা চালান। এসময় মুজিবকে প্রথমে তুরস্ক বা ইরানে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাই ৮ ফেব্রুয়ারি আকস্মিকভাবে মুজিবকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্তনেয়া হয়। ভুট্টো মুজিবকে সরাসরি কয়েকটি কারণে ঢাকা পাঠাতে চাননি। প্রথমত, এর ফলে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হতো। এছাড়া একটি স্বাধীন দেশে পাকিস্তানের মতো শত্রপক্ষোর বিমান অবতরণের জঠিলতাও ছিল। মুজিব নিজেই পরে স্বীকার করেন পাকিস্তান সরকার তাঁকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্তনেয় এবং একজন বন্দী হিসেবে এ ব্যাপারে তাঁর করার কিছুই ছিল না। মুজিব তাঁর সাংবিধানিক উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেনসহ ঐ দিন লন্ডন এবং ১০ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতির পর ঢাকায় পৌঁছেন। ঢাকা ফিরে ঐ দিনই সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে এক বিশাল সমাবেশে মুজিব ভুট্টোর প্রস্তাবিত বিশেষ সম্পর্কের

Dhaka University Institutional Repository

বিপক্ষে মত দিয়ে বলেন, পাকিস্তানি ভাইয়েরা আপনাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নাই। আমি চাই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনের মর্যাদাহানি করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের সাথে আমাদের যে ধরণের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধু সেই ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে।

শেখ মুজিবের এই ভাষণে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, কনফেডারেশন ও শিথিল সম্পর্ক সংক্রান্ত ভুট্টোর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল তাঁর এই ভাষণের উল্লিখিত অংশটুকু। অন্যদিকে সদ্য স্বাধীন দেশে প্রদত্ত তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রথম ভাষণে পাকিস্তান ও পাকিস্তানি বাহিনী সম্পর্কে কঠোর বক্তব্য না দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সমতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব স্থাপনের আহবান জানান। মুজিবের এই বক্তৃতা বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচার পেলেও ১৩ জানুয়ারি লাহোরে ভুট্টো সাংবাদিকদের 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের' মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি বিশ্বের বিভিন্নদেশের কাছে আবেদনও রাখেন তারা যেনো 'তথাকথিত বাংলাদেশকে' স্বীকৃতি না দেন। কারণ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে তার কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। বাংলাদেশকে কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি তাঁর সমঝোতার পথে বাধার সৃষ্টি করছে বলেও তিনি মন্তড়ব্য করেন। তিনি মুজিবের ১০ জানুয়ারির ভাষণকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করার অনুরোধ জানান, কারণ তাঁর ভাষায় মুজিবের এটাই শেষ কথা নয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বাংলাদেশকে চালসহ অন্যান্য পণ্য সহায্য, দুটি দেশের মধ্যে বিমান সার্ভিস চালু এবং ২৮,০০০ বাঙ্গালি সৈন্যকে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাবও দেন। ভুট্টোর ঐদিনের ভাষণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পরের দিনই মুজিব সাংবাদিকদের বলেন, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সব দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং টিকে থাকার জন্যই এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পরের দিন মুজিব আরো বলেন, ভুট্টো যদি মনে করেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র, তবে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আমি পাকিস্তানেরও প্রেসিডেন্ট, পশ্চিম পাকিস্তানে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগেরও ক্ষমতা রাখি। ভুট্টো মুজিবের এই উক্তিকে কূটনৈতিকভাবে ব্যবহার করন এবং পাকিস্তানের ঐক্যের স্বার্থে মুজিবের হাতে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ক্ষমতা অর্পণ করে রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। তিনি মুজিবকে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী যেকোনো একটি পদ গ্রহণের পুরনো প্রস্তাবও নতুন করে দেন। অবশ্য মুজিব ভুট্টোর কূটনৈতিক চাল বুঝতে পেরে ১৮ জানুয়ারি বলেন, আমি পাকিস্তান চাই না, বাংলাদেশ হচ্ছে এখন বাস্তব সত্য।' বাংলাদেশের একজন সরকারি মুখপাত্র এক বিবৃতি মারফত ঐ দিনই বলেন, অথচ এই ভুট্টোই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণে বাধা দানকারীদের অন্যতম ছিলেন। ১০ মাস পর তাঁর এই প্রস্তাব সত্যিই বিলম্বিত সিদ্ধান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মুজিবের পরিষ্কার বক্তব্য সত্ত্বেও ভুট্টো স্বীকৃতির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রচারণা এবং তাঁর জানুয়ারি মাসের শেষেরদিকে ৮টি মুসলিম দেশ সফরের আগেভাগে স্বীকৃতির প্রশ্নে বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করতে অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা অব্যাহত রাখেন। ভুট্টো তাঁর সফরের প্রাক্কালে অর্থাৎ, ১৯ জানুয়ারি বলেন, অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোতেই পাক ভারত উপমহাদেশের সমস্যার সমাধান করতে হবে। পাকিস্তানের এখন প্রথম কাজ হচ্ছে টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে একটি নতুন দেশ গড়ে তোলা। কিন্তু বাংলাদেশের ঐক্যের বিপক্ষে বক্তব্য, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতে স্থানান্তর, ২৪ জানুয়ারি দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, বাংলাদেশ সরকারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত ও আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টায় ভারতে আটক পাকিস্তানি বন্দিদের ব্যাপারে পাকিস্তান চিন্তিড়ত হয়ে পড়ে। ভুট্টো জানুয়ারি মাসে একদিকে যেমন ব্যাপক কূটনৈতিক উদ্যোগ চালান এবং মুসলিম দেশ সফরে মাধ্যমে ভারতের দখল করে নেয়া পাকিস্তানি ভূখন্ড প্রত্যর্পন এবং পাক যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির জন্য ভারত ও বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পান তেমনি তিনি সফরকারী ৮টি দেশের (ইরান, তুরস্ক, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, সিরিয়া, লিবিয়া ও মিশর) রাষ্ট্র প্রধানদের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্যের সর্বশেষ সুযোগ দেয়ার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি জানুয়ারি মাস পর্যন্তবাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী ২১টি দেশের মধ্যে ১০টি দেশের সঙ্গে পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ৩১ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং বৃটেনের আশু স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণায় পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্তনেয়। জানুয়ারি মাসে এসব উদ্যোগের পাশাপাশি পাকিস্তান সরকারি পর্যায়ে ঈদের উৎসব পালন না করার সিদ্ধান্তনেয়। কারণ, ভুট্টোর ভাষায়, দেশের জনসংখ্যার বড় অংশ পূর্বাঞ্চলের জনগণকে বিদেশী আগ্রাসনের আওতায় রেখে পশ্চিম পাকিস্তান ঈদ উৎসব পালন করতে পারে না। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য ছিল রীতিমতো হাস্যকর, কেননা ২১টি দেশ বাংলাদেশকে যেখানে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে এবং তার স্বাধীনতা লাভের পর দেড়মাস অতিবাহিত হয়েছে, তখনও এ ধরণের সিদ্ধান্তরীতিমত কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূতও ছিল। যদিও তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সেটা ছিল অত্যন্তপ্রয়োজনীয়। তবে ভুট্টোর অপপ্রচার ও হুমকি সত্ত্বেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি থেমে থাকেনি।[৩৮] দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ তারিখে পাকিস্তান বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। একই তারিখে তুরস্ক ও ইরানের সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সংবাদে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বস্তি ও সন্তোষ প্রকাশ করে। ঐ দিন বাংলাদেশ বেতারের দুপুর ১টায় সংবাদ বুলেটিনে বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু লাহোরে ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করার সিদ্ধান্তঘোষণা করেছেন।[৩৯] এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ ভারত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- এ

৩৮। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পৃঃ-৩৫২-৩৫৩

৩৯। এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা- ১৯৯৩, পৃ- ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন-

On 19 March (1972) Bangladesh signed a treaty of peace and friendship with India based on the model of the Indo-brief treaty of 197. [৪০]

উক্ত চুক্তির ফলে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ বিষয়ে যে একটি মিশ্র ধারণা সৃষ্টি হয় ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ ও মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক সম্পর্ক আরো উত্তর উত্তর উন্নতির ফলে তার অনেকটা অপনোদন হয়।[৪১] অনেক মুসলিম দেশ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে স্বীকৃতি প্রদান না করলেও পরবর্তীতে স্বীকৃতি প্রদান করে। নিম্নে সারণিতে তারিখওয়ারী দেশের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

সারণি ঃ ১১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী মুসলিমদেশ ১৯৭১ -১৯৭৫

ক্রমিক	দেশের নাম	তারিখ
১	টোংগো	২৪ জানুয়ারী ১৯৭২
২	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
৩	মালয়েশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
৪	ইন্দোনেশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
৫	গাম্বিয়া	২মার্চ ১৯৭২
৬	গ্যাবন	৬ এপ্রিল ১৯৭২
৭	মালদ্বীপ	১২ এপ্রিল ১৯৭২
৮	সিয়েরালিওন	২২ এপ্রিল ১৯৭২
৯	ইরাক	৮ জুলাই ১৯৭২
১০	ইয়েমেন গনপ্রজাতন্ত্র	৩১ জুলাই ১৯৭২
১১	উগান্ডা	১৬ আগস্ট ১৯৭২
১২	ঘায়ানা	৮ ডিসেম্বর ১৯৭২
১৩	আফগানিস্তান	১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩
১৪	লেবানন	২৮ মার্চ ১৯৭৩
১৫	মরোক্ক	১৩ জুলাই ১৯৭৩
১৬	আলজেরিয়া	১৬ জুলাই ১৯৭৩
১৭	তিউনেশিয়া	১৬ জুলাই ১৯৭৩
১৮	মৌরিতানিয়া	১৬ জুলাই ১৯৭৩
১৯	আইভরিকোস্ট	২৩ আগস্ট ১৯৭৩
২০	মিশর	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
২১	সিরিয়া	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

৪০। Abdullah al Mamun, পৃ.৫২

৪১। এম এ ওয়াজেদ মিয়া, পৃ.১৭২

Dhaka University Institutional Repository

২২	নাইজার	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
২৩	গিনিবিসাউ	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
২৪	ক্যামেরুন	৬ অক্টোবর ১৯৭৩
২৫	গিনি	১০ অক্টোবর ১৯৭৩
২৬	জর্ডান	১৬ অক্টোবর ১৯৭৩
২৭	বেনিন	২২ অক্টোবর ১৯৭৩
২৮	কুয়েত	৪ নভেম্বর ১৯৭৩
২৯	আরব রিপাবলিক অব ইয়েমেন	৫ নভেম্বর ১৯৭৩
৩০	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪
৩১	ইরান	২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪
৩২	তুরস্ক	২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪
৩৩	নাইজেরিয়া	২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪
৩৪	কাতার	৪ মার্চ ১৯৭৪
৩৫	আরব আমিরাত	১০ মার্চ ১৯৭৪
৩৬	কঙ্গো	২১ মার্চ ১৯৭৪
৩৭	বাহরাইন	৯ এপ্রিল ১৯৭৪
৩৮	ওমান	১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪
৩৯	সোমালিয়া	২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪
৪০	সৌদি আরব	১৬ আগস্ট ১৯৭৫
৪১	সুদান	১৬ আগস্ট ১৯৭৫

তথ্যসূত্র ঃ আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন; বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১ -১৯৮১ পৃ -২০০-২০৫ থেকে সংগৃহীত ।

৬.১.৩. ওআইসির শিক্ষা কার্যক্রম

ওআইসি আন্তর্জাতিক শান্তি, সৌহার্দ্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য কাজ করার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংস্থাটির charter এ বলা হয়েছে-

- To preserve and promote the lofty Islamic values of Peace, Compassion, tolerance, equity, justice and human dignity, to contribute to international peace and security.

- To create conducive conditions for sound up-bringing of Muslim children and youth and to inculcate in them Islamic Values through education for strengthening their cultural, social, moral and ethical ideas. [৪২]

সংস্থাটির Charter এর উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে Islamic University of Technology (IUT) আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে এ কথাটিকে আরো ত্বরান্বিত, দৃঢ় ও বেগবান করেছে।

৪২। — Charter of the organization of the Islamic Conference, P- 1-2

Dhaka University Institutional Repository

Islamic University of Technology (IUT)

Islamic University of Technology (IUT) & subsidiary organ of the Islamic conference (OIC) located at Board Bazar, Gazipur is the First International University in Bangladesh, from 1978 to 1994 A known as Islamic center for technical and vocational training and Research (ICTVTR), then in 1994 was named as Islamic Institute of Technology (IIT) and Finally in the year 2000 it flourished as IUT. [৪৩]

The organization of the Islamic Conference (OIC) সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ১৯৭৭ সালে ত্রিপোলীয়, লিবিয়ায় অনুষ্ঠিত ৮ম সেশনে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ে মানব সম্পদ গড়ে তুলার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। The Islamic Conference of Foreign Ministers (ICFM) এর উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশে একটি Technical center প্রতিষ্ঠার বিষয়েও আলোচনা হয়। পরবর্তীতে ৯ম পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশে Islamic center for Technical and Research (ICTVTR) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

It was initially established as the Islamic center of Technical and Vocational Training and Research, ICTVTR in pursuance of the Resolution No- 5/9-E of the Ninth Islamic Conference of Foreign Minister (ICFM) held in Dakar, Senegal in 1978. The foundation stone of ICTVTR as laid on 27 March, 1981 by has excellency late Ziaur Rahman, The President of Bangladesh is the presence of his excellency late Yasir Arafat, President of Palestine and late Dr. Habib Chatty, the than Secretary General of the OIC on the 30 acre land donated by the Government of the People's Republic of Bangladesh to the OIC. [88]

১৯৮৭৮ সালে ICTVTR এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও পুরোপুরি ভাবে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৮৬ সালে। এ প্রসঙ্গে IUT এর বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলন ড. ফজলে ইলাহী উল্লেখ করেন যে, The Long regular classes started in December 1986 with 66 student from Bangladesh, Jordan, Yemen, Pakistan, Tunisia and since then the academic programmes are being held as per schedule[৪৫].

৪৩। The Guardian, 2009, P-58
88। IUT Calendar, 2004/2005, Dhaka, P-13
৪৫। The Guardian, April 2007, Dhaka, P-13

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরিভাবে কার্যক্রম শুরু করার পর এর সুনাম OIC সদস্যদেশসমূহ ছাড়াও বিশ্বের অপরাপর দেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন এর কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নামকরণের পরিবর্তনে জন্য তাগিদ অনুভূত হয়। এক পর্যায়ে ক্লাসাবাংকা, মরক্কোতে অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ সালের ২২তম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের সিদ্ধান্তক্রমে ICTVTR এর নাম পরিবর্তন করে Islamic Institute of technology (IIT) নামকরণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আরো যুগোপোযোগী করে ২০০০ সালে এর নামকরণ করা হয় Islamic University of Technology (IUT) নামকরণ করা হয়। OIC এর ব্যাপারে সেক্রেটারী জেনারেলের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, The Islamic Institute of Technology (IIT) Dhaka Bangladesh was established by Resolution No- 5/9-E of the 9th ICFM with the name of "Islamic Center for Technical and Vocational Training and Research (ICTVTR)", The Institute was resumed by Resolution No 27/22-E of the 22nd ICFM as Islamic Institute of Technology (IIT). The institute provides a professional training leading to professional training leading to engineering degrees in various technical sections. Name of the institute is proposed to be changed into Islamic University of Technology (IUT). [৪৬]

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে শুরু হওয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে অদ্যাবধি পরিচালিত হয়ে আসছে। "বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০টি দেশের ৭৭০ জন ছাত্র অধ্যয়নরত আছেন এবং প্রায় ১৪০ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা রয়েছেন, ৫০ জন অত্যন্তঅভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক রয়েছেন।" [৪৭]

Islamic Development Bank Bangladesh Islamic Solidarity Educational Wakff IDB-BISEW.

IDB প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তারে কাজ করছে। এধরনের একটি কার্যক্রম Islamic Development Bank- Bangladesh Islamic Solidarity Education Wakf (IDB-BISEW) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এক চুক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশ সরকার রোকেয়া স্মরণী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় ২ একর জমি প্রদান করলে IDB এক কোটি বত্রিশ লাখ (তৎকালীন) টাকা ব্যায়ে ২১ তলা বিশিষ্ট একটি বহুতল ভবন তৈরী করে। [৪৮]

৪৬। IUT calendar, 2004/2005, P.8

৪৭। এম পাটোয়ারী, সাক্ষাৎকার - সৈয়দ শাহ এমরান

৪৮। Annual Report, IDB-BISEW, 2003

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন কোর্সে ৫৪০১ জনকে স্কলারশীপ প্রদান করে। তন্মধ্যে ৩৯৩৫ জনকে Computer Fundamental Course এবং ২১৭০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে Professional Course Graduate তৈরীর[৪৯] মাধ্যমে ৯৭৭ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রদান করে দেশে বেকারত্ব নিরসন এবং তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ নির্মাণে কাজ করছে।[৫০] উল্লেখ্য যে, ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের একটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে।

৫.৪.ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এর কার্যক্রম

The Islamic Development Bank (IDB) ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত The Conference of Finance Ministers of Muslim Countries এর সিদ্ধান্তড়ক্রমে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০ অক্টোবর ১৯৭৫ খ্রিঃ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু করে।[৫১] ওআইসি'র আর্থিক কার্যক্রম মূলত IDB এর মাধ্যমে করে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, IDB প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এখানে ১ জানুয়ারী ১৯৭৬ থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্তসময়ের কার্যক্রমের একটি তথ্য উপস্থাপন করা হলো। 'মোট ৬৫টি প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা করে ৫৭০ মিলিয়ন ডলার, ৮টি প্রকল্পে কারিগরি সহযোগিতা করে এতে খরচ হয় ৪২ মিলিয়ন ডলার, ২০২টি বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ৬৯৫৩.৭ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহযোগিতা করে, ১২টি প্রকল্পে বিশেষ সহযোগিতা করে ৩৫.৭ মিলিয়ন ডলারের।'[৫২] সারনি ১৩ তে উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি ধারায় পাওয়া যাবে।

সারণি ঃ ১২

২০১০ সালে IDB অনুমোদিত বাংলাদেশে প্রকল্প ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তার তালিকা-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের/কারিগরি সহয়তার প্রকল্পের নাম	অর্থ প্রদানের ধরণ	মোট অর্থ	IDB প্রদত্ত অর্থ	মন্তব্য
১.	গুণগতমান সম্পন্ন শস্য বীজ সরবরাহ বর্ধিতকরণ প্রকল্প	ঋণ ও ইসতেসনা	৪৩-৬৮ মিলিয়ন ডলার	১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ, ২৫ মিলিয়ন ডলার	-
২.	গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা দান প্রকল্প	কারিগরি সহায়তা	০.৩৬ মিলিয়ন	০.৩০ মিলিয়ন ডলার	

সূত্র ঃ ২০১০ সালের IDB রিপোর্ট পর্যলোচনা পূর্বক তৈরী।

৪৯। Report, IDB-BISEW, 2008
৫০। দূররে মাখদূম, সাক্ষাৎকার - সৈয়দ শাহ এমরান
৫১।— Charter of The Islamic Development Bank (IDB)
৫২। IDB Annual Report, 2009

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, গুণগত মান সম্পন্ন শস্য বীজ সরবরাহ বর্ধিতকরণ প্রকল্পটি জেদ্দা ঘোষণার[৫৩] আওতায় খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো- বাংলাদেশের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি- এগুলো হলো বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন কর্পোরেশন। গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যেক্তাদের সহায়তা দান প্রকল্প কারিগরি সহায়তার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সমষ্টিগত অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র, মাঝারী উদ্যোক্তাদের ৬টি জেলায় কার্যক্রম উন্নয়ন ও স্থায়ীকরণে সহায়তা প্রদান। এছাড়াও IDB বিভিন্ন সময় বিশ্ব বা মানবতার জন্য সাহায্যে প্রদান করে থাকে। 'বাংলাদেশে নভেম্বর ২০০৭ সালে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রলয়ংকরী 'সিডর' যে আঘাত হেনেছিল তখন বিভিন্ন প্রকল্পে ১৩০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্যে প্রদান করে। উক্ত সাহায্যের ৮৫% বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন- ৭০০ স্কুল/শেল্টার সেন্টার তৈরীতে ব্যয় হয়। বাকী ১৫% জরুরী ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়'।[৫৪] IDB প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে ওআইসির জোরালো ও আরো অধিকতর কার্যক্রম সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যেক্তা ও কারিগরি সহয়তা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

৫.৫. ওআইসির অন্যান্য সংগঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা

বাংলাদেশ ও অন্যান্য ওআইসি'র অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনেও কাজ করে থাকে।[৫৫] তন্মোধ্য গুরুত্বপূর্ণ হলো-

১। আল কুদস কমিটি, যার নেতৃত্ব ছিলেন মরক্কোর বাদশা হাসান।

২। ইরান-ইরাক যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারী নয় সদস্য বিশিষ্ট ওআইসি শান্তিকমিটি।

৩। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি। যার নেতৃত্ব ছিলেন সেনেগালের প্রেসিডেন্ট।

৪। মরক্কোর বাদশাহের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট স্থায়ী কমিটি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন

ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে প্রতি বছর যে কোন দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন হয়ে থাকে। প্রয়োজনে বিশেষ সম্মেলন[৫৬] হতে পারে। ১৯৮৩ সালের ৬-১০ ডিসেম্বর ঢাকায় ওআইসি এর চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৫৩। IDB এর ৩৩তম বার্ষিক সভা ২০০৮ সালের জুন মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয়। IDB এর বোর্ড অব গভর্ণর্স উক্ত সভার মাধ্যমে জেদ্দা ঘোষণা (Jeddah Declaration) প্রদান করেন। এতে সদস্য দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক খাদ্য মন্দার সময় যেন খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় সে জন্য ৫ বছরে সদস্য দেশগুলোকে ১.৫০ বিলিয়ন ডলারের একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।

৫৪। IDB Annual Report, 2009

৫৫। আব্দুল লতিফ খান, পৃ.১০৭

৫৬। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের চারটি বিশেষ বৈঠক বসেছিল। প্রথম বৈঠক ঃ ২৭-২৮ জানুয়ারী, ১৯৮০, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। দ্বিতীয় বৈঠক ঃ ১১-১২ জুলাই, ১৯৮০, আম্মান, জর্দান। তৃতীয় বৈঠক ঃ ১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ফেজ, তুরস্ক । চতুর্থ বৈঠক ঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

Dhaka University Institutional Repository

এতে উপস্থিতি হয় ৩৬ টি দেশের প্রতিনিধি। পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেয়- সাইপ্রাস, 'মরো লিবারেশন ফ্রন্ট, নাইজেরিয়া, রাবেতা আল-আলম-ই ইসলামী, জমিয়াতে দাওয়া, মু'তামার ই আলম-ই ইসলামী অব পাকিস্তান, আরব লীগ, অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি এবং জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতিনিধি।[৫৭]

সিদ্ধান্তঃ "আরব ভূমি থেকে ইসরাইলকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য করার জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহবানসহ আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। বেনিনকে ইসলামী সংস্থার পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করা হয়। [এর আগে বেনিনের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ছিল]। ঢাকার কারিগরি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের জন্য পঞ্চাশ লাখ ডলারের বাজেট অনুমোদন করা হয়। সাহেল সমস্যার উপর প্রস্তাব গৃহীত এবং সেসব দেশের সাহায্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রশাসক ও অর্থবিষয়ক এবং সংস্কৃতি ও ইসলাম বিষয়ক কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালতের সংবিধান পরিক্ষা করে দেখা হয় । ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।"[৫৮]

ঢাকা ঘোষণাকে ইসলামে মানবাধিকার সংক্রান্তঘোষণা বলে অভিহিত করা হয়। ঘোষনার শুরু তে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম আল হামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রসুলিল্লাহ'– উল্লেখ করা হয়। অত:পর মহান আল্লাহ তা'লার এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাদের আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে। এটি মূলত ইসলামের একটি নিয়ম– যা সকল মুসলমানের জন্য পালনীয় বিষয়। একই সাথে এ ঘোষণায় আল্লাহর একত্ববাদের এবং তার সার্বভৌমত্বের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যাক্ত করা হয়। এসাথে ইসলামী শরীয়তের বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় এর ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

ইসলামী উম্মাহর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করে, যাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠা উম্মাহ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যা মানবতাকে দিয়েছে ইহকালীন উন্নতি ও পরকালীন মুক্ত বিধানকারী এক বিশ্বজনীন ও সুষম সভ্যতা, যেখানে আছে ঈমানের সংগে জ্ঞানের সংযোগ, বিভিন্ন সংঘাতমুখর মতবাদ ও আদর্শের কারণে বিভ্রান্তমানবতাকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে এই উম্মাহর মাধ্যমে আকাঙ্খাগুলোকে পূরণ করা, জড়বাদী সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী সকল সমস্যার সমাধান করা, শোষণ ও অত্যাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য মানবাধিকারকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানব জাতির প্রচেষ্টার প্রতি অবদান রাখা এবং ইসলামী শরীয়ত অনুসারে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে তার স্বাধীনতা ও অধিকারকে নিশ্চিত করা।

৫৭। আব্দুল লতিফ খান, পৃ.২০৫

৫৮। সাজ্জাদ হোসাইন খান, ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, তেইশবর্ষ ঃ চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৪, পৃ.৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিশ্বাস করে যে, ইসলাম মুতাবিক মৌলিক অধিকারসমূহ ও স্বাধীনতা ইসলামী আকীদায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কারো সেগুলোকে লোপ করার অধিকার নেই, তা সে সম্পূর্ণ বা আংশিক যেভাবেই হোক, অথবা সেগুলোকে লংঘন বা প্রত্যাখ্যান করার, যেহেতু সেসব হচ্ছে তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের অবশ্য পালনীয় পবিত্র নির্দেশ, যেসব তাঁর সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে প্রেরিত এবং ওহীতে সম্পূর্ণ। কাজেই এসব নির্দেশের পালন হচ্ছে ইবাদত। আর এসবের অবজ্ঞা ও লংঘণ হচ্ছে পাপ। এজন্যে প্রত্যেকেই এবং উম্মাহ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে, এর জন্যে দায়ী।

এবং বিশ্বাস করে যে, সব মানুষই একই পরিবারভূক্ত যার সদস্যরা আল্লাহর অধীনে আদম (আঃ) এর বংশধর হিসেবে ঐক্যবদ্ধ। জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, নারী-পুরুষ, রাজ-নৈতিক মতবাদ, সামাজিক মর্যাদা অথবা অন্য বিষয়াদি নির্বিশেষে সকল মানুষ মর্যাদা, মৌল কর্তব্য ও দায়িত্বের দিক থেকে সমান। এবং সকল মানুষই হচ্ছে আল্লাহর বান্দা। তারাই হচ্ছে তাঁর প্রিয়তম যারা তাঁর বান্দাদের সেবা করে এবং শুধুমাত্র কর্তব্যবোধের ভিত্তি ছাড়া কারোই কারো ওপর প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব নেই। এই নীতিমালা এখন থেকে ইসলামে মানবাধিকার সংক্রান্তঢাকা ঘোষণা হিসেবে অভিহিত হবে।[৫৯]

উপরোক্ত ঘোষনার[৬০] মাধ্যমে ইসলামের শ্বাশ্বত রূপ ফুটে ওঠেছে। ইসলাম কেবল একটি অনুষ্ঠান স্বর্বস্ব ধর্ম নয় বরং এটি একটি জীবন বিধান, ঘোষনাপত্রে তার সরূপ পরিস্ফূঠিত হয়েছে। ইসলামে মানব কল্যান এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য তাগিদ রয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নায় এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে– "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন মাত্র নারী ও পুরুষথেকে সৃস্টি করেছি,এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো"। [৬১] অপর এক আয়াতে রয়েছে- "হে রাসূল আপনাকে তো সমগ্র মানব কূলের জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।" [৬২] অন্য এক আয়াতে রয়েছে- "অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে,যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায় "।[৬৩] এক হাদিছ বর্ণিত হয়েছে " হযরত জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লা (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না।"[৬৪]

৫৯। সাজ্জাদ হোসাইন খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫০
৬০। বিস্তারিত দেখুন, ঢাকা ঘোষণা
৬১। আলকুরআন ; সূরা আল – হুজরাত আয়াত ১৩
৬২। আলকুরআন ; সূরা সাবা আয়াত ২৮
৬৩। আলকুরআন ; সূরা আশ্ –শূরা আয়াত ৪২
৬৪। শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতিব, *মেশকাতুল মাসাবিহ*, কিতাবুল আদাব, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মানব কল্যান, মানবাধিকার এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির কথাই বলা হয়েছে। এ ধরনের অনেক আয়াত ও হাদিছ রয়েছে যা থেকে মানবাধিকার সংরক্ষনের বিষয়ে মুসলিম জাতি সর্তক এবং এ বিষয়কে কার্যকর করতে সচেস্ট হতে পারে।

ওআইসি একটি আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক সংস্থা। এর মূল লক্ষ্য হলো 'মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা মোকাবেলা করাসহ মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুমূক্ত ও নিরাপদ করা এবং মুসলিমভ্রাতৃত্বকে জোরদার করা'। তবে এ কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করা অতি কঠিন একটি বিষয়। কারণ মুসলমানরা আজ চর্তুদিক থেকে শত্রু বেষ্ঠিত। অন্যদিকে নিজেরাও কৌশলী নয় বরং কার্যকরী অংশই ভোগবাদে বিশ্বাস। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ১৯৭১ সালে স্বধীনতা অর্জন করলেও বাস্তবে আজও নব্য সাম্রাজ্যবাদের তাবামূক্ত নয় দেশটি। এ বহুবিদ বিবেচনায় বাংলাদেশে ওআইসি'র কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত সর্তকমূলক অবস্থান থেকে গৃহীত হয়, এবং তা- ই সমিচীন। ওআইসি বিশ্বব্যাপী তার লক্ষ্য অর্জনে এবং উদ্দেশ্য সাধনে যে সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে , তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমই হচ্ছে শান্তি অর্জন সর্ম্পকিত। তবে কার্যক্রম মূল্যায়নে সফলতা বা ব্যথতা থাকতে পারে এবং এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর মূল্যায়ন অনুরূপ বা সমপর্যায়ভূক্ত ।

৬.২.ফিলিস্তান

৬.২.১. ফিলিস্তিন সমস্যা

প্রাচীন মিশরীয় এবং মেসোপটেমিয় সভ্যতার পর হিব্রূ, হিটাইট ও ফিনিশীয় সভ্যতা[৬৫] পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তী কালে আবার কানান, ফিলিস্তিয়্য এবং ফিনশিয়া অঞ্চল 'ফিলিস্তিন' নামে বিশ্ব ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে[৬৬]। এখানে লক্ষনীয় যে, ফিলিস্তীন বা প্যালেস্টাইন আগে এক দেশের[৬৭] নাম ছিল। ৬০ লাখ[৬৮] জনসংখ্যার এই দেশটিতে অধিকাংশই মুসলমান ছিল। প্যালেস্টাইনীদের পূর্ব পুরুষরা মাছ ধরে, পশুপালন করে ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বহুকাল ধরেই ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সুযোগ খুঁজে আসছিল।

---

৬৫) ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মানব সভ্যতার ইতিহাস*, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করন-২০১০, পৃ.২৬১

৬৬) সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, *ইসরাইল ও মুসলিম জাহান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৩, পৃ.৩৪

৬৭) ১৯৪৮ সালের ১৫ মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত ফিলিস্তিন একটি দেশ হিসেবে পরিচিতি ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৫ মে একে বিভক্ত করে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

৬৮) ফিলিস্তিন ভূমিতে প্রতিরোধ লড়াইয়ের শুরু থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনি জাতির ২৬১০০০ জন শহীদ হন, ১৮৬০০০ জন আহন হন, ১৬১০০০ জন পঙ্গু হন। এছাড়া প্রায় দু মিলিয়ন ফিলিস্তিনি স্বদেশ ছেড়ে বাহিরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের পরিবারবর্গসহ শরণার্থীতে পরিণত হয়। সে দু মিলিয়ন শরণার্থী এখন ৫ মিলিয়ন ৪ লক্ষ (মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল; ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা; (প্রথম প্রকাশ-২০০৩) পৃ.২১) (২০০৩ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী বর্তমানে ফিলিস্তিনে ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৯৫ জন রয়েছে (দেখুন- *The Europa world year Book 2004*, Volume-2, Europa Publication London, pp.3320)

Dhaka University Institutional Repository

৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে ইহুদীদের সেকেন্ড টেম্পল[৬৯] (Second Temple) ধ্বংস[৭০] করার ফলে তাদের প্রাধ্যান্য লোপ পায় এবং ইহুদীরা নিরাপত্তার অভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে খ্রিস্টানরা। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) খিলাফত কালে ৬৩৮ সালে মুসলমানরা ব্যাপক বিজয় লাভ করে ও সমগ্র ফিলিস্তিনে বিনা রক্তপাতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।[৭১] ৬৩৮ সাল থেকে ১০৯৯ সাল পর্যন্ত ৪৬১ বছর মুসলমানদের শাসনাধীন থাকার পর ১০৯৯ সালে খৃস্টানদের দখলে চলে যায়। ১২৪৪ পর্যন্ত প্রায় ১৪৫ বছর আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের পর ১২৪৪ সালে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীনে পুনরায় চলে আছে। দীর্ঘ ৬৭৫ বছর পর ১৯১৯ সালে বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণাধী হয়[৭২]। দীর্ঘ সময় পরিক্রমার পর উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইহুদীরা সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৮৮৬ সালে ডঃ থিওডর হার্জিন ইহুদীবাদকে রাজনৈতিক রূপ দান করেন। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্যাসলেত নামক শহরে সর্বপ্রথম ইহুদী কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে ইহুদীরা তাদের পবিত্রভূমি প্যালেস্টাইনের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে স্থায়ী আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। আর এই অভিযান সফল করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করে "World Zionist Organisation" বা বিশ্ব ইহুদী সংগঠন।[৭৩]

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ১ম বিশ্বযুদ্ধে বৃহত্তর অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ইহুদীদের আরো অনুপ্রাণিত করে। তারা বৃটিশদের কাছে তাদের দাবী তুলে ধরে ও বিভিন্ন বিষয়ে বৃটিশদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকায় তারা সহজেই তাদের মতানুকূলে নিতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে Dr. Chaim Weizman গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব Lord Belfour ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ইহুদী সংগঠনের সভাপতি Lord Rothshield এর উদ্দেশ্যে লেখেন, "His Majestys Government View favour the establisment in Palestine of a national home for the Jewish people" অর্থাৎ তিনি বৃটিশ সরকারে পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য স্থায়ী বাসভূমি গঠনের আশ্বাস দেন।[৭৪]

---

৬৯) সেকেন্ড টেম্পল: সেকেন্ড টেম্পল ছিল জেরুজালেমে ইহুদীদের কেন্দ্রীয় আস্তানা। রোমানদের সাথে ইহুদীদের যুদ্ধের প্রথম টেম্পল (First Temple) ধ্বংশ হয়। পরবর্তীতে খ্রিষ্টপূর্ব-৫১৬ থেকে ৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেবর্তী সময়ে দ্বিতীয় টেম্পল (Second Temple) তৈরী করে।

৭০) ফিলিস্তিনের শাসনকর্তা রোমানদের বিরুদ্ধে ৬৪ ও ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। দ্বিতীয় খ্রিপ্পা ও প্রোকিউরিটার ফ্লোরাস উভয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলে বিশাল রোমান বাহিনী 'টাইটাস' এর নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে প্যালেষ্টাইন অভিমুখে রওয়ানা হয়। টাইটাস বাহিনী বনী ইসরাইলদের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য, শান, শওকত রাজ্য হযরত দাউদ (সা.) কর্তৃক তৈরীকৃত বিশাল উপসনালয় মসজিদ এবং হযরত সোলায়মান (আ.) এর গড়া সিংহাসন জয় করে নেয়ার জন্ন পবিত্র জেরুযালেম নগরী অবরোধ করে সংঘটিত করে চরম ধ্বংসলীলা। বনী ইসরাইলদের এটাই ছিল চরমতম বিপর্যয় (সাইদুর রহমান ও মুহাম্মদ সিদ্দিক, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০)

৭১) সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*,অনু: ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স-কলকাতা, পৃ.৩১৪

৭২) ডা. মুহাম্মদ গোলাম মোয়াজ্জেম, ক্রসেড ও মুসলিম বিশ্ব, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫৪

৭৩) আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সিড়ি বই বিতান, ঢাকা-২০০৯, পৃ.২৩৫-২৩৬

৭৪) নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭২৭

Dhaka University Institutional Repository

পরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন হলে বৃটিশরা মিশর তথা আরবদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে প্যালেস্টাইনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং তাদের প্রশ্রয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদীরা এসে বসবাস করতে শুরু করে। সেখানে তাদের জমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়। আর ইহুদীরা আর্থিকভাবে অনেক স্বচ্ছল থাকায় দ্রুত মুসলমানদের জমি ক্রয় করতে থাকে। ক্রমে আরবরা তাদের জমি, ব্যবসা হারাতে থাকলে তাদের মধ্যে ইহুদী বিরোধী মনোভাব প্রকট হয়। ক্রমে শুরু হয় ইহুদী-মুসলমান দাঙ্গা-সংঘর্ষ। ১৯২১-১৯২৯ ও ১৯৩৬ সালে উভয়ের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয়।[৭৫] Winston Churchill "White paper" তত্ত্ব প্রকাশ করে উভয়ের দ্বন্দ্বের অবসানের চেষ্টা করলে তাতে বহিরাগত ইহুদীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা থাকায় ইহুদীরা এর চরম বিরোধিতা করে। ১৯৩০ এর "Passfield white paper" ও ইহুদীদের বিরোধিতার কারণে বাতিল হয়ে যায়। ১৯৩৩ সালের দিকে হিটলারের ইহুদী নির্যাতনের ফলে হাজার হাজার ইহুদী ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। এতে ক্ষুদ্ধ আরবরা বিশেষ করে ফিলিস্তিনীরা তাদের বিরুদ্ধে সংঘাত সংঘর্ষ শুরু করে।[৭৬]

১৯৩৯-এ সমঝোতার পদক্ষেপকে ইহুদীরা বৃটিশদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম বলে অভিহিত করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য কামনা করে। ১৯৪২ সালে নিউইয়র্ক এ ইহুদী সম্মেলনে Dr. Weizman "বিটমোর প্রোগ্রাম" নামে প্রস্তাব গ্রহণ করে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। এভাবে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার আশ্রয় করে ইঙ্গ মার্কিন মদদপুষ্ট হয়ে ইহুদীরা ১৯৪৮ সালের ১৪ মে তেলআবিবে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বেন গুরিয়নের সভাপতিত্বে জাতীয় পরিষদ প্যালেস্টাইনে "ইসরাইল" নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।[৭৭] যা ছিল আরবলীগের সিদ্ধান্তেড়র পরিপন্থী। আর তাই পরের দিনই ইহুদীদের বিরুদ্ধে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মিশর ও ইরাক যৌথভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় ইহুদী মুসলিম যুদ্ধের। ইহুদীরা ক্রমে বৃটিশ মার্কিনদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মালিক হতে থাকে। ১৯৫৩ সালে শ্যারনের গঠিত কমান্ড ইউনিট "১০১" জর্ডানের কিবিয়া গ্রামে মারাত্মক আক্রমন চালিয়ে সম্পূর্ণ গ্রাম ধুলিসাৎ করে দেয়। ১৯৫৬ সালে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরাইল যুদ্ধ ঘোষণা করে।[৭৮]

১৯৬৭ সালে ছয়দিন ব্যাপী যুদ্ধে ইসরাইল অনেক এলাকা দখল করে নেয়। তৎকালীন দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডো শ্যারন গাজা স্ট্রীটের দুই হাজার বাড়ী ধ্বংস করে দেয়।[৭৯] হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। অনেককে সিনাই পর্বতে নির্বাসন দেওয়া হয় ও অসংখ্য ফিলিস্তিনী গেরিলাকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হয়। এ ধরণের অসংখ্য হামলা তারা মুসলমানদের উপর চলাতে থাকে। কিন্ত সমরাস্ত্রে দুর্বল হলেও কঠোর মনোবল নিয়ে মুসলমানরা ঐ সব হামলার মোকাবিলা করে চলেছে।

---

৭৫) অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব*, ঢাকা-২০১২, পৃ.৪২৭

৭৬) আব্দুল লতিফ খান, পুর্বোক্ত, পৃ.২৩৬

৭৭) সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে ইসরাইল নামে একটি স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম লগ্ন ঘোষিত হয়। ২০৭৭২ বর্গ কিলো মিটার অঞ্চল নিয়ে এই রাষ্ট্রটি গঠিত হয় এবং জনসংখ্যা হল ৫১০০০০০। ইহুদীরা হিব্রু ভাষা এবং আরব আরবী ভাষা ব্যবহার করে (নির্মাল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পৃ.৭২৮)

৭৮) TA Bryson, *American Diplomatic Relations with the Middle East-1774-1975, A Survey*, New York, P.253.

৭৯. Ibid, p.278.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্যারন সেবরাও শাতিলা নামক ক্যাম্পের ফিলিস্তিনী বস্তিতে হামলা চালিয়ে প্রায় ২০ হাজার মুসলীমকে হত্যা করে। দিন যত গড়াতে থাকে ইসরাইলীরা ততই শক্তিশালী হতে থাকে। পক্ষান্তড়ে ফিলিস্তিনী তথা মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকে মনে করেন মধ্যপ্রাচ্যের অসন্তোষের মূল কারণ বিশ্বের তেলের মওজুদ। নিম্নের সারণিতে বিশ্বের তেলের রিজার্ভের অবস্থান দেখানো হলো।

সারণি: ১৩

অঞ্চলভিত্তিক তেলের রিজার্ভ

(বিলিয়ন ব্রারেল)

দেশ	১৯৮৬	২০০৬
উত্তর আমেরিকা	১০১.৬	৫৯.৯
দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা	৬৫.৬	১০৩.৫
আফ্রিকা	৫৮.০	১১৭.২
ইউরোপ ও ইউরো এশিয়া	৭৬.৮	১৪৪.৪
মধ্যপ্রাচ্য	৫৩৬.৭	৭৪২.৭
এশিয়া প্যাসিফিক	৩৯.৭	৪০.৫

সূত্র: ব্রিটিশ প্যাট্রোলিয়ামের Statistical Review of World Energy, June 2007 দেখুন Tiem, July 9, 2007.

বিশ্বকে তেলের রিজার্ভের ভিত্তিতে ৬টি অঞ্চলে বিভক্ত করলে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বের প্রায় ২ তৃতীয়াংশ তেল ২০০৬ সাল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে রিজার্ভ রয়েছে। তেল ছাড়াও ইসরাইল-ফিলিস্তিনে রয়েছে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের লড়াই। কারণ এখানে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদী সকলের ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে বলে তাত্বিকগণ মনে করেন। আর এসব কারনেই এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বহুল রাজনীতি, বিশ্ব রাজনীতি এবং দদ্ধ ও সংঘাত। নিম্নে ইসরাইল-ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি : ১৪

ইসলাইল-ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে : ১৯৪৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনাবলী

১৯৪৭	:	জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনি এলাকা বিভক্তির সিদ্ধান্ত।
১৯৪৮	:	ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সিরিয়া, মিশর, ফ্রান্স, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ।
১৯৫৬	:	মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসলাইল কর্তৃক মিশর আক্রনণ।
১৯৬৭	:	ইসলাইল কর্তৃক মিশর, সিরিয়া, জর্ডান আক্রমণ ও সিনাই, পশ্চিম তীর, গাজা ও সিরিয়ার গোলান উপত্যকা দখল।
১৯৬৯	:	২১ আগষ্ট মসজিদুল আকসার ক্ষতি সাধনের প্রতিবাদে ২২-২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাবাতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন এবং ওআইসি প্রতিষ্ঠা।
১৯৭০	:	২২-২৬ মার্চ ওআইসির প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে PLO কে সমর্থন দান এবং PLO কে ওআইসির পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান।
১৯৭১	:	২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ জেদ্দায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ওআইসির চার্টার অনুমোদন।
১৯৭৩	:	অধিকৃত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে মিশর ও সিরিয়ার সাথে ইসলাইলের যুদ্ধ।
১৯৭৪	:	২২-২৪ ফ্রেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব প্রচেষ্টার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি সমর্থন দান এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইসরাইলের প্রত্যাহারের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান।

১৯৭৫ : ওআইসির পঞ্চম পররাষ্টমন্ত্রী সম্মেলনে ইসরাইলের সাথে সকল ইসলামি দেশের সম্পর্কচ্ছেদ এর ঘোষণা।

১৯৭৮ : ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। সিনাই থেকে ইসলাইলের প্রত্যাহার। মিশরের সাথে ইসরাইলের কূটনেতিক সম্পর্ক। ৫বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা।

১৯৭৯ : মিশর ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করার কারনে ওআইসির সদস্যপদ বাতিল।

১৯৮১ : ইসলাইল কর্তৃক ইরাকের পারমাণবিক কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ। ফিলিস্তিন জনগণের সম্মানে ৩১ আগষ্টকে ইসলামী সংহতি দিবস ঘোষণা ওআইসির।

১৯৮২ : লেবাননে ইসরাইলি হামলা ও পিএলও-কে বাধ্য করা লেবানন ছেড়ে দিতে। অধিকৃত এলাকা ও জর্ডান নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনে রিগ্যানের প্রস্তাব। আরব রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক ইসরাইলের স্বীকৃতির প্রস্তাব। শর্ত ইসরাইলকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে। ইসরাইল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধানে ওআইসি ফেজ প্রস্তাব প্রদান করে।

১৯৮৪ : ওআইসির পঞ্চদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসরাইলকে আরব বিশ্বের সংঘর্ষের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের যে সকল স্থান ইসরাইল দখল করেছে তা পরিত্যাগের আহবান জানান।

১৯৮৭ : অধিকৃত ইসরাইলি এলাকায় 'ইন্তিফ়াদা' বা ফিলিস্তিনি গণঅভ্যুথান শুরু ।

১৯৮৮ : পিএলও'র আলজিয়ার্স সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ ও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা।

১৯৯১ : মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য শান্তিসম্মেলন শুরু । ইসরাইল, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের অংশগ্রহণ। আরব রাষ্ট্রগুলো ও ইসরাইলের মধ্যে অনৈক্য। শান্তিপ্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।

১৯৯২ : রোম, মরক্কো, ওয়াশিংটনে শান্তিআলোচনা অব্যাহত। ইসরাইলে নির্বাচনে রিকুদ পার্টির পরাজয় ও লেবার পার্টির সরকার গঠন। রাবিন নতুন প্রধানমন্ত্রী। ডিসেম্বরে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ৪১৫ জন ফিলিস্তিনিকে বহিষ্কার। শান্তিপ্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।

১৯৯৩ : ওয়াশিংটনে নবম ও দশম রাউন্ড শান্তিআলোচনা শুরু । ১০ সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও পিএলও পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি। ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও পিএলও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৯৪ : গাজা ও জেরিকোতে ফিলিস্তিনি শাসন প্রতিষ্ঠা। ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন।

১৯৯৫ : পশ্চিম তীরে (ফিলিস্তিনি) স্বায়ত্তশাসন-সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর। আততায়ীর হাতে রাবিনের মৃত্যু।

১৯৯৬ : স্বশাসিত ফিলিস্তিনি এলাকায় প্রথম নির্বাচন। আরাফাতের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়। ইসলাইলের নির্বাচনে লিকুদ পার্টির বিজয়। নেতানিয়াহুর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তি।

১৯৯৭ : হেবরন চুক্তি স্বাক্ষর (১৫ জানুয়ারি)। পূর্ব জেরুজালেম-এ ইহুদি বসতি নিয়ে উত্তেজনা।

১৯৯৮ : অক্টোবরে ওয়াশিংটনের অদূরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও ইসরাইলের মধ্যে 'উইরিভার' চুক্তি স্বাক্ষর। ইসরাইলে নয়া নির্বাচনের ঘোষণা।

১৯৯৯ : ৪ সেপ্টেম্বর পূর্বের ওইরিভার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ২য় বার একটি চুক্তি করেন ফিলিস্তিন ও ইসরাইল। ইসলাইলে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু ।

২০০১ : ইসরাইলের সাধারণ নির্বাচনে ডানপন্থিদের বিজয়। শ্যারন প্রধানমন্ত্রী। পেরেজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

২০০২ : ইসরাইল- ফিলিস্তিনি দ্বন্দ্ব। ইসরাইল- ফিলিস্তিনি সংলাপ বন্ধ।

২০০৩ : যুক্তরাষ্ট্রের রোড ম্যাপ শান্তি পরিকল্পনা।

২০০৪ : আরাফাতের মৃত্যু।

২০০৫ : ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাস বিজয়ী। ওলমার্ট ইসলাইলের প্রধানমন্ত্রী। ২১ জানুয়ারী মক্কা আল মোকাররমায় ওআইসির বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের ৪২৫ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লেবাননের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলো এবং ফিলিস্তিন ইসরাইলের পরিত্যাগের আহবান জানানো হয়।

২০০৭ : হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ্ব। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হানিয়ার পদত্যাগ। নভেম্বর অ্যানাপোলিসে ওলমার্ট-আব্বাস শীর্ষ সম্মেলন।

২০০৮ : বুশের ইসরাইল সফর।

সূত্র ঃ বিভিন্ন সূত্র থেকে গবেষক কর্তৃক তৈরী।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.২. P.L.O প্রতিষ্ঠা

ইসরাইল কর্তৃক নির্বাসিত প্যালেস্টাইনীরা মাতৃভূমিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে আরবলীগের[৮০] প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে এরূপ কয়েকটি সংঘঠনকে নিয়ে Palestine Liberation Organization বা P.L.O গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে P.L.O - কে জর্ডান তার এলাকা থেকে জবরদস্তি করে বের করে দেয়, কেননা P.L.O এর কারণে জর্ডানকে বারবার ইসরাইলী আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছিল। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় এবং সংস্থাটি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের[৮১] সদস্যপদ লাভ করে।[৮২]

১৯৮০ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ইয়াসির আরাফাতকে[৮৩] ভবিষ্যতের প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্র[৮৪] প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। একসময়ে P.L.O এককভাবে ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদ (Palastine National Council (PNC)) ছিল। পরবর্তীতে ফাতাহ ১৯৬৮ সালে এবং অন্যান্য গেরিলা সংগঠনগুলো ১৯৬৯ সালে PNC তে যোগদান করে।[৮৫] ১৯৯২ সালের জুনে ইসরাইল পশ্চিম পেরুতে P.L.O বাহিনীর সদর দপ্তর ধ্বংস করার জন্য তথাকথিক "অপারেশন পিস ফর গ্যালিনীস্ব" কার্যকরী করে। এতে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা আত্মরক্ষা করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিসে P.L.O তাদের সদর দপ্তর পুনঃস্থাপন করে।

---

৮০) ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ আবর রাষ্ট্রগুলোর সংহতিমূলক সংগঠন আরবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৩টি যথাক্রমে মিশর, ইরাক, ডর্জান, লেবানন, স্কৌদি আরব, সিরিয়া, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, বাহরাইন, কুয়েত, লিবিয়া, মরক্কো, ওমান, কাতার, সুদান, তিউনেসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কমোরু দীপপুঞ্জ, জিবুতি, মৌরিতানিয়া, ফিলিস্তিন ও সোমালিয়। সংস্থার সদর দপ্তর তিউনেসিয়ার রাজধানী তিউনিসে ছিল পরবর্তীতে ইরাক-কুয়েত বিরোধের সময় স্থানান্তর করে মিশরের কায়রোতে স্থানান্তর করা হয়। (বিস্তারিত আব্দুল লতিফ খান)

৮১) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনঃ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ন্যাম (Nam) ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বাদুং এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ১৯৬১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১২০।

৮২) নুর হোসেন, *জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ*, পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৬২

৮৩) গোটা আরব বিশ্বে যাকে "দ্য গ্রেট সারভাইভার বলে ডাকা হয় তিনিই ইয়াসির আরাফাত। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের এক সময়ের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট। ইয়াসির আরাফাত ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর জেরুজালেমে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। আরাফাতের বার বার রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতাকে হার মানায় একমাত্র তার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেচে থাকার রেকর্ড। ১৯৬৮ সালে তিনি PLO এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে ফিলিস্তিন কেন্দ্রীয় কমিটি ইয়াসির আরাফাতকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করে। ১৯৯৩ সালে 'আসলো'র আলোচনা শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে আশার আলো জাগিয়ে তোলে। তিনি ১৯৯৫ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৯৬ সালের ২০ জানুয়ারী ৮৮% ভোটে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২০০২ সালের ১৮ জানুয়ারী পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরে গৃহবন্দী হন। ১ মে দীর্ঘ ৩৪ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তিনি মুক্ত হন। ২০০২ সালের ২৬ জুন তিনি প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ৫ অক্টোবর আরাফাত জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের আইনে স্বাক্ষর করেন। ২০০৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৮৪) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে ২০১২ সালের সম্মেলনে ফিলিস্তিন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদান করেছে (বিস্তারিত www.un.com)

৮৫) আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সপ্তম সংস্করণ, সিড়ি বই বিতান, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.২৪১

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে প্রতিটি আরব রাষ্ট্রে ছাড়াও রাশিয়া, চীন, কিউবা, ভারত, বাংলাদেশ, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে P.L.O এর মিশন বা প্রতিনিধি রয়েছে।[৮৬]

৬.২.৩. হামাস প্রতিষ্ঠা

প্যালেস্টাইনীদের অধিকার নিয়ে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী সোচ্ছার হামাস জঙ্গী ইসলামী আন্দোলন দল। এই হামাসের জন্ম হযরত ঈসা (আঃ) (যিশু খ্রিষ্টের) জন্মস্থান বেথেলহেমের কাছে বৈইশে উদ্বাস্তু শিবিরে। এই শিবিরের অধিকাংশ প্যালেস্টাইনী কর্মহীন। তখন শিবিরে ৬০% উদ্বাস্তু বয়স ১৮ বছরের নিচে। ১৯৮৭ সালে অধিকৃত হলনায় প্যালেস্টাইনীদের গাজা অভূত্থান হয়। ইন্তিফাদা শুরু হবার পর থেকে এক মাসে এই ৯০০ ফিলিস্তিনি ও ৮৫ জন ইসরাইলী সৈন্য নিহত হয়। আজও এই শিবিরে ১২ হাজার প্যালেস্টাইনী আটক রয়েছে। দীর্ঘ যন্ত্রণা ও ক্রোধের আগুনে লাল হওয়া দলের সদস্যরা স্বাধীনতা ছাড়া যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসছে।[৮৭] কেউ কেউ মনে করেন হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে মুসলিম ব্রাদার হুডের প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে মিশরে ১৯৮৭ সালে এই দলটি গঠিত হয়। তবে যে ভাবেই বা যাদের নিয়েই হামাস গঠিত হউক না কেন এটি গঠনের পিছনের কারণ নিম্নরুপ বলে অনেকে মনে করেন :

১. ইসলামী চিন্তাধারা প্রভাবিত ইসরাইল-আমেরিকা অশুভ আতাত বিরোধী মতবাদ বিভিন্ন আকার-প্রকার ও পদ্ধতিতে সংগঠিত ও প্রকাশিত হতে থাকা।

২. ইসরাইল-আমেরিকা আতাত অতিশয় পদ্ধতিগতভাবে ও উন্নত টেকনোলজির মাধ্যমে মূখ্য উদ্দেশ্য ঢেকে রেখে ফিলিস্তিনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচার অভিযানে এগিয়ে চলা।

৩. উপরে প্যালেস্টাইনের যে ভৌগলিক ধর্মীয় এবং জাতিগত জনসংখ্যার বিবরণ রেখেছি, তা থেকে একটা কথা বলা চলে যে ব্যাপকভাবে সাম্রাজাবাদ ও আধিপত্য বিরোধী গণ আন্দোলনের মাধ্যমে (যা ভারতে বৃটিশ বিরোধী বা দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা চামড়া আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনের রুপে দেখা গিয়েছিল) ফিলিস্তিনিদের কোনও স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা সম্ভব হয় নি। সেই ১৯৪৮ থেকে টেরোরিস্ট অভিযানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের আধুনিক ও সর্বোৎকৃষ্ট সমরাস্ত্র দিয়ে তৈরী সেনাবাহিনী দ্বারা ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার দাবী দাবিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটি সেটেলমেন্টের সাথে যোগাযোগের রাস্তা নির্মানে গোটা পশ্চিম তীর জাল ঘেরা করা হয়েছে। পিএলও নেতৃত্বের স্বাধীনতা আন্দোলন বিদেশ ভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ ঘরে ঘরে জনে জনে ইসরাইলি আর্মি, ইহুদি অভিবাসী সেটলার পরিবেষ্টিত হয়ে ফিলিস্তিনিরা বসবাস করে। পশ্চিম তীর ও গাজার জনগণ ছাড়াও বহুসংখ্যক রিফিউজিও এ অঞ্চলে জাতিসংঘের পরিদর্শন ক্যাম্পে রয়েছে। বাইরে থেকে ইহুদি আমদানী করে ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে ওদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

---

৮৬) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪১.

৮৭) The Europen world year Book 2004, Volume-2, PP.3324 (বিস্তারিত দেখুন-৩৩০৮-৩৩২৮)

Dhaka University Institutional Repository

পিএলও নেতৃত্বকে দেশছাড়া হতে বাধ্য করা হয়েছিল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী প্যালেস্টাইনে ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আরাফাতের নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্যই হয়েছিল বলতে হবে। যেটা স্বাধীনতা কামিদের মতে আন্দোলনে বিরতি টানা। কিন্তু ভোলা উচিত নয় যে আরাফাত লেনিন স্টালিন-মাও সে তুঙ নন।

৪. অর্থনৈতিভাবে প্যালেস্টাইনিদের দরিদ্রতার আবর্জনায় ডুবানো হয়েছে। যার কিছু বিবরণ সাইট্রাস ও অলিভ আহরণ এবং ঐসব ফলবাগান ধ্বংসের বর্ণনার মধ্যদিয়ে বলা হয়েছে।[৮৮]

বাস্তবে হামাম ফিলিস্তিনীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করলেও তা করেছে সন্ত্রাসী পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক। হামাস গ্রুপ ছাড়াও আরও দু'টি শক্তিশালী উগ্রপন্থী (PLF, PFLP) গ্রুপ প্যালেস্টাইনে রয়েছে। ২০০৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকা করে।[৮৯]

৪.৪.সমঝোতার পদক্ষেপ

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গত অর্ধশতাব্দী ধরে প্যালেস্টাইন ইসরাইল সমস্যাকে শুধু প্রত্যক্ষ করেছে তা নয় তারা কিছু সমঝোতার পদক্ষেপও নিয়েছিল। তাদের সমঝোতার সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে যেটি সবচেয়ে সফল বলে বিবেচনা করা হয় তা হল ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টম্বর সংগঠিত চুক্তি। শান্তির অনুসন্ধান মূলত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছে যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য ভোট দেয়। এ লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ডের লুমান শহরে বেশ কিছু অসফল উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র, সোয়িভেয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সের সমর্থন নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্যালেস্টাইনীদের ব্যাপারে ২৪২ নং প্রস্তাবনা রাখে যা আরব লীগ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়।

১৯৭০ সালে মার্কিনীদের Shutle diplomacy-র আওতায় ২১ ও ২২ ডিসেম্বর জেনেভাতে শান্তিআলোচনা শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ সিরিয়ায় মিশর তাদের কিছুটা হারানো এলাকা ফিরে পায়। ১৯৭৭ সালের শেষে শান্তির নতুন উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯৭৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন মধ্যস্থতায় মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি ক্যাম্প ডেভিড নামে পরিচিত। মিশর তার হারানো এলাকা ফিরে পায় ও ইসরাইলকে সমর্থন দান করে। আরব লীগ PLO-র চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে।[৯০] এভাবে বারবার প্যালেস্টাইনীদের স্বার্থ উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। দীর্ঘকালীন স্থবিরতার পর নতুন করে শান্তিআলোচনা শুরু হয় এবং এটি ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, উপসাগরীয় যুদ্ধকালীন সময়ে ইরাক ইসরাইল আক্রমণ করে সমস্যাকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে।

---

৮৮) আবু মোহাম্মদ মজহারুল ইসলাম, *সন্ত্রাসী নয় ওরা মুক্তিযোদ্ধা*, সমাবেশ, ঢাকা-২০০৪, পৃ.১০৮
৮৯) পূর্বোক্ত, পৃ.১০৯
৯০) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্যালেস্টাইনি ইন্তিফাদাহ

১৯৮৭-র ডিসেম্বর প্রথমদিকে প্যালেস্টাইনি ইন্তিফাদাহ শুরু হয়। এ অভ্যুত্থান দমনের জন্য ইসরাইল অস্ত্রের শক্তিসহ এই ভূমিকার ফলে অধিকৃত অঞ্চলে পরিস্থিতির যে মারাত্মক অবনতি হয়, প্যালেস্টাইনি অধিকার কমিটির ১৯৮৮ সালের রির্পোটে সে ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্যালেষ্টাইনিদের মধ্যে প্রাণহানি ও নির্যাতনের ব্যাপকতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিটি সতর্কবানী উচ্চারণ করে যে, ইসরাইলের এ ধরনের আচরণ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলবে, ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী সমাধানের অন্বেষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগকে বিঘ্নিত করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপদগ্রস্ত করবে। রির্পোটে আবারও উল্লেখ করা হয় যে, প্যালেষ্টাইনি জনগণকে যতদিন পর্যন্ত তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত রাখা হবে, ততদিন এ সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। প্যালেস্টাইনি অধিকারসমূহের মধ্যে যেগুলোর কথা রির্পোটে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় সেগুলো হচ্ছে : বাইরের হস্তক্ষেপমুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার, ঘরেফেরা ও সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার এবং নিজস্ব একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পাওয়ার অধিকার। রির্পোটে আরো বলা হয়, যতদিন পর্যন্ত প্যালেস্টাইনি ও অন্যান্য আরবভূমি ইসরাইলিরা জবরদখল করে রাখবে ততদিন পর্যন্ত সে-অঞ্চলে সমস্যার কোনো সমাধান আসবে না। ইন্তিফাদাহ শুরু হবার পর থেকে অধিকৃত এলাকার প্যালেস্টাইনিদের জীবন চিহ্নিত হয়েছে অস্বাভাবিক মাত্রার সংঘাত ও নির্যাতনের ঘটনায়।[৯১]

প্রফেসর এসপোসিটো উল্লেখ করেন, The Primary Cause of Intifada was not Islam or Islamic revivalism but Continued Islamic Occupation of the west bank and Gaza and the desperation of young Palestinians in Particular.[৯২]

দখলদারবাহিনী প্যালেস্টাইনিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে নিরাপত্তা পরিষদ ইসরাইলি-অধিকৃত এলাকায় প্যালেস্টাইনি অসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপারিশসহ একটি রিপোর্ট পেশের জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ জানায়।

মহাসচিবের ২১-১-৮৮ তারিখের রির্পোটে বলা হয়, প্যালেস্টাইনি জনগণ ও ইসরাইলবাসীদের নিরাপত্তাবিধানে শেষপর্যন্ত একমাত্র নিশ্চিত পথ হবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আরব-ইসরাইল বিরোধের এমন একটি সামগ্রিক, ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী মীমাংসা বের করা যা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। রিপোর্টে বলা হয়, সংলাপের কার্যকর প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং তার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্বে জরুরিভিত্তিতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে, একটি রাজনৈতিক সমাধান সাপেক্ষে, ইসরাইল কর্তৃক চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন।

৯১) তোফাজ্জল হোসেন, *জাতিসংঘ*, ঢাকা,২০০৭, পৃ,২৫৯.
৯২) সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, *ইসরাইল ও মুসলিম জাহান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৩, পৃ,৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

রির্পোটে সুপারিশ করা হয়, চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের সেইসব বিশিষ্ট পক্ষ-যাদের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ যেন এই কনভেনশনের এক নম্বর ধারায় বর্ণিত দায়দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের কাছে ঐকান্তিক আবেদন জানানোর কথা বিবেচনা করে।

এই ধারায় সবরকম পরিস্থিতিতেই এ কনভেনশনের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সুপারিশে নিরাপত্তা পরিষদকে আরো অনুরোধ জানানো হয়েছে যে, উল্লিখিত বিশিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতি এমন আবেদন জানানো হয় যে, তারা এই কনভেনশনের প্রয়োগ সম্পর্কে ইসরাইল সরকারকে তার মনোভাব পরিবর্তনে প্রভাবিত করার জন্য তাদের সবরকম সামর্থ কাজে লাগায়। তার পাশাপাশি ইসরাইল নিম্নবর্ণিত অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপগুলো নিতে পারে বলে রির্পোটে উল্লেখ করা হয় :

ক) আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ধারসমূহের সম্পর্কে ইসরাইলি সামরিকবাহিনীর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দান (কনভেনশনে ও শর্তকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে):

খ) ইসরাইলি সেনা সদস্যদেরকে এ নির্দেশ দেয়া যেন তারা সকল পরিস্থিতিতেই গোলযোগে আহত ব্যক্তিদেরকে দ্রুততার সাথে চিকিৎসাসেবার জন্য স্থানান্তরে সাহায্য করে এবং এ বিষয়টিও নিশ্চিত করে যে, সামরিক তৎপরতার কারণে হাসপাতাল ও চিকিৎসাকর্মীদের দক্ষ কার্যসম্পাদন ব্যাহত না হয় :

গ) বেসামরিক জনগণের জন্য খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রীর সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার জন্য ইসরাইলি সেনা সদস্যদের নির্দেশ দেয়।[৯৩]

এ প্রসঙ্গে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাবিন প্রথমে বলেছিলেন, ''তোমাদের হাড্ডি ভেঙ্গে চুর্ণ বিচূর্ণ করে দেব''। কিন্ত পরবর্তীতে বলেছিলেন ''ইসরাইলী সেনাবাহিনীকে তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র শহরের রাস্তায় এমন পুলিশী শক্তিতে পরিণত করতে পারি না যে, কেবল বাচ্চাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াবে''[৯৪]

২৮-১-৮৮ তারিখে এই রিপোর্টের ওপর নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কে অংশ নিয়ে কমিটির চেয়ারম্যান মাসাম্বা সারে (সেনেগাল) রিপোর্টটি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই রিপোর্টে প্যালেস্টাইনি জনগণের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অধিকৃত অঞ্চলে নৃশংস নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে তিনি দখলদার পক্ষ হিসেবে ইসরাইলকে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে বর্ণিত দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিষদের প্রতি আহবান জানান। তিনি প্যালেস্টাইনি জনগণের পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণে মানবিক সংস্থাগুলোর শক্তি বৃদ্ধি এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে নতুন করে প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানান। এই রিপোর্টের ওপরও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হয়।[৯৫]

---

৯৩) তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ,২৬০

৯৪) মুহাম্মদ হাসনাইন হায়কল, *ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা*, (অনুবাদ- ডা. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা,২০০৩, পৃ,৭২১

৯৫) তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ,২৬০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের শান্তি আলোচনা

১৯৯১ সালে মাদ্রিদে শুরু হয় মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক শান্তি সম্মেলন ইসরাইলসহ মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবানন এই শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই আলোচনা অব্যাহত থাকে রোম, মরক্কো ও ওয়াশিংটনে। মধ্যপ্রাচ্যে আরব ইসরাইল সমস্যা যে কারণে আরো জটিল আকার ধারণ করে তা হলো-

১. ইসরাইল কর্তৃক আরব অধিকৃত অঞ্চল প্রত্যাবর্তনের জন্য আরব রাষ্ট্রদের দাবী।

২. স্বাধীন প্যালেস্টানীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

৩. আরব রাষ্ট্রগণের ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান।

এসব দাবীর প্রতি কোন পক্ষই নমনীয় মনোভাব পোষণ করেনি বলে সমঝোতার সকল প্রায়াস ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৯১ সালের ২৭ অক্টোবর মাদ্রিদে সর্বপ্রথম আরব ইসরাইলের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জজ বুশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট গরভাচেভ, PLO- এর পক্ষে নেতত্ব দেন হানান আশরাবী এবং মাহমুদ আব্বাস ইসরাইলের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ। ইসলাইলের প্রধানমন্ত্রী সামীবের অনীহা ছিল। এ আলোচনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কারণ ইসরাইল কিছুতেই অধিকৃত জেরুজালেম এলাকায় বসতি স্থাপন থেকে বিরত হতে চাচ্ছিল না।[৯৬]

১৯৯৩ সালের স্বায়ত্তশাসন চুক্তি

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে লন্ডনে ইসরাইলী প্রফেসর Yair Hirchfield এবং P.L.O অর্থ দপ্তরের প্রধান Ahmed Kariah এর মাঝে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী J.J. Holst এর মধ্যস্থতায় নরওয়ে, সুইডেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারি পর্যায়ে ৮ মাস ধরে ১২টিরও অধিক বৈঠক চলে। ২৯ আগষ্ট তারিখে গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে প্যালেস্টাইন স্বায়ত্তশাসন ও পারস্পরিক স্বীকৃতি বিষয়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হয় সেই ঐতিহাসিক চুক্তি। এতে মোট ১৭টি ধারা ছিল। তার মধ্যে নিচে পাঁচটি ধারা উল্লেখ করা হলো-[৯৭]

১. ১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর থেকে চুক্তিটি কার্যকর হবে।

২. ১৯৯৩ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে গাজা উপত্যকা ও জেরিকো শহর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হবে।

৩. ১৯৯৪ সালের ১৪ এপ্রিলের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহার শেষ হবে।

৪. ১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হবে।

৫. ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে অন্তর্বর্তী স্বায়ত্তশাসনের মেয়াদ শেষ হবে।

---

৯৬) তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৮

৯৭) *আজকের কাগজ*, ১৩ অক্টোবর-১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সালের স্বায়ত্ত্বশাসন চুক্তির ব্যাপারে উভয় দেশেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইসরাইলের প্রধান তিনটি দল ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টি, মলভেট পার্টি ও টসমেট পার্টি চুক্তির ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে। অবশ্য নেসেটে এ চুক্তি ৬১-৫০ ভোটে পাশ হয়। অপরদিকে প্যালেস্টাইনী উগ্রবাদী তিনটি সংগঠন হামাস পার্টি PLF ও PFLP পার্টিও এ চুক্তির বিরোধিতা করেছে। তারা ইয়াসির আরাফাতকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে আখ্যায়িত করে। চরমপন্থী সংগঠনগুলোর এ কার্যকলাপকে আরো উসকে দেয় হেবরণ হত্যাকান্ড, যেটি সংগঠিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এদিন চরমপন্থী ইহুদীরা নামাজ পড়া অবস্থায় অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। ফলে স্বায়ত্ত্বশাসন চুক্তি ভেস্তে যেতে বসেছিল। অবশেষে ৪/৫/৯৪ তারিখে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়।[৯৮]

চুক্তির ফলাফল

এই চুক্তির ভিত্তিতে ১৭ মে গাজায় প্যালেস্টাইন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। ইসরাইল ১৮ মে ১৯৯৪ তারিখে স্বায়ত্ত্বশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে গাজা, জেরিকো শহর হস্তান্তড় করে। ২৭ মে ১৯৯৪ তারিখে প্যালেস্টাইনের খসড়া সংবিধানে জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫-এ P.L.O কর্তৃক চুক্তির খসড়া দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি চূড়ান্তড়ভাবে স্বাক্ষরিত হয় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে হোয়াইট হাউসে। এ চুক্তির ফলে পশ্চিম তীর এলাকাকে তিন ভাগ করে প্রথম অংশ প্যালেস্টাইনিদের নিয়ন্ত্রণে, দ্বিতীয় অংশ ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে ও তৃতীয় অংশ ইসরাইল প্যালেস্টাইনের যৌথ নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়।[৯৯]

হেবরণ চুক্তি

১৯৯৬ সালে আইজ্যাক রবিনের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় আসলে শান্তিপ্রক্রিয়ায় ছন্দ পতন হয়। ক্ষমতায় এসেই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু শান্তিড়র মূল বক্তব্য Land for peace কে অস্বীকার করে বলেন Peace for security, তিনি ১৯৯৫ এর চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে নানা চাপে ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে হেবরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি মতে হেবরণ শহরের আশিবাগ এলাকা ও আশেপাশে গ্রামাঞ্চল থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে বলে বলা হয়। কিন্তু এ চুক্তিতে বসতি স্থাপনকারী ৪০০ ইহুদী পরিবার ও নতুন বসতি স্থাপন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তনেয়া হয়নি।[১০০]

উই রিভার চুক্তি

১৯৯৮ সালে 'উই রিভার' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'উই রিভার' চুক্তিকে বলা হয়েছিল, ইসরাইল অধিকৃত আরব এলাকা পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ফিলিস্তিনীদের হাতে অর্পণ করবে, উভয়পক্ষ সন্ত্রাস দমনে উদ্যোগ নেবে, পিএলও জাতীয় কমিটি ও ফিলিস্তিনী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তাদের জাতীয় সনদ থেকে ইসরাইলবিরোধী ধারাগুলো এক্সপাঞ্জ করবে ইত্যাদি।

---

৯৮) তারেক শামসুর রেহমান, *নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*; দ্বিতীয় সংস্করন, ঢাকা-২০০৮, পৃ.৬২

৯৯) মুহাম্মদ হাসনাইল হাইকল, *ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা* (অনুবাদ ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৩, পৃ.৭২৭-৭২৮

১০০) সাইদুর রহমান ও মুহাম্মদ সিদ্দিক, *ইসরাইল ও মুসলিম জাহান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৩, পৃ.৪২৫-৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

মৌরল্যান্ড চুক্তি

২৩ অক্টোবর ৯৮ মৌরল্যান্ডে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে একটি অর্ন্তবর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি ১৯৯৯ সালের ৪ মে-র মধ্যে চূড়ান্তচুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে একটি অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ।[১০১] নির্ধারিত সময়ে চুক্তি না হলে ইয়াসির আরাফাত একতরফাভাবে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবেন বলে অস্বীকার করেছেন।

ক্যাম্প ডেভিড শান্তি আলোচনা

২৫ জুলাই ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেভিডে ফিলিস্তিন ইসরাইল শান্তিআলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দীর্ঘ পনের দিন ব্যাপী অনেক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে কোন সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়। মধ্যপ্রচ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় চলতি প্রয়াসে ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে অনেকে মনে করেছিলেন। কিন্ত তা বাস্তবে কোন ভূমিকা রাখেনি।

সারম আল শেখ শীর্ষ সম্মেলন

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে ইসরায়েলের প্রধান বিরোধী দল লিকুদ পার্টির নেতা পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়ল শ্যারন জেরুজালেমে মুসলিমদের পবিত্র মসজিদআল আকসা সংলগ্ন ইহুদিদের ধর্মস্থলে টেম্পল মাউন্ট পরিদর্শন করেন এখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিরা। ইসরাইলী সৈন্যরা তাদের উপর ঘুলিবর্ষণ করলে কয়েকদিনের মধ্যেই নিহত হয় ষাট জন ফিলিস্তিনী। ঘটনা দ্রুত খারাপ হতে থাকে। এমতাবস্থায় বিশ্ব নের্তৃবৃন্দ এগিয়ে আসেন। ১৭ অক্টোবর ২০০০ সালে মিসরের সারম আল শেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় মধ্যপ্রাচ্য শীর্ষ সম্মেলনে বসেন। সম্মেলনে ইসরায়েলের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত, মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ও জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ ৩৬ ঘন্টা আলোচনা শেষে তারা ইসরাইল ও ফিলিস্তিন বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান।[১০২] তবে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। শীর্ষ সম্মেলনে-

(ক) দুই পক্ষ চলমান সহিংসতার অবসানে একমত হয়েছেন।

(খ) এ টি তদন্তকমিশন সহিংস ঘটনার তদন্তকরবে।

(গ) শান্তিপ্রক্রিয়ায় ফিরে আসতে উপায় খুঁজে বের করা হবে।

(ঘ) দুই পক্ষই অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়েছে।

কার্যত শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে। এখনও ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে এবং হতাহতের পরিমান বেড়েই চলছে।

---

১০১) *The Europa World Year book 2004*, Volume-2, P.3311

১০২) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৩

ক

Dhaka University Institutional Repository

রোড ম্যাপ

সময় পরিক্রমায় ফিলিস্তিনে ইসরাইলীদের অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাদের অযৌক্তিক, জঘন্য ও মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যার প্রতিবাদে ফিলিস্তিনীরা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালালে তাদের সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করা হয়। বর্তমান সময়ে ইহুদীরা মধ্যপ্রচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাই তারা নির্বিচারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ী, অফিস আদালত, সবকিছু গুড়িয়ে দিচ্ছে যা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। এমনই এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অতীতে গৃহীত পদক্ষেপের ন্যায় "রোড ম্যাপ" পরিকল্পনা UN,EU, USA ও Russia যৌথভাবে গ্রহণ করেছে যা ছিল শান্তিড় প্রিয় মানুষের ও ফিলিস্তিনী মুসলমানদের প্রাণের দাবী । নিম্নে 'রোড ম্যাপ' পরিকল্পনা [১০৩] সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

'রোড ম্যাপ' UN,EU, USA ও Russia এই চতুষ্টয়ের শান্তিপরিকল্পনা যা বিবাদমান ইহুদী ও মুসলিমদের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংঘ ও রাষ্ট্রগুলো নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই 'রোড ম্যাপ' তত্ত্ব প্রচার করে। ৩০ এপ্রিল (২০০৩) সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এই 'রোড ম্যাপ' তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এতে রয়েছে ধারাবাহিক তিনটি প্রক্রিয়া এবং এটির পূর্ণ রুপদানে সময় ধরা হয়েছে ২০০৫ সাল পর্যন্ত।

প্রথম পর্যায়

'রোড ম্যাপ' এর প্রথম ধাপে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের উপর কতকগুলো শর্ত আরোপ করা হয় যাতে শান্তিকর্মসূচী বাস্তবায়ন সহজতর হয়। এ পর্যায়ে ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান দিক হলো ঃ

১. সর্বপ্রথম অত্যন্তআবশ্যিকভাবে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের সর্বপ্রকার সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে।
২. মধ্যপ্রাচ্যে লিখিতভাবে ইসরাইলের উপস্থিতি ও অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।
৩. ফিলিস্তিনী নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার আরও অধিক মাত্রায় কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে।
৪. ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের জন্য যুগোপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করবে।
৫. অবাধ ও নিরপক্ষ জাতীয় নির্বাচনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৬. রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কার আনবে।
৭. সর্বোচ্চ মাত্রায় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

---

১০৩) আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, পৃ.২৫৭-২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ইসরাইলের জন্য যে সব পদক্ষেপের কথা বলা হয় সে গুলো হল ঃ

১. ফিলিস্তিনী নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিবে।

২. ২০০০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের পর অধিকৃত ভূখন্ড প্রত্যাহার করবে।

৩. ফিলিস্তিনী অঞ্চলে ইহুদী বসতি স্থাপন দ্রুত বন্ধ করতে হবে।

৪. সন্ত্রাসবাদ বন্ধের জন্য ইসরাইল ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে।

৫. তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও এর গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধিতে ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের সাহায্য করবে।

উপরের নির্দেশাবলীর কার্যকারিতা ২০০৩ সালের ৩০ জুনের মধ্যে পর্যবেক্ষণের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়। আর এই পর্যবেক্ষকগণ থাকবে উক্ত চার সদস্য ''রোড ম্যাপ" এর প্রথম ধাপটি শুরু হয় ২০০২ অক্টোবর থেকে এবং জুন ২০০৩ সালে শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

'রোড ম্যাপ' এর ২য় পর্যায় শুরু হয় জুন ২০০৩ থেকে এবং শেষ হবে ডিসেম্বর ২০০৩ সালে। এ সময়ে প্রস্তাবক সংগঠন চতুষ্টয় ফিলিস্তিন ইসরাইল ভূখন্ডে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের উপর নিম্নবর্ণিত নির্দেশ প্রদান করে।

ফিলিস্তিনীদের করণীয়

১. জাতীয় সরকারের সুস্পষ্ট কাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে।

২. ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইসরাইলের জন্য করণীয়

১. ফিলিস্তিনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ও সফলতার জন্য ইসলাইল ব্যাপক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে শেষে বলা হয় ফিলিস্তিনে জাতীয় নির্বাচনের পর UN, EU, USA ও Russia এর সাথে পরামর্শ মোতাবেক ফিলিস্তিনী সরকারকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসবে।

তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়ে ২০০৪ সালের প্রথম দিকে ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রাদেশিক সীমান্তবিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ, সীমান্তসমস্যার সমাধান, জেরুজালেমের মর্যাদা রক্ষা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে স্থায়ী সমাধানে স্বেচ্ছার লক্ষ্যে ইসলাইল ফিলিস্তিনীদের নিয়ে ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়। সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক এগুলো ২০০৫ সালে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইসরাইল, লেবানন, সিরিয়া তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহযোগিতার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তগৃহী হবে।[১০৪]

১০৪) পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৮-২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

'রোড ম্যাপ' পর্যালোচনা ঃ

মধ্যপ্রাচ্যের সুখ শান্তিড়র পথে ইসরাইল ফিলিস্তিন সংঘর্ষ মারাত্মক প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বহু পূর্ব থেকেই এই সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে অনেক পদক্ষেপ, এতে মধ্যস্থতা করে দেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। যার প্রায় সবগুলোই ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গৃহীত 'রোড ম্যাপ' পরিকল্পনা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি আপাতদৃষ্টিতে এটির কতকগুলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হ'ল ঃ

ইতিবাচক দিকসমূহ

ইসরাইল রাষ্ট্রের কৃত্রিম আবির্ভাবের পর থেকে অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে অসংখ্য ছোট খাট যুদ্ধ ও সংঘর্ষে মুসলমানরা ক্রমেই পরাজিত হতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ এর আরব ইসরাইল যুদ্ধে বিশ্বের অন্যতম কতিপয় বৃহৎ শক্তির মদদপুষ্ট ইসরাইলের ক্রমবর্ধমান শক্তির কাছে মুসলমানরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আস্তে আস্তে তারা বিশেষ করে দ্বন্দ্বমান ফিলিস্তিনীরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। অন্যদিকে ইসরাইল ক্রমান্তয়ে শক্তিশালী হতেই থাকে। সে জন্য 'রোড ম্যাপ' এর মত পদক্ষেপ একদিকে যেমন বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের মহান মানবতার দাবী; তেমনি শত বঞ্চনা, অত্যাচার নির্যাতন নিষ্পেষণে জর্জরিত অসহায়, নিঃস্ব, বঞ্চিত ফিলিস্তিনী নারী পুরুষের প্রাণের দাবী হিসাবে আবির্ভূত হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী দেশ, সংঘের শর্ত, সমালোচনা উপেক্ষা করে ইসলাইল তার নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। যা চরমভাবে মানবাধিকারের লংঘন। তাই ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে হলেও এ ধরণের পদক্ষেপ ইসরাইলী ধ্বংশাত্মক কার্যকলাপের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে আবির্ভূত হয়। তাদের ধ্বংস হত্যার অভিযান খানিকটা ব্যাহত হয়েছে ঐ 'রোড ম্যাপ প্লানের' জন্য। 'রোড ম্যাপ' পরিকল্পনাতে 'Land for peace' তত্ত্বের জোরালো সমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে উভয় অঞ্চলের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অবৈধভাবে ভূমি দখল ও তার প্রতিশোধ কার্যক্রমকে রুখতে 'land for Peace' এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উল্লেখ রয়েছে। এ ধরণের প-্যান খুবই আশাপ্রদ ও যুগোপযোগী। এই পরিকল্পনাতে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনকে পরস্পর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও জনতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এরা উভয়ে পরস্পর মিলে মিশে বসবাস করবে এবং একে অন্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করবে।

প্রথম দিকে প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং ইসরাইল ফিলিস্তিনিরা যেভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত তাতে ভবিষ্যতে উভয় দেশে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাই তাদের এই ধ্বংশাত্মক পথ পরিহার করে শান্তিড়র ছায়ায় আসার জন্য এ প-্যানে জোরালোভাবে আহবান জানানো হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাইল সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে তৈরী একটি রাষ্ট্র। ক্রমে এটি ভিন্নরূপ ধারণ করে বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। তাই এর শক্তিকে ঘৃণা করার বদলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। এভাবে আশেপাশের

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রগুলো দ্বারা আন্তরিকভাবে সমর্থিত হলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত অনেকটা হ্রাস পাবে বলে চিন্তাশীলদের ধারণা করেছিলেন।

মানবজীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাবক হিসাবে ধর্মকে উল্লেখ করা যায়। যে কোন মানুষ জন্মের প্রারম্ভিক ও পরবর্তী সময় থেকে ধর্মীয় আদব নির্দেশের গন্ডীর ভিতর থেকে বড় হতে থাকে। তাই এই ধর্মীয় অর্থাৎ ধর্মের প্রতি দুর্বলতার প্রবণতা বলতে গেলে বেশ সহজাত। তাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন স্থান, ঘটনা, অবস্থা জনমনে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। জেরুজালেম হলো সমগ্র বিশ্বের যেন কেন্দ্রস্থল, তেমনি মুসলমান, ইহুদী প্রমুখ ধর্মের প্রাণ কেন্দ্র। সুতরাং এর গুরুত্ব প্রায় সকলের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যাকে নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূত্রপাত অতীতে অনেক হয়েছে এবং এখনও চলছে। তাই এই পবিত্র ভূমির গুরুত্বকে স্বীকার করে সকলের নিকট পবিত্র স্থান করে রাাখার প্রস্তাব আলোচ্য 'রোড ম্যাপ' এ রাখা হয়েছে।

সর্বপরি 'রোড ম্যাপ' পরিকল্পনা United Nations (UN), European Union (EU) United states of America (USA) ও Russia এই চারটি শক্তিশালী সংঘ ও রাষ্ট্রের মধ্যে গৃহীত হয়েছে। তাই এর বিরুদ্ধে উভয় দেশ থেকে তেমন কোন সমালোচনার অবকাশ নেই। ফলে এই পরিকল্পনাটি উভয় ভূখন্ডের জনগণকে একত্রে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করে দ্বন্দ্ব সংঘাতের পথ থেকে ফিরে আসতে কিছুটা হলেও চাপ প্রয়োগের মতো অবস্থারই সৃষ্টি করবে।

'রোড ম্যাপ' এর নেতিবাচক দিক ও সমস্যা

'রোড ম্যাপ' প্রক্রিয়ার প্রণেতারা এর মাধ্যমে দীর্ঘ ৫০ বছরের ইসরাইলী নির্যাতনের ঘৃন্য শিকার ফিলিস্তিনীদের যে কোন আত্মঘাতী ও অন্যান্য আক্রমন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাজারো নির্যাতনের শিকার ফিলিস্তিনীরা যখন প্রতিশোধের নেশায় জীবন বাজি রাখতে পরোয়া করছে না, কখন তাদের পক্ষে তা বন্ধ করা অত্যন্তকঠিন বলেই মনে হচ্ছে। ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের সাথে তিনমাসের যুদ্ধ বিরতির পরিকল্পনা করলে সেখানে তাদের অন্তঃবিরোধ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপগুলো হাজার হাজার বন্দীর মুক্তির শর্ত জোরালো ভাবেই জুড়ে দিচ্ছে।

এদিকে ইসরাইল ১৯৬৭ সালের পর থেকে যে সব ভূমি অবৈধ দখল করেছে তার প্রত্যাহারের কথা রয়েছে। কিন্তু তাও অত্যন্তকঠিন। ফিলিস্তিনীরা এটাকে স্বাগত জানালেও ইসলাইলীরা এখন পর্যন্তখুব সামান্য অংশই ফেরত দিয়েছে। সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তনে তারা বেশ নাখোশ। দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে ইসরাইল যে ফিলিস্তিনীদের উপর ব্যাপক ধ্বংশযজ্ঞ চালিয়েছে তার স্বাক্ষী পুরো বিশ্বই। তাই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পর পুনর্গঠন ও সংস্কার কাজে ইসরাইলের কাছ থেকে বড় অংকের খেসারত দাবী করা হতে পারে। আর তা প্রদানের মানসিকতা ইসরাইলের কর্তা ব্যক্তিবর্গের মাঝে খুব কমই পরিলক্ষিত হবার সম্ভাবনা বেশী।

অবৈধভাবে জমি দখল ও সেখানে স্থাপিত ইহুদী বসতি তুলে নেওয়ার বিষয় ইসরাইলের জন্য অত্যন্তচ্যালেঞ্জিং। যা শান্তিপ্রক্রিয়ার পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওয়েস্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে এটি আরও কঠিন। জাতীয় নির্বাচনের সময় এরিয়েল শ্যারন ও তার জোট দল সেখানে লোকজনের নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক প্রতিশ্রুত দেয়। কিন্তু রোড ম্যাপ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি শেরনকে তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতির উল্টো

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করতে হয় তাহলে জোটের অন্যতম দল National Religious Party (NRP) & Gosher Party কোয়ালিশন থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারে। তখন এরিয়েল শ্যারন এর জন্য তা হবে অনেক ঝুকিপূর্ণ, কেননা ঐ দল দুটির Knesset এর মোট ১২০ আসনের ৫৯ টি আসনে তাদের প্রাধান্য রয়েছে। ফলে শ্যারন Govt. পতন বরণ করতে বাধ্য হবে। তাই 'রোড ম্যাপ' ইসরাইলের পক্ষে পুরোমাত্রায় মানা খুবই অসম্ভব। স্বাধীন ফিলিস্তিন কায়েমের লক্ষ্যে 'ইন্তিফাদা' আন্দোলনের অন্যতম শরীক হামাস। আর এই সশস্ত্র সংগঠনটির উপর বাস্তব ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্বাস ও পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের তেমন কোন শক্তিশালী প্রভাব ছিলনা। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা ও আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন বলেন, 'বন্দী প্রায় ৬/৮ হাজার কমারেডদের মুক্তি দেয়া না হলে জঙ্গীরা অস্ত্র বিরতির ব্যাপারে অটল থাকতে পারে না। তিনি আরও বলেন, আমাদের ধৈর্য্যের সীমা আছে। বন্দী মুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনভাবেই এটিকে পাশ কেটে যাওয়া যাবে না'।[১০৫]

বছরের পর বছর ধরে হত্যা-নির্যাতনের শিকার ফিলিস্তিনীরা ভ্রাতৃ হত্যার চরম প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইসরাইলের সাথে তাই ক্ষমতার ভারসাম্য না থাকায় তারা বেছে নিচ্ছে Suicide Bombbing এর মত কর্মকান্ড। অন্য দিকে এ ধরনের বম্বিং বন্ধ না হলে Illegal Settlement সমস্যার সমাধান ইসরাইলের জন্য দুরূহ ব্যাপার। তাই 'রোড ম্যাপ' প্লান অনেকটা অনিশ্চয়তার আবর্তে দোদুল্যমান।

জেরুজালেমে চলমান প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীদের অত্যন্তআদরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মুসলমানদের। কেননা ধর্মীয় অনুভূতিতে একমাত্র ব্যাপকভাবে প্রভাবিত জনগোষ্ঠী হলো মুসলমান। যদিও সমগ্র মুসলমানদের মাঝে একতা না থাকার কারণে এখনও বিশ্বব্যাসী তা প্রত্যক্ষ করতে পারে নি। আর এই চরম অনুভূতির জন্যই ফিলিস্তিনীরা জেরুজালেমকে স্বাধীন ফিলিস্তিনের রাজধানী করতে বদ্ধপরিকর। তাই 'রোড ম্যাপ' শান্তিপ্রক্রিয়ার সফলতা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখিন।

একথা আজ প্রায় পুরো বিশ্বই অবগত সমগ্র বিশ্বে প্রভাব বিস্তারকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর শুরু হয় USA এর নতুন সাম্রাজ্য। Geo-Political কারণে মধ্যপ্রাচ্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। তাই USA তাদের মিত্র সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য শুরু থেকেই সক্রিয় । সেজন্যই ইসরাইলের ১৯৪৮ এর ১৪ মে স্বাধীনতা ঘোষণার এক ঘন্টার মধ্যেই USA প্রেসিডেন্ট কার্যত ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান করেন। এরপর থেকে তারা মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে জন্য ইসরাইলকে সর্বদিক থেকে সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে। তাদের বন্দৌলতে ইসলাইল এখন এটম বোমার অধিকারী । ফলে অনেকে মনে করেন বিশ্ব রাজনীতির পট বদলের জন্যই প্রেসিডেন্ট বুশের 'রোড ম্যাপ' প্লান। কেননা ব্যাপক সমালোচনা উপেক্ষা করে এবং উপযুক্ত কোন অভিযোগ ছাড়াই স্বাধীন মুসলিম দেশ ইরাকে হামলা করে তিনি বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। বিশ্ব জনগণের নজর ভিন্নদিকে টানতেই তার এ পরিকল্পনার অবতারণা বলেই সমালোচকদের ধারণা।

---

১০৫) দৈনিক প্রথম আলো, ১১ জুলাই,২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদী আরব দ্বন্ধ বিশেষ করে ইসরাইল ফিলিস্তিন সংঘাত দীর্ঘদিনের । ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতার দাবী শ্যারনে শক্তির দাপটের কাছে পরাভূত। তাই পূর্বের অসংখ্যা চুক্তি-আলোচনা যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে তাদের দ্বন্ধের অবসান কর স্বাধীনভাবে উভয়ের বসবাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে বুশ নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শান্তি প্রিয় নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন এবং USA সমস্ত বিশ্বে সুনাম অর্জন করতে পারবে।

স্বাধীন ইরাক আক্রমনের পূর্বে যে সমস্ত অভিযোগ দাঁড় করানো হয় সেগুলো যুদ্ধের পরও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বুশ ও বে-য়ার সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। শুধু দেশের বাইরে নয় দেশের ভিতরেও তারা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সম্মুখিন।

এরূপ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্য এই অসময়ে ইরাক যুদ্ধের চুড়ান্তশেষ না করেই তার শান্তিপ্রিয়তার আবহ তৈরী করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারেক শামছুর রেহমান উল্লেখ করেন ইসরাইলের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেও ইসরাইল কখনও তার একগুয়ে মনোভাব পরিত্যাগ করেনি। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩০৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইলের অধিকৃত আরব এলাকা ফিরিয়ে দেবার কথা। কিন্ত ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের সে সিদ্ধান্তকখনও কার্যকর করেনি। অথচ ১৯৯১ সালে ইরাকের ব্যাপারে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকার্যকর করার জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠান হয়েছিল ও ইরাককে বাধ্য করা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তমানতে। আর এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল আমেরিকা প্রশাসন। একই সাথে ইহুদিবাদকে 'বর্ণবাদ' বলে যে সিদ্ধান্তজাতিসংঘে গৃহীত হয়েছিল, ১৯৯২ সালে সেই প্রস্তাব বাতিল ঘোষণা করে আমেরিকা প্রশাসন জাতিসংঘে নতুন প্রস্তাব এনেছিল এবং জাতিসংঘে তা গৃহীতও হয়েছিল। অথচ আমেরিকা প্রশাসন কখনও ইসরাইলকে বাধ্য করেনি কিংবা জাতিসংঘ ইসরাইলকে বাধ্য করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি আরব এলাকা ফিরিয়ে দিতে। ইসরাইলের ভূমিকার কারণে ফিলিস্তিনীদের মাঝে ইসরাইল বিরোধী জনমত দিনে দিনে বাড়ছিল।[১০৬] এরূপ অবস্থায় ওআইসির সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠি এবং জাতিসংঘকে অনুরোধ জানালেও তা কার্যকরী হয়নি।

৬.২.৪. আরাফাত-পরবর্তী ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর (নভেম্বর, ২০০৪) ফিলিস্তিনি পার্লামেন্টের স্পিকার রাওহি ফাতুহ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আব্বাস পিএলও প্রধান ও ফারুক কাদুমি আল ফাত্তাহর প্রধান হিসেবে দায়িত প্রাপ্ত হন। ইতোপূর্বে এই তিনটি দায়িত্ব আরাফাত একই পালন করতেন। আরাফাত অতিরিক্ত আরেকটি দায়িত্ব পালন করতেন, তা হচ্ছে নিরাপত্তা বিষয়টি। এ বিষয়টি আরাফাত তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন।

---

১০৬) তারেক শামসুর রেহমান, *বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর*, ঢাকা,২০০৮, পৃ.১৬৭-১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়টি আরাফাত তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। এমনও জানা যায়, মাহমুদ আব্বাসকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করলেও আরাফাত নিরাপত্তা বিষয়টি মাহমুদ আব্বাসের হাতে অর্পন করতে রাজি ছিলেন না। যে কারণে মাহমুদ আব্বাসকে পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।[১০৭]

আরাফাতের মৃত্যুর পর ৯ জানুয়ারি (২০০৫) খ্রীঃ ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন[১০৮] অনুষ্ঠিত হয়। পিএলও মাহমুদ আব্বাসকে তাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু জঙ্গিরা মাহমুদ আব্বাসকে সমর্থন করেন নি। মাহমুদ আব্বাস পরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। আরাফাতের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে তিনি জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। যদিও হামাস ও ইসলামিক জিহাদ[১০৯] আরাফাতের কিছু নীতির বিরোধীতা করেছিল। আরাফাতের মৃত্যুর পর এ দুটি সংগঠন আবার তৎপর হয়েছে। তারা প্রকাশ্যেই বলছে, আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে। এ দুটি সংগঠন ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষেরও সমালোচনা করেছে। নির্বাচনে হামাস প্রার্থী দেয় (১৯৯৬ সালের ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হামাস অংশ নেয়নি, বয়কট করেছিল নির্বাচন) এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে হামাস নির্বাচনে বিজয়ী হয়।

কিন্তু আরাফাত তার ক্যারিশমা দিয়ে যেভাবে ফিলিস্তিনী কট্টরপন্থিদের একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনেছিলেন, মাহমুদ আব্বাসের পক্ষে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। মাহমুদ আব্বাস পিএলও প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর আততায়ীরা রামাল্লায় তার ওপর গুলিবর্ষণ করে। এর অর্থ পরিষ্কার, ফিলিস্তিনী আন্দোলনের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ রয়েছে। আগামীতে ইসরাইলের সঙ্গে যে কোন আলাপ-আলোচনায় অথবা তথাকথিত 'রোডম্যাপ' বাস্তবায়নে এই বিভেদ একটি বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। পিএলওতে কট্টরপন্থিরা আবার প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। অনেকেরই মনে থাকার কথা, পিএলও গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। কিন্তু কট্টরপন্থিদের একটি গ্রুপ ১৯৬৭ সালে আহমেদ সুকারিয়াকে পিএলও'র নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে। আর কট্টরপন্থিদের মুখপাত্র হিসেবে তখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসেন ইয়াসির আরাফাত। আরাফাত ছিলেন আল-ফাত্তাহ উপদলের প্রধান। ১৯৬৫ সালে আল-ফাত্তাহ ইসরাইলের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনার জন্য গঠন করে তাদের সামরিক শাখা 'আসিফা' এবং 'আসিফা'র উদ্যোগে পরিচালিত হয় 'ফেদাইন' বা কমান্ডো আক্রমণ।১৯৬৯ সালে ফিলিস্তিন ন্যাশনাল কাউন্সিলের কায়রো সম্মেলনে ফাত্তাহ গ্রুপ পিএলওর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে এবং আরাফাত নির্বাচিত হন পিএলওর এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে। আল-ফাত্তাহ সত্তর দশকের প্রথম দিকে বিমান হাইজ্যাক করে তা বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিত। কালের পরিক্রমায় পিএলও তাদের কঠোর মনোভাব পরিত্যাগ করে।

---

১০৭) তারেক শামছুর রেহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪১

১০৮) সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী ফিলিস্তিনে আরাফাতের মৃত্যুর কারণে ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১০৯) ইসলামিক জিহাদঃ ইসলামিক জিহাদ সুশিক্ষিত আরবদের একটি সংগঠন। এটি ১৯৭৯-৮০ সালে মিশরে অধ্যায়নরত ফিফিস্তিনী ছাত্রদের দ্বারা গঠিত। ইসলামিক জিহাদ অসলো চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে। সংগঠনটির মহাসচিব হলেন রাসাদান আব্দুল্লাহ সালেহ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের নভেম্বরে ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে একহাতে পিস্তলের খালি খাপ ও অন্য হাতে জলপাই গাছের ডাল নিয়ে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতায় বলেছিলেন, ফিলিস্তিনী জনগণ শান্তিচায়। ১৯৮৮ সালে পিএলওর আলজিয়ার্স সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করা হয়।

দুঃখজনক হচ্ছে, ইসরাইল ১৯৯৩ সালের পর থেকে ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করলেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩০৮ নং প্রস্তাব অনুয়ায়ী ইসরাইল অধিকৃত আরব এলাকা ফিরিয়ে দেয়ার কথা। কিন্ত ইসরাইল সেই প্রস্তাবের ব্যাপারেও কোন সম্মান দেখায় নি। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে ২০০১ সালে ইসরাইলে উগ্র ডানপন্থি নেতা এরিয়েল শ্যারনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর। শ্যারন ক্ষমতা গ্রহণ করে ফিলিস্তিনী-ইসরাইলী সংলাপ বাতিল করে দেন। ফলে ফিলিস্তিনী এলাকায় শুর হয় ইন্তিফাদা বা গণঅভ্যুত্থান। পরিস্থিতির অবনতি ঘটে ২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর, যখন ইয়াসির আরাফাকে ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ বেথেলহেম শহরে বড়দিনের উৎসবে যোগ দিতে বাধা দেয়। আরাফাতের অফিসে বিমান হামলা চালাতেও ইসরাইল দ্বিধাবোধ করেনি। প্রায় তিন বছর যাবৎ আরাফাত ছিলেন তার অফিসে অবরুদ্ধ। তাকে রামাল্লার পিএলও'র সদর দফতরের বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। এক পর্যায়ে ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ তাকে তার সদর দফতর থেকে উৎখাত করে রামাল্লা থেকে বহিষ্কারেরও উদ্যোগ নিয়েছিল। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 'চাপ' এর মুখে ইসরাইল সেই প্রস্তাব আর বাস্তবায়ন করে নি। কিন্ত ইসরাইল তার আগ্রাসী নীতি অব্যাহত রেখেছিল। ২০০১ সাল থেকে চার বছরে ইসরাইল এক এক করে ফিলিস্তিনী নেতাদের টার্গেট করে তাদের হত্যা করছিল। আর পরিণতিতে ইসরাইলের অভ্যন্তরে বাড়ছিল আত্মঘাতী বোমা হামলা। এমনি এক পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের রোডম্যাপ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।[১১০]

আরাফাতের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-য়ারের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বুশ যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ। বুশ বলেছিলেন, ''আগামী চার বছরের মধ্যে স্বাধীন একটি ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করবে।''[১১১] বিষয়টি প্রেসিডেন্ট বুশ যত সহজভাবে বলেছেন তা তত সহজ নাও হতে পারে। বুশ কিংবা পশ্চিমা শক্তির উদ্যোগে যদি একটি তাঁবেদার ও ইসরাইল নির্ভর ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাতে ফিলিস্তিনী জনগণের সমর্থন থাকবে না। ফিলিস্তিনী জনগণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাস একদিনের নয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনী অধ্যুষিত আরব এলাকা বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে বৈরিতার জন্ম হয়েছিল আজ প্রায় ৬৪ বছর পরও তার কোন সমাধান হয়নি। পশ্চিমা শক্তিগুলো সেদিন জাতিসংঘকে ব্যবহার করে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। কিন্ত ফিলিস্তিনীরা তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার পর আজও তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি।

---

১১০) তারেক শামছুর রেহমান, ২০০৮, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট বুশের শাসনামলে তথাকথিত রোডম্যাপের কথা শোনা গেলেও, এই রোডম্যাপ ফিলিস্তিনী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এবং হয়তো এ কারণেই এটি বাস্তবায়িত হয়নি। বুশ প্রশাসন একটি 'স্বাধীন ফিলিস্তিনী' রাষ্ট্রের কথা বললেও সেখানে কোন আন্তর্জাতিক ছাপ ছিল না। বরং এটা প্রমাণিত হয়েছিল, শ্যারনের মতো বুশ প্রশাসনও চাননি আরাফাতকে সামনে রেখে এই রাষ্ট্রটি গঠিত হোক। বুশ প্রশাসনও আরাফাতের বিরোধী ছিল। ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একটি বাস্তব সত্য। এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না। আরাফাত এক সময় ছিলেন গেরিলা নেতা। যিনি হাতে বন্দুক নিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীতে তার উপলব্দি হয়েছিল শান্তির জন্য ইসরাইলকে মেনে নিতে হবে। তিনি তাই করেছিলেন কিন্ত সমর্থন পাওয়া যায়নি ইসরাইলের কট্টরপন্থি ইহুদিদের। রাবিন শান্তিবাদী ছিলেন। ১৯৯৫ সালে আততায়ীর হাতে রাবিনের মৃত্যুর পর 'দ্বিতীয় আরেকজন' রাবিন ইসরাইলে জন্ম নেয়নি। আর এ কারণেই শান্তিআন্দোলন বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সময় শ্যারনের নিষ্ঠুরতা কতটুকু চরমে ওঠেছে তার একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হ'ল।

(U.S Agency for International Development (US-AID) নামক মানবনতাবাদী প্রতিষ্ঠানের জরীপে বলেছে ফিলিস্তিনীদের পাঁচ বৎসরের নীচে শিশুদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন অপুষ্ঠিতে ভোগে। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগই নয়, যুদ্ধ, নৃতাত্বিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি মানুষ সৃষ্ট কারণেও দুর্ভিক্ষ হতে পারে। এ অধিকৃত ফিলিস্তিনী এলাকায় এই নীতিভ্রষ্ট কাজ চলছে একটা জাতির নাগরিকদের লক্ষ্য করে। প্রমাণ ইসরাইলি সেনাবাহিনী আরোপিত প্রধান প্রধান নাগরিক কেন্দ্রে অবরোধ স্থাপন। বিগত ২০ শে জুন ২০০৩-এ ইসরাইলি সৈন্যদের পুন: অবরোধের কারণে যা যা ঘটে চলেছে তা হচ্ছে অবরোধের ফলে ফিলিস্তিনী পরিবারগুলো দিনের পর দিন স্বগৃহে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। তারা কাজ করতে বা খাবার কিনতে যেতে পারে না। ডাক্তারের নিকট পেঁছুতে পারে না। বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। রাস্তায় অবরোধ বসিয়ে সামরিক চেক পয়েন্টগুলো খাদ্য চলাচলে এবং জনজীবনে স্বাভাবিক ব্যবস্যা বানিজ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকরা ফিলিস্তিনী নগরগুলির মধ্যে চলাচল করতে পারে না। ফলে মানুষ তার বঞ্চিত এবং ধার করা অর্থ খরচ করে জীবন ধারণ করছে। রিপোর্টটিতে আরও বলেছে যে, পশ্চিম তীরের এক চতুর্থাংশ মানুষের অন্ন সংস্থাপনের জন্য তাদের সহায় সম্বল বিক্রি করা শেষ ইতিমধ্যেই। বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্যে পাওয়া যায় ফিলিস্তিনিদের শতকরা ৬২ ভাগ মানুষ দৈনিক ২ ডলার উপার্জনে জীবন ধারণ করে।[১১২]

---

১১১) *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ নভেম্বর
১১২) আবু মোহাম্মদ মজহারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আরাফাত-পরবর্তী ফিলিস্তিনী রাজনীতি আরও জটিল হচ্ছে। পিএলও প্রধান মাহমুদ আব্বাসের হামাস ও ইসলামিক জেহাদের নেতাদের ইসরাইলে আক্রমণ না চালানোর অনুরোধ জানালেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফিলিস্তিনী নেতৃবৃন্দের পক্ষে এদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইসরাইলকে এটা উপলব্ধি করতে হবে, যুদ্ধ চালিয়ে গেলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা যাবে না। শান্তির জন্য চাই উদার মনোভাব। চাই রাবিনের মতো একজন নেতা, যিনি ওয়াশিংটনে আরাফাতের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর আগে। শ্যারন সেই ধরনের নেতা ছিলেন না। তার অসুস্থতার কারণে ইসরাইলে নয়া নেতৃত্ব ক্ষমতা নিয়েছে। তাদের সাথে হামাসের সহাবস্থান কীভাবে হয়, সেটাই দেখার বিষয় এখন। তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে এখন সিদ্ধান্তনিতে হবে। এক. স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ, দুই.জেরুজালেমের ভবিষ্যৎ, তিন. উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনীদের নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এই তিনটি বিষয়ে যদি কোন সমাধান না হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠিত হবে না।[১১৩]

৬.৩. আফগানিস্তান

১৯৭৯ সাল থেকে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলছে। এ গৃহযুদ্ধ মূলত দুটি পর্যায়ে রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের দ্বন্দ্ব মূলত সাবেক সোভিয়েত মতাদর্শে বিশ্বাসী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব বনাম বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের মধ্যকার। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতনের পরে আদর্শ তথা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। আফগানিস্তান ভৌগোলিক ও সামারিক দিকে দিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ মুসলিম দেশ। দেশটির এই গুরুত্বের প্রেক্ষিতে মূলত পরাশক্তির উপস্থিতির কারণে দেশটিতে গৃহযুদ্ধের সুচনা হয়। আফগানরা যোদ্ধা জাতি হিসেবে পরিচিত। তাদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ বন্ধে বিভিন্ন উদযোগ গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত স্থায়ী শান্তি অর্জিত হয়নি। তাই এশিয়া তথা বিশ্ব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আফগান সমস্যা একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১১৪]

---

১১৩) তারেক শামসুর রেহমান, পূর্বোক্ত, ২০০৮,পৃ.২৪৪
১১৪) আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সিঁড়ি বই বিতান, ঢাকা-২০০৯, পৃ.৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৫

একনজরে আফগান রাজনীতি

১৯৭৩	:	অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বাদশাহ জহির শাহের ক্ষমতা থেকে উৎখাত।
১৯৭৮	:	আফগানিস্তানে অভ্যুত্থান। তারাকি রাষ্ট্রপ্রধান। রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাফিজুল্লাহ আমিন কর্তৃক ক্ষমতাগ্রহণ।
১৯৭৯	:	সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কর্তৃক আফগানিস্তান দখল। বারবাক কারমালকে ক্ষমতায় বসানো হয়।
১৯৮০	:	আফগান সংকট নিরসনে ওআইসি'র প্রস্তাব। মুজাহিদিনদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।
১৯৮৫-৮৬	:	সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানে আফগান মুজাহিদিনদের জোট গঠন।
১৯৮৮	:	সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভ কর্তৃক সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তড়
১৯৮৯	:	ফেব্রুয়ারীতে সোভিয়েত সেনাদলের আফগানিস্তান ত্যাগ।
১৯৯২	:	কাবুলে ডা. নাজিবুল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত। মুজাহিদিনদের ক্ষমতা দখল। কিন্তু মুজাহিদিনদের মধ্যে অন্তড়্র্দ্বন্দ্ব।
১৯৯৩	:	জুমাহিদিনদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি। রাষ্ট্রপ্রধান বুরহান উদ্দিন রব্বানির ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি।
১৯৯৫	:	তালেবান বাহিনীর আত্মপ্রকাশ ও কান্দাহার দখল।
১৯৯৭	:	তেহরানে তালেবান বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত। রব্বানি ও দোস্তামের দেশত্যাগ।
১৯৯৮	:	তালেবানদের ক্ষমতা করায়াত্ত ও আফগানিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তালেবানদের হাতে।
২০০০	:	ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপ্রধান রব্বানির নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলীয় জোটগঠন।
২০০১	:	আফগান যুদ্ধ। তালেবানদের পতন ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতৃত্বাধীনে কাবুলে সরকার গঠন। হামিদ কারজাই প্রেসিডেন্ট।
২০০৫	:	নির্বাচনে হামিদ কারজাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত।
২০০৭	:	তালেবানদের উত্থান। সরকারকে চ্যালেঞ্জ।

উৎস ঃ তারেক শামসুর রেহমান এর বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বন তৈরী।

আফগান সংকট ত্বরান্বিত করণ এবং সমাধান করণ বিষয়ে এ সসম্যায় বিভিন্ন দেশের অবস্থান বিভিন্ন রকম। দেশসমূহের এ অবস্থানের উদ্দেশ্যেসমূহ নিম্নে আলোচিত হ'ল।

আফগান সংকটে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য

১. মুজাহিদিন গ্রুপগুলোকে সমর্থন করার পেছনে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক কারণ নিহিত আছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান ডুরান্ড লাইন বরাবর পূর্ব দিকের পশতুন উপজাতী অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিজের সীমান্তে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। আফগান শাসকরা নিজেরা পশতুভাষী হওয়ায় তারা কখনও এটাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাখতুনিস্তান নামের একটি স্বাধীন পশতুন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায়। এর ফলে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

২. আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে কমিউনিজমের প্রসার ঘটাতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সোভিয়েত ভূমিকা মুজাহিদিনদের পক্ষ অবলম্বনে সহায়তা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর মতে, জেনারেল জিয়াউল হক তার ক্ষমতাকে সংহত করা এবং একনায়তান্ত্রিক শাসন প্রলম্বিত করার উদ্দেশ্যে আফগান সংকটকে কাজে লাগাচ্ছিল।

৪. পাকিস্তানের ভারত বিরোধী ভূমিকা এবং এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিক সামরিক সরঞ্জাম পাবার আশায় আফগান সংকটকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[১১৫]

১৯৭৯ সাল থেকে আফগানিস্তান এশিয়া তথা বিশ্ব রাজনীতির একটি অন্যতম ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দেশটিকে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তি সমূহের সামরিক এবং কূটনৈতিক বিরোধ শুরু হয়। দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় এর জন্য দায়ী নয়। ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামরিক গুরুত্বই তাকে বিশ্বব্যাপী সামরিক এবং মতাদর্শগত বিরোধের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছে।[১১৬]

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ও স্বার্থ

যে সব উপাদানসমূহের কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে মুজাহিদিন দলগুলোর পক্ষে ভূমিকা পালনে বাধ্য করেছিল তা নিম্নরূপ ঃ

১. ইরানের শাহের পতন ও খোমেনীর মার্কিন বিরোধী মনোভাব আরব জগতে তার ভাবমূর্তি ও প্রভাব ম্লান করেছে। আফগানিস্তানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই ভাবমূর্তি আবার উজ্জ্বল করার আগ্রহী বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

২. আফগান সংকট ঘনীভূত রাখতে পারলে রাশিয়া বেকায়দায় থাকবে। এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাই নিঃসন্দেহে কাম্য।

৩. যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে আফগানিস্তানে বিদেশী সৈন্যর উপস্থিতির বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তির সমর্থক তৃতীয় বিশ্বের মনোভাবকে তারা আফগান পরিস্থিতির ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ব্যবহার করে লাভবান হবেন।

৪. আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের প্রভাবকে প্রসারিত করতে সচেষ্ট। আফগানিস্তানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব এবং রাশিয়ার সীমান্তে আক্রমণাত্মক মহড়ায় অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠবে। ভারত এবং চীনের ওপর নজর রাখাও সম্ভব হবে। তাই সে মুজাহিদিনদেরকে সমর্থন জানায়।

৫. আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতির অজুহাতে মার্কিন প্রশাসন ভারত উপ-মহাদেশে ভারত সোভিয়েত শক্তির বলিষ্ট প্রতিপক্ষ হিসেবে তৈরী করার জন্য পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদান করেছিল।

---

১১৫) পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৫
১১৬) নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬২৬

Dhaka University Institutional Repository

৬. যুক্তরাষ্ট্রের ভীতি যে, বিক্ষুব্ধ বেলুচিস্তান স্বাধীন হলে মস্কো ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগরে প্রভাব বিস্তার করবে। অন্যদিকে লিবিয়া এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের সহযোগিতায় পারস্য উপসাগর এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে। যদি তা হয় তবে জরুরী অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদেশগুলোতে তেল সরবরাহ বিঘ্নিত হবে।[১১৭]

৭. বৈদেশিক (পাশ্চাত্য) সহযোগিতা ব্যতীত আফগান মুজাহিদিনগণ রক্ষক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান থেকে দখলদার রুশ আগ্রাসন বাহিনীকে বিতাড়িত করা ছিল অসম্ভব। অবশ্য এর জন্য দীর্ঘ দশ বছর তাদের ধৈর্য ধারণ এবং আত্মহুতি দিতে হয়। অবশ্য মিশর, সউদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য অব্যহত ছিল। এ কারণে অনেক সমালোচক আফগান রুশ যুদ্ধকে ছায়া যুদ্ধ (Shadow war) বলেছেন। এ প্রসঙ্গে চীনও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে আফগানদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। আফগানদের সহযোগিতা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে সমঝোতায় আসে। আমেরিকার সি আই এর মাধ্যমে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যুদ্ধের জন্য সউদি আরব জেহাদ ফান্ডে অনুদান দেয়।[১১৮]

সাবেক সোভিয়েতের ভূমিকা ও মনোভাব

আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠানোর প্রশ্নে মস্কো তার দিক থেকে বরাবর নিজের অবস্থানকে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্ট করেছে।

১. তার মতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও বহিঃশক্তির আক্রমণ আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিল এবং দক্ষিণ সীমান্তবর্তী দেশটি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল যা পরিণামে সোভিয়েত নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারতো।

২. ইরানের ইসলামী বিপ্লব অর্থাৎ মৌলবাদের প্রভাব যাতে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট প্রজাতন্ত্রগুলোতে বিস্তার ঘটিয়ে তার অখন্ডতার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সে আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠায়।

৩. খন্দকার আবদুল হামিদ 'আফগানিস্তান সোভিয়েতের ভিয়েতনাম প্রবন্ধে লিখেছেন যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ সফল হলে পাকিস্তান হিন্দুস্থনাসহ দক্ষিন এশিয়ায় এবং ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনায়াসে তার প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে পারতো।

---

১১৭) আব্দুল লতিফ খান, পুর্বোক্ত, পৃ.৩০৬

১১৮) অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব তুরস্ক ইরান আফগানিস্তান*, ঢাকা-২০১২, পৃ.৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. তাছাড়া এমনিতেই দেখা যায় বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের আপন এলাকার চারপাশে কোন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সরকার বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না। মস্কোর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।[১১৯]

৫. আসল কথা হলো আফগানিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ হয়। সে কারণে দেখা যায় যে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট, চেঙ্গিসখানসহ বহু যুদ্ধবাজদের দ্বারা আফগানিস্তান বার বার আক্রান্ত হয়েছে। ইংল্যান্ড, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রও এ দেশটি আক্রমন করে।[১২০]

সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক প্রয়াস

ওআইসি ১৯৮০ সালে ২৭-২৯ জানুয়ারী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত (ওআইসি) এর বিশেষ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে আফগান সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মুজাহিদিন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আলোচনার প্রস্তাব করেছিল। কিন্ত আফগানিস্তানের নিকট তা অগ্রহণযোগ্য ছিল।[১২১] ওআইসির প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে আফগানিস্তানকে অনেক মাশুল দিতে হয়। যে কারণে আজও আফগানিস্তান পরিপূর্ণ স্বাধীন হয়নি।

অবশেষে আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে ১৯৮৮ সালের ১৪ এপ্রিল জেনেভায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তান একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। এই পাঁচটি অংশে যে সব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তা হলো ঃ

১. পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে একে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার;
২. পাকিস্তান থেকে ৩০ লক্ষ এবং ইরান থেকে ১৫ লক্ষ আফগান শরণার্থীর স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন;
৩. এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি;
৪. সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার এবং
৫. আফগানিস্তানে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক ব্যবস্থা সম্পর্কে এক নতুন সমঝোতা স্মারক।[১২২]

---

১১৯) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৭
১২০) তারেক শামসুর রেহমান, *বিশ্ব রাজনীতির-১০০ বছর*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা-২০১০, পৃ.১৯৩
১২১) আব্দুল লতিফ খান, পুর্বোক্ত, পৃ.৩০৮
১২২) পূর্বোক্ত, পৃ.৩১০

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনকে[১২৩] গ্রেফতার ও তালেবানদের ক্ষমতা থেকে উৎখাতের লক্ষ্যে গত ৭ অক্টোবর (২০০১) সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলার মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধের শুরু হয়েছিল, তার শেষ হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর (২০০১) আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কান্দাহার পতনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু নতুন করে সেখানে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তালেবানরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে এখন হামিদ কারজাই সরকারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করছে। এই প্রথমবারের মতো ইউরোপের বাইরে আফগানিস্তানে ন্যাটোর সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু ন্যাটোর সেনাবাহিনী তালেবানদের সাথে পেরে উঠছে না। বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে তারা হেরে যাচ্ছে। এমনি এক পরিস্থিতিতে তালেবানদের সাথে কারজাই একটি 'সংলাপ' এর উদ্যোগ নিলেও তা জট খুলছে না। আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তালেবানরা সংগঠিত হওয়ায় এখন আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে।[১২৪]

৬.৪. ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া মুসলিম প্রধান বৃহৎ রাষ্ট্র। ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। দেশটিতে ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে সুহার্তোর পতনের পর যারাই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তারা কেউই স্থায়িত্ব পাননি। একমাত্র ব্যতিক্রম সুশিলো ইয়োধোয়েনো। তিনি ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হন। সুহার্তোর পতনের পর ১৯৯৯ সালে সেখানে গণকংগ্রেস কর্তৃক যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বিজয়ী হয়েছিলেন আবদুর রাহমান ওয়াহিদ। মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী ওই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াহিদ তাকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরে মেঘবর্তী ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ওয়াহিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যাবহার ও অযোগ্যতার অভিযোগ উঠলে, ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট গত ১ ফেব্রুয়ারি (২০০১) তাঁকে তিরস্কার করে। পার্লামেন্ট তাঁকে 'ইমপিচ' করার উদ্যোগ নিলে ওয়াহিদ পদত্যাগ করেন এবং ২৩ জুলাই (২০০১) মেঘবর্তী নয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেন।[১২৫]

তিনি বিরুদ্ধে দলে থাকা অবস্থায় পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার বিষয়ে বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় মতামতের অবস্থায় সমস্যার পড়েন। যাহোক তৎকালীন ব্যবস্থা অনুযায়ী ৬ জাতি গ্রুপের[১২৬] আওতাধীন গনভোটের ফলাফল তিনি মেনে নেন। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান এ জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১২৭]

---

১২৩) ওসামা বিন লাদেন- আল কায়েদার নেতা, যুক্তরাষ্ট্রের তালিকাভূক্ত এক নম্বর সন্ত্রাসী।

১২৪) তারেক শামসুর রেহমান, ঢাকা-২০০৮, পৃ-১৫৮

১২৫) পূর্বোক্ত, ঢাকা-২০০৮, পৃ,১৬০.

১২৬) ৬ জাতি গ্রুপ ঃ ১৯৭৫ সালে পূর্ব তিমুর থেকে পর্তুগিজরা চলে যাওয়ার পর ১৯৭৬ সালে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপটি দখল করে ২৭ তম প্রদেশ ঘোষনা করে। পরবর্তীতে স্বাধীনতার প্রশ্নে এখানে আন্দোলন শুরু হলে ১৯৯৯ সালে গণ ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। জাতিসংঘের উদোগে উক্ত গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ৬ জাতি গ্রুপ গঠিত হয়। এ ৬ জাতি হলো, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, জার্মান, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র (সুত্র-তারেক শামসুর রেহমান, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি)

১২৭) The ASian Age, Calculta, October 19, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা করা হয়েছিলো এর ফলে সেখানে সহিংসতার অবসান হবে। অথচ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও সেখানে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পরও সেখানে ২০০১ সালেই ৪৩২ জন লোক নিহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯ ডিসেম্বর (২০০০) ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ওয়াহিদ আচেহ প্রদেশ[১২৮] সফর করেছিলেন। ওই সফরকালে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তিআলোচনা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্ত তা সত্ত্বেও আলোচনা আর অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি মেঘবর্তী সুক্ষমতাসীন হবার পর বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিষয়টি ইন্দোনেশিয়ার জন্য সুখকর নয়। ইরিয়ান জায়ারে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলনের পেছনে খ্রিষ্ট্রীয় ধর্ম প্রচারকদের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে।[১২৯]

ওআইসির মহাসচিব হামিদ আল গাবিদ ইন্দোনেশিয়া সফর করেন এবং সমস্যাটি আভ্যান্তরীন উল্লেখ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।[১৩০] কিন্ত কে কার কথা শুনে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা পুর্ণ স্বাধীনতা চায়। আচেহ প্রদেশে ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ের মতো পরিস্তিতির উদ্ভব হতে পারে। ফিলিপাইনের সরকারকে গত ৩০ বছর ধরে মুসলিম জঙ্গিদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে আচেহ প্রদেশে। এখানেও মুসলিম জঙ্গিরা তৎপর। সাম্প্রতিক সময়ে মালুকু প্রদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের খবরও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মালুকু প্রদেশের দুটি বড় শহর মাসাসারে ও উজং পানদাংয়ে সাম্প্রতিক সময়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তেল গ্যাসের পাশাপাশি এ অঞ্চলে ইউরেনিয়ামের রয়েছে। পারমানবিক বোমা তৈরীতে এই ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইউরেনিয়ামের ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তিগুলোর যে আগ্রহ থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দেনেশিয়া যদি অদুর ভবিষ্যতে ভেঙ্গে যায় এবং পুর্ব তিমুরের মতো বেশকিছু ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাহলে সেসব দেশে পশ্চিমা শক্তির প্রভাব বাড়বে। এতে করে এ অঞ্চলে একুশ শতকে ইন্দেনেশিয়ার যে অন্যতম একটি শক্তি হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে সম্ভাবনা আর থাকবে না।

---

১২৮) আচেহ প্রদেশ ঃ আচেহ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ যা উত্তর সুমাত্রার একটি দ্বীপ। এর রাজধানীর নাম বান্দা আচেহ। তেল, গ্যাস, তামা ও বারারসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এ প্রদেশ। ইন্দোনেশিয়া মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে শতকরা ৩০ ভাগ আসে আচেহ প্রদেশের তরল গ্যাস থেকে, কিন্ত তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের জনগণ দরিদ্র। এখানকার জনগোষ্ঠি অনেকটা কট্টরপন্থী মুসলমান। প্রদেশটির প্রেসিডেন্ট সূকর্নয় শাসনামল থেকে ''বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করে আসছে। কিন্ত সেখানখার জনগণ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম আসছে। এ সংগ্রাম পরিচালনা করছে 'ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট' নামক সংগঠন। সূহার্তোর পদত্যাগের পর আচেহ প্রদেশের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এ বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৯৯ সালের ৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতা ঘোষনার হুমকি দেয়। ইন্দোনেশিয়ার সরকার স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাখ্যান করে। তবে সেখানে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব পেশ করে (আব্দুল লতিফ খান, পুর্বোক্ত)।

১২৯) তারেক শামসুর রেহমান, ঢাকা-২০০৮, পৃ.১৬৭

১৩০) www.oic.oci-org.com. (প্রেস রিলিস)

পূর্ব তিমুরের বাইরে ইরিয়ানা জায়া আচেহ মালুকু কিংবা কালিমান্তান ও সুলাভেসি ইন্দোনেশিয়ার যেকোন প্রদেশের কথাই বলা হোক না কেন এখানে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক ভিত্তি এত শক্তিশালী নয় যে স্বাধীন দেশ হিসেবে এই প্রদেশগুলো দাঁড়াতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে পশ্চিমা শক্তিগুলো বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি এদের নির্ভরতা বেড়ে যাবে। ফলে হয়তো তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জিত হবে। কিন্ত মূল ক্ষমতা থেকে যাবে অষ্ট্রেলিয়ার হাতে। এ অঞ্চলে জনগণের মঙ্গল এতে নিশ্চিত হবে না। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ব তিমুর তথা এ অঞ্চলের তেল গ্যাসের ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তির আগ্রহ আগামী দিনে এ অঞ্চলে বড় ধরনের অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে।

৬.৫.ইরাক

ইরাকের রাজনীতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। এক সময় মনে করা হতো ইরাকের ক্ষমতা থেকে সাদ্দাম হোসেনকে সরিয়ে দিতে পারলেই ইরাক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই ধারনা এখন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ইরাকে অস্ট্রেক্তিক আগ্রাসন, এমনকি সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিয়েও ইরাক সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। এক সময় ছিল যখন মার্কিন জনমত ইরাক আগ্রাসনের পক্ষে ছিল। ইরাক দখল করে নেয়ার চার বছর পরও ইরাকে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়নি। বরং পরিস্থিতি সেখানে দিনে দিনে অবনতির দিকে যাচ্ছে।

২০০৮ সালে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন সাবেক চীফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ জেনারেল স্যার মাইক জ্যাকসন বলেছিলেন, মার্কিন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, মার্কিন বাহিনী 'জাতি গঠনের কাজ করে না' বলে রামসফেল্ড যে মন্তব্য করেছেন তা অর্থহীন। এছাড়াও তিনি সাদ্দাম হোসেনের উৎখাতের পর ইরাকি সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্তকেও অদূরদর্শী হিসেবে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমদের উচিত ছিল ইরাকি সেনাবাহিনীকে আগের অবস্থাতেই রেখে তাদের যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। ইরাকে ব্রিটিশ বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযোগ করেছে তাও নাকচ করে দেন তিনি। এমনিতেই ইরাক পরিস্থিতি নাজুক। শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব ও এদের মধ্যে দাঙ্গা খোদ ইরারেক রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। পুলিশ বাহিনীর অনেকেই এখন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। যে কারণে সেপ্টেম্বর মাসে (২০০৭) প্রধানমন্ত্রী নূরি আল মালিকী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৪ হাজার কর্মকর্তা কর্মচারিকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন। এ থেকে বোঝা যায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে পুলিশ বাহিনী দরকার, সরকার সেই পুলিশ বাহিনী গত চার বছরেও গঠন করতে পারেনি।[১৩১]

---

১৩১) তারেক শামসুর রেহমান, ঢাকা-২০০৮, পৃ.২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের তেলের মওজুদের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য এগিয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্বে রয়েছে বিশ্বের মোট মওজুদের ৫৫ শতাংশ। মধ্যপ্রাচ্যের যে কয়টি দেশ এই তেল সম্পদের মালিক তারা হচ্ছে নিম্নরুপ।[১৩২]

সরণি-১৬
বিশ্বে তেলের মওজুদ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	তেলের মওজুদ	বিলিয়ন (ব্যারেল)
১	সৌদি আরব	২৫৯	(২৪%)
২	ইরাক	১১৩	(১১%)
৩	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯৮	(৯%)
৪	ইরান	৯০	(৯%)
৫	কুয়েত	৯৪	(৯%)
৬	ভেনিজুয়েলা	৭৩	(৭%)
৭	মেক্সিকো	৪৮	(৫%)
৮	রাশিয়া	৪৮	(৫%)
৯	যুক্তরাষ্ট্র	২৩	(২%)

সুত্র ঃ তারেক শামসুর রেহমান

তেলের মওজুদ থেকে মধ্যপ্রাচ্য কিংবা ইরাকের গুরুত্ব স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে ওঠে। আন্তজাতিক তৈল ব্যবসা প্রধাণত কয়েকটি বৃহৎ বানিজ্য সংস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও ক্ষমতাশালী সাতটি সপ্তভগ্নী [১৩৩] নামে পরিচিত।[১৩৪] বাহ্যিক যাই থাকুক আভ্যান্তরীন কারণ যে 'তৈল' তা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে ইরাকের রাজনীতি ক্রমশই এক ধরনের অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন হামলা ও ইরাক 'দখল' হয়ে যাবার পর ইরাকিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার লক্ষ্যে যেসব কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, তার কোনটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। ইরাকিদের হাতে সার্বভ্যৌমত্ব ফিরিয়ে দেয়ার পর সেখানে সংবিধান প্রণয়ন করার লক্ষ্যে একটি নির্বাচন হয়েছিল। সরকারও গঠিত হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। সরকারে প্রথমবারের মতো একজন কুর্দিনেতা সে দেশের প্রেসিডেন্ট হন। তার নাম জালাল তালাবানি। একজন শিয়া নেতা নূরি আল মালিকী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয় এবং তারা একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। আর সেই সংবিধানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ১৫ অক্টোবর (২০০৫) সালে সেখানে সাংবিধান প্রশ্নে একটি গণভোগ অনুষ্ঠিত হয়।

---

১৩২ তারেক শামসুর রেহমান, ঢাকা-২০১০, পৃ.১৭৫

১৩৩) সপ্তভগ্নী ঃ এদের ক্ষমতার পরিধি এবং বিভিন্ন দেশের রাজনীতির উপর এদের প্রভাবের কথা চিন্তা করলে 'সপ্ত ড্রাগন' নামই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এগুলো হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক্সন, টেক্সাকো, ষ্ট্যান্ডার্ড ওয়েল অব ক্যালির্ফোনিয়া, মবিল এন্ড গালফ, ওলন্দাজ ও বৃটিশ যুক্ত মালিকাধীন 'রয়্যাল ডাচ' শেল এবং বৃটিশ মালিকানাধীন, বিট্রিশ পেট্রোলিয়াম, (বি.পি) (বিস্তারিত দেখুন Anthony ampson, The Seven Sister, Holdder and Stougton, London, 1975

১৩৪) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (দ্বিতীয় খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০০, পৃ.৪৭৯

Dhaka University Institutional Repository

কিন্ত সুন্নি সম্প্রদায় এই সংবিধান ও গণভোটের বিরোধিতা করেছিল। আর কুর্দি ও শিয়ারা এই সংবিধান সমর্থন করেন। সুন্নিরা মুলত তিনটি বিষয়ে তাদের আপত্তি জানিয়েছিল। এই তিনটি বিষয় হচ্ছে ফেডারেল শাসনব্যবস্থা, বাথ পার্টির গ্রহণযোগ্যতা ও সরকার কাঠামো।[১৩৫]

২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে বুশের ইরাক নীতি ছিল ভুল। বুশ প্রশাসন সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি নিশ্চিত করে ইরাক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্ততা সহজে হবে বলে মনে হয় না। মৃত সাদ্দাম হোসেন ইরাকের বর্তমান রাজনীতিকে খুব একটা নিয়ন্ত্রণ করেন না। যদিও সুন্নিদের মাঝে তার কিছুটা প্রভাব রয়েছে। এখন ইরাকের রাজনীতি মূলত গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে। যাদের বাহ্যত কোন সুস্পষ্ট রাজনীতি নেই। এদের উদ্দেশ্য একটাই, ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার। কিন্ত দু:খের বিষয় হলো এ বিষয়ে ওআইসি বক্তৃতা-বিবৃতি ব্যাতীত কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নি।

৬.৬. ইরান-ইরাক যুদ্ধ

ইসলামী উম্মার আদর্শ বিচ্যুতির ইতিহাসে যে ক'টি আত্মঘাতি সংঘাতের উল্লেখ রয়েছে ইরান-ইরাক যুদ্ধ তার মধ্যে একটি উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন। পশ্চিম এশিয়ার তেল সমৃদ্ধ দু'প্রতিবেশী ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ইরান-ইরাক দীর্ঘদিন এ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ যুদ্ধ 'উপসাগরীয় যুদ্ধ' নামেও পরিচিতি। ১৯৮০ সালের ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর এর মধ্যবর্তী রাত্রে ইসরাইলী কায়দায় ঝটিকা আক্রমনের মাধ্যমে ইরাক উপসাগরীয় যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরান-ইরাক যুদ্ধই হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। শাতিল আরবের তীরে দজলা ফোরাত বা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিশ নদীর জলপথ ভাগাভাগি নিয়ে এ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। রক্তক্ষয়, লোকক্ষয়, অর্থক্ষয়, সম্পদ ক্ষয়ের এ লড়াই দীর্ঘ ৯ বছর পরে শেষ হয়।[১৩৬]

যুদ্ধের কারণ হিসেবে ভিন্ন একটি মতামতও পাওয়া যায় ভারতের লেখক নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ উল্লেখ করেন- এই যুদ্ধের পটভূমিরূপে সত্তরের দশকের শেষভাগে ইরাক-ইরান সম্পর্কের তিক্ততার বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৭৯-র ১৬ জানুয়ারী ইরানের শাহ মুহাম্মদ রেজা পাহ্লভির সাঁইত্রিশ বছরের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে। আয়াতোল্লা খোমেইনীর নেতৃত্বে ইসলামিক মৌলবাদী চিন্তাধারা ইরানের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটায়। সীমান্ত-বিরোধকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্ত তাৎক্ষনিক কারণ হিসাবে ১৯৭৮-৭৯-তে ইরানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করা যায়। ইরানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী ইরাকের কাছে ভীতির কারণ ছিল। কারণ খোমেইনীর ভাবধারা ইরাকের অভ্যন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, এই ধরনের আশাংকা ছিল। অন্যদিকে ইরান ইরাকের সম্মুখে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

---

১৩৫) তারেক শামসুর রেহমান, ঢাকা-২০০৮, পৃ.২৪৬-২৪৭
১৩৬) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন-এর ধারণা ছিল যে, খোমেইনীর ধর্মান্ধতার প্রসার প্রতিরোধ এবং ইরানের নতুন সরকারের যদি পতন ঘটান যায় তাহলে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরাকের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।[১৩৭]

সফিউদ্দিন জোয়ারদার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন 'সীমান্ত প্রশ্নে ইরাকের সহিত সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে' [১৩৮]নিম্নের সারনিতে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো।

সরণি-১৭

ইরান ইরাক যুদ্ধের ঘটনাবলী যেগুলো যুদ্ধের জন্য দায়ী

(১) ১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে লেবাননে ইরাকি রাষ্ট্রদূত এক বক্তৃতায় ইরাক সরকারের তিনটি দাবি পেশ করেন ঃ ১৯৭৫ সালের চুক্তি বাতিল, ইরাক কর্তৃক ১৯৭১ সালের দখলকৃত আবু মুসা ও তানব দ্বীপসমূহ প্রত্যর্পণ এবং ইরানের বেলুচ, কুর্দ ও আবরদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দান।

(২) নভেম্বর মাসে বাগদাদ বেতার অভিযোগ করে যে, ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী তেহরানস্থ ইরাকি কূটনীতিবিদদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করিতেছে।

(৩) ডিসেম্বর মাসে ইরান অভিযোগ করে যে, ইরাকি বাহিনী কয়েকবার তাহার সীমানা লংঘন করিয়াছে।

(৪) ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে দুই দেশ স্ব স্ব রাষ্ট্রদূত দেশে ফিরাইয়া আনে।

(৫) এপ্রিল মাসে ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদী জাতিসংঘের মহাসচিবকে লিখিত এক পত্রে বলেন যে, জাতিসংঘের উচিত ইরানের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া দখলিকৃত উপসাগরীয় দ্বীপসমূহ ত্যাগে তাকে বাধ্য করা। ইহার পর পরই ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদিক কুতুবজাদাহ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ইরাকি সরকার সম্পূর্নভাবে 'সাম্রাজ্যবাদী ও জাইয়নবাদীদের' নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।

(৬) ঐ মাসেই ইরানের একটি তেল রক্ষণাগারে অগ্নিসংযোগ ঘটে এবং একটি বিস্ফোরণে আবাদান শোধনাগারে তৈল ও গ্যাস বহনকারী পাইপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইরান ইরাককে এই ব্যাপারে দায়ী করে।

(৭) এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে ইরানের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং খোমিনী ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে 'ইসলাম ও মুসলামানের শত্রু' আখ্যায়িত করিয়া তাহার উৎখাত কামনা করেন।

(৮) এই সময় ইরাক হইতে হাজার হাজার ইরাকি শিয়া ও কুর্দদের বহিস্কার করা হয়। তাহারা ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

(৯) জুলাই মাসের ৬ তারিখে সীমান্তের কয়েকটি স্থানেই সংঘর্ষ হয় এবং ইরাক এই সংঘর্ষে বিমানও ব্যবহার করে।

(১০) সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে সাদ্দাম হোসেন ও ইরাকি বা'য়ত দলের মুখপত্র 'আস-সাওরা' ঘোষণা করে যে, ইরাকি বাহিনী 'জাইন-ই-কাউস' এলাকা 'মুক্ত' করিয়াছে এবং ইরান স্বীকার করে যে, তাহার দুইটি ফ্যান্টম জঙ্গি বিমান গুলি করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছে।

---

১৩৭) নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৭৭-৬৭৮

১৩৮) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

(১১) সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে সংসদে এক বক্তৃতায় সাদ্দাম হোসেন একতরফাভাবে ১৯৭৫ সালের চুক্তিবাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মন্তব্য করেন যে, সমগ্র শাত-ইল-আরবের উপর ইরাকের সার্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পরই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়।

উৎস ঃ সফিউদ্দিন জোয়ারদার।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের কারণ

১.ঐতিহাসিক : ইরান-ইরাক বিরোধের শিকড় রয়েছে ইতিহাসের অনেক গভীরে। এতে আরব-অনারব, শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ২. দু'দেশের দীর্ঘ সীমান্ত বিরোধ ৩. মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ শক্তি হিসেবে ইরাকের আত্মপ্রকাশের. বাসনা ৪. বিপ্লবোত্তর ইরানের অস্থির অবস্থা ৫. বিপ্লবোত্তর ইরানের প্রতিকূল আন্তর্জাতিক অবস্থান ৬. ইরানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে রুশ উস্কানি ৭. উভয় দেশের নেতৃত্বে পারস্পরিক রেষারেষি ৮. খোমেনী কর্তৃক ইরানী বিপ্লব রপ্তানীর আহবান ৯. আরবীস্তান নিয়ে সংঘাত ১০. যুদ্ধের তাৎক্ষনিক কারণ।

যুদ্ধ বন্ধের জন্য শান্তির প্রয়াস

জাতিসংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, আরব লীগ, আসিয়ান ও সার্কসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ফোরাম এই যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। এই যুদ্ধ অবসানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যারা উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে (PLO)-এর চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত, সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমে, বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব মিঃ জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলারের নাম অগ্রগণ্য।[১৩৯]

নিরাপত্তা পরিষদ উভয় রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য আবেদন জানায়। কিন্ত উভয় পক্ষই সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। শুধু তাই নয়, ইরাক খুররাম শহর দখল করে। সাত-ইল-আরবের উপর অবস্থিত এই শহর ইরানের অন্যতম প্রধান বানিজ্য বন্দর। ইরাক ইরানের আবাদন বন্দরকেও অবরোধ করে।

১৯৮১-র সেপ্টেম্বর মাসে ইরানের প্রতি আক্রমনের ফলে ইরাক আবাদন থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। ডিসেম্বর মাসে ইরান সুসানগার্ড-এর নিকটবর্তী অঞ্চলের উপর হানা দেয়। ১৯৮২ সালে ইরানের ব্যাপক আক্রমনের ফলে ইরাকী বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ঐ বছর মার্চ মাসে ইরানের আক্রমণের ফলে ইরাকের তিন ডিভিসন সৈন্য নিহত এবং পনের হাজার সৈন্য বন্দী হয়। ইরান খুররাম শহর থেকে ইরাকী বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। তাছাড়া খুজেস্তান অঞ্চল থেকেও ইরাকী বাহিনী সরে যেতে বাধ্য হয়। জুলাই মাসে ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা এবং ইরাকী সরকারের পতনের পরিস্থিতি গড়ে তোলে। ফলে যুদ্ধের এলাকা আলর প্রসারিত হয়।

১৩৯) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিস্থিতির মধ্যে ইরাক বিরোধ মীমাংসার জন্য যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করে। ১৯৮২-র জুন মাসে ইজরায়েল লেবানন আক্রমন করে। নিজেদের যুদ্ধ বন্ধ এবং ইজরায়েলী আক্রমন বন্ধে লেবাননের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য ইরাক ইরানের কাছে প্রস্তাব দেয়। ইরানের অভ্যন্তর থেকে নিজের সেনাবাহিনী অপসারণের প্রস্তাবও ইরাক সম্মত হয়। ইরাক আরও প্রস্তাব দেয় যে, ইসলামিক সম্মেলন, সংস্থা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশ, আরব লীগ, গাল্‌ফ কো অপারেশন কাউন্সিলকে (GCC) বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হোক। ইরান ঐ প্রস্তাব[১৪০] প্রত্যাখ্যন করে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার উদ্দোগ

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ১৯৮১ সালে (২৫ জানুয়ারী) মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি শান্তি কমিটি গঠন করে। কিন্ত এ কমিটির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ১৯৮৩ সালে (এপ্রিল মাসে) ৪র্থ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে (যা বাগদাদে অনুষ্ঠিত হয়) যুদ্ধ বিরতি এবং অস্ত্র সংবরণের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি শান্তি কমিটি পুনরায় গঠন করে। সম্মেলনে ঘোষনা করা হয় যে, উভয় রাষ্ট্র যদি শান্তির আবেদনে সাড়া না দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করবে ; এবং তখণ পর্যন্ত (OIC) এ যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে অনেক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিল।[১৪১] গালফ সহযোগিতা পরিষদের উদ্‌যোগ ইরান ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে (Gulf Co-operation Council) যুদ্ধ বন্ধের জন্য উভয় রাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানায়। এ ছাড়াও (GCC) তার প্রতিটি বৈঠকে এই যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগ

জাতিসংঘ মহাসচিবের ৯ দফা প্রস্তাব, জাতিসংঘ মহাসচিব পেরেজ দ্য কুয়েলার ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে ১৯৮৭ সালে ৯ দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি ওই প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতিকালে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের কথা বলেন। যে দিন থেকে যুদ্ধ বিরতি হবে ঠিক তখন থেকেই আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে যার যার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিবে। নির্দিষ্ট তারিখে যুদ্ধ বিরতি তদারক করতে ও পরে সৈন্য প্রত্যাহার করতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের পাঠানো যেতে পারে এবং পরে তাদের সমস্যাবলী সমাধানে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো যেতে পারে। মহাসচিবের এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ইরান ইরাকের কাছে পাঠানো হয়। ইরাক রাজী হলেও ইরান এতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্ত ব্যাক্তিগতভাবে ইরান-ইরাক সফর করে দুই পক্ষকে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে রাজী করান। জাতিসংঘের মহাসচিবের উদ্‌যোগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে ৫৯৮ প্রস্তাবের মাধ্যমে ইরান ইরাক যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করে।

---

১৪০) নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ,৬৮০-৬৮১.
১৪১) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ,৩৫১.

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইরান ইরাক যুদ্ধ বিরতি পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ (United Nations Iraq-Iran Military Observer Group) বা সংক্ষেপে (Unimog) গঠন করে। ২৪টি দেশের সেনাবাহিনী থেকে (UNIMOG) এর সদস্যদের গ্রহণ করা হয়। যাহোক অবশেষে ইরান-ইরাক যুদ্ধ ১৯৮৮ সালের ২০ শে এপ্রিল সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে যুদ্ধ কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ হয়নি। কারণ দু'পক্ষই যুদ্ধ পুর্ববর্তী অবস্থান মেনে নিয়েছে।[১৪২]

ইরান ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব

সফিউদ্দিন জোয়ারদার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন 'সীমান্ত প্রশ্নে ইরাকের সহিত সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটায়' ইরান সরকার জিম্মি সমস্যা আর দীর্ঘায়িত না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খোমিনীর একজন আত্মীয় ও বিপ্লবী সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি সাদিক তাবাতাবায়ী সেপ্টেম্বর মাসে মন্তব্য করেন যে, একজন দায়িত্বশীল মার্কিন কর্মকর্তার সহিত জিম্মি সমস্যা আলোচনা করিতে তিনি আগ্রহী। তাহার এই মন্তব্য পশ্চিম জার্মান সরকার মার্কিন সরকারকে অবহিত করে। ইরানি কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য প্রেসিডেন্ট কার্টার সেপ্টম্বরের ১০ তারিখ মার্কিন আলোচনাকারী দলের নাম ঘোষণা করেন। পররাষ্ট্র দফতরের ডেপুটি আন্ডার-সেক্রেটারী ওয়ারেন ক্রিস্টোফারের নেতৃত্বে গঠিত এই দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন কার্টার অন্যতম উপদেষ্টা লয়েড কাটলার, সহকারী কোষাগার সচিব রবার্ট কারসওয়েল, পররাষ্ট্র দফতরের আইন উপদেষ্টা রবার্ট ওয়েন, নিকটপ্রাচ্য ও দক্ষিন এশিয়ার দয়িত্বে নিয়োজিত সহকারী পররাষ্ট্র সচিব হ্যারল্ড সন্ডার্স ও একজন ইরান-বিশেষজ্ঞ আর্নল্ড র‍্যাফায়েল। এই সময় তাবাতাবায়ী প্রকাশ করেন যে, খোমিনী জিম্মি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চারটি শর্ত আরোপ করেছেন ঃ (ক) শাহের সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটককৃত সমস্ত ইরানি সম্পত্তি মুক্ত ঘোষণা (গ) ইরানের বিরুদ্ধে সমস্ত দাবি দাওয়া পরিত্যাগ (ঘ) ইরানে রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ না করিবার ব্যাপারে মার্কিন প্রতিশ্রুতি।[১৪৩]

ইরান ইরাক যুদ্ধের প্রাথমিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। কারণ ইরানের সাথে ১৯৮০ সালে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্নরূপে ছিন্ন হয়। তবুও ইরাক এযুদ্ধে জয়লাভ করুক এটাই যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব। কারণ ইরানের জয় হলে উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অনেকখানি হ্রাস পাবে। এজন্য এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে। ১৯৮৭ সালের পর থেকে ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুবই খারাপ হয় এবং উপসাগরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটে অনেকবার।

যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে তার বন্ধু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকসহ সকল আরব রষ্ট্রকে সহায়তা করে।

---

১৪২) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫১
১৪৩) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি স্বার্থ

১৯৪৮ সালের ১১ জুন দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত মার্কিন সহকারী সচিব রিচার্ড মারফি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি মূল স্বার্থের কথা উল্লেখ করেন ঃ

১. পাশ্চাত্যদেশ সমূহের পেট্রোলিয়ামের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করা। ১৯৮৩ সালে এই অঞ্চলের তেলের ওপর পশ্চিম জার্মানীর ১৩%, ব্রিটেনের ১৪%, ফ্রান্সের ৩৬%, এবং জাপানের ৫৬% নির্ভরশীলতা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রও ব্যাপকভাবে এই অঞ্চলের তেলের উপর নির্ভরশীল ছিল।

২. রাশিয়া এবং ইরানকে প্রতিহত করা।

৩. পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

৪. আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক-ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটানো। যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে রাখার পক্ষপাতী। কারণ আরব রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বিবাদ পরোক্ষভাবে ইসরাইলকে শক্তিশালী করবে এবং তার স্বার্থকে সমুন্নত রাখবে।[১৪৪]

৬.৭.কাশ্মীর

অবিভক্ত ভারতের সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্য ছিল কাশ্মীর।[১৪৫] ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটেনের পার্লামেন্ট যখন ব্রিটিশ শাসনের অবসান করে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান এবং একে দ্বিখন্ডিত করে পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোষণা প্রদান করে তখন ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী অধিকাংশ রাজ্য ভারতের সাথে এবং কিছু কিছু পাকিস্তানের সাথে অঙ্গীভুত হয়। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা হরিসিংহ স্বাধীন থাকার মনোভাব গ্রহণ করেন এবং ভারত ও পাকিস্তানের সাথে স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার জন্য চুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই কাশ্মীরকে তাদের সাথে একীভুত হওয়ার জন্য মনস্তাত্বিক চাপের মধ্যে রাখে। কাশ্মিরের জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন খাদ্য সামগ্রী, লবন, কেরোসিন, পেট্রোল, ভোজ্য তেল ইত্যাদি পূর্ব থেকেই পাকিস্তান থেকে সরবরাহ হতো। কিন্তু পাকিস্তান হঠাৎ করে এরূপ জরুরী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাশ্মীরে সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্তিতে চাপ দিতে থাকে।

---

১৪৪) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫১

১৪৫. কাশ্মীর: এর আয়তন প্রায় ৮৫ হাজার বর্গমাইল। ১৯৪১ সালে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ যা বর্তমানে দেড় কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীরের তিনটি প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে ছিলো: কাশ্মীর প্রদেশ ৯৩%, জন্ম প্রদেশ ৬১% এবং গিলগিটে ৯৯.৫%। বিট্রিশ শাসনাধীনে ১৮৪৬ সালের ১৬ মার্চ অমৃতসর চুক্তি মোতাবেক তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার রাজ্যটি ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে গলাব সিংহ নামে জনৈক দেশীয় ডোগরা গোষ্ঠী সর্দারের কাছে বিক্রি করে দেয়। এর একশত এক বছর পরে ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর শেষ মহারাজা হরিসিংহ কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের সংগে অঙ্গীভুত করেন। শেখ আবদুল্লাহ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আব্বাসের নেতৃত্বে প্রথম কাশ্মীরের জনগনের মহারাজা বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পরে শেখ আবদুল্লাহ ১৯৩৯ সালের দিকে তার দল মুসলীম কনফারেন্সকে অসাম্প্রদায়িক ন্যাশনাল কনফারেন্স নাম দিয়ে কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে ভারতও তার সাথে অন্তর্ভূক্তি ছাড়া কোনো ধরনের সহযোগিতা দিতে নারাজ থাকে। এমতাবস্থায় মহারাজা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে থাকে। এরূপ একটি অবস্থায় মহারাজা ভারতের সাথে অন্তর্ভূক্তির দিকে ধীরে ধীরে আগাতে থাকে। এ বিষয় অনুধাবন করতে পেরে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের উপজাতীয় মুসলমানদের মুজাহিদ বাহিনী মহারাজার সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এদেরকে পরাজিত করে শ্রীনগরের উপকুলে উপস্থিত হয়। মহারাজা পালিয়ে দিল্লী পৌছেন। ভারতের শেষ ভাইস রয় এবং স্বাধীন ভারতে প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সংগে ২৬ অক্টোবর কাশ্মীরকে ভারতভূক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর পরপরই ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে অভিযান চালায় ও মুজাহিদদের হাত থেকে কাশ্মীরের ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ২৪ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ২৭ অক্টোবর ভারত কাশ্মীরের মূল ভূখন্ড দখল করে নেয়।

১৯৪৮ সালের ১৭ জানুয়ারী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ পাক-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা স্বরূপ এক প্রস্তাব পাশ করে। এর তিন দিন পরে জানুয়ারীর ২০ তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের জন্য জাতিসংঘ কমিশন সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘ বাহিনী তৈরী করে। কিন্ত জাতিসংঘ বাহিনী গঠন দীর্ঘ সময় নেয় এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারী যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয় এবং সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এ সময় ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের দখলে রাখে আর পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণে রাখে উত্তরের বাকি এক-তৃতীয়াংশ পর্বত সংকুল ভূখন্ড যা পরবর্তীতে আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত হয়।[১৪৬] এতে পাক–ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটে, পরবর্তীতে কাশ্মীর নিয়ে দু'দুটি[১৪৭] যুদ্ধ হয়, একটি ১৯৪৭-৪৮ সালে অপরটি ১৯৬৫ সালে।[১৪৮]

---

১৪৬. আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৬

১৪৭. দু-দুটি যুদ্ধ: ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে সংঘটিত হয় কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও পাকিস্তান '৪৭-৪৮ সালের ভুল সন্দেহের পুনরাত্তি ঘটায় এবং যথারীতি যুদ্ধ শেষে সামগ্রীক ফলাফল পাকিস্তানের বিপরীতেই থেকে যায়। এর আগে ১৯৪৭ সালের মূল সমর পরিকল্পনাই আবারো ১৯৬৫ সালের শেষ ভাগে। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ও ভারতের গুজরাটের সীমান্ত মধ্যবর্তী 'রান অব কচ্ছ'-এর জলাভুমিতে একটি ছোট্ট বিতর্কিত এলাকার মালিকানা নিয়ে পাকিস্তান শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এলাকাটি অনায়াসে দখল করে নেয়। পাকিস্তানের অতর্কিত আক্রমনে ভারতীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এটা ছিল ভারতের জন্য এক সীমিত সামরিক পরাজয়। তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ভারত তার সুবিধাজনক সময়ে পাকিস্তানের দুর্বলতম স্থানে আঘাত হেনে এর উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানের শাসকবর্গ এই হুমকিকে আদ্ভৌ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেনি। বরঞ্চ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল রেখে কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাবার লক্ষ্যে তার নিয়মিত বাহিনী প্রেরণ করে। পাকিস্তানের সমর বিশেষজ্ঞরা ধরেই নিয়েছিল যে, তাদের এই উস্কানিমূলক কার্যকলাপের ফলে যুদ্ধ শুরু হলে '১৯৪৭-১৯৪৮' সালের মতো গোলযোগপূর্ন কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্ত আসলে তা হয়নি। ভারত অধিকৃত পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের নাজুক স্থানসমূহে সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমন চালায়। পাকিস্তান তাদের মূল ভূখন্ডের ওপর এই আক্রমনের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। শুধু তাই নয়, ভারতীয় আক্রমণের সংগে সংগে কাশ্মীরে পাকিস্তানের সকল প্রকার সামরিক তৎপরতাও বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ দিনের এই যুদ্ধে সামরিকভাবে পাকিস্তান বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, অর্থ্যাৎ যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল তার কিঞ্চিত অর্জন করতে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ভারত পাকিস্তানের মূল ভূখন্ডে আক্রমন করে ঘোষিত প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের স্থিতিবস্থা ফিরিয়ে আনে (আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত)।

(১৪৮) তারেক শামসুর রেহমান, পূর্বোক্ত, ঢাকা-২০০৮, পৃ.১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের ভারত-পাকিস্তান কমিশনের প্রস্তাবে কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার অব্যবহিত পরেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়। ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই তা মেনে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলেও ভারত বিভিন্ন অজুহাতে জাতিসংঘ প্রস্তাব কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানায়। ভারত শেখ আবদুল্লহকে কাশ্মীরের মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করে কিন্তু ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে তাকে বরখাস্ত করে একটি গণপরিষদ গঠন করে এবং সংগে সংগে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্ত ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ওই কার্যক্রমকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও তখন থেকে ভারত কাশ্মীরকে তার অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবেই বিবেচনা করে আসছে।[১৪৯]

দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই ঘোলাটে হচ্ছে। ভারত পাকিস্তান উভয় দেশের সম্পর্ক নষ্টের মুল অন্যতম কারণ কাশ্মীর। অন্য দিকে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর যে বিষয়টি এখন সর্বমহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে, তা হচ্ছে এ অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। দু'টি দেশ, ভারত ও পাকিস্তান মূলত পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ভারতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতার জন্ম হয়নি, বরং অনেক আগে থেকেই এই দুটো দেশের মাঝে একধরনের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলে আসছিল। সূক্ষভাবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটো দেশে দারিদ্র্য থাকলেও, অস্ত্র ক্রয়খাতে দেশ দুটো যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করছে। এ অঞ্চলে গত কয়েক দশক ধরে দারিদ্র্য যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি বেড়েছে অস্ত্র ক্রয় খাতে অর্থের পরিমাণ। মার্কিন কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের এক গবেষণায় বলা হয়েছে ২০০৬ সালে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সমরাস্ত্র কিনেছে পাকিস্তান। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। এরপরের অবস্থান সৌদি আরবের[১৫০]। পাকিস্তান যে পরিমাণ অস্ত্র ক্রয় করেছে, তার পরিমাণ ৫ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। অথচ অস্ত্র ক্রয় খাতে অর্থের পরিমাণ যদি কমানো যেত, তা হলে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে এই দুটো দেশের দারিদ্র্যও কমানো যেত। শুধু তাই নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও একটি ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অপর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির ১২ শতাংশের বসবাস দক্ষিণ এশিয়ায়।[১৫১] গবেষণায় বলা হয়েছে দৈনিক ১ ডলার আয়কারীর সংখ্যা পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় এলাকায় ১৯৯০ সালের ২৯ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালে ৯ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে।

---

(১৪৯) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৬
(১৫০) আমার দেশ, ৪ অক্টোবর, ২০০৭
(১৫১) নয়াদিগন্ত, ৯ নভেম্বর, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামাবাদ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন কেন্দ্র তাদের এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে, প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের হিসেবে বিশ্বে ভারতের স্থান ১৪২, কিন্ত মোট অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে এর স্থান প্রথমে। অন্যদিকে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের হিসেবে পরিসংখ্যানটি কিছুটা পুরনো হলেও সাম্প্রতিক সময়ের হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তান শীর্ষে অবস্থান করছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক অপর একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর্মস কন্ট্রোল অ্যান্ড ডিজআর্মামেন্ট এজেন্সি'র এক গবেষণায় দেখা গেছে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্তভারতে মোট ১৭১১১৭ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানে এ সময় সরবরাহ করা হয়েছিল ৬২৫০৩ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র। ওই সময় দক্ষিণ এশিয়ায় সরবরাহকৃত মোট অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ ছিল ৩০১০০০ মিলিয়ন ডলার।

আমরা জানি প্রায় ১৪০ কোটি লোকের দেশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া। এর মাঝে প্রায় ১২০ কোটি লোকই বাস করে ভারত ও পাকিস্তানে। পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর একটি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া। এ অঞ্চলের জনগণের মাথাপিছু আয় উন্নত বিশ্বের চাইতে অনেক কম। এখানে মাথাপিছু জাতীয় আয় যেখানে ৫০০ ডলারের নিচে, সেখানে উন্নত বিশ্বে এর পরিমাণ বছরে ১৭ হাজার ৪৭০ ডলার। গড় আয়ু এখানে মাত্র ৫৭ বছর, অথচ উন্নত বিশ্বে মানুষ বাঁচে গড়ে ৭৬ বছর। প্রতিদিন ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ এখানে ২১৮৬, অথচ উন্নত বিশ্বে প্রতিদিন গ্রহণ করা হয় ৩৩৯০ ক্যালরি। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের এই দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি দূর করার জন্য প্রয়াত অধ্যাপক হক ইউএনডিপির পক্ষ থেকে একটি প্যাকেজ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনা ছিল ১৫ বছর মেয়াদি (১৯৯৫-২০১০)। তিনি মোট ৫টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছিলেন- প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পানীয় জলের সরবরাহ, পুষ্টিহীনতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ২০১০ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের ১২ কোটি ৬০ লক্ষ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হবে ৩৭০০ কোটি ডলার। ২০১০ সাল নাগাদ ৬৯ কোটি লোকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য দরকার হবে ৩১০০ কোটি ডলার। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা পায় না ২৭ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ। একই কথা প্রযোজ্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা পায় না ৭ কোটি ৪০ লক্ষ শিশু। ২০১০ সাল নাগাদ তাতে যোগ হবে আরো ৫ কোটি ২০ লক্ষ শিশু। বর্তমানে ৩৫ কোটি মানুষের জন্য খাবার পানির কোনো সরবরাহ নেই। ২০১০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৭৭ কোটিতে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে দরকার পড়বে ৩৭০০ কোটি ডলার। এই অঞ্চলের ৮ কোটি ৭০ লক্ষ লোক অপুষ্টির শিকার। এদের জন্য বছরে ১০০ কোটি ডলারও ব্যয় হবে না। ২০১০ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ বিবাহিত দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আসবে। আর এদের জন্য বছরে ব্যয় হবে ১৬০ কোটি ডলার। মোট ব্যয় (২০১০ সাল পর্যন্তড়) ধরা হয়েছে ২৪০০ কোটি ডলার।[১৫২] দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণু শক্তি সমৃদ্ধ দুই দেশের অবস্থান নিম্নের সারনিতে উল্লেখ করা হলো।

১৫২) তারেক শামসুর রেহমান, পূর্বোক্ত, ঢাকা-২০০৮, পৃ.১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৮

দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণু শক্তি সম্পন্ন দুই দেশ

পাকিস্তান	ভারত
ঘোরি ক্ষেপণাস্ত্র :	অগ্নি ক্ষেপনাস্ত্র
দৈর্ঘ্য : ১৫ মিটার	অগ্নি : ১
পাল্লা : ১৫০০ কি. মি.	দৈর্ঘ্য : ১৮.৪১ মিটার
বহনযোগ্য বিস্ফোরক : ৭০০ কেজি	পাল্লা : ১৫০০ কি. মি.
মোতায়েনের সংখ্যা : অজ্ঞাত	বহনযোগ্য বিস্ফোরক : ১০০০ কেজি
	মোতায়েনের সংখ্যা : অজ্ঞাত
	অগ্নি : ২
	পাল্লা : ২৫০০ কি.মি.
	পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্র
পাল্লা : ১৫০০ কি. মি.	দৈর্ঘ্য : ৯ মিটার
বহনযোগ্য বিস্ফোরক : ৭০০ কেজি	পাল্লা : ২৫০ কি. মি.
মোতায়েনের সংখ্যা : অজ্ঞাত	বহনযোগ্য বিস্ফোরক : ৫০০ কেজি
	মোতায়েনের সংখ্যা : ১০০

অস্ত্রসম্ভার

সৈন্য	:	৫২০০০০	৯৮০০০০
আধা-সামরিক	:	৫১৯৫০০	১৪৪০০০
রিজার্ভ সৈন্য	:	৫১৩০০০	১১১০০০০
যুদ্ধট্যাংক	:	২০৫০	২৪০০
যুদ্ধবিমান	:	৪৩০	৮৪৪

সূত্র: রয়টার্স-এর প্রতিবেদন, দেখুন আজকের কাগজ, ২৬ জানুয়ারি, ২০০২

যা হোক ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের অস্ত্র প্রতিযোগিতা পরিহার করে শান্তি সৃষ্টির জন্য ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সম্মেলনে ব্যাপক আলোচনা হয়। তাদের আহবান জানানো হয় কাশ্মীরের জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু এতে কাজ হয়েছে সামান্যই।

৬.৮. কুয়েত

মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ কুয়েত।[১৫৩] কুয়েতের উপর ইরাকের আক্রমন উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে ভয়াবহ ছিল। তবে পার্থক্যটা হল ইরাক পিছু হটার সময় তেলকূপগুলোতে যে বিস্ফোরণ ঘটায় তাতে সমস্ত উপসাগরে চরম পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছিল এবং এই প্রথম জলচর জীবনের সব থেকে বেশি ক্ষতি সাধিত হয়।

১৫৩. কুয়েত: এর আয়তন মাত্র ১৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১.৯ মিলিয়ন। এর বাৎসরিক জাতীয় উৎপাদন হচ্ছে ১৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী এই দেশটির প্রতিবেশী দেশ হচ্ছে ইরাক, সৌদি আরব এবং ইরান। এই দেশটি অটোম্যান সাম্রাজ্যকালে ইরাকের বসরা প্রদেশেরই একটি অংশ ছিল। ১৮৯৯ সাল থেকে কুয়েত ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণে থাকার পর ১৯৬১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময় ইরাক কুয়েতকে তার নিজের অংশ বলে দাবি করে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে ইরাক পুনরায় একই দাবি জানায়। ১৯৮০ সাল ইরাক-ইরানের থেকে আট বছরের কুয়েত যুদ্ধে ইরাককে প্রায় ১০০০ কোটি ডলার সাহায্য প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানায়। ফলে সাময়িকভাবে ইরাক কুয়েতের উপর তাদের দাবি স্থগিত রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

ইরাক কুয়েত দুটো দেশই অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। অটোম্যান শাসকরা কুয়েতকে বসরার সাথে সংযুক্ত করেছিল। ১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় আরব ভূমির দেশত্যাগী লোকেরা ধীরে ধীরে কুয়েতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে এরা যখন শাসকে পরিনত হয়, তখন তারা বসরার অঙ্গরাজ্য হিসেবে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। বসরার অধীনে কুয়েতের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। এদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলে গ্রেট ব্রিটেনের উত্থান ঘটতে শুরু করে। ফলে তুর্কিদের বেশ উপকার হয়। তারা ব্রিটিশদের সহযোগিতায় অটোমানদের দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ১৯২২ সালে এসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তিতে বলা হয় অর্ধেক করে কুয়েতি এলাকা সৌদি আরব ও ইরাকের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। কিন্তু এ প্রস্তাব কার্যকরী হয় নি। এরপর ব্রিটিশরা যখন এই এলাকা থেকে চলে যায় তখন কুয়েতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেয় এবং ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে কুয়েত স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুয়েতের ইরাক থেকে পৃথক করার ফলে ইরাকের ভৌগলিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুয়েতের অবস্থানের কারণে উপসাগরে ইরাকের প্রবেশ দ্বার শুধু শুরুই হয়নি, উপরন্ত ইরাকের একমাত্র বন্দর উন্ম কসর (Ummqasr) এর ব্যবহার হয়ে উঠে অসুবিধাজনক। এ কারণে ইরাক কুয়েতকে তার দুটো ছোট দ্বীপ লীজ দেয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কুয়েত তাতে রাজি হয়নি। ইরাকের বারবার নিয়ন্ত্রণ দাবি সত্ত্বেও কুয়েত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে মূলত ব্রিটিশদের সহায়তায়। তবে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো ইরাক-কুয়েত সম্পর্ক কিন্তু সবসময় টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল না বরং স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। বিগত ১৯৮০-৮৮ সালের ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় কুয়েত ইরাককে ১৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছিল। অথচ যুদ্ধ শেষে সাদ্দাম হোসেন সবকিছুই ভুলে যায়, এবং কুয়েত আক্রমন করে বসেন। সাদ্দামের কুয়েত আক্রমনের অনেকগুলো কারণ ছিল।[১৫৪]

ইরাক ১৯৯০ সালের ২ আগষ্ট অতি প্রত্যূষে এক সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে কুয়েত দখল করে নেয়। কুয়েতের দামমান প্রদেশের ওপর হামালা চালালে আমীরের ভাই শেখ ফাহদ আল আমেদ আল সাবাহ নিহত হয় এবং কুয়েতের আমীর শেখ জাবের আল আহমদ আল সাবাহ হেলিকপ্টার যোগে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সৌদি আরবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ২ আগষ্ট কুয়েত দখলের পর ইরাক ৪ আগষ্ট কুয়েতে স্বীয় অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ৮ আগষ্ট কুয়েতকে ইরাকের সঙ্গে একীভূত করার ঘোষণা দেয়। ২৮ আগষ্ট ইরাক কুয়েতকে তার ১৯ তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং কুয়েতকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করে।[১৫৫] কুয়েত নগরীর নাম পরিবর্তন করে ইরাক এর নাম রাখে কাজিমা ।[১৫৬]

---

১৫৪. তারেক শামসুর রেহমান, পূর্বোক্ত, ঢাকা-২০১০, পৃ.১৭১
১৫৫. আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৩
১৫৬. কাজিমা: কুয়েতের এই নাম অটোমান সাম্রাজ্যের আমলে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ইরাক-কুয়েত বিরোধের কারণ

ইরাক কুয়েতের বিরোধকে নিম্নরূপ ভাবে চিত্রায়িত করা যায় ঃ- প্রথমত : কুয়েত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন সে ব্রিটিশের আশ্রিত ছিল। এর আগে থেকেই কুয়েতের ওপর ইরাকের দাবি ছিল। স্বাধীনতার পর সৌদি আরব ও ইরাকের সাথে কুয়েতের সীমান্ত অ-চিহ্নিত থেকে যায়। ১৯৬৯ সাল নাগাদ কুয়েত সৌদি সীমান্ত নির্ধারিত হলেও ইরাকের সাথে তার কোনো সীমানা নির্ধারিত হয়নি। ফলে কুয়েত ইরাক কয়েকবার সংঘাত হয় এবং ৬০-এর দশকে সেখানে আরবলীগ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ১৯৬৩ সালে ইরাক কুয়েতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলেও ১৯৭৩ সালে আবার সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয় এবং ইরাক কুয়েতের একটি সীমান্ত চৌকি দখল করে ও সেখানে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। পুনরায় ১৯৭৫ সালে এ বিরোধের একটা নিস্পত্তি হয়। দ্বিতীয়ত ঃ ইরাকের অভিযোগ কুয়েত ওপেক (OPEC) নির্ধারিত কোটার বেশি তেল উৎপাদন ও রপ্তানি করে বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্যের অধোগতিতে কার্যত সাহায্য করছে। ইরাক তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ২৫ মার্কিন ডলার দাবি করে, কিন্তু কুয়েত ব্যারেল প্রতি ১৪ মার্কিন ডলার পেয়েই সন্তুষ্ট এবং সে ওই টাকা পশ্চিমা দেশগুলোতেই বিনিয়োগ করে থাকে। তেলের দাম কম হওয়াতে ইরাকের লোকসান হচ্ছে এবং সে তার যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন করতে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তৃতীয়ত ঃ ইরাক সরাসরি অভিযোগ করে যে, কুয়েত ইরাকের তেল ক্ষেত্রের অন্যূন ২৪০ কোটি ডলারের তেল চুরি করেছে এবং এ কাজটি করা হয়েছে গত এক দশকে রুমেইলা তেল ক্ষেত্র থেকে। তাই ইরাক কুয়েতকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৪০ কোটি মার্কিন ডলার দেয়ার জন্য চাপ দেয়। এ ক্ষেত্রে সমস্ত কূটনৈতিক উদযোগ ও সৌদি বাদশাহসহ অন্যান্য পক্ষের মধ্যস্থতা ও আপস রফা ব্যর্থ হলে ইরাক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে কুয়েত দখল করে নেয় এবং পরবর্তীতে কুয়েতকে তার সাথে একত্রিত ঘোষণা করে।[১৫৭]

শান্তি প্রয়াস

কুয়েত সংকটের রাজনৈতিক শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের সমস্ত প্রচেষ্টা ইরাকের একঘেয়েমী নীতির জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এই সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে দুই পরাশক্তির শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সমস্যার সামরিক সমাধানের পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ইরাককে কুয়েত ত্যাগে বাধ্য করার জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে ৬৬০ এবং ৬৬৪ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। কিন্তু ইরাক তারপরও কুয়েত ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। ১৯৯০ সনের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট, মিখাইল গর্বাচেভের বিশেষ দুত মি. প্রেমাকভ ইরাক সফর করেন এবং সেখানে ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে মত বিনিময় করে কুয়েত সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

---

১৫৭) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমাকভের এই আশাবাদের ঘোষণার পর সোভিয়েত মধ্যস্থতায় কুয়েত সংকটের রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে বলে সমগ্র বিশ্ববাসী অনুমান করেছিল। কিন্তু ইরাক সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। জাতিসংঘ মহাসচিব ইরাককে কুয়েত ত্যাগ করতে রাজি করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও সম্পুর্ণরূপে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হয় ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিমান আক্রমণ। দীর্ঘ প্রায় এক মাস যুদ্ধের পরে ইরাক বিনাশর্তে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেয় এবং কুয়েত থেকে তার সেনাবাহিনী দ্রুত সরিয়ে নেয়, ফলে কুয়েত মুক্ত হয়।[১৫৮]

যুক্তরাষ্ট্র ওই সংকটে কিন্তু বসে থাকেনি বরং কূটনৈতিক সাফল্যকে পুঁজি করে একটা যৌথ বাহিনী গঠন করে ইরাকের কুয়েত আক্রমনের যথাযথ সাড়া প্রদান করে। কুয়েত মুক্ত অভিযানের নামকরণ করা হয় প্রথমে (Desert Shield) পরে (Desert Strom) যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় এলাকায় ৬ লাখের মত সৈন্য মোতায়েন করেছিল। অপারেশন ডেজার্ট ষ্টর্মে প্রানহানি অন্য যে কোন যুদ্ধ থেকে কম ছিল। যেখানে কোরিয়া যুদ্ধে ৪.৫ মিলিয়ন, ভিয়েতনাম যুদ্ধে ২ মিলিয়নের উপর, লেবাননে ২.৫০,০০০; ইরান-ইরাক যুদ্ধে ৫,০০,০০০ লোকের প্রানহানি ঘটে সেখানে এই যুদ্ধে প্রায় ১,০০,০০০ লোকের প্রানহানি ঘটে। তবে যুদ্ধোদ্যোগ আর আধুনিক সমরাস্ত্রের ব্যবহারের দিকে থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোরিয়ার পরেই এর অবস্থান ছিল।[১৫৯]

অপারেশন ডেজার্ট ষ্টর্মে মার্কিন কূটনীতির সাফল্যের কোন তুলনা হয় ন। ওয়াশিংটন সমস্ত পশ্চিমাদেশ গুলোর সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ইরাকের পরীক্ষিত বন্ধু, কিন্তু কুয়েত আক্রমণের দায়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাকের উপর নাখোশ হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধে সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে সমর্থন দিয়েছিল নিম্নের সারিণ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

সারণি ঃ-১৯

অপারেশন ডেজার্ট ষ্টর্মে অংশ নেয়া বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী

দেশের নাম	ঃ	পরিমান
যুক্তরাষ্ট্র	ঃ	৩,৫০,০০০
সৌদি আরব	ঃ	৪৫,০০০
মিশর	ঃ	৩৮,৫০০
ব্রিটেন	ঃ	৩২,০০০
সিরিয়া	ঃ	২১,০০০
পাকিস্তান	ঃ	১১,০০০
উপসাগর সহযোগী কাউন্সিল	ঃ	১০,০০০
বাংলাদেশ	ঃ	২,০০০
মরক্কো	ঃ	১,৭০০
নাইজার	ঃ	৫০০
চেকোস্লোভাকিয়া	ঃ	২০০

বলা যেতে পারে কুয়েত মুক্তির যুদ্ধ ছিল একটি দেশের বিরুদ্ধে বহু জাতির যুদ্ধ। অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা নিম্নে উল্লেখ করতে পারি।

১৫৮) পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৫

১৫৯) তারেক শামসুর রেহমান, পূর্বোক্ত, ঢাকা-২০১০, পৃ.১৭০

১. আরব দেশগুলোর সেনাবাহিনী এই প্রথম সক্রিয় ভাবে এক্ষেত্রে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে; ২. আরব দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তি আরও প্রকট হয়ে উঠে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে; ৩. এই প্রথমবারের মত এই অঞ্চলে মার্কিনীরা এত বড় আকারের ভূমিকা পালন করে। এর আগে তারা দুটো ছোট আকারের ভূমিকা রেখেছিল লেবাননে ১৯৫৮ সালে এবং ১৯৮২-৮৩ সালে; ৪. এই প্রথমবার আঞ্চলিক আর বহিঃশক্তি একত্রে যুদ্ধ করে, যেটা কিনা অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় দেখা গিয়েছিল; ৫. ব্রিটেন ও ফ্রান্স একত্রে যুদ্ধে অংশ নেয় যেটা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়নি; ৬. অতীতে সাদ্দাম হোসেন মূলত আশা করেছিলেন প্যান আরব বা প্যান ইসলামিক একটা অনুভূতি আরব সরকারগুলোর মধ্যে তৈরী হবে কিন্তু সেটা হয়নি; ৭. যুদ্ধের আগে, এমনকি পরেও জোটবদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সহজ ছিলনা।

জোটের অন্তর্ভূক্ত অনেক আরব বা অনারব দেশেরই অনেক রকম সমস্যা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ সেই পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ইরাককে যুক্তরাষ্ট্র যে শাস্তি দিয়েছিল তা সমস্যার কোন সমাধান বয়ে আনতে পারেনি। তার বড় প্রমাণ ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে পুনরায় ইরাক আক্রমন করে ও দেশটি দখল করে নেয়। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ সূচনা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশ, আর ২০০৩ সালে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু করেন তার ছেলে জর্জ বুশ।[১৬০]

কুয়েত সংকটে ইরাক মারাত্মকভাবে পরাজয়বরণ করে। কুয়েত সংকট সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইরাক এককভাবে দায়ী। ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম রাষ্ট্র কুয়েতকে ইরাক দখল করে আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ লংঘন করে। ইরাকের এ ধরনের হটকারী ভূমিকার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বলয় সম্প্রসারণ করতে প্রয়াস পায়। বর্তমানে কুয়েত মোটামোটি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কুয়েতের প্রদান করতে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক সুবিধা। ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে ইরাক কুয়েতকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে ইরাক কুয়েত স্থায়ী শান্তি স্থাপন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।[১৬১] কুয়েতের ন্যায় ধনী অথচ ছোট দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষা করা বহুলাংশে সফল কূটনীতির উপর নির্ভরশীল। কুয়েত সরকার এই ব্যাপারে সচেতন বলেই মনে হয়। কুয়েত একদিকে যেমন উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (Gulf Cooperation Council-GCC) সদস্য হিসাবে অন্যন্য উপসাগরীয় দেশের সহিত সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার প্রয়াস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অবস্থান দৃঢ়তর করতে প্রয়াস লাভ করেছে।[১৬২] ওআইসি দুটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ধ্বংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হলে এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধন করে। ওআইসি বার বার যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে তাগিদ প্রদান করে কিন্তু তাতে ফল হয়নি।

---

১৬০) পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৮
১৬১) আব্দুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬
১৬২) সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : ওআইসির কার্যক্রম মূল্যায়ন: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : ওআইসির কার্যক্রম মূল্যায়ন: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

ওআইসি জাতিসংঘের পর বৃহৎ সংস্থাসমুহের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একমাত্র সংস্থা। তবে অঞ্চলভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক সংস্থা রয়েছে।[১] গুরুত্ব বিবেচনায় ওআইসি বিশ্বসংস্থার মর্যাদা লাভ করেছে। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিগত চার দশকে অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পর বর্তমান অবস্থানে এসেছে। সংস্থাটিকে গতিশীল করতে সংস্কার করা হয়েছে এর সাংগঠিক কাঠামোতে। চার্টার পরিবর্তন করে নতুন চার্টার প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এর অর্জন অনেক,সফলতা ব্যাপক, ব্যর্থতাও কম নয়। কখনো দৃঢ়, কখনো নিস্প্রভ কখনো গতিশীল, কখনো হোচট খেয়েছে। কখনো উদ্দেশ্য সাধনে নিরন্তর আবার কখনো নিস্তব্ধ। নিম্নে এর সমালোচনা সফলতা এবং কার্যক্রমের একটি খতিয়ান তুলে ধরা হলো।

৭.১. ওআইসির সমালোচনা

বিশ্বসংস্থা হিসেবে ওআইসি-র রয়েছে ইমেজ সংকট। ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক লেখক নির্মলকান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ ওআইসি সম্মেলনকে মুসলমান ধর্মযাজকদের সম্মেলন বলে উল্লেখ করেন। ইরান ইরাক যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে বলা হয়। ১৯৮১-র ২৫ শে জানুয়ারী মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন ইরানের তীব্র নিন্দা করে। ইরান ঐ সম্মেলনে যোগ দেয়নি। অস্ত্র সংবরণ এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলনে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয় ১৯৮২-র মে মাসে ইরাক-ইরান যুদ্ধে সাহায্যের জন্য সাদ্দাম হোসেন আরব রাষ্ট্রসমূহের কাছে আবেদন জানান। ঐ বছরই জুলাই মাসে ইরান ইরাকের সীমান্ত লংঘন করে। কোন আরব রাষ্ট্রই ইরাকের সাহায্য অগ্রসর হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আট সদস্যের কমিটির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৮৩-র এপ্রিল মাসে বাগদাদে অনুষ্ঠিত চারদিনের ইসলামিক সম্মেলনে যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কিত আলোচনার জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। মুসলমান ধর্মযাজকদের এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, উভয় রাষ্ট্র যদি শান্তির আবেদনে সাড়া না দেয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করবে। ইসলামিক সম্মেলনের প্রধান সেকেতুরে যুদ্ধ বন্ধের জন্য পুনরায় উভয় রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানান।[২] অন্যদিকে একই লেখক তাঁর উল্লেখিত বইয়ে জাতিসংঘ, আফ্রিকার ঐক্য সংস্থা, আসিয়ান, বিশ্বব্যাংক, সার্ক, ন্যাটো, ওপেক ও সাপটা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যর্থাথ ভাবে। বসনিয়া হারজেগোভিনায় সার্ব বাহিনী কর্তৃক মুসলিম জাতিগোষ্ঠি নিধন (Ethnic Cleansing) এবং মানবাধিকার লংঘ প্রতিবাদে ওআইসি বারবার জাতিসংঘের নিকট অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে। কিন্ত কতিপয় ইউরোপীয় শক্তির বিরোধিতার কারণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া যায় নি।[৩]

---

১. মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের আঞ্চলিক সংস্থার মধ্যে রয়েছে আরব লীগ, ডি-৮, ইকো (ECO), ইত্যাদি।

২. নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা-২০০৪, পৃ.৬৮১

৩. আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সিড়ি বই বিতান, ঢাকা-২০০৯, পৃ.৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

বসনিয়া হার্জিগোভিনার মুসলমানদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ওআইসি শত চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। ওআইসি মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ তথা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে লক্ষ্য অর্জনে তেমন কোন সফলতা লাভ করতে পারেনি। ইসলামী দেশগুলোর বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালে তা অনুভব করা যায়। বিভেদ আর অনৈক্যে ইসলামী দেশগুলো বিভক্ত। পরাশক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তাকারী হিসেবে কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বদা বিরোধিতা করছে।

১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত জেরুজালেম শহর, প্যালেষ্টাইন ও আরব ভূখন্ড আজও উদ্ধার করা হয়নি। ওআইসি সম্প্রসারণবাদী ইসরাইল এর বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোর কোন ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে না। ইসরাইলের পারমাণবিক নীতির বিরুদ্ধে ওআইসির তেমন কোন ভূমিকা নেই। মুসলিম দেশগুলো বিপুল জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্বেও ওআইসি সমষ্টিগত ভাবে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে রয়েছে বড় রকমের পার্থক্য। ওআইসির দুটি সংস্থা ইসলামী বার্তা সংস্থা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ইসলামী ইনষ্টিটিউট প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। অথচ কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৫ম শীর্ষ সম্মেলন এর জন্য ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছে। লেবাননের গৃহযুদ্ধ, আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি অবসানের ক্ষেত্রে ওআইসি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।[৪]

৭.২. ওআইসির সফলতা

ওআইসির সফলতা আকাশচুম্বী না হলেও একটি বিশ্বসংস্থা হিসেবে আবির্ভূত এ সংস্থাটিকে এ পর্যায়ে উন্নীত হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। সত্তর এর দশকের শুরু তে জন্ম নেয়া এ সংস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ৫৭টি রাষ্ট্রের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এটি শুধুমাত্র আর্দশগত অনুকূল কারণেই সম্ভব হয়নি এর জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দৃঢ় অবস্থানের প্রয়োজন হয়। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব সুদূর প্রসারী ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গ্রহণযোগ্য নীতির কারণে এ ব্যাপক অর্জন সম্ভব হয়েছে। এর সফলতার কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৭.২.১. জাতিসংঘের সাথে শান্তিকার্যক্রম

১০ অক্টোবর ১৯৭৫ সালের ৩৩৬৯ নং রেজুলেশন অনুযায়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (General Assembly) সভায় ওআইসি এবং এর সহযোগী সংস্থাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলশ্রুতিতে দুটি সংস্থা-জাতিসংঘ ও ওআইসি এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ উন্মোক্ত হয়।

---

৪. আবদুল লতিফ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৯

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ হলো- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ,সামাজিক, মানবাধিকার ,সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তি। উভয় সংস্থাই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে যে সকল ক্ষেত্রে সচেষ্ট তা হলো আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসন, বিশেষ করে যেখানে আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তার বিষয় জড়িত। নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self Determination) উপনিবেশিকতা মোচন (Decolonization), মানবাধিকার (Fundamental Human rights) এর অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন (Economic and technical Development)। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং জাতিসংঘ এর মধ্যে সহযোগিতা প্রদান জোরদার করণের নিমিত্ত জাতিসংঘ নিম্নোক্ত রেজুলেশন গ্রহণ করে।

সারণি ঃ ২০

ক্রম	রেজুলেশন নং	তারিখ
১.	৩৭/৪	২২ অক্টোবর ১৯৮২
২.	৩৮/৪	২৮ অক্টোবর ১৯৮৩
৩.	৩৯/৭	৮ নভেম্বর ১৯৮৫
৪.	৪০/৪	২৫ অক্টোবর ১৯৮৫
৫.	৪১/৩	১৬ অক্টোবর ১৯৮৬
৬.	৪২/৪	১৫ অক্টোবর ১৯৮৭
৭.	৪৩/২	১৭ অক্টোবর ১৯৮৮
৮.	৪৪/৪	১৮ অক্টোবর ১৯৮৯
৯.	৪৫/৯	২৫ অক্টোবর ১৯৯০
১০.	৪৬/১৩	২৮ অক্টোবর ১৯৯১
১১.	৪৭/১৮	২৩ নভেম্বর ১৯৯২
১২.	৪৮/২৪	২৪ নভেম্বর ১৯৯৩
১৩.	৪৯/১৫	১৫ নভেম্বর ১৯৯৪
১৪.	৫০/১৭	২০ নভেম্বর ১৯৯৫
১৫.	৫১/১৮	১৪ নভেম্বর ১৯৯৬
১৬.	৫২/৪	২২ অক্টোবর ১৯৯৭

সূত্র ঃ YearbooK of the Uunited Nations 1998 Volume-52.

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহ এবং ওআইসি এর সহযোগী, বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ এবং অধিভুক্ত ইনস্টিটিউটসমূহের মধ্যে জেনেভায় ১৩ থেকে ১৫ জুলাই ১৯৯৮ সালে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২৮-২৯ জুলাই ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের মহাসচিবের উপস্থিতিতে তৃতীয় উচ্চ পর্যায়ের আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সভায় ওআইসি এবং জাতিসংঘের মধ্যে উপরোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয় ।

ওআইসি তার ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। নিচে সেগুলো তুলে ধরা হলো-

ক. রাজনৈতিক
খ. অর্থনৈতিক
গ. শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক
ঘ. মানবিক সহায্য

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.২. রাজনৈতিক কার্যক্রম

ওআইসি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময় যেসব রাজনৈতিক কার্যক্রম নেওয়া হয়, সেগুলো হলো-

* ১৯৬৯ সালের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন শেষে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয় ইসরাইলকে অবিলম্বে ১৯৬৭ সালের পূর্ব সীমানায় ফিরে যেতে হবে। এ জন্যে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা কামনা করা হয়।

* আফগানিস্তানে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে দেশ থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার ও সোভিয়েত আগ্রাসন বন্ধের দাবী জানানো হয় ১৯৮০ সনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বিশেষ বৈঠকে। একই বৈঠকে সোমালিয়ার শান্তিবিনষ্টকারী সামরিক হস্তক্ষেপ ও আফ্রিকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বন্ধু রাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতির নিন্দা জানানো হয়।

* ১৯৮১ সালের শীর্ষ সম্মেলনে ১৯৬৭ সনে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত জেরুজালেম প্যালেস্টাইন ও আরব ভূখন্ড পুনরুদ্ধারের জন্যে জেহাদ এবং পরিবর্তে আর্থিক বয়কট নীতি গ্রহণ করে।

* ১৯৮২ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসরাইলকে অর্থনৈতিক বয়কট এবং পিএলও-কে সামরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি ইসলামিক অফিস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

* ১৯৮৪ সালে ইসরাইলর সাথে শান্তিচুক্তি করার কারণে শীর্ষ সম্মেলনে মিশরের সদস্যপদ স্থগিত করা হয়।

* ১৯৮৭ সনে পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলনে দুই মুসলিম রাষ্ট্র ইরান ইরাক যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও উভয় দেশের মধ্যে সব ধরনের সমরাস্ত্র বিক্রি প্রতিরোধ কল্পে ইসলামী শান্তিকমিটি গঠন করা হয়।

* ১৯৯০ সনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের নিন্দা করা হয় এবং ইরাকী সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান জানানো হয়।

* ১৯৯৩ সালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বসনিয়ার মুসলমানদের সহযোগিতা করার জন্যে একটি সমন্বয়কারী দল গঠন করা হয়। একই সম্মেলনে বাবরী মসজিদ ধ্বংস, হেবরণ মসজিদে নামাজরত মুসল্লীদের গুলি করে হত্যা, ইসরাইলের সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। এ ছাড়াও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ ও তাদেরকে স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার প্রদানের দাবী জানানো হয়।

* ১৯৯৩ সনের মধ্য জুলাইয়ে বসনিয়া হার্জেগোভিনা নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠকে মিলিত হয়। এতে যুগোশ-াভিয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে ওআইসি দেশ থেকে ৭০,০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণের দাবী জানানো হয়। জাতিসংঘ মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও তিউনিসিয়া থেকে মাত্র ৫০০০ সৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রদান করে।

* ১৯৯৫ সালে ওআইসি ৮ জাতির সমন্বয়ে (মিশর, ইরান, মালয়েশিয়া, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সেনেগাল এবং তুরস্ক) বসনিয়া হার্জেগোভিনা বিষয়ে একটি কন্টাক্ট গ্রুপ তৈরী করে যারা জাতিসংঘের অস্ত্র বিরতির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এতে সুফল পাওয়া যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বসনিয়া হার্জেগোভিনায় নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য গঠন করে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

* ২০০০ সালের মার্চ মাস আফগানিস্তানের যুদ্ধ বন্ধে ওআইসি প্রয়াস চালায়।

*২০০২ সালে ওআইসির মহাসচিব কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য উভয় দেশের সরকারের প্রতি আহবান জানান।

* অতীতের ন্যায় ২০০৩ সালেও ফিলিস্তিনে ইসরাইলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং মহাসচিব ক্ষোভ প্রকাশ করে তা বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট আহবান জানান।

*২০০৩ সালে ইরাক সমস্যা সমাধানের জন্য ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের প্রতি জাতিসংঘের ১৪৪১ তম সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলকে সহায়তা করার অনুরোধ জানান হয়।

৭.২.৩. অর্থনৈতিক কার্যক্রম

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সংহতি স্থাপন, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও ব্যাধি দূর এবং নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ওআইসি তার অর্থনৈতিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

* ১৯৮১ সনের শীর্ষ সম্মেলনে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।
* ১৯৮২ সনে শিল্পমন্ত্রীদের বৈঠকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উন্নয়নে পরস্পর সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
* ১৯৮৮ সনের ডিসেম্বর ঘোষণা বলা হয়, ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১০ বছরব্যাপী সহযোগিতার কর্মসূচি গৃহীত হবে।

সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক, কারিগরি এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদার করণের লক্ষে সামনে নিয়ে ১৯৮১ সালে একটি সাধারণ চুক্তি করা হয়। তাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য যৌথ ভাবে মূলধন ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালের শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশসমূহের আর্থিক সহযোগিতা (Economic Cooperation) নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮১ সালের কর্মসুচীকে ১৯৯৪ সালে রিভিউ করে আরও শক্তিশালী করা হয়।

১৯৯৪ এর কর্মসুচীতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে শরীক করা হয়। ১৯৯৪ সালে বসনিয়াতে ৫ লক্ষ ইউএস ডলার সহায়তা প্রদান করে। ৯০ এর দশকে গৃহীত দশটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসুচী বাস্তবায়ন হয়েছে, যদিও এ বিষয়টি নিয়ে অনেক বিশেজ্ঞ বার বার কর্মসুচী প্রণয়ন করেছেন। ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম শীর্ষ সম্মেলনে যৌথ উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নশীল দেশসমূহে আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জন্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কথা বলা হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত সমূহের

Dhaka University Institutional Repository

অনুবৃত্তি ক্রমে ২০০১ সালে সউদী আরবে এর জেদ্দায় প্রথম ওআইসি বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালে বাণিজ্য অগ্রাধিকার বিষয়ক চুক্তিতে ২২টি সদস্য দেশ স্বাক্ষর করে। এর ফলে Islamic Common Market প্রতিষ্ঠা অতি ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হয়।

২০০১ সালে ওআইসি মহাসচিব এই কমন মার্কেট এর প্রতি অনুসমর্থন প্রদানের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানান। ওআইসি বিশেষজ্ঞ দল 'কমন মার্কেট' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কাজ করে।

৭.২.৪. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ওআইসি বিভিন্ন সময় সেমিনার, সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ ছাড়া মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও উগান্ডায় ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের সাহায্যে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সহযোগতা করছে। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী গ্রন্থ 'স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশিত হলে ১৯৮৯ সালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে এর সমালোচনা করা হয়। এ ছাড়া এ মর্মে সিদ্ধান্তগৃহীত হয় যে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ উক্ত গ্রন্থের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করবে। এর ফলে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীদের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্ব থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিলোপ হচ্ছে।

মুসলিম দেশ এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা, পশ্চিমা বিশ্বের ইসলাম, কুরআন ও ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণা ও অবমূল্যায়ণ বিদূরিত করার নিমিত্ত বিভিন্ন শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশ করছে। এ ছাড়া ওআইসির মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সভায় তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭.২.৫. মানবিক সাহায্য

ওআইসি মানবসম্পদ উন্নয়নে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আফ্রিকায় খরা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত সেনেগাল, নাইজার, মৌরিতানিয়া, মালি, গায়েনা, চাঁদ, জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশগুলোতে ওআইসি বিশেষ সহযোগিতা দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও ওআইসি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও যুদ্ধাহত মুসলমানদের সহায়তা দেওয়ার জন্যে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'রেড ক্রিসেন্ট' এর সাথে কাজ করে থাকে।

জাতিসংঘ বিশেষ করে (NUHCR) এর সহযোগিতায় যুদ্ধ-বিধ্বস্থ বিভিন্ন মুসলিম অধ্যূষিত অঞ্চলে জরুরী ত্রাণ এবং সহযোগিতা প্রেরণ করে। সাহেল এলাকা যেমন বোরকিনা ফাসো, কেপ ভায়দে, শাদ, গাম্বিয়া, গায়ানা, গিনি বিসাউ, মালি, মৌরতানিয়া, নাইজার, এবং সেনেগাল এর সকল দেশে খরা কারণে খাদ্য দুর্যোগ দেখা দিলে ওআইসি সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯৯৯ সালে আলবেনিয়া দক্ষিণ সার্ভিয়ার কসোভো এবং মেটোহিজাতে জরুরী মানবিক সাহায্য প্রদান করা হয়। ২০০১ সালের অক্টোবর (Afghan People Assistance Fund) গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে আফগানিস্তানের সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের জন্য জরুরী (Trust Fund) গঠন করে সাহায্য প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্ঠম অধ্যায় ঃ ইসলামের আলোকে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি

Dhaka University Institutional Repository

অষ্ঠম অধ্যায় ঃ ইসলামের আলোকে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনীতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা বিশেষত: উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়াবলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। একাডেমিক থিংক ট্যাংকারদের আলোচনায় রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়টি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসেবে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ধর্মের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারতাবাদ সহ বিভিন্ন আধুনিক মতাদর্শ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসারের কারণে ধর্মের প্রভাব পশ্চিমের সমৃদ্ধ জীবনমানের দেশসমূহে পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও নিঃশেষ হয়নি।[১] পশ্চিমের সমৃদ্ধ দেশসমূহের তুলনায় পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দেশসমূহে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নানা কারণে এখনও খুবই ঘনিষ্ঠ।[২] এ কারণে উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি আলোচনায় ধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকে। ইসলাম পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম। প্রায় সকল মুসলিম প্রধান দেশ উন্নয়নশীল বিশ্বে অবস্থিত। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বিবেচনা করা হয়[৩] বলে মুসলিম দেশসমূহের রাজনীতিতে ইসলামের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ কারণে রাজনৈতিক উন্নয়ন সহ মুসলিম প্রধান দেশসমূহের রাজনীতির বিভিন্ন দিক ইসলাম থেকে পুরোপুরি আলাদা করে অধ্যয়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উপাদান পবিত্র কুরআন নির্দেশিত মুসলিম ঐক্য। কিন্ত রূঢ় শুনালেও বাস্তবে মুসলিম ঐক্য একবিংশ শতাব্দির সূচনালগ্ন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি ।

রাজনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা,এর নিয়ামকসহ অনেক বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলেও সমাজ বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ [৪] উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেশ ক'টি প্রপঞ্চেরে উপস্থিতির উপর জোর দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে জাতীয় একাত্মতা, জাতীয় ঐক্য, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, বৈধতা, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান, গণতন্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, রাজনীতিতে বেসামরিক নেতৃত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ইহজাগতিক রাজনীতি, শিক্ষার উচ্চহার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সমাজ বিজ্ঞানী উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে আসছেন বিধায় এ বিষয়ে আরো নতুন নতুন তথ্য সংযোযিত হতে পারে।

---

১. C.A. leeds, *political Studies* (U.K. Macdonald and Evans Limited 1981). P. 137.

২. Robert F. Spencer, *Religion in Asian Societies' in his (ed.),* `Religion and change in Contemporary Asia' (Minneapolis, University of Minneasota Press, 1971) p.11.

৩. A.K.S. Lambton, *Islamic Political Thought' in Joseph Schachat and C.E. Booworth (eds.)* The Legacy of Islam (Oxford, Oxford University Press 1979) p. 404.

৪. উন্নয়ন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে কাজ করেছেন পাশ্চাত্যের এমন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে লুসিয়ান পাই, সিডনী ভারবা, গ্যাব্রিয়েল এ্যালমন্ড জে, এস. কোলম্যান. এ এফ কে. আরগনসিস্ক, এস. এন. আইজেনষ্টাড. এফ. আর. ভি. মেহাডন. এস. পি. হান্টিংটন, এল বাউন্ডার প্রমুখ উল্লেখ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১. মুসলিম ঐক্য

আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, তাঁর একত্ববাদ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা:) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল এ প্রত্যয়ে বিশ্বাসী এবং ইলাহী কালাম কুরআন ও মহানবীর (সা)-এর হাদীসকে জীবন পথ পরিক্রমার নির্দেশক রূপে নীতিগতভাবে বিশ্বাসী সকল মানুষ মুসলিম। এখানে দেশ কাল পাত্রের কোন ভেদাভেদ করা হয় না। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলাম অনুসরণ প্রচেষ্টাই মুসলিম হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। মুসলিম ঐক্য বলতে উপর্যুক্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী বিশ্বের মুসলামানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতা সম্প্রীতি একতার পরিবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে।

মুসলিম ঐক্যের ওপর ইসলামে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-[৫]

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

বিদায় হজ্বের ভাষণে হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন-'হে লোকসকল, আমার বাণী মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে চেষ্টা কর। জেনে রেখো, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সবাই একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সমগ্র দুনিয়ার সকল মুসলমান একই অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।[৬] মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা:) উপর্যুক্ত বাণী দ্বারা মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও ঐক্যের ভিত্তি সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। কোন গোত্র, সংগঠন অথবা জাতির পক্ষে বড় কিছু অর্জন করতে হলে ঐক্যের বিকল্প নেই। এ কারণেই বলা হয় ঐক্যই শক্তি। অনৈক্যেই দুর্বলতা। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে স্মীথের মত হচ্ছে-"The role of Religion in Political development in the West has been a highly significant one. It has contributed to the idea of limited government and individual freedom, been deeply involved in the general process of modernization through its internal upheavals, interacted with the major ideologies of modern times. Given rise to important political parties, and been an influential factor in the moulding of political cultures. The question of the relationship between religion and political development in the third world can be no less signiticant.[৭]

---

৫. আল-কুরআন, ৩ : ১০৩ (তোমরা সম্মিলিত ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না)

৬. র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, *ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০১০, পৃ. ২৭.

৭. Donald Eugene Smith, *Reiligion and political Development* (Boston, Little Brown and Company, 197). p. 32.

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত বিশ্বের তুলনায় উন্নয়নশীল বিশ্বের সমাজ ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র ইত্যাদি দ্বারা তুলনামূলক ভাবে বেশি বিভক্ত বিধায় সামাজিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে এসব দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে ধর্মের ভূমিকা বেশি হওয়া স্বাভাবিক।[৮] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় সকল মুসলিম-প্রধান দেশ উন্নয়নশীল বিশ্বে অবস্থিত। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশ হিসেবে এবং ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে বিশ্বাস করা হয় বিধায় মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইসলামের ভূমিকার মূল্যায়ন হওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

উন্নয়ন সম্পর্কিত পাশ্চাত্য লেখকদের অধিকাংশের রচনায় 'পশ্চিমা মডেল' তথা পাশ্চাত্যকরণকে উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন বলে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখা যায়।[৯] পাশ্চাত্য দেশগুলোর উন্নয়ন ধারাকে সামনে রেখে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য প্রপঞ্চ নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও সমালোচনা করা হয়। রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে পশ্চিমা লেখকদের ধারণার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের ধারনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও ইসলাম উন্নয়নের নামে ঢালাও ভাবে পাশ্চাত্যকরণ অনুমোদন করে না।[১০]
আমরা জানি উন্নয়নের সঙ্গে পরিবর্তনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ইসলাম উন্নয়নের স্বার্থে পরিবর্তন অনুমোদন করলেও বিশ্বাস ও নৈতিকতার পরিবর্তন অনুমোদন করে না।

জন, এল, এসপোজিটোর ভাষায়, "Reformers undersntanding of Islamization is more faithfull to history, recognizing the creative process by which Islam developed.--- Muslim borrowed freely from the cultures that they conquered, adopting and adapting political, legal, social, and economic practices as long as they were not contrary to Islam. Therefore, Islamic system of government and the Shariah were not only based upon Quranic and Prophetic guidelines, but those ideas, practices and institutions, from Arabia, Byzantinium and the Sasanid empires, which did not contradict Islam and were adopted and modified. While traditionist take great pains to emphasize the total self-sufficiency of Islam, reformist insist that while some past low and institutions may be valuable, new circumstance and problems require new solutions formulated in light of Quranic principles through selective borrowing.

৮. James S Coleman 'The Political Systems of the Developing Areas' in G.A Almond and J.S. Coleman eds. *The Polittics of Developing Areas* (New Jersey, Princeton University Press, 1960), p.537. Gunnar myrdal, Asian Drama : An Abridgement (U. K. Penguin Books Limited, 1977) p. 141.

৯. এ প্রসঙ্গে জি. এলমন্ড, সিডনী ভারবা, সি,বি,পাওয়েল, ড্যানিয়েল লার্নার ডেভিড এ্যান্টার, এডওয়ার্ড শীলস প্রমুখের রচনাবলী দেখা যেতে পারে

১০. John L. Esposito, *Islam and Politics Syracuse University Pess*, New York, 1984. PP. 234-235

Dhaka University Institutional Repository

This will result in "Islamic modernization" not simply wholesale modernization. The purpose of Islamization is to separate modernization from westernization. The goal is to establish a synthesis which is both Islamic and modern."[১১] ইসলাম মানুষের নৈতিক ও জাগতিক উন্নয়ন একান্তভাবে কামনা করে। এ কারণে কল্যাণকর পরিবর্তন ইসলামে অনাকাঙ্খিত নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, [১২]

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

মানুষের মধ্যকার দৃশ্যমান পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে আল কোরআনে বলা হয়েছে, [১৩]

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ইসলাম মানুষের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য জাগতিক উন্নয়নের ন্যায় নৈতিক উন্নয়নকেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। এ কারণে ইসলাম উন্নয়নের স্বার্থে পরিবর্তন অনুমোদন করলেও তা' অবশ্যই কোরআন ও হাদীসের মূল শিক্ষার পরিপন্থী হতে পারবে না। উন্নয়ন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্য ধারণার এখানেই রয়েছে মূল পার্থক্য।[১৪]

প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় একাত্মতা (identity) ও জাতীয় সংহতি (integration) অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়। একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চরের মানুষ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও যে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে তাকে জাতীয় একাত্মতা বলা যায়।[১৫]

একটি দেশে জাতীয় একাত্মতা সৃষ্টি হলে সে দেশের জনগণ নিজেদেরকে বিশেষ ভাষা, সংস্কৃতি ও অঞ্চলের মানুষ না ভেবে সামগ্রিক ভাবে একটি দেশের অধিবাসী হিসেবে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়ে উঠে। একটি দেশের জনগণের এ জাতীয় মনোভাবকে জাতীয় সংহতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।[১৬]

---

১১. দেখুন, Muhammad al-Buracy, Administrative Developnment: An Islamic perspective (London, K.P.I. Lomoted. 1985). PP 7-10. Ibrahim A. Ragab, 'Islam and Development,' in Kenneth P. jameson and Charles K. Wiber, (eds.), *Religious Valies and Development*, Pergamon Press, Oxford, 1981, p. 516.

১২. আল-কুরআন, সুরা আর রাদ, আয়াত : ১১, (নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কোন জনগোষ্ঠীর অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে)

১৩. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩, (হে মানুষেরা ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও)

14. Michael C. Hudson, 'Islam and Political Development' in John L. Esposito, (ed.)., Islam and Development Religion and socio-political change, Syracuse University Pess, 1982, New York, pp. 3-7.

১৫. দেখুন, L. Binder, 'Crisis of Political Development' in L. Binder et. al. Crisis and Sequances in Political Development. Princeton universitys Press, new Jersey, 1971,p. 65.

১৬. দেখুন, L. W. Pye 'Identity and Political Culture' in L. Binder et. al. Ibid. pp. 101-34.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বের রাজনীতি অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, প্রায় সকল মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রে অন্ততঃ ঐ রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে জাতীয় একাত্মতা ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম প্রধান দেশসমূহের অমুসলিম অধিবাসীদের মনে একাত্মতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায়ও ইসলাম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে[১৭], যেমন 'রসূলের (সাঃ) মদিনা রাষ্ট্র'। তবে বর্তমান বিশ্বে এর উদাহরণ বিরল। অন্যদিকে ইহুদী, খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্ম সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ যে সব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশের রাজনীতিতেও এসকল ধর্মসমূহ একাত্মতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তঅমুসলিম-প্রধান দেশসমূহের মুসলিম অধিবাসীদের মানসিকতায় একই রূপ ভূমিকা পালন করতে পারে না। রাজনীতিতে জনগণের অংশ গ্রহণ ব্যতিত গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলাম তত্ত্বগতভাবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কয়েকটি দিক (জনগণের সার্বভৌমত্ব, ইহজাগতিকতা ইত্যাদি) অনুমোদন না করলেও নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন, সরকারের গঠনমূলক বিরোধিতার স্বীকৃতি, ক্ষমতা লাভের ভিত্তি হিসেবে জনসমর্থন ও শাসনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রভৃতি মৌলিক প্রশ্নে ইসলামের সঙ্গে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কোন বিরোধ নেই। জন সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল সরকারকেই বর্তমানে বৈধ সরকার বলে ধারণা করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহের শাসকগণ বৈধতা অর্জনের জন্য জনগণের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহারে প্রয়াস পান। মুসলিম প্রধান দেশসমূহও এর ব্যতিক্রম নয়।[১৮] জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার প্রসার, রাজনৈতিক উন্নয়ণ প্রভৃতি প্রপঞ্চের সঙ্গে ইসলামের কোন বিরোধ নেই।

ইসলাম ধর্ম হলেও মুসলমানের নিকট এটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবেও সমাদৃত। ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী মুসলমানগণ রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বোক্ত প্রপঞ্চসমূহ অনুমোদন করলেও ইহজাগতিক রাজনীতি অথবা ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথকীকরণ সম্পর্কিত ধারণা অনুমোদন করে না। এঁদের ধারণায়, সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাস মানুষকে উদার করে এবং সব মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। ধর্ম মানুষকে নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। পরকালের ভয়, অন্যায়- অবিচার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে মানুষকে সহায়তা করে। বাস্তবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় এখানে পাশ্চাত্য শক্তি মুসলমানদের বিভক্ত করতে সমর্থ হয়েছে , যার ফলে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি আজ বহুধা বিভক্ত ।

---

১৭. Myron Weiner, The Politics of South Asia,' in G.A. Almond and J.S. Coleman (eds.), op. cit., p. 179, আরও দেখুন D.E. Smith, *Religion and Politics in Burma*, Princeton University Pess, New Jersey, 1965. p. 320.

১৮. দেখুন, D.E. Smith, Religion and political Development op. Binnaz Topark. Islam and Political Development in Turkey (Leiden. E.J. Brill 1981) Marjore Kelly (ed.), *Islam religion and Political life of a world Community,* Praeger, NewYork, 1984.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের উন্নয়নের উপর বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নৈতিকতার উন্নয়ন ব্যতীত মানবসম্পদের সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। ধর্ম মানুষকে মানবিকতা তথা নৈতিকতার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ ইসলাম ধর্মে যেখানে নৈতিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহের রাজনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সকল পাশ্চাত্য দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন হুবহু একই পথে অর্জন সম্ভব হয় নি। দেশ বিশেষের নিজস্ব বিশিষ্ট্য ঐ দেশের রাাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বের নানা অঞ্চলে মুসলিম প্রধান দেশসমূহের অবস্থান বিধায় এসব দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সামঞ্জস্য থাকলেও ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক বিকাশ সহ নানা ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য। ফলে মুসলিম প্রধান দেশসমূহের রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমরূপ না হওয়াই স্বাভাবিক। আবার মুসলিম ঐক্য সৃষ্টিতে উল্লেখিত সাদৃশ্য সুদৃঢ় নিয়ামক হিসাবে কাজ করছে না। অন্যদিকে ঐক্য প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার অনেক কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

৮.২. মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় সমূহ

ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা আবশ্যক। আল কুরআন হচ্ছে ইসলামের মূল উৎস। ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাই মুসলমানদেরকে কোরআন অনুসারে 'মুমিন' হতে হবে। সত্যিকার 'মুমিন' তিনিই যিনি কোরআন নির্দেশিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত জীবন-বিধান ইসলাম অনুসরণ করেন। এক কথায়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ আনুযায়ী সামগ্রিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মুসলমানদের মধ্যে কাঙ্খিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[১৯] আল কুরআন ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশনা সকল মুসলামানের পক্ষে সমরূপে অনুধাবন অক্ষমতাই মুসলিম অনৈক্যের প্রধানতম কারণ বলে ধারণা করা হয়। কোরআনের ভাষা অত্যন্তউঁচুমানের আরবী। অনারব ও অপ্রাজ্ঞ আরব মুসলমানদের পক্ষে কোরআনের মর্মবাণী অনুধাবন সুকঠিন। এছাড়া কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে[২০] সে সবের মর্মবাণী বিভিন্ন তাফসীরে এসেছে। তবে এ বিষয়ে আল্লাহই সংকেতপ্রতিম এ আয়াতসমূহের মর্মকথা সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। এ সব কারণে ইসলানের প্রথম যুগেই বিভিন্ন প্রশ্নে মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে মতাভিন্নতা দেখা দেয়। কাদ্‌রিয়া, জাবারিয়া, মুতাযিলা, আশারীয়া, সুফীবাদসহ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্নে মুসলমানদের মতান্তর ক্রমান্তয়ে বাড়তে থাকে।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মপালন পদ্ধতি, সমাজ ও রাজনীতির কিছু বিষয়সহ বিভিন্ন প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও আল্লাহর একত্ব, সর্বশেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব, কালিমা, নামাজ রোজা, হজ্ব, যাকাত, পুনরুত্থান, পরকালীন মুক্তি, শাস্তিও শাস্তি ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য রয়েছে।

---

১৯. বিস্তারিত দেখুন, মুফতী মুহাম্মদ শাফী, *তাফসীরে মারেফুল কোরআন* (অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প) পৃ.১৯২

২০. মুতাশাবিহাত আয়াত বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু গৌণ বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য যুগে যুগে মুসলিম ঐক্যকে নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গৌণ বিষয়ের অনৈক্য মুসলিম জাহানকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। মুসলমানরা নানা দল, উপদল, ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। বিতর্কিত বিষয়াবলীতে সিদ্ধান্তপ্রদানের সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কেন্দ্রের অস্তিত্ব মুসলিম জাহানে নেই। এ কারণে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহা লব্ধ জ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হয়নি। এ কারণে মৌলিক বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ না করে গৌণ বিষয়ের মতভিন্নতা মেনে নিয়েই বৃহত্তম মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে মুসলমানদেরকে চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হিসাবে প্রধানত যে বিষয়াবলীকে মনে করা হয় তা হলো-অমুসলিম ষড়যন্ত্র, ইসলামী রাজনীতির অপব্যবহার, সন্ত্রাসবাদ (সন্ত্রাসবাদের অপবাদে),বলিষ্ঠ মুসলিম নেতৃত্বের অভাব,মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি।

৮.২.১. অমুসলিম ষড়যন্ত্র

ইসলামের বিরুদ্ধে,মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই সর্বাত্মক ভাবে শুরু করেছে ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। আল কুরআনের ঘোষণাও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিমদের প্রকৃত শত্রু হিসাবে বরাবরের মতো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে প্রধান অমুসলিম শক্তিগুলো জোটবদ্ধ হয়েছে। আলকুফরুমিল্লাতা ওয়াহিদা।[২১] মুসলিম অনৈক্যের পেছনে অমুসলিম ষড়যন্ত্র একটি বড় কারণ বলে ধারণা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের আবির্ভাব পরবর্তী কাল থেকে বৈধতা চলে আসছে। উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ইহুদী-খৃষ্টান ষড়যন্ত্রের বাইরে অন্যান্য কোন কোন ধর্মগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রও মুসলিম ঐক্যকে বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে চলেছে। মুসলমানদের বিভক্ত ও দাবিয়ে রাখার জন্য অমুসলিম বৃহৎ শক্তিসমূহ মুসলমানদের ক্ষেত্রে এক নীতি এবং অমুসলিমদের ক্ষেত্রে অন্য নীতি অনুসরণ করছে। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে গৃহীত দ্বৈতনীতি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফিলিস্তিন, ইরাক, কসোভো, আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, সুদান ও ফিলিপাইনের ঘটনাবলী উপর্যুক্ত সত্যকে দিবালোকের মত স্পষ্ট করে। মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণেই বর্তমান বিশ্বের উদ্বাস্তুদের ৯২ ভাগই মুসলামান।[২২] মুসলামানদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাইরের ষড়যন্ত্র অতীতে চলেছে, বর্তমানে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। এ আশংকা ও বিপদ সামনে রেখেই মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি ও কৌশল অর্জন করতে হবে। মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ষড়যন্ত্র দূরীভূত করা সম্ভব হলে বহিঃ ষড়যন্ত্র মুসলিম শক্তি ও ঐক্যকে শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষভাবে তেমন করতে পারবে না।

---

২১. দেখুন : প্রফেসর ড.হাসানুজ্জামান চৌধুরী, মৌলবাদ নয় ইসলাম, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.৬০

২২. দৈনিক ইনকিলাব, ৭ এপ্রিল, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের পরকালীন জীবনের পাশাপাশি ইহকালীন জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ও গৌরব লাভের জন্য শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতা অর্জন, পরমত সহিষ্ণুতা, ছোট-খাটো বিষয়ে মতানৈক্য পরিহার, বিভিন্ন মতের সমন্বয়, জনসমর্থনের ওপর নির্ভরশীল বৈধ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জাতি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হতে হবে।

৮.২.২. ইসলামী রাজনীতির অপব্যবহার

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার মুসলিম ঐক্যের পথে একটি প্রধান অন্তরায় বলে অনেকে ধারণা পোষণ করে থাকেন। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অর্থে ও তাৎপর্যে ধর্ম। ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ খোদায়ী বিধানমালায় রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি অথবা নৈতিকতা ও রাজনীতি আলাদা বিষয় নয়।[২৩] পৃথিবীর প্রায় সব বড় ধর্মকেই সমাজ জীবনে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ধর্ম বিশ্বাস মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[২৪] সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্ম প্রভাবিত রাজনৈতিক চেতনা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের রাজনীতিকে কম-বেশি প্রভাবিত করে থাকে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রসমূহও এ প্রভাবের বাইরে নয়।

তবে শিল্পায়ন, নগরায়ন, আধুনিকায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশসমূহের জনমানস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারতাবাদ ইত্যাদি ধারণা দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত নয় বলে এ সব দেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব তুলনামূলক ভাবে বেশি পরিলক্ষিত হয়। জে. এস. কোলম্যানের মতে, প্রায় সকল উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এসব দেশের নব্য সেক্যুলার এলিট গোষ্ঠিও তাই ধর্মের রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।[২৫] এশিয়ার অনেকে দেশে জাতি-রাষ্ট্রের প্রেরণা ও যৌক্তিকতা প্রদর্শনেও ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।[২৬] উর্পযুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, শুধু ইসলাম নয় অন্যান্য ধর্মও রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করেছে বর্তমানেও করছে। তবে সৃষ্টির সূচনা থেকে শাশ্বত ধর্ম তথা ইসলামের ধারাবাহিকতায় শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রচারিত ইসলাম চিরন্তন সার্বজনীন জীবনধর্ম, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম।

---

২৩. A.K.S. Lambton, Islamic Political Thought' in Joseph Schacht and C.,E. Bosworth eds. *The Legacy of Islam*, Oxford University Press, 1979, p. 404.

২৪. বিস্তারিত, J. Milton Yinger, Religion, Society and the Individual, *An Introduction to the Society of Religion*, The Macmillan Company, New York, 1967, pp. 231-34.

২৫. J.S Coleman `The Political Systems of the Developing Areas' in G.A Almond and J.S. Coleman eds. *The Politics of Developing Areas*, Princeton University Press, New Jersey, 1960, pp. 537.

২৬. Robert E. Spencer, Religion in Asian Societies' in his ed. *religion and changes in Contemporary Asia*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1971 p.11.

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-[২৭]

ان الدين عند الله الاسلام.

অধিকাংশ মুসলিম-প্রধান দেশ উন্নয়নশীল বিশ্বে অবস্থিত বিধায় এখানে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক অন্তত খৃষ্টীয় জগতের তুলনায় বর্তমানে বেশি ঘনিষ্ঠ বলে ধারণা করা যায়। আধুনিক অর্থে রাজনীতি একটি কূটকৌশল এবং এখানে বস্তুত: কোন নীতি বা আদর্শ কাজ করে না বলে অনেকে মনে করেন। এসত্ত্বেও আদর্শের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় রাজনীতিকে একেবারে আদর্শ-মুক্ত করা কখনও সম্ভব হয়নি।[২৮] তবে ধর্মকে বিশেষতঃ ইসলামকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহার প্রশ্নে মুসলিম পন্ডিতদের কেউ কেউ ঐকমত্য পোষণ করেন না। সৈয়দ হোসায়েন নছরের মতে, ইসলাম ধর্মকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচনা পর্যায়ে কুরআন ও সুন্নাহর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য, গভীরতা ও সনাতন ইসলামী গুণাবলীর ক্ষেত্র বিশেষে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যে রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ইসলামকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করবে সে দল বা গোষ্ঠী যদি পার্থিব স্বার্থান্বেষী হয় তারা গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষার্থে একে ব্যবহার করতে চাইতে পারে। ইসলামকে আধুনিক করার প্রচেষ্টাও এঁরা করতে পারেন।[২৯]

এ কারণে ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ভাবে অগ্রণী মুসলমানদেরকে অত্যন্তসচেতন ও সাবধান হতে হবে। ধর্মের রাজনৈতিক অপব্যবহার ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হবে অত্যন্তক্ষতিকর। মুসলমানদের ধর্মনিষ্ঠা যাতে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট না হয়, সে ব্যাপারেও হতে হবে সচেতন। স্মরণ রাখা দরকার যে, ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই।

৮.২.৩. সন্ত্রাসবাদ (সন্ত্রাসবাদের অপবাদ)

১৯৯০ এর দশকে বসনিয়া, কসোভা, মোডেনিয়া, চেচনিয়া, আজারবাইন, তাজিকিস্তান, কাশ্মীর, ভারত, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, সুদান ও নাইজেরিয়ায় মুসলমান এবং অমুসলমানরা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ওইসব দ্বন্দ্বে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম সশস্ত্র সংগঠন এবং আফগানিস্তান যুদ্ধের অংশ নেয়া মুজাহেদিন যোদ্ধারা।

---

২৭. আল-কোরআন, ৩: ১৯ (ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন) বিস্তারিত দেখুন, মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, ইসলামে বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি:একটি পর্যালোচনা,*ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ-২০০৮,পৃ-২৭ ।

২৮. Edward Shills, *The Intellectuals and the Power and other Essay*, Chicago University Press, 1983, Chicago, pp. 40-41.

২৯. Syed Hussein Nasr, "Present Tendencies: Future Trends" in Majorie Kelly (ed.) Islam : *The Religion and Political Life of World Community*, Praeger, New York, 1984, p. 283.

Dhaka University Institutional Repository

হানটিংটন একটি সাময়িকীর (The Economist) উদ্ধৃতি করে জানিয়েছেন, ১৯৮৩-২০০০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ১১টি এবং সম্ভবত ১২-১৬টি এবং সম্ভবত ১২-১৬টি বড় ধরনের কার্যক্রমের জন্য মুসলমানরা দায়ী। তালিকাভূক্ত সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে পাঁচটিকে সন্ত্রাসবাদের সহযোগিতাকারী রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত করেছে সেগুলো মুসলিম রাষ্ট্র এবং এভাবে বৈদেশিক বিভিন্ন সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদের সাথে যোগসাজসের জন্য তালিকাবদ্ধ করা হয়। ১৯৮০-৯৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১৭টি সামরিক অভিযানের সাথে জড়িত ছিল। International Institute of Strategic Studies-এর মতে যদিও মুসলমানরা বিশ্ব জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মাত্র, তারপরও ২০০০ সালে ৩২টি সামরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে (১৯৮০-১৯৯৪) দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যক দ্বন্দ্বে মুসলমানরা জড়িত ছিল।[৩০]

অনেক তাত্ত্বিক একে মুসলমানদের স্বভাব সুলভ ঘটনা বললেও পিছনে অনেক কারণ বিরাজমান ১১ সেপ্টেম্বর (২০০১) টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাকে 'New War' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে এটি নতুন কিছু নয়। হানটিংটেন মনে করেন, মুসলমানদের সহিংসতার এক ধরনের বহমানতা এবং পূর্বের ধরনের পরিবর্তিত রুপ। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ বিচ্ছিন্ন ভাবে এবং তুলনামুলক ভাবে সীমিত আকারে ছিল। বৈরুতে ১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ব্যারাকে আক্রমণের ফলে ২৯৯ জন নিহত হয় এবং ১৯৯৮ সালে আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে আক্রমণের ফলে ২২৪ জন নিহত হয়। বিভিন্ন মুসলমান দল এবং রাষ্ট্র এসব ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।

১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে আমেরিকানদের এবং আমেরিকান বিভিন্ন স্থাপনার উপর যে বড় বড় আক্রমণ হয়েছে তার সবগুলোই প্রায় ওসামা বিন লাদেনের যোগসাজসে সৃষ্ট। ১১ সেপ্টেম্বরের পরে প্রকাশ পায় বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে লাদেনের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক রয়েছে, যাদের পৃথিবীর যে কোন স্থানে আক্রমণ করার সকল প্রকার দক্ষকর্মী এবং সম্পদ রয়েছে বলে মনে করা হয়। তাদের কাছে রাসায়নিক এবং জীবাণু আক্রমণের সরঞ্জামাদি রয়েছে। এই প্রথম বারের মতো খোদ আমেরিকাতেও এই নেটওয়ার্ক ধবংসাত্মক আঘাত হেনেছে।[৩১] সন্ত্রাস সকল মানবিক মূল্যবোধের বিপরীত। সুতারাং চূড়ান্ত বিবেচনায় ইসলামের বিশ্বজনীন মানবতার দৃষ্টিতে এটি আত্মঘাতী।

৮.২.৪. বলিষ্ঠ মুসলিম নেতৃত্বের অভাব

পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব না হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহের নানা ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এ সব দেশের অনেকগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। এ সব আন্দোলনের নেতৃত্বকে সার্বভৌমত্ব, নেতা নির্বাচন তথা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ, অমুসলিমদের অবস্থান ও মর্যাদা, নারী অধিকার, নারী নেতৃত্ব, জনপ্রশাসন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, ক্রীড়া, সঙ্গীততথা সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে যুগোপযোগী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালাতে হবে। কিন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে সফলতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

৩০. তারেক শামসুর রেহমান, *নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৮, পৃ-৩১৯-৩২০.

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ,৩২

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কোরআন ঐক্যের ভিত্তি রূপে বর্ণ, গোত্র, জাতিগত পরিচয়কে অনুমোদন না দিলেও স্বাভাবিক পরিচয় সূত্ররূপে এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৩২] মহান আল্লাহ প্রতিটি 'কওম'-এর জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মদীনা সনদে যে উম্মাহর কথা বলা হয়েছে তা জাতি সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার কাছাকাছি। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র জতিরাষ্ট্র। মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে জাতিরাষ্ট্র কাঠামোতে আবদ্ধ মুসলিম নেতৃত্বকে উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে-ও কাজ করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের এ ঐক্য নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূরীকরণ এবং বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষায় হাতিয়ার হতে হবে। প্যালেস্টাইনের মুক্তি আন্দোলন, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, আধিপত্যবাদ বিরোধী আফগানদের সংগ্রাম, ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসন সহ বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষেত্র ও ইস্যুতে মুসলিম কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নতির জন্য একমাত্র বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কান্ডারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮.৩. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান

মুসলিম রাষ্ট্র[৩৩] সমূহের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিভিন্ন কারণে গুরুত্ব পূর্ণ। এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ ইউরোপ মহাদেশের রাষ্ট্র সমূহ আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ কিংবা আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ন অবস্থানে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের[৩৪] রাষ্ট্রসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ বিবেচিত হয়। এগুলো ধর্মীয় কারণে যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণ বিবেচনায় বিশ্বের যে কোন প্রান্তের দেশগুলোর চেয়ে অগ্রগামী অবস্থানে রয়েছে।

৩২. হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও (আল কুরআন, সুরা হুজরাত, আয়াত-১৩)

৩৩. মুসলিম রাষ্ট্রঃ মুসলিম রাষ্ট্র বলতে ওআইসির সদস্য দেশকে বুঝানো হয়েছে।

৩৪. মধ্যপ্রাচ্য নামক অঞ্চল এবং এর অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের চিহ্নিতকরণ প্রশ্নে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্ক এ অঞ্চলে বিরাজমান সমস্যাগুলোর মতোই প্রকট। মধ্যপ্রাচ্য নামটি প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন নৌ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন আলফ্রেড থেয়ার মাহান (Alfred Thayer Mahan) ১৯০২ সালে ন্যাশনাল রিভিউ (ব্রিটিশ সাময়িকী) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর The Persian Gulf and International Relations' নামক প্রবন্ধে। কিন্তু নামটি তখন ব্যবহারিক মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নামটি কিছুটা ব্যবহৃত হতে থাকে। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময় হতে নামটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে ব্রিটেন ও নামকরণ করলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের সীমানার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকেও কোন স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ১৯৪৭ সালের ১৯ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত বিতর্ক হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারী ক্রিস্টোফার মেহিউ মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, Where Precision would be required we should not use this term. এ থেকে বুঝা যায় যে, ব্রিটিশ সরকার সুনির্দিষ্ট সীমানার প্রশ্নে মধ্যপ্রাচ্য নামটি ব্যবহার করা উচিত নয় বলে মনে করে। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা নির্ধারণের প্রয়াস চালিয়েছে। Middle East Institute নামে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি সংগঠন এ ব্যাপারে চরম মত পোষণ করে। এ প্রতিষ্ঠানের মতে মরক্কো হতে ইন্দোনেশিয়া এবং সুদান হতে উজবেকিস্তান পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহানই মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। আবার সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থে মধ্যপ্রাচ্য বলতে শুধু ফারটাইল ক্রিসেন্টকে (সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইরাক ও ইসরাইলে) বুঝানো হয়েছে। (এম এ কাউসার, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, উনিশ ও বিশ শতক)

Dhaka University Institutional Repository

ফিলিস্তিন, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, সউদি আরব, কুয়েত, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, মিশর, এবং ইউরেশিয়ার দেশ তুরস্ক ঐতিহাসিক ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বলে স্বীকৃত।[৩৫] ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মান, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই এলাকার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠায় ব্রিটেন ১৯৮২ সালে এই এলাকার প্রত্যেক শেখের সাথে একই ধরনের একক সুবিধামুলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয় তার প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। স্নায়ুযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা মার্কিন সরকারকে আর গভীর ভাবে ভু-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে গুরুত্ব পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের সাথে জড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।[৩৬]

ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ধনী গরিব উভয় প্রকার রাষ্ট্র রয়েছে, অর্থাৎ উন্নত ও উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্র বিদ্যমান। কিন্ত তেল সমৃদ্ধ ধনী দেশগুলোর চিত্র ভিন্ন। তেল রপ্তানীকারী মুসলিম দেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধিহার লক্ষ্যনীয়। ধনীশালী দেশসমূহের কাছে দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে গণ্য করেনি, উপরন্ত ওই সময় পৃথিবীর প্রধান তেল বাণিজ্য আমেরিকা থেকে আরব ভূখন্ডে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়। কেবল সউদি আরবই নয় অচিরেই পশ্চিম লিবিয়া থেকে পূর্বে ইরান পর্যন্ত বিশাল ভূ-খন্ডে পারস্য উপসাগর বরাবর এলাকায় তেলের বিশাল ভান্ডার আবিস্কার এই এলাকাকে বিশ্বের নব্য শক্তিতে পরিণত করে। কেবল তাই নয়, এই নব্য তেল শক্তি বিশ্বের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে তার প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্যকে বিঘ্নিত করে। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহের ক্রমাগত ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নির্ভরশীলতা এই এলাকার তেলকে তাদের বিশ্ব বাণিজ্যের রক্ষাকবচ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।[৩৭]

ফিলিস্তিনে অবস্থিত জেরুজালেম ইবাদতগাহ পৃথিবীর তিন তিনটি প্রধান ধর্মের মুসলিম, খৃষ্টান ও ইয়াহুদী সম্মিলিত পবিত্র স্থান। সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজের অতি পবিত্র এই জেরুজালেম মসজিদ মসজিদুল আকসা বা বায়তুল আকসা যেখান থেকে মহানবী (সা.) পবিত্র মিরাজে গমন করেন।[৩৮]

বিশ্বে তেল মওজুদের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য এগিয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে রয়েছে বিশ্বের মোট মওজুদের ৫৫ শতাংশ।[৩৯] মধ্যপ্রাচ্যে যে কটি দেশ এই তেল সম্পদের মালিক তারা হচ্ছে ঃ

---

৩৫. এম এ কাউসার, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ.৯

৩৬. ড. কে টি হোসাইন, মুসলিম বিশ্বের সম্পদ ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভবনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ-৬৩১ এবং সফিউদ্দিন জোয়ারদার, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬৩

৩৭. তারেক শামসুর রেহমান, *বিশ্ব রাজনীতি ১০০ বছর*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৭৫

৩৮. খান আনসারু-দ-দীন অহমাদ, পবিত্র গ্রন্থসমূহের আলোকে ইসরাইল সমস্যা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮০৪.

৩৯. তারেক শামসুর রেহমান, *নয়া বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৬ এর ব্র্যাকেটে বিশ্বের রিজার্ভের কত অংশ তেলের মওজুদ মুসলিম বিশ্বে তা দেখানো হয়েছে। তেল মওজুদের এই পরিমাণ থেকে উপসাগরের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। একই ভাবে সারণি-১৩তে অঞ্চলভিত্তিক তেলের রিজার্ভ দেখানো হয়েছে।

সারণি : ২১

বিশ্বে গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ

দেশ	রিজার্ভ (ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট)	উৎপাদন (বিলিয়ন কিউবিক মিটার)	রিজার্ভের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক
কাতার	৯১০.১	৩৯.২	৬৫৭.৭
ইরান	৯৭০.৮	৮৫.৫	৩২১.৬
আরব আমিরাত	২১৩.৯	৪৫.৮	১৩২.৩
সৌদি আরব	২৩৮.৪	৬৪.০	১০৫.৫
রাশিয়া	১৬৯৪.৪	৫৮৯.১	৮১.৫
আলজেরিয়া	১৬০.৪	৮২.০	৫৫.৪
তুর্কমেনিস্তান	১০২.৪	৫৪.৬	৫৩.১
মালয়েশিয়া	৮৭.০	৫৩.৯	৪৫.৭
ইন্দোনেশিয়া	৯০.৩	৭৩.৩	৩৪.৯
উজবেকিস্তান	৬৫.৭	৫৫.৮	৩৩.৩
নরওয়ে	৮৪.২	৭৮.৫	৩০.৪
হল্যান্ড	৫২.৭	৬৮.৮	২১.৭
আর্জেন্টিনা	২১.৪	৪৪.৯	১৩.৫
যুক্তরাষ্ট্র	১৮৬.৯	৫৪২.৯	৯.৮
কানাডা	৫৬.৬	১৮২.৮	৮.৮
ব্রিটেন	২০.৮	৯৫.৯	৬.১

(*) রিজার্ভের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে বছরের হিসেবে

সূত্র :	BP Statisticl Review of World Energy, 2005 উল্লেখ করে Michael J. Economides, The Coming Natural Gas Cartel, Foreign Policy, Web Exclusive, Posted Marck 28, 2006.

সারণি: ২২

এপেকভূক্ত দেশগুলোর সামাজিক চিত্র

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মাথাপিছু আয় (ডলার)	জিএনপি বৃদ্ধি
ওশেনিয়া			
অস্ট্রেলিয়া	১৮.৩১	২০০৯০	৩.৭
নিউজিল্যান্ড	৩.৬৩	১৫৭২০	৩.৩
পাপুয়া নিউগিনি	৪.৪	১১৫০	৭.৬
আমেরিকান			
কানাডা	২৯.৯৬	১৯০২০	১.৯
মেক্সিকো	৯৩.১৮	৩৬৭০	১.৮
যুক্তরাষ্ট্র	২৬৫.২৮	২৮০২০	২.৪
চিলি	১৪.৪১	৪৮৬০	৭.২
এশিয়া			
ব্রুনাই	.২৯	৯৬৩৫	২.৫
চীন	১২২১.৭২	৭৫০	১২.৩

Dhaka University Institutional Repository

হংকং	৬.১৯	১৫৩৬০	৫.৫
ইন্দোনেশিয়া	১৯৭.০৫	১০৮০	৭.৭
জাপান	১২৫.৭৬	৪০৯৪০	১.৪
মালয়েশিয়া	২০.৫৬	৪৩৭০	৮.৭
ফিলিপাইন	৭১.৮৯	১১৬০	২.৯
সিঙ্গাপুর	৩.০৪	৩০৫৫০	৮.৭
দক্ষিণ কোরিয়া	৪৫.৫৪	১০৬১০	৭.৩
তাইওয়ান	২১.৪৭	১২৮৩৮	৬.৭
থাইল্যান্ড	৬০.০০	২৯৬০	৮.৩
নতুন সদস্যরাষ্ট্র			
ওাশিয়া	১৪৭.০	২৪১০	৯.০
ভিয়েতনাম	৭৪.৫	২৯০	৪.৫
পেরু	২৩.৭	২৪২০	৬

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায় : সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায় : সুপারিশমালা

ওআইসিকে অধিকতর কার্যকরী বিশ্বসংস্থা হিসেবে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলে নিন্মোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(১) বিশ্বের প্রায় প্রতি ছয়জন লোকের মধ্যে একজন মুসলমান। সমস্যা হ'ল মুসলমানরা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধে সংহতি ও ঐক্যকে অবলম্বন না করে বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ ও তাদের যোগাযোগকে সুদৃঢ় করে শক্তিশালী হয়েছে, হচ্ছে, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হচ্ছে, বিভেদে জড়িয়ে পড়েছে, মতপার্থক্য বাড়ছে, এমনকি যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ওআইসি'র বড় দায়িত্ব হ'ল সকলের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় করে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

(২) বিশ্বে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকল বর্ণ, ধর্ম, এবং জাতির উন্নয়ন করতে হবে। বিশ্ব সংস্থা হিসেবে ওআইসিকে এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে।

(৩) মুসলিম দেশে অমুসলিম সংখ্যালঘু এবং অমুসলিম দেশে মুসলিম সংখ্যালঘু উভয় ধরনের মানুষের জন্য ওআইসি বর্তমানে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ওআইসিকে আরও দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত করতে হবে যে, ইসলামের অনুশাসন যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিম সরকার কিংবা মুসলিম জনগণ অমুসলিমদের প্রতি ন্যায় ও নিরপেক্ষ আচরণ করতে পারে। সকলের মধ্যে উগ্র-জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় করনীয় নির্ধারণ করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৪) ইসলামী বিশ্ব সম্পদশালী হলেও অধিকাংশ দেশ ও জনগণ অর্থনৈতিক ভাবে গরীব ও দুর্বল। এ সকল দেশে তেল-গ্যাস সহ খনিজ সম্পদ এবং মানবসম্পদ প্রচুর রয়েছে, কিন্ত এর যথাযথ উত্তোলন ও যাবতীয় প্রক্রিয়া সহ অর্থনৈতিক ব্যবহার হচ্ছে না বা এসব দেশ সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহারে সক্ষম নয়। পশ্চিমা বিশ্ব এখন শিক্ষা-বিপ্লবকে অতিক্রম করে তথ্য-বিপ্লবে পা দিয়েছে-জয় করেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম উৎকর্ষতা অর্জন করছে। এমতাবস্তায় সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সদস্যভুক্ত দেশসমূহের প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে ওআইসিকে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

(৫) ওআইসিকে সংস্কার করতে হবে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এর সাংগঠনিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে। এর ইমেজ সংকট রয়েছে। ইমেজ সংকট কাটিয়ে উঠতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মুসলিম বিশ্বকে শক্তিশালী করার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক ভাবে পারস্পরিক বোঝা-পড়ার অবস্থান তৈরী-পূর্বক শক্তি অর্জন করতে হবে। এ শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্য হবে পাশ্চাত্য শক্তির সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক সৃষ্টি ও পরস্পরকে বোঝা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ওআইসি'র পর্যবেক্ষক সদস্য বৃদ্ধি করতে হবে। ইউএস এ (আমেরিকা), চীন, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোকে পর্যবেক্ষক সদস্য করতে হবে। কারণ বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ এসব দেশের এবং এসব দেশ ও সংস্থা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে বা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

(৭) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মত ওআইসিকে একটি পরিষদ গঠন করতে হবে। ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের ক্ষেত্রে এই পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।

(৮) জাতিসংঘের শান্তি মিশনের মত ওআইসি শান্তি মিশন কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

(৯) ইসলামিক কমন মার্কেটের ধারণাকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(১০) ওআইসি জাতিসংঘের সমান্তরাল প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ব সংস্থা তো নয়ই বরং বিশ্ব শান্তির সহায়ক ও সম্পূরক সংস্থা হিসেবে যথাযথ শক্তি অর্জনে প্রয়োজনীয় সকল দিক থেকে অগ্রগামী থাকতে হবে।

(১১) উগ্র-মুসলিম জাতিয়তাবাদী, মুসলিম সন্ত্রাসবাদ, পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব লালন এবং তৈরী, আভ্যন্তরীণ আন্তঃজাতীয় শান্তি বিনষ্টকারী সংগঠন পরিচালনা ইত্যাদি নেতিবাচক কার্যক্রম থেকে মুসলিম বিশ্বকে নিরাপদ রাখার জন্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা গ্রহনে ওআইসির শক্তি অর্জন যেমন প্রয়োজন তেমনি মুসলিম বিশ্বের বাইরে থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী কোন আগ্রাসী অভিযান ও চাপিয়ে দেয়া নির্যাতন-নিপীড়নের অবসান কল্পে সংহত ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ পূর্বশর্ত স্বরূপ বিবেচ্য। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুসলিম বিশ্বে অমুসলিম বিরোধী যে কোন সন্ত্রাসী-এর উৎস হচ্ছে বিভিন্ন ছল-ছুতোয় আগ্রাসন ও নিপীড়ন। এটাও বাস্তবতা, মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়াধর্মী এর পাল্টা কর্মসূচীকে অনেকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংগ্রাম হিসেবে দেখে। সুতরাং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ওআইসি'র কর্মকান্ডকে ক্রিয়া-প্রতিক্রয়ার উভয় দিকটিকেই যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনাপূর্বক কর্মকান্ড পরিচালনা করেতে হবে। কথিত সন্ত্রাস উস্কে দেয়া থেকে সকল আগ্রাসী শক্তিকে নিবৃত্ত রাখার গুরু দায়িত্ব পালনই মুসলিম বিশ্ব ও বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত বিবেচিত হওয়া উচিত।

(১২) এ প্রেক্ষিতে প্রধান কাজ হবে আন্ত:ধর্মীয় সহাবস্থান ও ইসলামে বিশ্বশান্তির ধারণা, আদর্শ ও লক্ষ্যকে বিশ্ব ব্যাপী তুলে ধরা এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ গ্রহণ করা।

(১৩) চার্টার সংশোধন করে প্রতি বছর ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজনের ব্যবস্থা করলে সংস্থাটি আরো শক্তিশালী হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিবছর একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ থাকবে, এ সুনির্দিষ্ট তারিখে সুনির্দিষ্ট স্থানে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সুনির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে শীর্ষ সম্মেলনের জন্য যেমন সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সৌদি আরবের জেদ্দায়। তেমনি এর আঙ্গিক বৃদ্ধি করে স্থায়ী ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন ভবন তৈরী করা প্রয়োজন। তা সৌদি আবরে অথবা সকলের সম্মতিতে অন্য কোন দেশে। এতে সংগঠনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠতে সহায়তা করবে। একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, যে কোন বিরোধ অথবা কোন রাষ্ট্রের নেতিবাচক মনোভাব একে স্থায়ী কাঠামোভুক্ত করতে যেন বাধ না সাধে যে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

''বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা'' জ্ঞানের জগতে নতুন একটি সংযোজন। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে যেমন ইতোপূর্বে তেমন কোন ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়নি, তেমনি অন্যান্য ভাষায়ও এ বিষয়টি ছিল অনেকটা উপেক্ষিত। এ বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের প্রকাশনাও স্বল্প। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ এবং ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্র হওয়ায় এ বিষয়টি আমি পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য গবেষণার বিষয় হিসেবে মনোনীত করি। আমার অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক ও তথ্যমূলক আলোচনা ব্যাপকভিত্তিক হওয়ায় প্রাসঙ্গিক দিকগুলো এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় অত্যন্ত সতর্কভাবে অধ্যায় বিভাজন ও বিন্যাসের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ গবেষণা-কর্মটি মোট নয়টি অধ্যায়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। ভূমিকায় গবেষণা কর্মটির পটভূমি, প্রেক্ষিত পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি, প্রকাশনা পর্যালোচনা, অধ্যায় পর্যালোচনা এবং গবেষণা-কর্মটির যৌক্তিকতা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ইসলামে বিশ্বশান্তির ধারণা'। এখানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামে কি কি শিক্ষা রয়েছে পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত করে এর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায় মহানবী (সা) কি ভাবে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রতিটি পর্যায়ে কিভাবে শান্তি অন্বেষণ করেছেন, প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে বিশ্বশান্তির বার্তা গ্রহণ করার জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে বলে মনে করি। একই সাথে অমুসলিম পন্ডিতগণ মহানবী (সা) এর কার্যক্রমকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু বর্ণনা রয়েছে। যেহেতু আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি 'বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা' শীর্ষক, সেহেতু বিশ্বশান্তির সর্বোচ্চ অবলম্বন ইসলামের শান্তি প্রচেষ্টাকে জানা ও বুঝা এবং তদানুসারে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা গ্রহণ করাই যৌক্তিক। সে তাগিদ থেকেই প্রথম অধ্যায়ে এ সকল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম, 'সমকালীন অবস্থা ওআইসি প্রতিষ্ঠা'। এ অধ্যায়ে ওআইসি প্রতিষ্ঠার পটভূমি, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং শান্তি ও সংঘর্ষ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি ''বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা'' শীর্ষক বিধায় ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ এবং ওআইসি প্রতিষ্ঠা লাভের পর্যায়গুলো এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এজন্য এ বিষয়ে পাঠকমহলের কৌতূহলের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে। 'শান্তি' বিষয়টি শিরোনামের অংশ, এজন্য এ বিষয়ে তাত্ত্বিকদের ভাবনা পর্যালোচনাপূর্বক শান্তি এবং সংঘর্ষ বিষয়ে এ অধ্যায়ে ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ওআইসি পরিচিতি ও এর সংস্থাসমূহের কার্যক্রম'। ইতোমধ্যে ওআইসি যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন তা আলোচিত হয়েছে, আলোচ্য অধ্যায়ে ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ কারণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসি প্রতিষ্ঠা, সংস্থাটির লক্ষ্য উদ্দেশ্যে উল্লেখপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ওআইসির সাংগঠনিক কাঠামো, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সম্মেলন, স্থায়ী কমিটি, সচিবালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত, স্বাধীন স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন, সহযোগী সংস্থাসমূহ, বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠাসমূহের বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচন- পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি'। এ অধ্যায়ে ওআইসির ৫৭টি সদস্য রাষ্ট্র এবং ওআইসি'র পর্যবেক্ষক ৫টি সদস্য রাষ্ট্রের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ওআইসির ১০টি পর্যবেক্ষক সদস্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্র। ওআইসি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে কাদের নিয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে তাদের পরিচিতি জানা আবশ্যক বলে বিবেচিত হওয়ায় আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ওআইসির সম্মেলনসমূহ ও কার্যক্রম'। আলোচ্য অধ্যায়ে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ, ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সমূহের সিদ্ধান্তসমূহ এবং ওআইসির সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণের ভাষণ উল্লেখপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে। কোন সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য সে সংস্থার নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তাবলী ও বক্তব্য আলোচনা-পর্যালোচনা প্রয়োজন। তবে যেহেতু আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি শুধুমাত্র ওআইসির কার্যক্রম ভিত্তিক নয় বরং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসির ভূমিকা শীর্ষক, সেহেতু এখানে সকল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কিংবা ঘোষণা এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়নি। বরং নমুনা হিসেবে কয়েকটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও রাষ্ট্রপ্রধানগণের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে থেকে নবম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের এক জনের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে কলেবরও সীমাবদ্ধ রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্থ রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যানের লক্ষ্যে ওআইসির কার্যক্রম'। ওআইসির সনদের ২৭ ধারায় বলা হয়েছে, ''ওআইসি'র সদস্যরাষ্ট্রসমূহ যারা কোন বিরোধের পক্ষভুক্ত এবং যে বিরোধের ফলে ইসলামী উম্মাহ বা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে তার সমাধানের জন্য উদ্যোগ, আলোচনা, তদন্ত, মিমাংসা, সালিশি, বিচারিক নিষ্পত্তির অথবা তাদের পছন্দ অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারে''। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমস্যাগ্রস্থ রাষ্ট্রের বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছে। সমস্যাগ্রস্থ দেশসমূহে শান্তির লক্ষ্যে ওআইসি'র কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা বিশেষ করে বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, কাশ্মীর ও কুয়েতের অবস্থাসহ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ওআইসির কার্যক্রম মূল্যায়নঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি'। ওআইসি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এর বিশাল প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে একটি সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য রয়েছে। সংস্থাটির যেমন সফলতা রয়েছে প্রচুর, তেমনি এর ব্যর্থতাও কম নয়। এজন্য এ বিশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থার আলোচনার পাশাপাশি রয়েছে সমালোচনা। আলোচ্য অধ্যায়ে ওআইসির সমালোচনা, সফলতা, জাতিসংঘের সাথে শান্তি কার্যক্রম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক এবং মানবিক বিষয়সহ এ সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম ' ইসলামের আলোকে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি'। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে একটি ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। বিশেষ করে যে জাতি বা গোষ্ঠি এ লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে তাদের নিজেদের মধ্যে সর্বাগ্রে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ইসলাম যেহেতু সকল সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির শান্তির লক্ষ্যে এর অভ্যুদয়কালীন সময়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, যেহেতু বিশ্বশান্তির নমুনা ইসলামে বিরাজমান, সেহেতু ইসলামের আলোকে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং এ মহৎ কাজের অন্তরায়সমূহ কি কি তা এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের নাম 'সুপারিশমালা'। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি শুধুমাত্র একটি গবেষণাকর্ম নয় বরং এটি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দিক নির্দেশনাও বটে। এ অভিসন্দর্ভটি পাঠ এবং আলোচনা-পর্যালোচনার ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী মানুষের কাছে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচিত হবে। বিধায়, ওআইসিকে অধিকতর কার্যকরী বিশ্বসংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলে অত্র অধ্যায়ে উল্লেখিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে ফলপ্রসু ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

উপসংহারের মাধ্যমে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করা হয়। পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর পরিশিষ্ট-১ এ ওআইসির সনদের (১৪ মার্চ ২০০৮ তারিখে সংশোধিত) বাংলা অনুবাদ, পরিশিষ্ট-২-এ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য জাতিসংঘ সনদের ধারা ২৩ থেকে ধারা ৫৪ পর্যন্ত বাংলা অনুবাদ এবং সর্বশেষে ওআইসির ১৪ মার্চ, ২০০৮ তারিখে সংশোধিত ইংরেজি চার্টার পরিশিষ্ট ৩-এ উল্লেখ করা হ'ল।

মহানবী (সা.)-এর সময়ে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রচার-প্রসার হলেও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে এর প্রচারে, প্রসারে আরও ব্যাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মতভেদ, মতানৈক্য ও দলাদলি সৃষ্টি হলেও উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে মুসলিম বিশ্বের ব্যাপ্তি ছিল সুপ্রশংসিত। বিশ্বের অর্ধেকের বেশি যে সভ্যতা শাসন করে এক পর্যায়ে সে সভ্যতার আলোক রশ্মি স্তিমিত হতে থাকে। উনবিংশ শতকে এ ধারা আরো অবনতির দিকে ধাবমান হলে এ শতকের শেষের দিকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ধারণা শাসক শ্রেণীর নিকট গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতকে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ এ ধারণাকে আরো গতিশীল করে তুলে। মুসলিম শাসক শ্রেণীর ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার এক পর্যায়ে ১৯৬৯ সালে 'আল কুদস' তথা বায়তুল মোকাদ্দাস ইহুদীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে এর প্রতিবাদে ওআইসি বাস্তবে রূপ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

যে কারণে ওআইসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে আজও তা উদ্ধার কিংবা এ সমস্যার সমাধান হয়নি। এ যেমন বাস্তবতা, তেমনি বাস্তবতা হ'ল মুসলিম বিশ্ব নতুন নতুন সমস্যায় আরো ভারাক্রান্ত। কিন্তু ওআইসি সকল সমস্যা ও মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে আশানুরূপ কর্মকান্ড উম্মাকে দেখাতে না পারলেও এটি একটি বিশ্বসংস্থা হিসেবে ঋজু অবস্থান নির্মাণ করতে পেরেছে বলেই উদ্ভূত সমস্যায় মাঝে মধ্যে আলোকবর্তিকা দৃশ্যমান হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় ও পরবর্তীতে এ সংস্থার সহযোগিতা, ফিলিস্তিনে মুসলিম নিধন বন্ধ এবং তাদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির দৃষ্টি আকর্ষণ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ, বসনিয়া-হারজিগোভিনায় মুসলিম নিধন বন্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা, ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণের পর কার্যকরী উদ্যোগ, আফগানিস্তানের মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা, কাশ্মীরের মুসলমানদের অধিকার প্রদানের বিষয়ে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ, মালি, উগান্ডা, লিবিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, সাইপ্রাস, আলবেনিয়াসহ যে সকল দেশে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা হচ্ছে অথবা তাদের অধিকারের বিষয়ে অন্যজাতি হস্তক্ষেপ করছে, সেখানেই ওআইসি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে আমার প্রত্যাশা, 'বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসি'র ভূমিকা' অভিসন্দর্ভটি পাঠে পাঠক যেমন ওআইসি'র পরিচিতি জানতে পারবেন, তেমনি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওআইসির কার্যকরী উদোগের বিষয়েও অবহিত হতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর-২০০২

আরবী ও উর্দু গ্রন্থাবলী

২। আবু আবদিল্লাহ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ১ম সং, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল-আরাবিয়্যাহ মিশর, ১৩৮২/১৯৬৩

৩। আবু ইসহাক নাইসাপুরী, *আল-কাশফ ওয়াল-বয়ান 'আন-তাফসীরিল কুরআন*, তা.বি.

৪। আবু উমার উসমান ইবন আবদির রহমান, *মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, ফী উলুমিল হাদীস, হিন্দুস্তান, হি, ১৩৫৭

৫। আবু বকর আহমদ আল-জাসসাস, *আহকামুল-কুরআন*, লাহোর, সুহাইল একাডেমী, তা.বি.।

৬। আবু বকর ইবন হিদায়াতুল্লাহ, *তাবাকাতুশ শফিঈয়্যাহ*, মাতবাআহ বাগদাদ, তা.বি.

৭। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবন ফুরাক, *কিতাবু মুশকিলিল হাদীস ওয়া বায়ানিহী*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০০/১৯৮০

৮। আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম আর-রাযী, *কিতাবুল জারহ ওয়াত-তা'দীল*, ১ম সং, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৭২/১৯৫২

৯। আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরা'আতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান*, বৈরুত,দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

১০। আবু মুহাম্মদ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-আইনী, *উমদাতুল কারী*, দারুল ফিকর, মিশর, তা.বি.

১১। আবু মুহাম্মদ হুসাইন আল-গাযালী আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত-তানযীল*, মিশর, ১৩৩১ খ্রি.।

১২। আবু মুহাম্মদ হুসাইন আল-গাযালী, *জাওয়াহিরুল কুরআন*, কুরদিস্তান, আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩২৯ হি.

১৩। আবু মুহাম্মদ হুসাইন আল-গাযালী, *কাওয়া'ইদুল আকাইদ*, কায়রো, ১৩৯০ হি.১৯৭০ খ্রি.।

১৪। আবুল লাইছ নাসর ইবন মুহাম্মদ আস-সমরকান্দী, *তাফসীর বাহরুল উলূম*, তা.বি.

১৫। আব্দুল্লাহ বায়যাবী, *আনওয়ারুত-তানযীল*, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়াহ, তা.বি.

১৬। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, *সীরাতু আহমদ ইবন তূলূন*, মাতবাআতুত তারাক্কী, দিমাশক, ১৩৫৮/১৯৩৯

১৭। আবুল বারকাত আব্দুল্লাহ আল-নাসাফী, *মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকাইকুত-তা'ভীল*, দেওবন্দ, ইদারা-ই-ফিকরি ইসলামী, তা.বি.

১৮। আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন উমার ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, বৈরুত, দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি/১৪০৭ হি.।

১৯। আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবন উমার ইবন কাছীর, *রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল-জিহাদ*, কায়রো, মাতবাআতু আবীল হাওল, ১৩৪৭ হি.।

২০। *আবুল ফিদা, আল মুখতাসার ফী আখবারিল বাশার*, ১ম সং, ১ম সং, দারুত-তাবাআতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, তা.বি.

২১। আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবন উমার ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল-আযীম*, বৈরুত, দারুল-মা'রিফাহ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

২২। আবুল মাহাসিন আল হুসাইনী, *যায়লু তাযকিরাতিল হুফফায*, দামিশক, মাতবাআতুত-তাওফীক ১৩৪৭ হি.

২৩। আবুল হাসান আলী নদভী, *তারীখ-ই দাওয়াত ওয়াআযীমত*, ২য় সং, মাজলিস-ই তাহকীকাত ওয়া নাশারিয়াত ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ১৪০৩/১৯৮৩

২৪। আবুল হাসান আস-সাখাভী, *তুহফাতুল আহবাব ওয়া বুগয়াতুত তুল্লাব ফিল খিতাতি ওয়াল-মাযারাত ওয়াত-তারাজুম ওয়াল-বুকাইল মুবারাকাত*, মাতাবাউল উলুম ওয়াল আদাব, কায়রো, ১৩৫৬/১৯৩৭

Dhaka University Institutional Repository

২৫। আবুল ফালাহ আবদুল হাই ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, ১৩৫০/১৯৩২

২৬। আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ*, ২য় সং, মাতবাআতুল-আরাবিয়্যাহ, মিশর, ১৩৪৭/১৯২৮

২৭। আবদুল-ওয়াহাব ইবন তাকিইয়্যুদ্দীন আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা*, ১ম সং, আল মাতবাআতুল হুসায়নিয়াহ, মিশর, তা.বি.

২৮। আবদুল ওয়াহাব ইবন তাকিইয়্যুদ্দীন আস-সুবকী, *মুঈদুন-নিআম ওয়া মুবীদুন নিকাম*, তাহকীক মুহাম্মদ আলী আল-নাজ্জার, দারুল কুতুবিল আরাবী, মিশর, ১৯৬৭/১৯৪৮

২৯। আবদুল ওয়াহাব আশ-শারানী, *কিতাবুল মীযান*, ১ম সং, আল-মাতবাআতুল হুসাইনিয়্যাহ, মিশর, ১৩২৯/১৯১১

৩০। আব্দুল কারীম আস-সামআনী, *আল-আনসাব*, বৈরুত, দারুল জিনান ১৯৮৮ খ্রি.

৩১। আবদুল কাদির আল-কুরাশী, *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, ১ম সং, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩৩২/১৯১৪

৩২। আবদুর রহমান ইবন আবদুল হিকাম, *ফাতহ মিশর ওয়া আখবারিহা, মাতবাআহ ব্রীল*, লাইডেন,১৯২০ খ্রি.

৩৩। আবদুর রহমান ইবন আলী ইবনুল জাওযী, , *আল-মুনতাযাম ফী তা'রীখিল মুলূকি ওয়াল-উমাম*, ১ম সং, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দরাবাদ, ১৩৫৭/১৯৩৮

৩৪। আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তা'রীখুল খুলাফা*, করাচী, নুর মুহাম্মদ কারখানা ই তিজারাতে কুতুব, তা.বি.

৩৫। আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারাহ ফী আখবারি মিশর ওয়াল-কাহিরাহ*, মিশর, মাতবাআতু ইদারাতিল ওয়াতান, তা.বি.

৩৬। আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, কায়রো, মাকতাবুত ওয়াহবাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রি./১৩৯৬ হি.

৩৭। আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়তী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, দিল্লী, মাকতাবাতু ইশাআতিল ইসলাম, তা.বি.

৩৮। আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *বুগয়াতুল উয়াত*, দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি

৩৯। আবদুল মাজীদ মাহমুদ, *আবু জাফর আত তাহাভী ওয়া আসারুহ ফিল-হাদীস*, ১ম সং, আল মাজলিসুল 'আলা লিরি'আয়াতিল-ফুনূন ওয়াল-আদাব ওয়াল-উলূমিল ইজতিমাইয়্যাহ, কায়রো, ১৩৯৫/১৯৭৫

৪০। আবদুল হালীম চিশতী, *আল-বিযাআতুল মুযজাত লিমান ইউতালিউল-মিরকাত*, ১ম সং, মাজলিসু ইশাআতিল মাআরিফ, মুলতান, পাকিস্তান, ১৩৯০/১৯৭০

৪১। আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাহ আল-মুসতাতরাফা লি-বায়ানি মাশহুরি কুতুবিস-সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ*, দারুল ফিকর তা.বি.

৪২। মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরাআন*, বৈরুত, মু'আসসাসাতুর-রিসালাহ, ১৯৮৩ খ্রি.

৪৩। আল-হাফিয যাহাবী, *আল-ইবার ফী খাবরে মান গাবার*, বৈরুতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

৪৪। আব্দুস সালাম নদভী, *ইমাম রাযী*, লাহোর, ইদারা-ই ইসলামিয়াহ, ১৯৮৮ খ্রি.

৪৫। আলী ইবন আবিল মুকাররাম আবুল হাসান ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, মিশর, দারুশ-শা'বা তা.বি.

৪৬। আলী ইবন আবিল মুকাররাম আবুল হাসান ইবনুল আছীর, *আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব*, কায়রো, মাতবা'আতুল কুদসী, ১২৫৮ হি.

৪৭। আলী ইবন আবিল মুকাররাম আবুল হাসান ইবনুল আছীর, *আল-ইবার ফী খাবরি মান গাবার*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা.বি.

৪৮। আলী ইবন আবিল মুকাররাম আবুল হাসান ইবনুল আছীর, আল-*কামিল ফিত-তা'রীখ*, বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.

৪৯। আলী ইবন মুহাম্মদ আল বুযদুবী, *আল উসূলুল বুযদুবী*, পাকিস্তান, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

৫০। আলী ইবনুল হাসান ইবন আসাকির, *তা'রীখু দিমাশক*, ২য় সং, দারুল মাসীরাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯

৫১। আল্লামা ইউসুফ খায়রুদ্দীন, *আল মু'তাসার মিনাল-মুখ্‌তাসার মিন মুশকিলিল আছার*, ২য় সং, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, দক্ষিণাত্য, ১৩৬২/১৯৪৩

৫২। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *হুসনুল মুহারাহ ফী আখবারি মিশর ওয়াল-কাহিরাহ*, মাতাবাআতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিশর, ১২৯১/১৮৮২

৫৩। আল্লামা জালালুদ্দীন, *দুররুস সাহাবাহ ফী মান দাখালা মিশর মিনাস-সাহাবাহ*, মূলঃ হুসনুল মুহাদারাহ, তা.বি.

৫৪। আল্লামা জালালুদ্দীন, *লুববুল লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব*, Lugduni Batavourum, Aphdb E.J. Brill, Cademiae Typogrhphum, 1851

৫৫। আল্লামা জালালুদ্দীন, *আত তাআককুবাত আলাল মাওদূআত*, হিন্দুস্তান, ১৩০৩/১৮৮৯

৫৬। আল্লামা জালালুদ্দীন, *মানাহিলুস সাফা ফী তাখরীজিশ শিফা*, হিন্দুস্তান, ১২৭৬/১৮৬০

৫৭। আল্লামা জালালুদ্দীন, *তাদরীবুর রাবী শারতু তাকরীবিন নববী' আল-মাতবাআতুল খায়রিয়্যাহ*, মিশর, ১৩৫৭/১৯৩৮

৫৮। আল্লামা জালালুদ্দীন, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ৩য় সং, মাতবাআহ মুসতাফা আল-বাবী, মিশর, ১৩৭০/১৯৫১

৫৯। আল্লামা তাহির ইবন সালিহ ইবন আহমাদ আল-জাযাইরী, *কিতাবু তাওবীহিন-নযূর ইলা উসূলিল 'আসর*, আল-মাতবাআতুল জামালিয়্যাহ, মিশর, ১৩২৯/১৯১১

৬০। আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আবদির রহমান আস-সাখাভী, *আল মাকাসিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাসীরিম মিনাল আহাদিল মুশতাহারা আলাল-আলসিনাহ*, হিন্দুস্তান, ১৩০৪/১৮৮৭

৬১। আল্লামা হাকীম আহমদ হুসাইন উসমানী, *তারিখে ইবনে খালদূন (উর্দূ)*, নাফীস একাডেমী করাচী, ১ম সংস্করণ

৬২। আহমদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'আরাবী, একাদশ সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রি.।
আঈনী, ইকদুল-জিনান, মিশর, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি।

৬৩। আহমাদ আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দী, *কিতাবু সুবহিল আ'শা*, আমীরিয়্যাহ প্রেস, কায়রো, ১৩৩২/১৯১৪

৬৪। আহমাদ আমীন, *যুহ্‌রুল ইসলাম*, ৩য় সং, মাতবাআতুল লাজনাহ ওয়াত-তা'লীফ, কায়রো, মিশর, তা.বি.

৬৫। আহমাদ আবু বকর আল-বায়হাকী, *কিতাবু মা'রিফাতিস সুনান ওয়াল-আছার*, আবু সালমাহ শফী আহমাদ বিহারী, পাটনা, ভারত, তা.বি.

৬৬। আহমাদ ইবন আলী আল-মাকরীযী, *খিতাতুল মাকরীযিয়্যাহ*, নতুন সং, দারু সাদির, বৈরুত, ১৩২৪/১৯০৬

৬৭। আহমাদ ইবন আলী আল-খাতীব, *তা'রীখু বাগদাদ*, ১ম সং, মাকতাবাতুল খাঞ্জী, কায়রো, ১৩৪৯/১৯৩১

৬৮। আহমাদ ইবন আলী আল-খাতীব, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, ভারত, ১৩৫৭/১৯৩৮

৬৯। আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ সফিয়্যুদ্দীন খাযরাজী, *খুলাসাতু তাযহীব তাযহীবিল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, ৩য় সং, মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯

৭০। আহমাদ ইবন আবদিল হালীম আবুল আব্বাস তাকীয়্যুদ্দীন ইবন তায়মিয়্যা, *মিনহাজুস-সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ'বূলাক*, মিশর, ১৩২২/১৯০৪

৭১। আহমাদ আমীন, দূহাল ইসলাম, ৭ম সং, মাকতাবাতুন নাহয়া ওয়াল মিসমিয়্যাহ, কায়রো, তা.বি.

৭২। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-তাহাভী, *শারহু মাআনিল আছার*, ১ম সং, এডুকেশনাল প্রেস, করাচী, ১৩৯০/১৯৭০

৭৩। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-তাহাভী, *ইখতিলাফুল-ফুকাহা*, ১ম সং, মাতবাআতু মা'হাদিল আবহাসিল ইসলামিয়্যাহ' ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৩৯১/১৯৭১

৭৪। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-তাহাভী, *আল-জামিউল কাবীর ফিশ শুরু* ত, প্রকাশক,

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ শাখত, আহমাদ ইহসান প্রেস, ১৯২৯

৭৫। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-তাহাভী, *মুখতাসারুত-তাহাভী*, ১ম সং, দারু ইহইয়াইল উলুম, বৈরুত, ১৪০৬/১৯৮৬

৭৬। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-তাহাভী, *আল-আকীদাতুত-তাহাভিয়্যাহ*, ১ম সং, আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা-১৯৮৪

৭৭। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-তাহাভী, শারহ *মুশকিলিল-আছার*, ১ম সং, দাইরাতুল মাআরিফ,হায়দরাবাদ, ডিকান, ১৩৩৩/১৯১৫

৭৮। আহমদ মুস্তাফা তাশকুবরা যাদেহ, *মিফতাহুস-সা'আদাহ ওয়া মিসবাহুল সিয়াদাহ*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা.বি.

৭৯। আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, *তা'রীখুল আদাবিল আরাবী*, ২৪শ সংস্করণ, তা.বি.

৮০। ইউসুফ আলবান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরীবাহ ওয়াল-মুআররিবাহ*, পাকিস্তান, মাদানী কুতুবখানা, তা.বি.

৮১। ইউসুফ ইবন আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহী*, ১ম সং, ইদারাতুত তাবাআহ আল মুনীরিয়্যাহ, মিশর, তা.বি.

৮২। ইউসুফ জামালুদ্দীন মিয়াজী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, বৈরুত, মুআসসাসাতুর-রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রি.

৮৩। ইউসুফ মুহাম্মদ বিন্নৌরী, *মাআরিফুস সুনান*, ১ম সং, আল-মাকতাবাতুল বিন্নৌরিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান, ১৩৮৩/১৯৬৪

৮৪। ইবন কুতায়বাহ, *কিতাবু তা'বীলি মুখতালাফিল হাদীস*, ১ম সং, মাতবাআতু কুরদিস্তান আল-ইলমিইয়াহ, মিশর, ১৩২৬/১৯০৮

৮৫। ইবন কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, নতুন সং, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৩৯৮/১৯৭৮

৮৬। ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহব*, মিশর, মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০ হি.।

৮৭। ইবন আলী আলাউদ্দীন আল-মারাদীনি, *আল-জাওহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলাল বায়হাকী*, ১ম সং,তা.বি.

৮৮। ইবন খালদূন, *মুকাদ্দিমাহ*, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮১

৮৯। ইবন খালদূন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, অনুবাদ, নুর মুহাম্মদ মিয়া, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ খ্রি.

৯০। ইবন খালদুন, *তারিখে ইবনে খালদূন*, ১খ, দারুল কিতাব আল-লুবনানী ও মাকতাবুল মাদারেসের (যৌথ) প্রকাশনা, বৈরুত, লেবানন

৯১। ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান ওয়া আনবউ আবনাইয যামান*, তা.বি.

৯২। ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিয়্যাতুল-আ'য়ান ওয়া আনবা'উ আবনাইয-যামান*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি/১৪১৯ হি.

৯৩। ইবন খাইয়্যাত আবু আমর খলীফাহ, *কিতাবুত-তাবাকাত*, ২য় সং, দারু তায়্যিবাহ, রিয়াদ, ১৪০২/১৯৮২

৯৪। ইবন তাগরীবারিদী, *আন-নুজূমুয যাহিরাহ ফী মুলূকি মিশর ওয়্যাল-কাহিরাহ*, ওযারাতুস সাকাফাহ, মিশর, ৮৫৫/১৪৮০

৯৫। ইবনুন-নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, মাকতাবাতুল খাইয়াত, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রি.

৯৬। ইবন রাজাব আল-হাম্বালী, যায়লু *তবাকাতিল-হানাবিলা*, মিশর, মাতবাআতুস-সুন্নাতিল-মুহাম্মদীয়্যাহ, ১২৭২ হি.

৯৭। ইবন সা'দ, *আত্-ত্বাকাতুল-কুবরা*, বৈরুত, দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.

৯৮। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (আবদুল আযীয বিন বায-এর টীকা সম্বলিত), কায়রো, শতবর্ষ আসসালাফিয়্যাহ, ১৩৮০ হি

Dhaka University Institutional Repository

৯৯। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *নুযহাতুন নাযর শারহু নুখবাতিল ফিকার*, মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

১০০। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *নুখবাতিল ফিকর শারহু নুযহাতিন নাযর*, মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

১০১। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মীযান*, পাকিস্তান, ইদারাই তা'লীফাতে আশরাফিয়্যা, তা.বি.

১০২। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত-তাহযীব*, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি

১০৩। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *তাকরীবুত-তাহযীব*, বৈরুত, দারুল ফিকার, তা.বি.

১০৪। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম সং, দাইরাতুল মাআরিফ আন নিযামিয়াহ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য,১৩২৬/১৯০৮

১০৫। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *তাকরীবুত তাহযীব*, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, মদীনা ১৩৮০/১৯৬০

১০৬। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *হুদা আস-সারী*, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ১৪০২ হিঃ

১০৭। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *রাফউল ইসর আন কুদাতি মিশর*, ১ম সং, ওয়াযারাতুত তারবিয়াহ ওয়াত তা'লিম,মাতবাআতুল আমীরিয়াহ, কায়রো, ১৩৭৬/১৯৭৫

১০৮। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আর-রাহমাতুল গাইসিয়্যাহ বিত-তারজুমাতিল লায়সিয়্যাহ*, ১ম, সং, বূলাক, ১৩০১/১৮৮৪

১০৯। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *লিসানুল মীযান*, ১ম সং, দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩২৯/১৯১১

১১০। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ২য় সং, দারু ইহয়াইতু-তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ১৪০২ হিঃ

১১১। ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আদ-দুরারুল-কামিনাহ ফী 'আয়ানিল-মিয়াতিছ-ছামিনাহ*, হায়দরাবাদ, দায়িরাতুল-মা'আরিফ, ১৩৪৮ হি

১১২। ইবনুল আরাবী, *আহকামুল-কুর'আন*, বৈরুত, দারুল-মা'রিফাহ, তা.বি.

১১৩। ইবনুল আছীর, *তা'রীখুল কামিল*, ১ম সং, মাতবাআতুল আযহারিয়াহ, মিশর, ১৩০১/১৮৮৪

১১৪। ইবনুল আছীর, *গায়াতুল বায়ান ফী তাবাকাতিল কুরবা*, মাতবাআতুস সাআদাহ, মিশর, ১৩৫১/১৯৩৭

১১৫। ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ, জামইয়্যাহতুল মাআরিফিল মিসরিয়্যাহ*, মিশর, ১২৭৮

১১৬। ইবনুল ওয়ারদী, *তা'রীখু ইবনিল-ওয়ারদী*, মিশর, ১৮২৫ হি.

১১৭। ইবনুল জাওযী, আল-*মুনতাযাম ফী তা'রীখিল মুলূক ওয়াল-উমাম*, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫খ্রি

১১৮। ইবনুস সালাহ, *উলূমুল হাদীস* (ড. নুরুদ্দীন আত্তারের টীকা সম্বলিত), মদীনা, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩৮৬ হি

১১৯। ইবন শাকির আল-কুতবী, *যাইলু-ফাওয়াতিল ওয়াফায়াত*, কায়রো, মাতবাআতুস-সা'আদাহ, ১৯৫১ খ্রি.

১২০। ইবনুল হাসান নিযামুদ্দীন নাইসাপুরী, *গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান*, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৬ হি.

১২১। ইমতিয়ায আলী আরশী, *ফিহরিসতুল-মাখতূতাতিল আরাবিয়্যাহ*, হিন্দ, মাকতাবাতুর-রিযা, রামপুরা, ১৯৬৩ খ্রি, *ফাদাইলুল-কুরআন কায়রো: ঈসা আল-বাবী আল-হালবী*, ১৩৭১ খ্রি.

১২২। ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবনি মাজাহ* (মুহাম্মদ ফুআদ আবুদল বাকী টীকা সম্বলিত), ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী কোং লি. ১৩৭২ হি

১২৩। ইমাম খাত্তাবী, *মা'আলিমুস সুনান*, মাতবাআ আনসারুস-সুন্নাহ আল-মুহাম্মদিয়াহ, ১৩৬৭ হি

১২৪। ইমাম তিরমিযী, *সুনান আত-তিরমিযী মাআ শারহিহি তুহফাতুল আহওয়াযী*, মিশরীয় সংস্করণ

১২৫। ইমাম দারা কুতনী, *সুনানু দারা কুতনী*, পরিমার্জন সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সায়্যিদ আবদুল্লাহ হাশিম আল-ইয়ামানী আল-মাদানী, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

১২৬। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, মিশরীয় সংস্করণ, ১৩৪৭ হি
১২৭। ইমাম নববী, *আত-তাকরীব*, ২য় সং, ১৩৮৫ হি
১২৮। ইমাম সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী*, ২য় সং, ১৩৮৫ হি
১২৯। ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা* (মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী টীকা সম্বলিত), ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী এন্ড কোং লি. ১৩৭০ হি
১৩০। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামিউস সহীহিল মুসনাদিল মুখতাসার মিন উমূরি রাসুলিল্লাহি ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী*, ৩য় সং, নূর মুহাম্মদ আসাহহুল মাতাবি, করাচী, ১৩৮১/১৯৬১
১৩১। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ-শাফিঈ, *কিতাবুল উম্ম*, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৩৯৩/১৯৭৩
১৩২। ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান, *কিতাবুল আছার*, ১ম সং, ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান, হি. ১৪০৭
১৩৩। ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুওয়াত্তা*, আশরাফী বুক ডিপু, হিন্দুস্তান, তা.বি.
১৩৪। ইমাম শাফিঈ, *আর-রিসালাহ*, আহমাদ মুহাম্মদ শাকির-এর টীকা সম্বলিত
১৩৫। ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উছমান আয-যাহবী, *সিয়ারে আ'লামিন নুবালা*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, ১১ তম সংস্করণ, ১৪১৮/১৯৯৬
১৩৬। ইবরাহীম ইবন আলী আশ-শীরাযী, *তাবাকাতুল ফুকাহা*, বাগদাদ প্রেস, ১৯৫৬/১৯৩৭
১৩৭। ইসমাঈল পাশা বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনূন*, ইস্তাম্বুল, ওকালাতুল মা'আরিফ, ১৯৫১ খ্রি.
১৩৮। ইসমাঈল পাশা, *হাদিয়াতুল আরিফীন আসমাউল মুআল্লিফীন ওয়া আসরুল মুসান্নিফীন মিন কাশফিয যুনূন*, দারুল ফিকর, ১৪০২/১৯৮২
১৩৯। ইসমাঈল ইবনুল মালিক ইমামুদ্দীন, *তাকভীমুল বুলদান*, দারুত তাবাআতিস সুলতানিয়্যাহ, প্যারিস, ১৮৪০
১৪০। ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল-বুলদান*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল' ইলমিয়্যাহ, তা.বি।
১৪১। ইয়াকূত হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, ১ম সং, মাকতাবাহ খানজী, কায়রো, তা.বি.
১৪২। ইয়ায ইবন মূসা আল কাযী আন্দালুসী, *আশশিফা বিতারীখি হুকূকিল মুসতফা,*। বৈরুত, তা.বি.
১৪৩। উমর রিদা কাহহালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, মাকতাবাতুল মাসনা, বৈরুত, তা.বি.
১৪৪। উমার রিদা কাহহালা, *মু'জামুল-মু'আল্লিফীন*, বৈরুত, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরবী, তা.বি.
১৪৫। উমার ফাররুখ, *তা'রীখুল আদবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল ইলমলিল-মালাইন, ১৯৮৪ খ্রি.
১৪৬। ওয়াসী আহমাদ, *তারজুমাতুল ইমাম আবু জাফর*, মাকতাবাতু আসাফিয়্যাহ, দিল্লী, ১৩৪৮/১৯২৯
১৪৭। কাসিম ইবন কুতলূগা, *তাজুত তারাজিম ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ*, মাকতাবাতুল আনী, বাগদাদ, ১৯৬২ খৃঃ
১৪৮। খতীব আল-বাগদাদী, *তা'রীখু বাগদাদ*, বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি.
১৪৯। খায়রুদ্দীন ইবনুল আলুসী, *জামউল-আয়নায়ন ফীমুহাকামাতিল-আহমাদাইন*, মাতবা'আতুল মাদানী, ১৯৬১ খ্রি.
১৫০। খায়রুদ্দীন আস-যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, বৈরুত, দারুল ইলম লিল-মালাইন, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.
১৫১। গোলাম আহমদ হারিরী, *তা'রীখুত-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরীন*, দিল্লী, তাজ কোম্পানী, ১৯৯৪ খ্রি.
১৫২। জামাল উদ্দীন ইউসুফ ইবন তাগরীবিরদী, *আন-নুজূমুয-যাহিরাহ ফী মুলুক মিশরা ওয়াল-কাহিরাহ*, কায়রো, দারুল কুতুবিল মিশরীয়াহ, ১৩৫০ হি.
১৫৩। জামালুদ্দীন আল-ইফরীকী ইবন মানযূল, *লিসানুল আরাব*, বৈরুত, দারু ইয়াহয়াইত-তুরাছিল 'আরবী, ১৪১৩ হি/১৯৯৩ খ্রি.
১৫৪। জামালুদ্দীন আসনুবী, *তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ*, বাগদাদ, ১৩৯০ হি
১৫৫। জুরজী যায়দান, *আদাবুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, কায়রো, দারুল হিলাল, ১৯৫৮ খ্রি.
১৫৬। তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ফাহাদ, *লাইযুল আলহায বিযায়লি তাবাকাতিল হুফফায*, দামিশক,

Dhaka University Institutional Repository

মাতবাআতুত-তাওফীক, ১৩৪৭ হি

১৫৭। *তাফসীর ইবন কাছীর*, কায়রো, ঈসা আল-বাবিল-হালাবি, ১৯৫১ খ্রি।

১৫৮। নাসিরুদ্দীন বায়যাবী, *তাফসীরুল বায়যাবী*, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, তা.বি.

১৫৯। ডক্টর আহমদ ছা'লাবী, *মাওসূ'আতু-তা'রীখিল ইসলামী ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ৮, সংস্করণ, ১৯৯০.

১৬০। ডক্টর আহমদ শিরবাসী, *কিসসাতুত তাফসীর*, বৈরুত, দারুল জীল ১৯৭৮ খ্রি.

১৬১। ডক্টর আহমদ শিবলী, *মাওসূয়াতু-তারীখিল-ইসলামী ওয়াল-হিদারাতিল-ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো, মাকতাবুন-নাহদাতিল মিসারিয়্যাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, তা.বি.।

১৬২। ডক্টর ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াজীয*, মিশর, মাজমাউল-লুগাতিল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.

১৬৩। ডক্টর মুহাম্মদ আবুল খায়েব আইউব আলী, *আকীদাতুল ইসলাম ওয়া-ইমামুল মাতুরদী*, ১ম সং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪০৪/১৯৮৩

১৬৪। ডক্টর মুহাম্মদ আদীব সালেহ, *লামহাতুন ফী উসূলিল হাদীছ*, বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.

১৬৫। ডক্টর মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরুন*, দারুল কুতুবিল হাদীছ, ১৯৭৬ খ্রি/১৩৯৬ হি.

১৬৬। ডক্টর মুহাম্মদ সাব্বাগ, *আল-হাদীছুন-নাবাবী*, বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি/১৪০৬ হি.

১৬৭। ডক্টর সালাহুদ্দীন মুনাজ্জিদ, আল-মুয়ারিরখুদ-দিমাশকি ওয়া আছারুহা, মূল *মাখতূতাত মিনাল-কারনিছ ছালিছ ইলা নিহায়াতিল আ'শির আল-হিজরী*, কায়রো, মাতবায়াতু মিশর, ১৯৫৬ খ্রি.

১৬৮। ডক্টর সালাহুদ্দীন মুনাজ্জিদ, *লি-ইবন কাছীর ফী আওয়ালি মাওলিদির রাসুল (স)*, বৈরুত, দারুল-কিতাব, ১৯৬১ খ্রি.

১৬৯। ডক্টর সুবহী সালিহ, *উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, ১ম সং, দারুল ইলম, বৈরুত, ১৯৮৪

১৭০। ডক্টর হাসান ইবরাহীম, *তা'রীখুল ইসলাম*, কায়রো, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যা, ১৯৯১ খ্রি/১৪১১ হি.

১৭১। ফুয়াদ আল-বুসতানী, *দা'ইরাতুল মা'আরিফ*, বৈরুত, ১৯৫৬ হি.

১৭২। ফরীদ আব্দুল আযীয জুন্দী, *মু'জামুল বুলদান*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

১৭৩। ফাতহুল্লাহ খলীফ, *ফাখরুদ্দীন আর-রাযী*, বৈরুত, ১৯৭১ খ্রি.

১৭৪। ফুয়াদ সযিগীন, *তা'রীখুত-তুরাছিল-ইসলামী*, অনুবাদ, মাহমুদ ফাহমী হিজাযী, ইদারাতুছ-ছাকাফাহ ওয়ান-নাশর, জামিআতু মুহাম্মদ ইবন সাউদ, সৌদি আরব, ১৪০৩/১৯৮৩ খ্রি.

১৭৫। বাগদাদী, *হাদিয়াতুল আরিফীন ফী আসমাইল মুআল্লিফীন ওয়াল-মুসান্নিফীন*, ইস্তাম্বুল, কালাতুল-মা'আরিফ, ১৯৫৫ খ্রি.

১৭৬। ব্রুকেলম্যান, *ত'রীখুল লুগাতিল-আদাবিল-'আরাবিয়্যাহ*, লাইডেন, ১৯৩৭ খ্রি,আল-মুলহিক সংযোজনী, তা.বি.

১৭৭। বদরুদ্দীন যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, বৈরুত, দারুল ফিকার, ১৯৮৮ খ্রি.

১৭৮। মাওলানা মুহাম্মদ তাহির, *মাজমা'উ বিহারিল আনওয়ার ফী গারাইবিত তানযীল ওয়া লাতাইফিল আখবার*, ১ম সং, নওল কিশোর, গুজরাট, হিন্দুস্তান, ১২৮৩/১৮৬৬

১৭৯। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দলভী, *মুকাদ্দিমাতআমানিল-আহবার*, ১ম সং, মাকতাবাহ ইয়াহইয়া-ভিয়্যাহ, সাহারাপুর, ইউ.পি, হিন্দুস্তান, ১৩৯৭/১৯৭৭

১৮০। মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরী, *হায়ত ইমাম তাহাভী*, ১ম সং, মাকতাবাহ হিজাজ, দেওবন্দ, ইউ.পি, ভারত, হিঃ ১৪০১

১৮১। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *আস-সিভায়াহ ফী শারহি শারহিল কিফায়াহ*, ১ম সং, মাতবাআহ মুসতাফাঈ, ভারত, ১৩০৬/১৮৮৯

১৮২। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ*, ১ম সং,

Dhaka University Institutional Repository

মাতবাআতুস সাআদাহ, মিশর, ১৩২৪/১৯০৬

১৮৩। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *আত-তা'লীকাতুস-সানিয়্যাহ আলাল ফাওয়াইদিল-বাহিয়্যাহ*, ১ম সং, আতুস-সাআদাহ, মিশর, ১৩২৪/১৯০৬

১৮৪। মাওলানা তাকিইয়ুদ্দীন নদভী, *ইলমু রিজালিল হাদীস*, ১ম সং, মাতবাআতু নদওয়াতিল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৪০৫/১৯৮৫

১৮৫। মাহমূদ ইবন উমার যামাখশারী, *আল-কাশশাফ আন হাকাইকি গাওয়ামিয তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাভীল ফী উজূহিত-তা'ভীল*, বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.

১৮৬। মুল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ ফী শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ*, ১ম সং, মাজলিসু ইশাআতিল মাআরিফ, মুলতান, ১৩৮৬/১৯৬৬

১৮৭। মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস-সাহীহ লিমুসলিম*, দিল্লী, মাতবা'আ ইলমী, ১৩৪৮ হি.

১৮৮। মুস্তাফা আব্দুল ওয়াহিদ, *আস-সীরাতুন-নাবাভীয়্যাহ*, তাহকীক, কায়রো, মাতবাআতুল-হালবী, ১৩৮৪ হি.।

১৮৯। মুহাম্মদ আলুসী, *রুহুল মা'আনী ফীতাফসীরিল-কুরআনিল-আযীম ওয়াস-সাবঈল মাছানী*, মুলতান, মাকতাবাতু ইমাদাদিয়্যাহ, তা.বি.।

১৯০। মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খতীব, *আল-ইকমাল*, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি.

১৯১। মুহাম্মদ আব্দুল বাকী ফুয়াদ, *আল-মুফহারাস লি-আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, কায়রো, দারুল হাদীস, ১৯৮৮খ্রি./১৪০৮হি.

১৯২। মুহাম্মদ আব্দুল আযীয যারকানী, *মানাহিলুল-ইরফান*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৬ খ্রি.

১৯৩। মুহাম্মদ আলী সাবুনী, *আত-তিব্‌য়ান ফীউলূমিল কুরআন*, বৈরুত, মুয়াসসসাতু মানাহিলল ইরফান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.।

১৯৪। মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল-কুরআন*, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৬ হি/১৯৮৬ খ্রি.

১৯৫। মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী, *জামিউল-বায়ান আন তা'ভীলি আইল-কুরআন*, বৈরুত, দারুল ফিকার ১৪১৫/১৯৯৫ হি.।

১৯৬। মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন নাসিরুদ্দীন,*আর-রদ্দুল ওয়াফির*, মিশর, মাতবা'আতু কুর্দিস্তান, আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩২৯ হি.

১৯৭। মুহাম্মদ ইবন জাফর আল-কাতানী, *আর-রিসালাতুল-মুসতাতওরফাহ*, দামিশক, দারুল ফিকরিল-আরাবী, ১৯৬৪ খ্রি.

১৯৮। মুহাম্মদ ইবন আহম্মদ কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, মিশর, আল-হায়্যাতুল-মিসরিয়্যাতিল 'আম্মাহ, ১৯৮৭ খ্রি.

১৯৯। মুহাম্মদ ইবন উমার ফাখরুদ্দীন রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব* (তাফসীরুল কাবীর), বৈরুত, মাকতাবুল আলামিল ইসলামী, ১৪১৩ হি.

২০০। মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *আর বাদরুত তালী বি মাহাসিনি মিন বা'দলি কারানিস সাবি*, কায়রো,মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৩৪৮ হি.

২০১। মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবনুল কায়্যিম, *ই'লামুল মূকিঈন আন রাববিল আলামীন*, মাতবাআতুস সাআদাহ, মিশর, ১৩৭৪/১৯৫৫

২০২। মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল মাকদিসি, *আহসানুত তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম মাতবাআতুব্রীল*, লাইডন, ১৯০৬

২০৩। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-কিন্দী, *আল বুলাত ওয়াল কুদাত*, Leyden: E.J. Imprimer ie Orentale, Luzac & Co., 46, Great, Russellstret, London, 1912.

২০৪। মুহাম্মদ কুরদ আলী, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাহ*, মাকতাবাতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৩৫৪/১৯৩৬

২০৫। মুহাম্মদ খিদরী বেক, *মুহাদারাতু তা'রীখিল-উমামিদ দাওয়াতিল আরাবিয়্যাহ* , দারুল ফিকরিল আরাবী,

Dhaka University Institutional Repository

মিশর, তা.বি.
২০৬। মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, দেওবন্দ, কুতুবখানা নাঈমিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি./১৪১৪ হি.
২০৭। মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী, *দাইরাতুল মা'আরিফ*, বৈরুত, দারুল মা'রিফা, তা.বি.
২০৮। মুহাম্মদ সালিহ যারকান, *ফাখরুদ্দীন আর-রাযী ওয়া আরাআহুল কালামিয়্যাহ ওয়াল-ফালসাফিয়্যাহ*, কায়রো, দারুল ফিকর, ১৯৬০ খ্রি/১৩৮৩ হি।
২০৯। মুহাম্মদ সিদকী জামীল, *মুকাদ্দামাতুল-বাহরিল মুহীত*, বৈরুত, দারুল ফিকার, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.
২১০। মুহাম্মদ শাকির আহমদ, *আল-বাইছুল হাদীছ*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৫১ খ্রি.
২১১। মুহাম্মদ শাকির আহমদ, *উমদাতুত তাফসীর আনিল-হাফিয ইবন কাছীর*, কায়রো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৬ খ্রি.
২১২। মুহাম্মদ শাকির আহমদ, *তাহকীক মুসনাদ ইমাম আহমদ*, কায়রো, দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৩৭১ হি.
২১৩। মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাওসারী, *আল-হাভী ফী সীরাতিত তাহাভী*, মাতবাআতুল আনওয়ার, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৯
২১৪। মুহাম্মদ ছাবিত কিনদী, *দায়িরাতুল-মা' আরিফিল-ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো: ১৯৩৩ খ্রি.
২১৫। রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফীগারীবিল কুরআন*, মিশর, মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবীম তা.বি.
২১৬। লুইস মালূফ, *আল-মুনজিদ ফীল-লুগাহ ওয়াল-আলাম*, দারুল মাশরিক, বৈরুত ২৮তম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.
২১৭। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী দাউদী, *তবাকাতুল মুফাসসিরীন*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.
২১৮। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ, *সিয়ারু আ' লামিন নুবালা*, ১ম সং, বৈরুত, ১৪০৩/১৯৮৩
২১৯। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ *আয-যাহাবী*, তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম সং, দাইরাতুল মাআরিফ,
২২০। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ সাখাভী, *আদ-দাওউল লামি' ফী আহলিল কারনিত তাসি'*, কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী ১৩৫৩ হি.
২২১। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, হায়দরাবাদ, ৩৩৪ হি.
২২২। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ যাহাবী, *মু' জামুল মুখতাসার*, আলীগড়, মাখুতাতু মাকতাবাতি আযাদ, তা.বি.
২২৩। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ যাহাবী, *সীয়ারু'আলাম-আন নুবালা*, বৈরুত, দারুল ফিকার, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি/১৪১৭ হি.
২২৪। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ যাহাবী, *মীযানুল ই' তিদাল*, মিশর, ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী ১৯৬৩ খ্রি.
২২৫। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস, *মুকাদ্দিমাহ, মাকতাবাহ মুসতাফাঈ*, কাশ্মীরী বাজার, লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৫৫ খৃঃ
২২৬। শায়খ ইসমাঈল, *তাফসীরে রুহুল বয়ান*, দারু ইহয়ায়ে তুরাছে আরাবী, লেবানন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৫/১৪০৫ হি
২২৭। শায়খ নিজাম, *ফাতাওয়া আলামগীরী*, এডুকেশন প্রেস, দারুল ইমারাহ, কলকাতা, ১২৪৩/১৮২৮
২২৮। শাহ আবদুল আযীয, *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, ১ম সং, মাবাআহ মুজতাবায়ী, দিল্লী, ১৩৩৪/১৯১৫
২২৯। শিহাবুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত বিন আবদুল্লাহ, *মু'জামুল বুলদান*, দারু ইহয়াইত তুরাছে আল-আরাবী, বৈরুত লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭-১৪১৭ হি
২৩০। হাজ্জী খলীফা, *কাশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল-ফুনূন*, ইস্তাম্বুল, ওকালাতুল মাআরিফ ১৩৬০ হি.
২৩১। হাকিম নীসাপুরী, *আল-মুসতাদরাক*, রিয়াদ, মাকতাবাতুন নাসর আল-হাদীসাহ, তা.বি.
২৩২। হাকিম নীসাপুরী, *মা' রিয়াফাতু উলূমিল হাদীস*, মাতবাআ আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মদিয়া, ১৩৬৭ হি
২৩৩। হাকীম আইউব মুহাম্মদ, *আল-ফাতহুস-সামাভী ফী মীলাদিত-তাহাভী* (সংক্ষিপ্ত), আল-মাকতাবাতুল-ইমদাদিয়্যাহ, মুলতান, শারহু মাআনিল-আসার-এর ভূমিকায় সংযোজিত, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

২৩৪। হাকীম আইউব মুহাম্মদ, *তারাজিমুল-আহবার মিন রিজালি শারহি মা'আনিল আছার*, ১ম সং, ১ম খঃ, মাকতাবাতুল খালীলিয়্যাহ, সাহারানপুর, ইউ.পি, ভারত, তা.বি

২৩৫। হুসাইন ইবন মুহাম্মদ আবুল কাসিম রাগিব, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, মায়মুনিয়াহ প্রেস, মিশর, ১৩২৪/১৯০৬

২৩৬। সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *বায়হাকী*, ইন্ডিয়া, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি/১৪০৬ হি.

২৩৭। সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *তারীখ-ই ইসলাম*, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ নুমান, কলুটোলা, ঢাকা, ১৯৬৯

২৩৮। সালিম মাহমুদ রিযক, *আসারু সালাতীনিল মামালিক*, কায়রো, মাতবাআতুত তাওয়াক্কুল, ১৩৬৬ হি.

২৩৯। সালিহ মুহাম্মদ যারকান, *ফাখরুদ্দীন রাযী ওয়া আরায়াহুল কালামিয়্যাহ ওয়াল ফালসাফিয়্যাহ*, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৬৩ খ্রি.

২৪০। সালাহুদ্দীন খলীল আস-সাফাদী, *আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত*, ইস্তাম্বুল, দাউদ রোড ১৯৭৪ খ্রি/১৩৯৪ হি. আইনুল আসর, তা.বি

২৪১। সুয়ূতী-আল্লামা জালাল উদ্দীন, *তারীখুল খোলাফা*, দারুল ফিকার, বৈরুত, লেবানন, তা.বি.

২৪২। সৈয়দ হাশিম আব্দুল আযীয গাযুলী, *ইবনুল জাওযী*, দামিস্ক, দারুল কলম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হি.

২৪৩। সৈয়দ মুহাম্মদ রশীদ রিযা, *তাফসীরুল মানার*, ৪র্থ সংস্করণ, কায়রো, ১৩৮০ হি/১৯৬০ খ্রি.

বাংলা

১। অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব তুরস্ক-ইরাক আফগানিস্তান, নভেল পাবলিশিং হাউস, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, (পুনর্মুদ্রণ)*, ২০১২,

২। অধ্যাপক হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক, মহানবী (সা)-র অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব, মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা (সম্পাদিত), *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৯

৩। আবু মোহাম্মদ মজহারুল ইসলাম, *সন্ত্রাসী নয় ওরা মুক্তিযোদ্ধা*, সমাবেশ প্রকাশনী, ঢাকা,২০০৪,

৪। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

৫। আব্দুল মোতালেব সরকার, *আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা,২০০২.

৬। আব্দুল লতিফ খান, *আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলী*, সিঁড়ি বই বিতান, সপ্তম সংস্করণ ঢাকা, ২০০৯

৭। আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যূদয় ও জাতিসংঘ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২,

৮। ইবন খালদূন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, (অনুবাদ) নুর মুহাম্মদ মিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩ খ্রি.

৯। এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৯৩

১০। এম এ কাউসার, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা,২০১২,

১১। কে এম রাইছ উদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান বাদ্রার্স এন্ড কোম্পানী, (নবম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ), ঢাকা ২০০১*

২২। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সংঘ প্রকাশ, চর্তুথ সংস্করণ-২০১০, ঢাকা

১৩। তারেক শামসুর রেহমান, *নয়াবিশ্ব ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, *(দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা,২০০৮*

১৪। তারেক শামসুর রেহমান, *বিশ্ব রাজনীতির, ১০০ বছর*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা,২০১০,

১৫। তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা,২০১১

১৬। তোফাজ্জল হোসেন, *জাতিসংঘ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা,২০০৭.

Dhaka University Institutional Repository

১৭। নির্মল কান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, স্ত্রীভুমি পাবলিশিং কোম্পানী, চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ২০০৪

১৮। ড. ওসমান গনী, *মহানবী (সা)*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮১

১৯। ড. ওসমান গনী, *হযরত আবুবকর (রা)*, কলিকাতা, ১৯৯৪

২০। ড. ওসমান গনী, *হযরত ওসমান গনী (রা)*, কলিকাতা, ১৯৯৪

২১। ড. ওসমান গনী, *উমাইয়া খেলাফত*, কলিকাতা, ১৯৯৫

২২। ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসুল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪

২৩। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মানব সভ্যতার ইতিহাস*, বুক চয়েস, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ,২০১০

২৪। ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবর রহমান, *মুহাদ্দিস প্রসংগ*, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৯৭৫

২৫। ডক্টর মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২

২৬। ডক্টর মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *মুফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা*, রাজশাহী, ইসলামিক রির্সাস সেন্টার, ২০০১

২৭। ডাঃ মোঃ আফাজ উল্লাহ, *বিশ্বনবী (সা) সম্বন্ধে অমুসলিম মনষিদের বাণী*, ঢাকা, ১৯৯৮

২৮। প্রফেসর ড.হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *মৌলবাদ নয় ইসলাম*, সেন্টার ফর ইসলামিক রির্সাস, ঢাকা, ২০০৫

২৯। ফিরোজা বেগম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

৩০। ফিলিপ কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, (অনুবাদ) অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, সম্পদনা হায়াৎ মামুদ, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা- ২০০২

৩১। ভবেশ রায়, *রাষ্ট্রকোষ*, জেকে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা,২০০৭

৩২। মফিজুল্লাহ, কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

৩৩। মহাথির মোহাম্মদ, *ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ*, (অনুবাদ) আবু জাফর, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯

৩৪। মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,২০০৯

৩৫। মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মারেফুল কোরআন*, (অনুবাদ) মাওলানা মহিউদ্দিন খান, (বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প)

৩৬। মুসা আনসারী, *মধ্য যুগের মুসলমি সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ/১৯৯৯

৩৭। মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯২

৩৮। মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭/১৪১৪.

৩৯। মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০

৪০। মুহাম্মদ হাসনাইন হায়কল, *ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা*, অনুবাদ ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৩

৪১। র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, *ইসলামের তিনটি গুরুত্ব, পূর্ণ দলিল*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০

৪২। শেখ মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, *ইসলামঃ রাষ্ট্র ও সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

৪৩। শ্রী প্রভাতাং;শু মাইতি, *ইউরোপের ইতিহাসের রুপরেখা*, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭,

৪৪। সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, *ইসলাম ও মুসলিম জাহান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ,ঢাকা, ২০০৩

৪৫। সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা*,২০০০

৪৬। সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। শাহাদাত হোসেন খান, *আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধ*, আবির বুকস, ঢাকা,২০০৪

৪৮। সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম (অনুবাদ)* গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪

৪৯। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম,* (অনুবাদ) ড. রশীদুল আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, (চতুর্থ মুদ্রণ), কলিকাতা, ১৯৯৫

৫০। সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

৫১। সম্পাদনা পরিষদ, সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, দারুল ফিকার কায়রো, অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩

৫২। সৈয়দ শাহ এমরান, *প্রসঙ্গ নজরুল*, ঝিঙ্গেফুল প্রকাশনা, ঢাকা, অক্টোবর ২০১০

৫৩। হারুনুর রশিদ ভুইয়া ও আব্দুল হামিদ (সম্মাদিত), *রাষ্ট্র আভিধান*, বর্তমান সময়, ঢাকা, ২০০৭

৫৪। হারুনুর রশিদ, *রাজনীতি কোষ*, মাওলা বাদ্রার্স, ঢাকা, ২০১২

ইংরেজি

১। Abdul Mukit Chowdury, *Islamic occasinans: Rituals, spirit and message*, Islamic Foundation, Dhaka, 2010

২। Adam Kuper, *The Social Science Encyclopaedia*, London: Library of Congress Cataloging in Publications Data, 1985 AD.

৩। A.K.S. Lambton, *Islamic Political Thought' in Joseph Schachat and C.E. Booworth (eds.)* The Legacy of Islam, Oxford University Press, Oxford, 1979

৪। A S Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary of current English*, Oxford University press, Seventh edition.

৫। Bernard, Leasis, *The Emergerce of Modern Turkey,* Oxford nuiversity press, Oxford, 1968

৬। C.A. leeds, *political Studies,* U.K. Macdonald and Evans Limited 1981.

৭। Coffrey Lewis, *Nation of the Modern Woold: Turkey*, London, E Benn, 1965

৮। D.E. Smith, *Religion and Politics in Burma*, Princeton University Pess, New Jersey, 1965.

৯। Donald Eugene Smith, *Riligion and political Development*, Little Brown and Company, Boston,1971.

১০। Edward Shills, *The Intellectuals and the Power and other Essay*, Chicago University Press, Chicago,1983.

১০। Edward A Farmer, *A History of Conquests of the Saracens*, London.

১১। E.I.Brill, *The Encyclopaedia of Islam, New Edition*, Leiden, Netherlands, (Reprint) 1979.

১২। E.I.Brill, *E.I. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936*, Leiden Edition, 1987

১৩। *English-Bengali Dictionary*, বাংলা একাডেমী, ২২ তম সংস্করণ, ঢাকা-২০০৩।

১৪। *EncycloPedia of the world*; The Unversital Academy Documentary Publishing & Research Centre; Dhaka-2012 (সম্পাদিত), *ঢাকা*, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

১৫। *Encyclopaedia of the Social Sciences*, New York: the MacMillan Company, 1963

১৬। Harun Ur Rashid, *An Introduction to peace and conflict studies*, The Universty Press Lida, Dhaka, 2005

১৭। John L. Esposito, *Islam and Politics*, New York, Syracuse University Pess, 1984

১৮। James S Coleman The Political Systems of the Developing Areas' in G.A Almond and J.S. Coleman eds, *The Polittics of Developing Areas,* New Jersey, Princeton University Press, 1960). Gunnar myrdal, Asian Drama : An Abridgement Penguin Books Limited, U. K. 1977.

১৯। J. Milton Yinger, Religion, Society and the Individual, *An Introduction to the Society of Religion* The Macmillan Company, New York,1967,

২০। L. Binder, 'Crisis of Political Development' in L. Binder et. al. *Crisis and Sequances in Political Development,* Princeton universitys Press, new Jersey, 1971,

২১। Lan Rechar Nelton, *A Popular Dictionary of Islam*, Cuzon Press, 15 The Quadrant Richmond Surrey, TWG, IBP. Revised edition, 1997.

২২। Michael C. Hudson, 'Islam and Political Development' in John L. Esposito, (ed.). *Islam and Development Religion and socio-political change* Syracuse University Pess, New York, 1982

২৩। Mohammed Rabi, *Conflict Resolution and Ethnicity*, westport, connecticut, London,1994.

২৪। Muhammad al-Buracy, *Administrative Developnment: An Islamic perspective, London, K.P.I. Lomoted. 1985.* Ibrahim A. Ragab, 'Islam and Development,' in Kenneth P. jameson and Charles K. Wiber, (eds.), *Religious Valies and Development* Pergamon Press, *Oxford*, 1981

২৫। Noor Ahmad Baba, *Organisation of Islamic Conference theory and practice of pan Islami Cooperation*, Dhaka-1994

২৬। Nur Ahmed, *Islam and its Holy Prophet as Judged by the Non Muslim World*, Chittagong, dateless

২৭। Osman Nur Topbas, *Islam Spirit and Form, Erkan Publication, Istanbul, 2003*

২৮। P.K. Hitti, *History of the Arabs*, the Macmillan Press Ltd, Londonm, 1972

২৯। Prof Masudul Hasan, *History of Islam*, vol.2. Adam Publishers, Revised edition, Delhi, India, 1995.

৩০। R.A, Nicholson, *A Literary History of the Arabs,* 1930 AD.

৩১। Robert E. Spencer, Religion in Asian Societies' in his ed. *Religion and changes in Contemporary Asia*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1971.

৩২। Sir Thomas Arnold, *The Caliphate*, Adam Publishers, Delhi, Reprint, 1994

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, London: the Macmillan Press Ltd. 1955

৩৪। SYED TAYYED-UR-RAHMAN, *GLOBALGEO-STRATEGY OF BANGLADESH, OIC AND ISLAMIC UMMAH*, ISLAMIC FOUNDATION, DHAKA,1985.

৩৫। Syed Hussein Nasr, "Present Tendencies: Future Trends" in Majoric Kelly (ed.) *Islam : The Religion and Political Life of World Community*, Praeger, New York, 1984.

৩৬। TA Bryson, *American Diplomatic Relations with the Middle East-1774-1975 A Survey*, New York.

৩৭। *The Encyclopaedia of Religion*, vo-5, MacMillan Publishing Company, edition, New York, 1993

৩৮। *The Europa world year Book* Europa Publication (London-2004) Volume-1 (Part Two), *2004*

ইসলামী বিশ্বকোষ

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, প্রকাশকাল, আগষ্ট ১৯৮৬

২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পুনঃ প্রকাশ, ২০০০

৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪খ, প্রকাশকাল, মে ১৯৮৮

৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫খ, প্রকাশকাল, নভেম্বর ১৯৮৮

৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৮৯

৬। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭খ, প্রকাশকাল, নভেম্বর ১৯৮৯

৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮খ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯০

৮। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ, প্রকাশকাল, নভেম্বর ১৯৯০

৯। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০খ, প্রকাশকাল, মে ১৯৯১

১০। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১খ, প্রকাশকাল, জানুয়ারী ১৯৯২

১১। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২খ, প্রকাশকাল, আগষ্ট ১৯৯২

১২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩খ, প্রকাশকাল, ডিসেম্বর ১৯৯২

১৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪খ, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

১৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫খ, প্রকাশকাল, মে ১৯৯৪

১৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬খ (১ম ভাগ) প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

১৬। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬খ (২য় ভাগ) প্রকাশকাল, মার্চ ১৯৯৬

১৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭খ, প্রকাশকাল, মে ১৯৯৫

১৮। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, প্রকাশকাল, মে ১৯৯৫

১৯। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯খ, প্রকাশকাল, অক্টোবর ১৯৯৫

২০। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ, প্রকাশকাল, এপ্রিল ১৯৯৬

২১। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১খ, প্রকাশকাল, আগষ্ট ১৯৯৬

২২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২খ, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

২২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩খ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯৭

২৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪খ (১ম ভাগ) প্রকাশকাল, আগষ্ট ১৯৯৮

২৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫খ, প্রকাশকাল, অক্টোবর ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

থিসিস

১। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৫ মার্চ, ২০০২

২। আ.হা. ইয়াহইয়ার রহমান, মাওয়ালী এবং ইসলামী উলুমে তাহাদের অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩। ডক্টর আফতাব আহমদ রহমানী, Hafiz Ibn al-Asqualani and his contribution to Hadith Literature, Rajshahi University, 1967.

৪। ডক্টর আ.ফ.ম. আকবর হোসাইন, আল্লামা ইবন কাছীর, তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশে তাঁর অবদান, কুষ্টিয়া, ইবি ১৯৯৯

৫। ডক্টর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভীর জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৬। Abdullah-AL-Mamun, Bangladesh and Muslim countries a Politics study, 1972-1990, Department of Political Science, University of Dhaika, Dhaka 1996.

৭। নুর হোসেন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকা/জার্নাল/WebSide

১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮৩,
২। জালাল ফিরোজ, সংঘর্ষ, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং বাংলাদেশ একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা, সমাজ নিরীক্ষন, নং-১২১ এপ্রিল-জুন ২০১২,
৩। Charter of the Organisagion of the Islamic Conference, সংশোধিত ১৪ মার্চ ২০০৮,
৪। www.oic-oci.org.com.
৫। The Asian Age, Calcutta, October 19, 1999.
৬। খোন্দকার আব্দুল হামিদ, আফগানিস্তান সোভিয়েতের ভিয়েতনাম, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (২৩ বর্ষ-চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন-১৯৮৪) সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুর;*
৭। Human Development Report, *UNDP, Year 2001.*
৮। World Health Report, *WHO, Year 2000.*
৯। www.un.com
১০।— Charter of the organization of the Islamic Conference, Article- 4
১১। IUT Calendar, 2004/2005, Dhaka,
১২। The Guardian, April 2007, Dhaka,
১৩। এম পাটোয়ারী, সাক্ষাৎকার - সৈয়দ শাহ এমরান
১৪। Annual Report, IDB-BISEW, 2003
১৫। Report, IDB-BISEW, 2008
১৬। দূররে মাখদূম, সাক্ষাৎকার - সৈয়দ শাহ এমরান
১৭।— Charter of The Islamic Development Bank (IDB)
১৮। IDB Annual Report, 2009
১৯। The ASian Age, calculta, October 19, 1999.
২০। আমার দেশ,
২১। দৈনিক ইত্তেফাক
২২। দৈনিক প্রথম আলো
২৩। দৈনিক ইনকিলাব
২৪। দৈনিক সমকাল
২৫। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৬। দৈনিক জনকণ্ঠ
২৭। দৈনিক সংবাদ
২৮। নয়াদিগন্ত, ৯ নভেম্বর, ২০০৭
২৯। Joseph Schachat and C.E. Booworth (eds.) *The Legacy of Islam* ,Oxford, Oxford University Press 1979
৩০। John L. Esposito, (ed.) *Islam and Development Religion and socio-political change Syracuse*, University Pess, New York, 1982
৩১। Marjore Kelly (ed.) *Islam religion and Political life of a world Community*, Praeger, NewYork, 1984.
৩২। A.K.S. Lambton, Islamic Political Thought' in Joseph Schacht and C.,*E.* Bosworth eds. *The Legacy of Islam* ,Oxford University Press 1979.
৩৩। G.A Almond and J.S. Coleman eds. *The Politics of Developing Areas*, New Jersey, Princeton University Press, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। ড. আনিসুজ্জামান, *বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা) এর অবদান*, ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০,

৩৫। খন্দকার মনসুর আহমেদ, *বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহান দিশারী মহানবী (সা)*, মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা, সম্পাদিত বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা),

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায় : পরিশিষ্ট-১

(ওআইসি-র সনদের বাংলা অনুবাদ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমরা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রবৃন্দ এই মর্মে সংকল্পবদ্ধ/প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ঃ

৯ থেকে ২২ রজব ১৩৮৯ হিজরী মোতাবেক ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ খ্রি. রাবাতে অনুষ্ঠিত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ এবং রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মেলন এবং ১৪ থেকে ১৮ মহররম ১৩৯২ হিজরী মোতাবেক ২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ ১৯৭২ খ্রি. জেদ্দায় অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলকে স্বীকৃতিদান;

- ইসলামের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে ঐক্য ও সংহতিকে সমুন্নত ও সুসংহত রাখার অপরিহার্যতার প্রতি অঙ্গীকার জ্ঞাপন;
- জাতিসংঘ সনদ, বর্তমান সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার জ্ঞাপন;
- মানবিক মর্যাদা, শান্তি, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সাম্য, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান মূল্যবোধ লালন এবং সমুন্নত রাখা;
- সদস্য রাষ্ট্রসমূহের টেকসই উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ইসলামের অগ্র সৈনিকের ভূমিকা পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা;
- মুসলিম জাতিসমূহ এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতি সমুন্নত ও জোরদার করা;
- সকল সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভৌগলিক অখন্ডতাকে সংরক্ষণ ও সম্মান জানানো বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা এবং সংলাপ এবং আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমর্থন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা উন্নয়ন, উৎসাহ ও সহযোগিতার প্রদান;
- সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সাংবিধানিক ও আইনী ব্যবস্থা অনুযায়ী মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, সুশাসন, আইনের শাসন, গণতন্ত্র এবং জবাবদিহিতার লালন ও উন্নয়ন;
- সদস্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আস্থা, বন্ধুত্বের সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতা প্রদান;
- ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, ইসলামের সুউচ্চ মূল্যবোধ লালন এবং ইসলামের প্রতীক, ঐতিহ্য ও সাধারণ উত্তরাধিকার সংরক্ষণ এবং ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীনতাকে সমর্থন প্রদান;
- বুদ্ধিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের সুউচ্চ আদর্শ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও জনপ্রিয়করণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো;

Dhaka University Institutional Repository

- অংশীদারিত্ব ও সমতার ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর অংশগ্রহনের নিমিত্ত টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণ;
- সকল সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং স্বাধীনতা ও ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা;
- ফিলিস্তিনী জণগণের যাঁরা বর্তমানে বিদেশী দখলদারদের অধীনে আছেন, সংগ্রামকে সমর্থন এবং আত্মানিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং আল কুদ্স আশ-শরীফে রাজধানীসহ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং একই সাথে এর ঐতিহাসিক ইসলামী পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণের অধিকার অর্জনে তাদের ক্ষমতা প্রদান;
- সদস্যরাষ্ট্রসমূহের আইন ও বিধান অনুযায়ী জীবনের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখা;
- মুসলিম শিশু ও যুবকদের যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা এবং তাদের সাংস্কৃতিক সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানো;
- সদস্যরাষ্ট্রের বাইরে অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মর্যাদা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণের জন্য তাদের সহায়তা প্রদান;
- এই সনদ জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য এবং নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং একই সাথে কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকা;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুশাসন কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ক্ষমতা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক এবং কোন দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;

অত:পর এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সংশোধিত সনদের প্রতি ঐকমত্য পোষন করা হয়।

অধ্যায়-১
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
অনুচ্ছেদ-১

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ :

১। সদস্য রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির বন্ধন দৃঢ় করা;

২। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা এবং সংরক্ষণ এবং মুসলিম বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষভাবে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য সাধারণভাবে সদস্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা সমন্বয় এবং একীভূত করা;

৩। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা এবং ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ অন্যরাষ্ট্রে নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;

৪। আগ্রাসনের শিকার দখলাধীন কোন সদস্যরাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে সমর্থন প্রদান;

৫। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করা,

৬। বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও সৌহার্দ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুবিচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের ভিত্তিতে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়ন;

৭। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে বিধৃত জাতি সমূহের অধিকারের প্রতি সমর্থন পূর্নব্যক্ত কর,

৮। ফিলিস্তিনী জনগণের আল-কুদ্স আল-শরীফে রাজধানীসহ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদানের এবং এর ঐতিহাসিক ও ইসলামী বৈশিষ্টসহ এখানে অবস্থিত পবিত্র স্থান সমূহের বৈশিষ্ট সংরক্ষণ করা;

৯। ইসলামিক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সংহতি অর্জনের নিমিত্ত আন্ত:ইসলামী অর্থনীতি ও বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করা;

১০। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের টেকসই এবং ব্যপকভিত্তিক মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়াস চালানো;

১১। সংযম ও সহনশীলতার ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ, ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানো;

১২। ইসলামের সার্বিক ভাবমর্যাদা রক্ষা ও সংরক্ষণ, ইসলামের অবমাননা প্রতিরোধ করা এবং সভ্যতা ও ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ উৎসাহিত করা;

১৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার এ সকল ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গবেষণা ও সহযোগিতা উৎসাহিত করা;

১৪। মানবাধিকার এবং নারী, শিশু, যুব ও প্রবীণ বিশেষ যত্নের প্রয়োজন এরূপ ব্যক্তিদের অধিকারসহ মৌলিক অধিকারের লালন ও সংরক্ষণ এবং ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ;

১৫। সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক হিসেবে পরিবারের ভূমিকার সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং গুরুত্ব প্রদান;

১৬। সদস্য বহির্ভূত দেশসমূহে মুসলিম সম্প্রদায় এবং সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের অধিকার, মর্যাদা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সুরক্ষা;

১৭। আন্তর্জাতিক ফোরাম সমূহে অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সমন্বিত অবস্থানের প্রসার এবং সমর্থন;

Dhaka University Institutional Repository

১৮। সকল রূপে ও আকারে সন্ত্রাস দমনে সহযোগীতা সংগঠিত অপরাধ, মাদক পাচার, দূর্নীতি, মুদ্রাপাচার/কালো টাকা সাদাকরন এবং মানব পাচাররোধে সহযোগিতা প্রদান;

১৯। প্রাকৃতিক দূর্যোগের মত জরুরী আস্থায় সহযোগিতা ও সমন্বয় করা;

২০। সদস্যদেশ সমূহের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং তথ্য ক্ষেত্র সম্প্রসারনের সহযোগিতা প্রদান;

অনুচ্ছেদ-২

সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকার করছে যে, অনুচ্ছেদ-১ এ বিবৃতি উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে তারা ইসলামের মহান শিক্ষা ও মুল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে এবং নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করবেন।

১। সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিবেন;

২। অধিকার ও দায়িত্বে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সার্বভৌম, স্বাধীন ও সমান;

৩। সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিমাংসা করবেন এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকী থেকে রিত থাকবেন;

৪। সকল সদস্য রাষ্ট্র অঙ্গীকার করছে যে, তারা অপরের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে;

৫। সকল সদস্য রাষ্ট্র অঙ্গীকার করছে যে, তারা আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং বর্তমান সনদ, জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান অনুযায়ী একে অন্যের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ হতে বিরত থাকবে;

৬। এই সনদে যাই থাকুক না কেন, তদ্বারা জাতিসংঘ সনদে যেরূপ বিধৃত আছে। কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমোদন দিবে না;

৭। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুশাসন গণতন্ত্র, মানবাধিকার মৌলিক অধিকার এবং আইনের শাসনের সম্প্রসার ঘটাবে;

৮। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ পরিবেশ সুরক্ষা এবং সংরক্ষণে প্রচেষ্টা চালাবে;

অধ্যায়-২

সদস্যপদ

অনুচ্ছেদ-৩

১। এই সংস্থা ৫৭টি রাষ্ট্র সমন্বয়ে গঠিত যারা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য এবং যারা অনুচ্ছেদ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী সনদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করবে।

২। জাতিসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র যাতে সংখ্যাগরিষ্ট জনসংখ্যা মুসলিম এবং যারা সনদের প্রতি আস্থাশীল এমন রাষ্ট্র সংস্থায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন দাখিল করে সংস্থায় যোগদান করতে পারেন, যদি তা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রীবর্গ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী ঐকমত্যের ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩। এই সনদে যাই থাকুক না কেন তদ্বারা বর্তমান সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অধিকার বা সদস্যপদ বা অন্য কোন বিষয়ে অধিকার ক্ষুন্ন করবে না।

অনুচ্ছেদ-৪

১। জাতিসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্রকে সংস্থার পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

২। আন্তর্জাতিক কোন সংস্থাকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সম্মেলনে পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগৃহীত হবে।

অধ্যায়-৩

অঙ্গ সমূহ

অনুচ্ছেদ-৫

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অংগ সমূহ নিম্মলিখিত বিষয় সমূহের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

১। ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন।

২। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ সম্মেলন।

৩। স্থায়ী কমিটি।

৪। নির্বাহী কমিটি।

৫। আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত।

৬। স্বাধীন স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন।

৭। স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটি।

৮। সাধারণ সচিবালয়।

৯। সহযোগী সংস্থাসমূহ।

১০। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সমূহ।

১১। অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ।

অধ্যায়-৪

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন

অনুচ্ছেদ-৬

সদস্য রাষ্ট্র সমূহের বাদশাহ এবং রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সমন্বয়ে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন গঠিত। এটি সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।

অনুচ্ছেদ-৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন আলোচনা ও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সনদে বর্ণিত উদ্দেশ্যবলী বাস্তবায়নে সকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্র ও উম্মাহর জন্য গুরুত্ববহ অন্যান্য ইস্যুও বিবেচনা করবে।

অনুচ্ছেদ-৮

১। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কোন একটিতে প্রতি তিনবছরে একবার ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

২। সাধারণ সচিবালয়ের সহায়তা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আলোচ্য সূচি প্রণয়ন এবং সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৯

উম্মাহর স্বার্থে প্রয়োজন হলে উম্মাহর জন্য গুরুত্ববহ বিষয় বিবেচনার জন্য অসাধারণ বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে এবং সংস্থার নীতি সমন্বয় করা হবে। অসাধারণ অধিবেশন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সুপারিশক্রমে অথবা কোন সদস্য রাষ্ট্রের বা মহাসচিবের উদ্যোগে অনুষ্ঠান হতে পারে, যদি এইরূপ উদ্যোগ সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের সমর্থন লাভ করে।

অধ্যায়-৫

পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদ

অনুচ্ছেদ-১০

১। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ প্রতি বছরে একবার কোন সদস্য রাষ্ট্রে মিলিত হবে।

২। কোন সদস্য রাষ্ট্র বা মহাসচিবের উদ্যোগে বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে যদি তা রাষ্ট্র বর্গের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের সমর্থন লাভ করে।

৩। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আলোচনার লক্ষে কোন বিশেষ মন্ত্রীপরিষদ সভা ডাকার জন্য সুপাশি করতে পারে। এরূপ সভার প্রতিবেদন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদে দাখিল করতে হবে।

৪। সংস্থার সাধারণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ উপায় বিবেচনার্থে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

(ক) সংস্থার সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্তও প্রস্তাবনা গ্রহণ,

(খ) পূর্ববর্তী শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তও প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা,

(গ) সাধারণ সচিবালয় ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহের কর্মসূচী, বাজেট ও অন্যান্য সার্বিক ও প্রশাসনিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন,

(ঘ) এক বা একাধিক সদস্যরাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান যদি সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক এমর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে কোন অনুরোধ করা হয়,

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) নতুন কোন সংস্থা বা কমিটি গঠনের সুপারিশ করা,

(চ) সনদের ১৬ ও ১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাক্রমে মহাসচিব নির্বাচন ও সহকারী মহাসচিববৃন্দের নিয়োগ,

(ছ) উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে অন্য যে কোন বিষয় বিবেচনা করা,

অধ্যায়-৬
স্থায়ী কমিটি
অনুচ্ছেদ-১১

১। সংস্থা এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় বিবেচনার্থে এই সংস্থা নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করছে,

এক ঃ আল কুদস কমিটি

দুই ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (COMIAC)

তিন ঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা সংক্রান্তস্থায়ী কমিটি (COMCEC)

চার ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা সংক্রান্তস্থায়ী কমিটি (COMSTECH)

২। শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের বা এরূপ কমিটির সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি সমূহের প্রধান হিসাবে আছেন বাদশাহ, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ।

অধ্যায়-৭
নির্বাহী কমিটি
অনুচ্ছেদ-১২

বর্তমান, পরবর্তী অথবা পরবর্তী ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সমূহের সভাপতি, চেয়ারম্যান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ, সাধারণ সচিবদের সদর দপ্তর যে দেশে অবস্থিত সে দেশ এবং পদাধিকার বলে মহাসচিব নির্বাহী সদস্য। নির্বাহী কমিটির সভাসমূহ কার্য পরিচালনা বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

অধ্যায়-৮
স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটি
অনুচ্ছেদ-১৩

স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটির বিশেষ অধিকার ও কার্যপদ্ধতি সমূহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

অধ্যায়-৯
আন্তর্জাতিক ইসলামিক আদালত
অনুচ্ছেদ-১৪

১৯৮৭ সালে কুয়েতে আন্তর্জাতিক ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। যা এ সংক্রান্তআইন কার্যকরের পর হতে এই সংস্থার মুখ্য বিচারিক শাখা হবে।

অধ্যায়-১০
স্থায়ী স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন
অনুচ্ছেদ-১৫

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংস্থার চুক্তি ও ঘোষণাবলীতে এবং সার্বজনীন ভাবে গৃহীত এবং বিধৃত নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ এবং মানবাধিকার দলীল সমূহের লালন করবে।

অধ্যায়-১১

সাধারণ সচিবালয়

অনুচ্ছেদ-১৬

একজন মহাসচিব যিনি এই সংস্থার মুখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবেন এবং এই সংস্থার জন্য প্রয়োজন এইরূপ কর্মীবাহিনী নিয়ে সচিবালয় গঠিত হবে। মহাসচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদে নির্ধারিত হবেন যা একবার নবায়ন যোগ্য হবে। মহাসচিব সদস্যরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে হতে সমতাভিত্তিক ভৌগোলিক বন্টন, আবর্তন ও সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতি সমান সুযোগের ভিত্তিতে এবং দক্ষতা, সততা ও অভিজ্ঞতার বিবেচনা করে মহাসচিব নির্ধারিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১৭

মহাসচিব নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন ঃ

(ক) যে সব বিষয় সংস্থার উদ্দেশ্য পূরন বা ব্যহত করতে পারে বলে মনে করেন তা সংস্থার উপর্যুক্ত শাখাসমূহের গোচরীভূত করবেন।

(খ) ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সমূহে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ এবং অন্যান্য মন্ত্রীপরিষদ পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্ত, সুপারিশ ও প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন তদারকী করবেন।

(গ, ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তড়, সুপারিশ ও প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্র সমূহের কর্মপত্র এবং স্মারক প্রদান করবেন।

(ঘ) এই সংস্থার সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

(ঙ) সাধারণ সচিবালয়ের কর্মসূচী ও বাজেট প্রনয়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(চ) সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সদস্যরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহের আদান-প্রদান করা।

(ছ) অন্যান্য এরূপ দায়িত্ব পালন করা যা ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত হয়।

(জ) সংস্থার কাজ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করা।

অনুচ্ছেদ-১৮

১। মহাসচিব ভৌগলিক বন্টনের নীতি অনুযায়ী এবং সনদের উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও সততার প্রতি লক্ষ্য রেখে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে নিয়োগের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের নিকট সহকারী মহাসচিব

Dhaka University Institutional Repository

পদসমূহের জন্য মনোয়ন দাখিল করবেন। সহকারী মহাসচিবের একটি পদ আল-কুদস এবং প্যালেস্টাইনের জন্য নির্বাচিত থাকবে। এক্ষেত্রে শর্ত থাকবে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রে তার প্রার্থী মনোয়ন দেবে।

২। মহাসচিব ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তএবং সুপারিশমালা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিশেষ প্রতিনিধিসমূহ নিয়োগ করতে পারেন। এরূপ নিয়োগ তার ম্যান্ডেটসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অনুমোদিত হতে হবে।

৩। মহাসচিব সুষম ভৌগলিক বন্টন নীতি অনুযায়ী যোগ্যতা, উপযুক্ততা, সততা এবং লিঙ্গের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে সদস্যরাষ্ট্র সমূহের নাগরিকদের মধ্য থেকে সাধারণ সচিবালয়ের কর্মী নিয়োগ করবেন। মহাসচিব অস্থায়ীভাবে বিশেষ এবং পরামর্শক নিয়োগ দিতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-১৯

দায়িত্ব পালনকালে মহাসচিব, সহকারী মহাসচিবগণ এবং সাধারণ সচিবালয়ের কর্মীগণ এই সংস্থা ব্যতীত কোন সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নির্দেশ প্রার্থনা বা গ্রহণ করবেন না। এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ থেকে তারা বিরত থাকবেন যা তাদের কেবলমাত্র সংস্থার নিকট দায়বদ্ধ আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসাবে তাদের মর্যাদা করে। সদস্যরাষ্ট্র সমূহেও এই একান্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করবেন এবং তাদের দায়িত্ব পালনের কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবেন না।

অনুচ্ছেদ-২০

সাধারন সচিবলায় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সভা প্রস্তুত করবেন এবং প্রশাসনিক ও সাংগাঠনিক বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশের সাথে ঘনিষ্ট সহযোগিতায় কাজ করবেন।

অনুচ্ছেদ-২১

সাধারণ সচিবালয়ের সদর দপ্তর জেদ্দা শহরে থাকবে। আল-কুদস মুক্ত না হওয়া পর্যন্তএভাবে থাকবে এবং কুদস মুক্ত হওয়ার পর এটাই হবে সংস্থার স্থায়ী সদর দপ্তর।

অধ্যায়-১২

অনুচ্ছেদ-২২

সনদের ধারা অনুযায়ী সংস্থা অধীনস্থ সংগঠন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং অধিভূক্ত মর্যাদা পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে প্রদান করতে পারবে।

অধীনস্থ সংগঠন

অনুচ্ছেদ-২৩

অধীনস্থ সংগঠন শীর্ষ সম্মেলন বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ সংক্রান্তবাজেট পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হবে।

অধ্যায়-১৩

বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ

অনুচ্ছেদ-২৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তঅনুযায়ী সংস্থার কাঠামোর আওতায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। সংস্থার সদস্যদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্যভূক্ত স্বেচ্ছামূলক এবং উন্মুক্ত। এদের বাজেট স্বাধীন এবং এদের নিজস্ব বিধি অনুযায়ী আইন সভায় অনুমোদিত হয়।

অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠাসমুহ

অনুচ্ছেদ-২৫

অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো সেই সত্তা বা সংস্থা যাদের উদ্দেশ্য এই সনদের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যভূক্তি ঐচ্ছিক এবং সদস্যরাষ্ট্র সমূহের প্রতিষ্ঠান ও শাখা সমূহের জন্য উন্মুক্ত। এদের বাজেট সাধারণ সচিবালয়ের অধীনস্থ শাখা এবং বিশেষায়িত সংগঠনের বাজেটের থেকে স্বাধীন। অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বলে সংস্থার পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান করা যেতে পারে। তারা অধীনস্থ শাখাসমূহ এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সদস্যরাষ্ট্র সমূহের নিকট থেকে স্বেচ্ছামূলক সহায়তা গ্রহন করতে পারেন।

অধ্যায়-১৪

ইসলামী এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা

অনুচ্ছেদ-২৬

বর্তমান সনদে বিধৃত উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নে এই সংস্থা অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

অধ্যায়-১৫

শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি

অনুচ্ছেদ-২৭

সদস্যরাষ্ট্র সমূহ, যারা কোন বিরোধের পক্ষভূক্ত এবং যে বিরোধের ফলে ইসলামী উম্মাহ বা আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে তার সমাধানের জন্য উদ্যোগ, আলোচনা, তদন্ত, মিমাংসা, সালিশি, বিচারিক নিষ্পত্তির অথবা তাদের পছন্দ অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে নির্বাহী কমিটি এবং মহাসচিবের সাথে আলোচনা-পরামর্শ।

অনুচ্ছেদ-২৮

আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই সংস্থা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা করতে পারে।

অধ্যায়-১৬

বাজেট এবং অর্থ

অনুচ্ছেদ-২৯

১. সাধারণ সচিবালয়ের এবং অধীনস্থ সংগঠনসমূহের বাজেট সদস্যরাষ্ট্র সমূহের জাতীয় আয়ের আনুপাতিক হারে নির্বাহ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সংস্থা বিশেষ তহবিল এবং এন্ডোমেন্ট (ওয়াকফ) গঠন করতে পারে যা সেচ্ছা ভিত্তিতে সদস্যরাষ্ট্র, ব্যক্তি এবং সংস্থাসমূহের চাদায় গঠিত হবে। এই তহবিলসমূহ এবং এনডোমেন্টসমূহ সংস্থার আর্থিক বিধিবিধানের অধীন হবে এবং অর্থ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে নিরীক্ষিত হবে।

অনুচ্ছেদ-৩০

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অনুমোদিত আর্থিক বিধি অনুযায়ী সাধারণ সচিবালয় এবং অধীনস্থ সংগঠনসমূহ তাদের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা করবে।

অনুচ্ছেদ-৩১

১. অংশগ্রহণকারী সদস্যরাষ্ট্র সমূহের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক "একটি স্থায়ী অর্থ কমিটি" গঠিত হবে যা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রবিধান অনুযায়ী সাধারণ সচিবালয় এবং অধীনস্থ সংগঠন সমূহের কার্যক্রম এবং বাজেট চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সংস্থার সদর দপ্তরে মিলিত হবে।

২. স্থায়ী অর্থ কমিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে যা কার্যক্রম ও বাজেট বিবেচনা এবং অনুমোদন করবে।

৩. সদস্যরাষ্ট্র সমূহ থেকে আর্থিক/নিরীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত "অর্থ নিয়ন্ত্রণ শাখা" অভ্যান্তড়ীন বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী সাধারণ সচিবালয় এবং অধীনস্থ শাখাসমূহের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করবে।

অধ্যায়-১৭

কার্যবিধি এবং ভোটদান

অনুচ্ছেদ-৩২

০১. পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ নিজস্ব কার্যবিধি গ্রহণ/অনুমোদন করবে।

০২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের কার্য প্রনালী বিধি সুপারিশ করবে।

০৩. স্থায়ী কমিটিসমূহ তাদের স্ব স্ব কার্য প্রনালী বিধি প্রনয়ন করবে।

অনুচ্ছেদ-৩৩

০১. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সভার ফোরাম হবে সদস্যরাষ্ট্র সমূহের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য।

০২. ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ঐকমত্যে পৌছা সম্ভব না হলে, সনদে অন্য কিছু বলা না থাকলে, উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

অধ্যায়-১৭

চূড়ান্তধারাসমূহ

বিশেষাধিকার সমূহ এবং অব্যাহতি

অনুচ্ছেদ-৩৪

১. দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এবং উদ্দেশ্যে সমূহ অর্জনের লক্ষ্যে সদস্যরাষ্ট্র সমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অব্যাহতি ও বিশেষাধিকার ভোগ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. সদস্যরাষ্ট্র সমূহের প্রতিনিধিবর্গ এবং সংস্থার কর্মকর্তাগণ 'এগ্রিমেন্ট অন প্রিভিলেজেস এন্ড ইমিউনিটিস অব ১৯৭৬' অনুযায়ী বিশেষাধিকার এবং অব্যাহতি ভোগ করবে।

৩. সাধারণ সচিবালয়, অধীনস্থ সংস্থা এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণ সংস্থা ও স্বাগতিক দেশ নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষাধিকার এবং অব্যাহতি ভোগ করবে।

৪. যে সদস্যরাষ্ট্রের চাঁদা বকেয়া থাকবে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদে কোন ভোট থাকবে না যদি তার বকেয়ার পরিমান পূর্ববর্তী দুই পূর্ণ বছরের মধ্যে প্রদেয় চাঁদার সমান ও বেশি হয়। অবশ্য পরিষদ যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চাঁদা প্রদানে ব্যর্থতা সদস্যের নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কারণে তাহলে তাকে ভোটদানের অনুমতি প্রদান করতে পারে।

প্রত্যাহার
অনুচ্ছেদ-৩৫

১. যে কোন সদস্যরাষ্ট্র প্রত্যাহারের এক বৎসর পূর্বে মহাসচিবের নিকট নোটিশ প্রদান করে সংস্থা থেকে সদস্য পদ প্রত্যাহার করতে পারে। এরূপ প্রজ্ঞাপন সকল সদস্যরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

২. সদস্যপদ প্রত্যাহারের আবেদনকারী রাষ্ট্র যে অর্থ বৎসরে আবেদন জমা দিবে সেই বৎসরের শেষ না হওয়া পর্যন্ত দায়-দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে। আবেদনকারী রাষ্ট্রের নিকট সংস্থার অন্যান্য সকল প্রাপ্য পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকবে।

সংশোধনী
অনুচ্ছেদ-৩৬

বর্তমান সনদের সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

ক) যে কোন সদস্যরাষ্ট্র বর্তমান সনদে কোন সংশোধনের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের নিকট প্রস্তাব পেশ করতে পারবে।

খ) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদিত হলে এবং দুই তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্রের ভোটে অনুসমর্থিত হলে প্রস্তাব কার্যকর হবে।

ব্যাখ্যা
অনুচ্ছেদ-৩৭

১. বর্তমান সনদের কোন অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা, প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে তা আন্তরিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং তা সকল ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ, সমন্বয় এবং সালিশির মাধ্যমে হতে হবে।

২. এই সনদের ধারাসমূহ সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক তার সাংবিধানিক প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে।

অনুচ্ছেদ-৩৮

সংস্থার ভাষা সমূহ হবে আরবী, ইংরেজি এবং ফার্সী

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা

অনুসমর্থন এবং কার্যকরীকরণ

অনুচ্ছেদ-৩৯

১. এই সনদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্টতায় গৃহীত হবে এবং প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনের জন্য অবমুক্ত থাকবে।

২. অনুসমর্থনের দলিল পত্রাদি সংস্থার মহাসচিবের নিকট জমা দিতে হবে।

৩. এই সনদ ১৯৭৪ সালের ১ ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে জাতিসংঘের সনদের অনুচ্ছেদ ১০২ অনুযায়ী নিবন্ধিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সনদকে প্রতিস্থাপন করছে।

{(ডাকার, সেনেগাল প্রজাতন্ত্র), ৭ বরিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৪ মার্চ-২০০৮}

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

(জাতিসংঘ সনদের নিরাপত্তা পরিষদ, বিরোধাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং শান্তি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর বাংলা অনুবাদ)

পঞ্চম অধ্যায়
নিরাপত্তা পরিষদ
ধারা-২৩
গঠন

১. জাতিসংঘের ১৫-সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে। চীন প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হবে। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের অপর ১০-সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করবে। নির্বাচনকালে প্রথমত আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা সংরক্ষণে ও সংগঠনটির অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণে জাতিসংঘের সদস্যদের অবদান এবং সম-ভৌগোলিক বন্টনের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখা হবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ১৫ তে উন্নীত হবার পর প্রথম নির্বাচনে ৪টি অতিরিক্ত সদস্যের মধ্যে ২টি একবছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। কোনো বিদীয়ী সদস্য আশু পূণনির্বাচনের জন্য যোগ্য হবে না।

৩. নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একজন প্রতিনিধি থাকবে।

কার্যক্রম ও ক্ষতাবলি
ধারা-২৪

১. জাতিসংঘ কর্তৃক দ্রুত ও কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সদস্যবৃন্দ নিরাপত্তা পরিষদের ওপর আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করছে এবং ঐ দায়িত্ব অনুযায়ী কর্তব্য পালনে নিরাপত্তা পরিষদ তাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করছে বলে স্বীকার করে নিচ্ছে।

২. এইসব কর্তব্য পালনে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি অনুযায়ী চলবে। কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৩. নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৪.

ধারা-২৫

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যগণ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তমেনে চলতে এবং তা কার্যকর করতে স্বীকৃত হচ্ছে।

ধারা-২৬

বিশ্বের লোকবল ও আর্থিক সম্পদ অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন যতদুর সম্ভব কম নিয়োজিত করে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় সেজন্য নিরাপত্তা পরিষদ ধারা-৪৭-এ বর্ণিত সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাসমূহ জাতিসংঘের সদস্যদের নিকট পেশ করার জন্য দায়ী থাকবে।

ভোটদান রীতি

ধারা-২৭

১. নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোটদানের অধিকার থাকবে।

২. পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে ৯টি সদস্যের ইতিবাচক ভোটে সিদ্ধান্তগৃহীত হবে।

৩. অন্যান্য বিষয়ে স্থায়ী সদস্যদের সমর্থনসূচক ভোটসহ মোট ৯টি সদস্যের ইতিবাচক ভোটে নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে, অবশ্য ষষ্ঠ অধ্যায় অথবা ধারা-৫২-এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে বিবদমান সদস্য ভোটদানে বিরত থাকবে।

কার্যপদ্ধতি

ধারা-২৮

১. নিরাপত্তা পরিষদ এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য সর্বদাই পরিষদের কার্যালয়ে প্রতিনিধি রাখবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ নৈমিত্তিকভাবে যেসব অধিবেশনে মিলিত হবে তাতে সদস্যদের প্রত্যেকই ইচ্ছা করলে সরকারের প্রতিনিধি অথবা বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত অন্য কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।

৩. সংগঠনটির সদর কার্যালয় ছাড়াও নিরাপত্তা পরিষদ তার বিচারে কার্যনির্বাহের জন্য প্রকৃষ্টতম স্থানে অধিবেশন আহবান করতে পারবে।

ধারা-২৯

নিরাপত্তা পরিষদ কার্যনির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে সহকারী অঙ্গসংস্থাসমূহ গঠন করতে পারবে।

ধারা-৩০

নিরাপত্তা পরিষদ সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ স্বীয় কার্যনির্বাহের নিয়মাবলি স্থির করবে।

ধারা-৩১

যদি নিরাপত্তা পরিষদে আনীত কোনো প্রশ্নের সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনায় পরিষদের সদস্য নয় এমন কোনো জাতিসংঘ-সদস্যের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত থাকে তবে ভোটাধিকার ব্যতিরেকে ঐ সদস্য প্রশ্নটির আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-৩২

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় এমন জাতিসংঘ-সদস্য অথবা জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোনো রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা পরিষদে বিবেচনাধীন কোনো বিরোধে পক্ষ বিশেষ হয় তবে ঐ বিরোধ সম্পর্কে আলোচনায় ভোটাধিকার ব্যতিরেক অংশগ্রহণের জন্য পরিষদ তাকে আমন্ত্রণ জানাবে। জাতিসংঘের সদস্যপদহীন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ স্বীয় বিবেচনা অনুসারে আলোচনায় অংশগ্রহণের শর্তাবলি স্থির করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিরোধাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

ধারা-৩৩

১. আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে হুমকিস্বরুপ কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুরো প্রথমত আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, সালিশি, বিচারবিভাগীয় নিষ্পত্তি, আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাদির মারফৎ অথবা তাদের পছন্দমতো অন্যান্য শান্তিড়্পূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করবে।

২. প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পক্ষগুলোকে আহবান জানাবে।

ধারা-৩৪

আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বা বিবাদে পরিণত হতে পারে এরূপ কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার কতটুকু আশস্কা রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারে।

ধারা-৩৫

১. জাতিসংঘের যে-কোনো সদস্য ধারা ৩৪-এ বর্ণিত যে কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

২. যদি জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোনো বিবদমান রাষ্ট্র এই সনদে গৃহীত শান্তিড়্পূর্ণ মীমাংসার বাধ্যবাধকতা মানতে সম্মত থাকে তবে ঐ রাষ্ট্র বিবাদটির সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

৩. এই ধারা অনুসারে আনীত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম ধারা ১১ ও ১২-এ বর্ণিত শর্তসাপেক্ষ হবে।

ধারা-৩৬

১. ধারা-৩৩-এ বর্ণিত যে-কোনো বিরোধ অথবা ঐ ধরনের কোনো পরিস্থিতির যে-কোনো অবস্থায় তা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত পদ্ধতি বা উপায়ে সুপারিশ করতে পারে।

৩. বিবদমান পক্ষগুলো কর্তৃক মীমাংসার জন্য ইতিমধ্যেই গৃহীত যে-কোনো পদ্ধতি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনা করে দেখা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এই ধারা অনুযায়ী সুপারিশাদি করার সময় নিরাপত্তা পরিষদের একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আইনগত বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি অনুসারে ঐ আদালতের আশ্রয় নেওয়াই বিবদমান দলগুলোর পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

ধারা-৩৭

১. বিবদমান পক্ষগুলো ধারা ৩৩-এ বর্ণিত কোনো বিবাদের বিষয় যদি ঐ ধারা অনুসারে মীমাংসা করতে সমর্থ না হয়, তবে তারা বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে ঐ বিবাদ চলতে দেওয়া বিশ্বশান্তিও নিরাপত্তার পক্ষে সত্যিই আশঙ্কাজনক, সে-অবস্থায় পরিষদ ধারা ৩৬ অনুসারে কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় কি না অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত মীমাংসার সূত্র সুপারিশ করা প্রয়োজন কি না তা বিবেচনা করে দেখবে।

ধারা-৩৮

যদি কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয় তবে ঐ পরিষদ শান্তিড়্পূর্ণ মীমাংসার জন্য ধারা ৩৩ থেকে ৩৭ পর্যন্তবর্ণিত বিধানসমূহের কোনোপ্রকার ব্যতয় না করেই বিবদমান পক্ষগুলোর কাছে সুপারিশাদি পাঠাতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

শান্তিড়্র প্রতি হুমকি, শান্তিড়্ভঙ্গ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা

ধারা-৩৯

শান্তির প্রতি কোনো হুমকি রয়েছে কিনা, শান্তিড়্ভঙ্গ হয়েছে কিনা, অথবা কোনো আক্রমণাত্মক কার্য ঘটছে কিনা, নিরাপত্তা পরিষদ তা নির্ধারণ করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য সুপারিশাদি করবে, অথবা ধারা ৪১ ও ৪২ অনুযায়ী প্রয়েজনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে।

ধারা-৪০

পরিস্তিতির অবনতি প্রতিরোধকল্পে নিরাপত্তা পরিষদ ধারা ৩৯ অনুযায়ী সুপারিশ জ্ঞাপন বা কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ করার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাতে পারে। এই সাময়িক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকার, দাবি অথবা অবস্থান কোনোপ্রকারে ব্যাহত হবে না। ঐরূপ সাময়িক ব্যবস্থাদি পালনে ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ নিরাপত্তা পরিষদ যথাযথভাবে করবে।

ধারা-৪১

নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্তড়্গুলোকে কার্যকর করার জন্য সশস্ত্র শক্তি নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা স্থির করবে এবং জাতিসংঘের সদস্যদের সেগুলো কার্যে বাস্তবায়িত করার জন্য আহবান জানাবে। সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আর্থিক সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, রেলপথ, আকাশ, ডাক, তার,

Dhaka University Institutional Repository

রেডিও এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রভৃতি এসব ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত।

ধারা-৪২

ধারা-৪১-এ বর্ণিত ব্যবস্থাদি অপর্যাপ্ত হবে বলে অথবা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে যদি নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তিড়, নিরাপত্তা রক্ষা, বা পুনরুদ্ধার কল্পে পরিষধ বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে। জাতিসংঘের সদস্যদের সামরিক মহড়া, অবরোধ সৃষ্টি অথবা নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী নিয়োগ করে সামরিক শক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি এই ব্যবস্থাদির অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

ধারা-৪৩

১. আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের আহবানের প্রেক্ষিতে এবং একটি বিশেষ চুক্তি অথবা চুক্তিসমূহ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের আন্তর্জাতি শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী, সহায়তা এবং যাতায়াতের অধিকারসহ সুযোগসুবিধাদি দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২. সামরিক দলের সংখ্যা ও প্রকারভেদ, তাদের প্রস্তুতির মাত্রা এবং সাধারণ অবস্থানক্ষেত্র এবং কি ধরনের সুযোগসুবিধা ও সহায়তা তাদের দেওয়া হবে, এইরূপ চুক্তি বা চুক্তিসমূহের দ্বারা তা নির্ণয় করা হবে।

৩. যথাসম্ভব দ্রুত নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে এই চুক্তি বা চুক্তিসমূহের জন্য আলোচনা শুরু করা হবে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্যবৃন্দ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ এবং সদস্যদের বিভিন্ন দলের মধ্যে চুক্তিগুলো সম্পাদিত হবে এবং স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ সংবিধান মোতাবেক অনুমোদন সাপেক্ষ থাকবে।

ধারা-৪৪

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সামরিক শক্তিপ্রয়োগ করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হলে, ধারা-৪৩-এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী জোগানোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিত্ববিহীন কোনো সদস্যকে আহবান করার পূর্বে সেই সদস্যের ইচ্ছা সাপেক্ষে তার সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দেবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তাকে আহবান জানাতে পারবে।

ধারা-৪৫

জরুরী সামরিক ব্যবস্থাদি গ্রহণে জাতিসংঘকে সক্ষম করার জন্য সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সদস্যরা নিজ নিজ জাতীয় বিমানবাহিনীকে অবিলম্বে প্রস্তুত করবে। এইসব বাহিনীর শক্তি ও প্রস্তুতির মাত্রা এবং যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিরূপিত হবে এবং তা ৪৩ ধারায় বর্ণিত বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহের শর্তের মধ্যে সীমিত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৪৬

সামরিকবাহিনী নিয়োগ সম্পর্কিত পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত হবে।

ধারা-৪৭

১. আন্তজার্তিক শান্তিও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন, পরিষদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব ও নিয়োগাদি, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে উপদেশ ও সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণের সেনাধ্যক্ষদের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির সুষ্ঠু দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হলে কমিটিতে স্থায়ী প্রতিনিধিত্ববিহীন জাতিসংঘের যে-কোনো সদস্যকে কমিটি সংযুক্ত হওয়ার জন্য আহবান জানাবে।

৩. নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত সকল সামরিক বাহিনীর পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সামরিক স্টাফ কমিটি নিরাপত্তা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

৪. নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং যথাযথ আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করে সামরিক স্টাফ কমিটি আঞ্চলিক উপকমিটি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ধারা-৪৮

১. আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ পালন করার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে তা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশনানুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য বা কিছুসংখ্যাক সদস্য কর্তৃক কার্যকর করা হবে।

২. এই সিদ্ধান্তজাতিসংঘের সদস্যগণ কর্তৃক সরাসরি অথবা তাদের সদস্যভূক্তি রয়েছে এরূপ উপযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে।

ধারা-৪৯

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত কর্মপন্থা অনুসরণ করার জন্য জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানে স্বীকৃত থাকবে।

ধারা-৫০

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক বা বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের অপর যে-কোনো সদস্য অথবা সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র ঐসব কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে যদি কোনো বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয় তাহলে ঐসব সমস্যার সমাধানকল্পে সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা করার অধিকার থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৫১

জাতিসংঘের কোনো সদস্যের ওপর কোনো সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলে যতক্ষন পর্যন্তনা আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করছে ততক্ষন সেই রাষ্ট্রের একক সহজাত অধিকার বা যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার সম্বন্ধে বর্তমান সনদের কোনো অংশই অন্তরায় হবে না। আত্মরক্ষার এই অধিকার কার্যকরী করার জন্য সদস্যগণ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাদি সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করতে হবে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য এই সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃক ও দায়িত্ব কোনো মতেই বাধ্যাগ্রস্ত হবে না।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিক ব্যবস্থাসমূহ

ধারা-৫২

১. আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থাসমূহ সৃষ্টির ব্যাপারে বর্তমান সনদে কোনো আপত্তি নাই, তবে এসব ব্যবস্থা বা সংস্থা এবং তাদের কার্যকলাপ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বা মুলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২. জাতিসংঘের সদস্যগণ স্থানীয় বিরোধসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের গোচরীভূত করার পূর্বে এসব ব্যবস্থা বা সংস্থার মারফত শান্তিক্পূর্ণভাবে সেগুলোর মীমাংসার জন্য সার্বিক চেষ্টায় নিয়োজিত হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগে অথবা পরিষদের নির্দেশক্রমে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধসমূহের শান্তিক্পূর্ণ উপায়ে মীমাংসার চেষ্টাকে নিরাপত্তা পরিষদ উৎসাহ প্রদান করবে।

৪. এ ধারা কোনোরূপেই ধারা ৩৪ ও ৩৫-এর কার্যকারিতা খর্ব করবে না।

ধারা-৫৩

১. উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও সংস্থাকে নিরাপত্তা পরিষদ স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে বাধ্যতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে নিয়োগ করবে। কিন্ত শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে নিরাপত্তা পরিষদ অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থার মাধ্যমে কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য যতদিন-না সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে জাতিসংঘ নতুন আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ততদিন ধারা ১০৭ অনুসারে অথবা কোনো রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে গঠিত আঞ্চলিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ-ধারার প্রয়োগ চলবে না।

২. বর্তমান ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শত্রুরাষ্ট্র বলতে সনদে স্বাক্ষরকারী যে-কোনো রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন শত্রুকে বুঝায়।

ধারা-৫৪

আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অথবা অভিপ্রেত কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদকে সবসময় সম্পূর্ণ অবহিত রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

ইসলামী সম্মেলন-সংস্থার গঠনতন্ত্র

Charter of the Organisation of the Islamic Conference

In the name of Allah, the most Compassionate, the most Merciful

we the Member States of the Organisation of the Islamic Conference, determined:

to acknowledge the Conference of Kings, Heads of State and Government of the Member Sates convened in Rabat from 9 to 12 Rajab. 1389 H. corresponding to 22 to 25 September 1969, as well as the Conference of Foreign Ministers held in Jeddah from 14 to 18 Muharram 1392 H correspoding to 29 February to 4 March 1972;

to be guided by the noble Islamic values of unity and fraternity, and affirming the essentiality of promoting and consolidating the unity and solidartiy among the Member Sates in securing their common interests at the international arena;

to adhere our commitment to the principles of the United Nations Charter, the present Charter and International Law;

to preserve and promote the lofty Islamic values of peace, compassion, tolerance, equality, justice and human dignity;

to endeavour to work for revitalizing Islam's pioneering role in the world while ensuring sustainable development, progress and prosperity for the peoples of Member States;

to enhance and strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim peoples and Member States;

to respect, safeguard and defend the national sovereignty, independence and territorial integrity of all Member States;

to contribute to international peace and secutity, Understanding and dialogue among civilizations, cultures and religions and promote and encourage friendly relations and good neighborliness, mutual respect and cooperation;

to promote human rights and fundamental freedoms, good governance, rule of law, democracy and accountability in Member States in accordance with their constitutional and legal systems;

Dhaka University Institutional Repository

to promote confidence and encourage friendly relations, mutual respect and cooperation between Member States and other States;

to foster noble Islamic values concerning moderation, tolerance, respect for diversity, preservation of Islamic symbols and common heritage and to defend the university of Islamic religion;

to advance the acquisition and popularization of knowledge in consonance with the lofty ideals of Islam to achieve intellectual excellence;

to promote cooperation among Member States to achieve sustained socio-economic development for effective integration in the global economy, in conformity with the principles of partnership and equality;

to preserve and promote all aspects related to environment for present and future generations;

to respect the right of self-determination and non-interference in the domestic affairs and to respect sovereignty, independence and territorial integrity of each member State;

to support the struggle of the Palestinian people, who are presently under foreign occupation, and to empower them to attain their inalienable rights, including the right to self-determination, and to establish their sovereign state with Al-Quds Al-Sharif as its capital, while safeguarding its historic and Islamic Character, and the holy places therein;

to safeguard and promote the rights of women and their participation in all spheres of life, in accordance with the laws and legislation of Member States;

to create conductive conditions for sound up-bringing of Muslim children and youth, and to inculcate in them Islamic values through education for strengthening their cultural, social, moral and ethical ideals;

to assist Muslim minorities and communities outside the Member States to preserve their dignity, cultural and religious identity;

to uphold the objectives and principles of the present Charter, the Charter of the United nations and international law as well as international humanitarian law while strictly adhering to the principle of non-interference in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State;

Dhaka University Institutional Repository

to strive to achieve good governance at the international level and the democratization of the international relations based on the principles of equality and mutual respect among States and noninterference in matters which are within their domestic jurisdiction;

Have resolved to cooperate in achieving these goals and agreed to the present amended Charter.

CHAPTER I
objectives and Principles
Article 1

The objectives of the Organization of the Islamic Conference shall be :

1. To enhance and consolidate the bonds of fraternity and solidarity among the Member States;
2. To safeguard and protect the common interests and support the legitimate causes of the Member States and coordinate and unify the efforts of the member States in view of the challenges faced by the Islamic world in particular and the international community in general;
3. To respect the right of self-determination and non-interference in the domestic affairs and to respect sovereignty, independence and territorial integrity of each Member State;
4. To support the restoration of complete sovereignty and territorial integrity of any Member State under occupation, as a result of aggression, on the basis of international law and cooperation with the relevant international and regional organizations;
5. To ensure active participation of the Member States in the global political, economic and social decision-making processes to secure their common interests;
6. To promote inter-state relations based on justice, mutual respect and good neighborliness to ensure global peace, security and harmony;
7. To reaffirm its support for the rights of peoples as stipulated in the UN Charter and international law;
8. To support and empower the Palestinian people to exercise their ritht to self-determination and establish their sovereign State with Al-Quds Al-Sharif as its capital, while safeguarding its historic and Islamic character as well as the Holy places therein;
9. To strengthen intra-Islamic economic and trade cooperation; in order to achieve economic integration leading to the establishment of an Islamic Common Market;
10. To exert efforts to achieve sustainable and comprehensive human development and economic well-being in Member States;
11. To disseminate, promote and preserve the Islamic teachings and values based on moderation and tolerance, promote Islamic culture and safeguard Islamic heritage;

Dhaka University Institutional Repository

12. To protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of Islam and encourage dialogue among civilizations and religions ;
13. To enhance and develop science and technology and encourage research and cooperation among Member States in these fields ;
14. To promote and to protect human rights and fundamental freedoms including the rights of women, children, youth, elderly and people with special needs as well as the preservation of Islamic family values;
15.To emphasize, protect the role of the family as the natural and fundamental unit of society;
16. To safeguard the rights, dignity and religious and cultural identity of Muslim communities and minorities in non-Member States;
17.To promote and defend unified position on issues of common interest in the international fore;
18. To cooperate in combating terrorism in all its forms and manifestations, organized crime, illicit drug trafficking, corruption, money laundering and human trafficking.
19. To cooperate and coordinate in humanitarian emergencies such as natural disasters;
20. To promote cooperation in social, cultural and information fields among the Member States.

Article 2

The member States undertake that in order to realize the objectives in Article 1, they shall be guided and inspired by the noble Islamic teachings and values and act in accordance with the following principles :

1. All Member States commit themselves to the purposes and principles of the United nations Charter ;
2. Member States are sovereign, independent and equal in rights and obligations;
3. All Member States shall settle their disputes through peaceful means and refrain from use or threat of use of force in their relations;
4. All Member States undertake to respect national sovereignty, independence and territorial integrity of other Member States and shall refrain from interfering in the internal affairs of others;
5.All Member States undertake to contribute to the maintenance of international peace and security and to refrain from interfering in each other's internal affairs as enshrined in the present Charter, the Charter of the United nations, international law and international humanitarian law;
6. As mentioned in the UN charter, nothing contained in the present Charter shall authorize the Organization and its Organs to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of nay State or related to it ;
7. Member States shall uphold and promote, at the national and international levels, good governance, democracy, human rights and fundamental freedoms, and the rule of law;
8. Member States shall endeavor to protect and preserve the environment.

Dhaka University Institutional Repository

CHAPTER II
Membership
Article 3

1. The Organization is made up of 57 States member of the Organization of the Islamic Conference and other States which may accede to this Charter in accordance with Article 3 paragraph 2.
2. Any State, member of the United nations, having Muslim majority and abiding by the Charter, which submits an application for membership may join the Organization if approved by consensus only by the Council of Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the council of Foreign Ministers.
3. Nothing in the present Charter shall undermine the present Member States' rights or privileges relating to membership or any other issues.

Article-4

1. Decision on granting Observer status to a State, member of the United nations, will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.
2. Decision on granting Observer status to an international organization will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.

CHAPTER III
Organs
Article 5

The Organs of the Organization of the Islamic Conference shall consist of :

1. Islamic Summit
2. Council of Foreign Ministers
3. Standing Committees
4. Executive Committee
5. International Islamic Court of Justice
6. Independent Permanent Commission of Human Rights
7. Committee of Permanent Representatives
8. General Secretariat

Dhaka University Institutional Repository

9. Subsidiary Organs

10. Specialized Institutions

11. Affiliated Institutions

CHAPTER IV
Islamic Summit
Article 6

The Islamic Summit is composed of Kings and Heads of State and Government of Member States and is the supreme authority of the Organization.

Article 7

The Islamic Summit shall deliberate, take policy decisions and provide guidance on all issues pertaining to the realization of the objectives as provided for in the Charter and consider other issues of concern to the Member States and the Ummah.

Article 8

1. The Islamic Summit shall convene every three years in one of the Member States.
2. The preparation of the Agenda and all necessary arrangements for the convening of the Summit will be done by the Council of Foreign Ministers with the assistance of the General Secretariat.

Article 9

Extraordinary Sessions will be held, whenever the interests of Ummah warrant it, to consider matters of vital importance to the Ummah and coordinate the policy of the Organization accordingly. An extraordinary Session may be held at the recommendation of the Council of Foreign Ministers or on the initiative of one of the Member States or the Secretary-General, provided that such initiative obtains the support of simple majority of the Member States.

CHAPTER V
Council of Foreign Ministers
Article 10

1. The Council of Foreign Ministers shall be convened once a year in one of the Member States.

Dhaka University Institutional Repository

2. An extraordinary Session of the Council of foreign Ministers may be convened at the initiative of any Member State or of the Secretary General if such initiative is approved by a simple majority of the Member States.
3. The Council of Foreign Ministers may recommend convening other sectorial Ministerial meetings to deal with the specific issues of concern to the Ummah. Such meetings shall submit their reports to the Islamic Summit and the Council of Foreign Ministers.
4. The Council of Foreign Ministers shall consider the means for the implementation of the general policy of the Organization by:

a. Adopting decisions and resolutions on matters of common interest in the implementation of the objectives and the general policy of the Organization;
b. Reviewing progress of the implementation of the decisions and resolutions adopted at the previous Summits and Councils of Foreign Ministers.
c. Considering and approving the program, budget and other financial and administrative reports of the General Secretariat and Subsidiary Organs;
d. Considering any issue affecting one or more Member States whenever a request to that effect by the Member State concerned is made with a view to taking appropriate measures in that respect;
e. Recommending to establish any new organ or committee;
f. Electing the Secretary General and appointing the Assistant Secretaries General in accordance with Articles 16 and 18 of the Charter respectively;
g. Considering any other issue it deems fit.

CHAPTER VI
Standing Committees
Article 11

1. In order to advance issues of critical importance to the Organization and its Member States, the Organization has formed the following Standing Committees:

   i. Al Quds Committee

   ii. Standing Committee for Information and Cultural Affairs (COMIAC)

   iii. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC)

Dhaka University Institutional Repository

iv. Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH).

2. The Standing Committees are chaired by kings and Heads of State and Government and are established in accordance with decisions of the Summit or upon the recommendation of the Council of Foreign Ministers and the membership of such Committees.

CHAPTER VII
Executive Committee
Article 12

The executive Committee is comprised of the Chairmen of the Current, preceding and succeeding Islamic Summits and Councils of Foreign Ministers, the host country of the Headquarters of the General Secretariat as well as the Secretary General as an ex-officio member. The Meetings of the Executive Committee shall be conducted according to its Rules of Procedure.

CHAPTER VIII
Committee of Permanent Representatives
Article 13

The prerogatives and modes of operation of the Committee of Permanent Representatives shall be defined by the Council of Foreign Ministers.

CHAPTER IX
International Islamic Court of Justice
Article 14

The International Islamic Court of Justice established in Kuwait in 1987 shall, upon the entry into force of its Statute, be the principal judicial organ of the Organization.

CHAPTER X
Independent Permanent Commission on Human Rights
Article 15

The Independent Permanent Commission on Human Rights shall promote the civil, political, social and economic rights enshrined in the organization's covenants and declarations and in universally agreed human rights instruments, in conformity with Islamic values.

Dhaka University Institutional Repository

CHAPTER XI

General Secretariat

Article 16

The General Secretariat shall comprise a Secretary-General, who shall be the Chief Administrative Officer of the Organization and such staff as the Organization requires. The Secretary-General shall be elected by the Council of Foreign Ministers for a period of five years, renewable once only. The Secretary-General shall be elected from among nationals of the Member States in accordance with the principles of equitable geographical distribution, rotation and equal opportunity for all Member States with due consideration to competence, integrity and experience.

Article 17

The Secretary General shall assume the following responsibilities:

a. bring to the attention of the competent organs of the Organization matters which, in his opinion, may serve or impair the objectives of the Organization;
b. follow-up the implementation of decisions, resolutions and recommendations of the Islamic Summits, and Councils or Foreign Ministers and other Ministerial meetings;
c. provide the Member States with working papers and memoranda, in implementation of the decisions, resolutions and recommendations of the Islamic Summits and the Councils of foreign Ministers;
d. coordinate and harmonize, the work of the relevant Organs of the Organization;
e. prepare the programme and the budget of the General Secretariat;
f. promote communication among Member States and facilitate consultations and exchange of views as well as the dissemination of information that could be of importance to Member States;
g. perform such other functions as are entrusted to him by the Islamic Summit or the Council of Foreign Ministers;
h. submit annual reports to the Council of Foreign Ministers on the work of the Organization.

Dhaka University Institutional Repository

Article 18

1.The Secretary-General shall submit nominations of Assistant Secretaries General to the Council of Foreign Ministers, for appointment, for a period of 5 years in accordance with the principle of equitable geographical distribution and with due regard to the competence, integrity and dedication to the objectives of the Charter. One post of Assistant Secretary General shall be devoted to the cause of Al-Auds Al-Sharif and Palestine with the understanding that the State of Palestine shall designate its candidate.

2.The Secretary-General may, for the implementation of the resolutions and decisions of the Islamic Summits and the Councils of Foreign Ministers, appoint Special Representatives, Such appointments along with mandates of the Special Representatives shall be made with the approval of the Council of Foreign Ministers.

3. The Secretary-General shall appoint the staff of the General Secretariat from among nationals of Member States, paying due regard to their competence, eligibility, integrity and gender in accordance with the principle of equitable geographical distribution. The Secretary-General may appoint experts and consultants on temporary basis.

Article 19

In the performance of their duties, the Secretary-General, Assistant Secretaries General and the staff of the General Secretariat shall not seek or accept instructions from any government or authority other than the Organization. They shall refrain from taking any action that may be detrimental to their position as international officials responsible only to the Organization. Member States shall respect this exclusively international character, and shall not seek to influence them in any way in the discharge of their duties.

Article 20

The General Secretariat shall prepare the meetings of the Islamic Summits and The Councils of Foreign Ministers in close cooperation with the host country insofar as administrative and organizational matters are concerned.

Dhaka University Institutional Repository

Article 21

The Headquarters of the General Secretariat shall be in the city of Jeddah until the liberation of the city of Al-Quds so that it will become the permanent Headquarters of the Organization.

CHAPTER XII

Article 22

The Organization may establish Subsidiary Organs, Specialized Institutions and grant affiliated status, after approval of the Council or Foreign Ministers, in accordance with the Charter.

Subsidiary Organs

Article 23

Subsidiary organs are established within the framework of the Organisation in accordance with the decisions taken by the Islamic Summit or Council of Foreign Ministers and their budgets shall be approved by the Council of Foreign Ministers.

CHAPTER XIII

Specialized Institutions

Article 24

Specialized institutions of the Organization are established within the framework of the Organization in accordance with the decisions of the Islamic Summit or Council of Foreign Ministers. Membership of the specialized institutions shall be optional and open to members of the Organization. Their budgets are independent and are approved by their respective legislative bodies stipulated in their Statute.

Affiliated Institutions

Article 25

Affiliated institutions are entities or bodies whose objectives are in line with the objectives of this Charter, and are recognized as affiliated institutions by the Council of Foreign Ministers. Membership of the institutions is optional and open to organs and institutions of the Member States. Their budgets are independent of the budget of the General Secretariat and those of subsidiary organs and specialized institutions. Affiliated institutions may be granted observer status by virtue of a resolution of the Council of Foreign Ministers. They may obtain voluntary assistance from the subsidiary organs or specialized institutions as well as from Member States.

Dhaka University Institutional Repository

CHAPTER XIV
Cooperation with Islamic and other Organizations
Article 26

The Organization will enhance its cooperation with the Islamic and other Organizations in the service of the objectives embodied in the present charter.

CHAPTER XV
Peaceful Settlement of Disputes
Article 27

The Member States, parties to any dispute, the continuance of which may be detrimental to the interests of the Islamic Ummah or may endanger the maintenance of international peace and security, shall, seek a solution by good offices, negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice. In this context good offices may include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General.

Article 28

The Organization may cooperate with other international and regional Organizations with the objective of preserving international peace and security, and settling disputes through peaceful means.

CHAPTER XVI
Budget & Finance
Article 29

1. The budget of the General Secretariat and Subsidiary Organs shall be borne by Member States proportionate to their national income.
2. The Organization may, with the approval of the Islamic Summit or the Council of Foreign Ministers, establish special funds and endowments (waqfs) on voluntary basis as contributed by Member States, individuals and Organizations. These funds and endowments shall be subjected to the Organization's financial system and shall be audited by the Finance Control Organ annually.

Article 30

The General Secretariat and subsidiary organs shall administer their financial affairs according to the Financial Rules of Procedure approved by the Council of Foreign Ministers.

Article 31

Dhaka University Institutional Repository

1. A permanent Finance Committee shall be set up by the Council of Foreign Ministers from the accredited representatives of the participating Member states which shall meet at the Headquarters of the Organization to finalize the programme and budget of the General Secretariat and its subsidiary organs in accordance with the rules approved by the Council of Foreign Ministers.
2. The Permanent Finance Committee shall present an annual report to the Council of Foreign Ministers which shall consider and approve the programme and budget.
3. The Finance Control Organ comprising financial/auditing experts from the Member States shall undertake the audit of the General Secretariat and its subsidiary organs in accordance with its internal rules and regulations.

CHAPTER XVII
Rules of Procedure and Voting
Article 32

1. The Council of Foreign Ministers shall adopt its own rules of procedure.
2. The council of Foreign Ministers shall recommend the rules of procedure of the Islamic Summit.
3. The standing committees shall establish their won respective rules of procedure.

Article 33

1. Two-third of the Member States shall constitute the quorum for the meetings of the Organization of the Islamic conference.
2. Decisions shall be taken by consensus. If consensus cannot be obtained ,decision shall be taken by a two-third majority of members present and voting unless otherwise stipulated in this Charter.

CHAPTER XVIII

Dhaka University Institutional Repository

Final Provisions
Privileges and Immunities
Article 34

1. The Organization shall enjoy in the Member States, immunities and privileges as necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its objectives.
2. Representatives of the Member States and officials of the organization shall enjoy such privileges and immunities as stipulated in the Agreement on Privileges and Immunities of 1976.
3. The staff of the General Secretariat, subsidiary organs and specialized institutions shall enjoy privileges and immunities necessary for the performance of their duties as may be agreed between the Organization and host countries.
4. A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the Council of Foreign Ministers if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The Council may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

withdrawal
Article 35

1. Any Member State may withdraw from the Organization by notifying the Secretary –General one year prior to its withdrawal . Such a notification shall be communicated to all Member States.
2. The State applying for withdrawal for withdrawal shall be bound by its obligations until the end of the fiscal year during which the application for withdrawal is submitted. It shall also settle any other financial dues it owes to the Organization.

Amendments
Article 36

Amendments to the present Charter shall take place according to the following procedure :

Dhaka University Institutional Repository

a. Any Member State may propose amendments to the present Charter to the Council of Foreign Ministers;

b. When approved by two-third majority of the Council of Foreign Ministers and ratified by a two-third majority of the Member States, it shall come into force.

Interpretation
Article 37

1. Any dispute that may arise in the interpretations, application or implementation of any Article in the present Charter shall be settled cordially, and in all cases through consultation, negotiation, reconciliation or arbitration;

2. The provisions of this Charter shall be implemented by the Member States in conformity with their constitutional requirements.

Language
Article 38

Languages of the Organization shall be Arabic, English and French.

Transitional Arrangement
Ratification And Entry Into Force
Article 39

1. Theis Charter shall be adopted by the Council of Foreign Ministers by two-third majority and shall be open for signature and ratification by Member States in accordance with the constitutional procedures of each Member State.

2. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Organization.

3. This Charter replaces the Charter of the Organization of the Islamic Conference which was registered in conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations on February 1, 1974.

Done at the city of Dakar (Republic of Senegal), the Seventh day of Rabi Al-Awal, One Thousand Four Hundred and Twenty-nine Hijra, corresponding to Fourteenth day of March Two Thousand and Fight.